বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

টাঙ্গাইল

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

টাঙ্গাইল জেলা

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
মো. আবদুল করিম মিঞা

সংগ্রাহক
আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন তরফতার
শফিউদ্দিন তালুকদার
মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন
স্বাধীন আজম
মোহাম্মদ আবু তাহের

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
টাঙ্গাইল

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২২/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩২৫

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
চারশত দশ টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : TANGAIL (Present state of Folklore in Tangail District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain., Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2013. Price : Tk. 410.00 only. US$: 10

ISBN-984-07-5334-7

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, æFolklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায়

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক

www.pathagar.com

কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল, বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান।

www.pathagar.com

২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিন্নি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগের অফিসার শারমিন আক্তার রুমি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে টাঙ্গাইলের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৯১

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. বনভূমি ও গাছপালা
ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঙ. জনবসতির পরিচয়
চ. নদ-নদী ও খাল-বিল
ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
জ. ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্থাপনা
ঝ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
ট. মুক্তিযুদ্ধ

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৯২-১৫৮

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকছড়া
ঘ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material folk culture) ১৫৯-১৭৩

লোকশিল্প (folk art)
১. কাঁসা ও পিতল শিল্প
২. তাঁত শিল্প
৩. মিষ্টি শিল্প
৪. পাটি শিল্প
৫, শিকা শিল্প
৬. বাঁশ শিল্প
৭. নকশিকাঁথা
৮. মৃৎশিল্প
৯. দারুশিল্প

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume) ১৭৪-১৭৬

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৭৭-১৮০
১. মাটির ঘর
২. দোচালা ছনের ঘর
৩. খড়ের পুঞ্জি বা পালা

লোকসংগীত ও গাথা/গীতিকা (folk song) ১৮১-৩৬২
১. মেয়েলি গীত
২. ভাটিয়ালি গান
৩. ঘাটুগান
৪. জারিগান
৫. ধুয়াগান
৬. নবান্নের গান
৭. মাগনের গান
৮. বারোমাসি গান
৯. ভাটারা গান
১০. নাচারি
১১. মালসি গান
১২. বিচ্ছেদ গান
১৩. হুলিগান
১৪. ছাদ পেটানোর গান
১৫. ধান ভানার গান
১৬. নাক, কান, ফুঁড়ানোর গান
১৭. বৃষ্টি নামানোর গান
১৮. একদিল গান
১৯. সারিগান
২০. বাউল গান
২১. মুর্শিদি গান

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ৩৬৩-৩৬৫
ক. বাঁশি
খ. একতারা
গ. হারমোনিয়াম
ঘ. ঘুঙুর
ঙ. ঢোল
চ. খোল
ছ. জুরি ও মন্দিরা
জ. গাবগুবাগুব
ঝ. টিকারা
ঞ. কাশর

www.pathagar.com

লোকউৎসব (folk festival) ৩৬৬-৩৭০

ক. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব
খ. নবান্ন
গ. শব-ই বরাত
ঘ. গায়েহলুদ
ঙ. ঈদ উৎসব
চ. শারদীয় দুর্গোৎসব
ছ. রথযাত্রা

লোকমেলা (folk fair) ৩৭১-৩৭৩

ক. জামাই মেলা
খ. মদনা মায়ের মেলা
গ. নটকা গোটার মেলা
ঘ. বার তীর্থের মেলা

লোকাচার (ritual) ৩৭৪-৩৮০

১. সাধভক্ষণ
২. খতনা
৩. পৌষ-পার্বণ
৪. অন্নপ্রাশন
৫. আকিকা
৬. ষষ্ঠি
৭. মঙ্গলাচরণ
৮. বউবরণ
৯. বৌভাত
১০. ভাত-কাপড়

লোকখাদ্য (folk food) ৩৮১-৩৮৩

লোকনাট্য (folk theatre) ৩৮৪-৪৪৫

লোকক্রীড়া (folk games) ৪৪৬-৪৬৪

ক. লৌকিক খেলা
১. লাঠি খেলা
২. হা-ডু-ডু খেলা
৩. দাড়িয়াবান্ধা
৪. চড়ুই খেলা
৫. শিশু ঘন্টি
৬. গামছাবারি খেলা
৭. পানি গোল্লাছুট খেলা

www.pathagar.com

৮. বিয়াবিয়া খেলা
৯. টুনটুনি পাখি খেলা
১০. চাক্কা খেলা
১১. গোল্লাছুট
১২. কুতকুত খেলা
১৩. তিনগুটি খেলা
১৪. চারগুটি খেলা
১৫. ধাপ্পা বা ফুলনা খেলা
১৬. মার্বেল খেলা
১৭. ষাঁড়ের লড়াই
১৮. মইদৌড়
১৯. নৌকাবাইচ
খ. খেলাধুলার দম

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৪৬৫-৪৬৯

ক. তাঁতি, খ. জেলে, গ. কামার, ঘ. কুলু, ঙ. কুমার, চ. নাপিত, ছ. স্বর্ণকার, জ. কাঠমিস্ত্রি/সূত্রধর, ঝ. মৌয়াল

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ৪৭০-৪৮০

ক. লোকচিকিৎসা
খ. তন্ত্রমন্ত্র

ধাঁধা (riddle) ৪৮১-৫১৯

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings and proverb) ৫২০-৫৪০

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৫৪১-৫৪২

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৫৪৩-৫৫৭

ক. নৌকা, খ. ভেলা, গ. পলো, ঘ. ঢেঁকি, ঙ. জাতা, চ. চালুনি, ছ. ডোল, জ. হুকা, ঝ. জাঁতি বা ছরতা, ঞ. লাঙল, ট. মই, ঠ. কোদাল, ড. গরুর গাড়ি/মহিষের গাড়ি, ঢ. ঘুঁটে বা গোবরের লড়ি, ণ. নলকাইটা, ত. ধিয়াইর, থ. ওছা/হরকা, দ. খুচইন/খুইয়া, ধ. ধর্মজাল বা ছিপজাল, ন. কোচ, প. খলুই, ফ. ছিক্কা বা শিকা, ব. মাথাল, ভ. হাতপাখা

লোকভাষা (folk language) ৫৫৮-৫৬০

ক. লোকনাম
খ. লোকগালি

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

'টাঙ্গাইল' নামকরণ সম্পর্কে রয়েছে নানারকম জনশ্রুতি। ইংরেজ আমলে এদেশের লোকেরা উঁচু শব্দের পরিবর্তে 'টান' শব্দই ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল বেশি। এখনো টাঙ্গাইল অঞ্চলে 'টান' শব্দের প্রচলন আছে। খন্দকার আবদুর রহিম লিখেছেন : তবে একথা অস্বীকার করার জো নেই যে খোসন্দপুর থেকে এনায়েতপুর পর্যন্ত যে পায়ে চলা রাহা টান আইল একদিন আটিয়া পরগনার শাসনকর্তার যাতায়াতের গরজে সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা ক্রমেই হয়ে উঠেছিল জনগণের রাহা। কাগমারী বন্দর ও শাহগঞ্জের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে টান আইল সাধারণ মানুষের যাতায়াতের হরহামেশা হয়ে থাকতো গুলজার।[১] তিনি আরো বলেন আজকের আদালত ভবনগুলো এনায়েতপুর গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। ১৮৬৯ সালে টান আইলকে থানা ঘোষণা করা হয়। তারপর হলো টান আইল মহকুমা। ১৮৭১ সালে যে আদমশুমারি হয়েছিল সেই সময়ে অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে ইংরেজি সরকারের বুদ্ধিজীবী লিপিকরেরা খুশিমত পরিবর্তন করেছেন। ফলে 'টান আইল' রূপান্তরিত হয়েছে টাঙ্গাইলে।[২] আবার কারো কারো মতে 'টান' এবং 'ইল' নামক দু'জন ইংরেজ সাহেব সন্তোষ জমিদারিতে এসেছিলেন। থানার স্থান নির্বাচনের জন্য তাদের নামানুসারে নাম হয়েছে টাঙ্গাইল। নামকরণের সর্বপ্রাচীন প্রবাদটি হলো চমচম-টমটম শাড়ি এই তিনটিতে টাঙ্গাইলের বাড়ি। টাঙ্গাইলের নামকরণ নিয়ে আরো অনেক মতভেদ রয়েছে। এর পূবে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ, উত্তরে জামালপুর, দক্ষিণে ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী টাঙ্গাইল জেলার আয়তন ৩৪১৪.৩৫ বর্গ কি.মি.। মোট জনসংখ্যা ৩৬,০৫,০৮৩ জন এর মধ্যে পুরুষ ১৭,৫৭,৩৭০ জন, মহিলা ১৬,৬৯,৭৯৪ জন। জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০৫৬ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৯। শিক্ষার হার ৪৬.৮%। টাঙ্গাইল জেলা মোট ১২ (বারো) টি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত (টাঙ্গাইল, মধুপুর, গোপালপুর, ভূঞাপুর, ঘাটাইল, কালিহাতী, দেলদুয়ার, নাগরপুর, মির্জাপুর, সখিপুর, বাসাইল ও ধনবাড়ি)। থানা ১৪ (চৌদ্দ) টি, পৌরসভা ১১ (এগারো) টি ও ইউনিয়ন ১১০ (একশত দশ) টি। জেলার মোট জমির পরিমাণ ৮৯২৫৪৮ একর। আবাদি জমির পরিমাণ ৫৫৩৭৯০ একর।

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার আয়তন ৩০২ বর্গকিলোমিটার। উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৪,৩৭,৮৮০ জন। তারমধ্যে পুরুষ ২,২৫,৬৮০ জন, মহিলা ২,১২,২০০ জন। টাঙ্গাইল সদর থানা ১৯৬২ সালেগঠিত হয়। পরে টাঙ্গাইল সদর থানাটি ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার উত্তরে কালিহাতী উপজেলা, দক্ষিণে নাগরপুর ও দেলদুয়ার, পূর্বে বাসাইল, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও পাবনার চৌহালি উপজেলা অবস্থিত।

www.pathagar.com

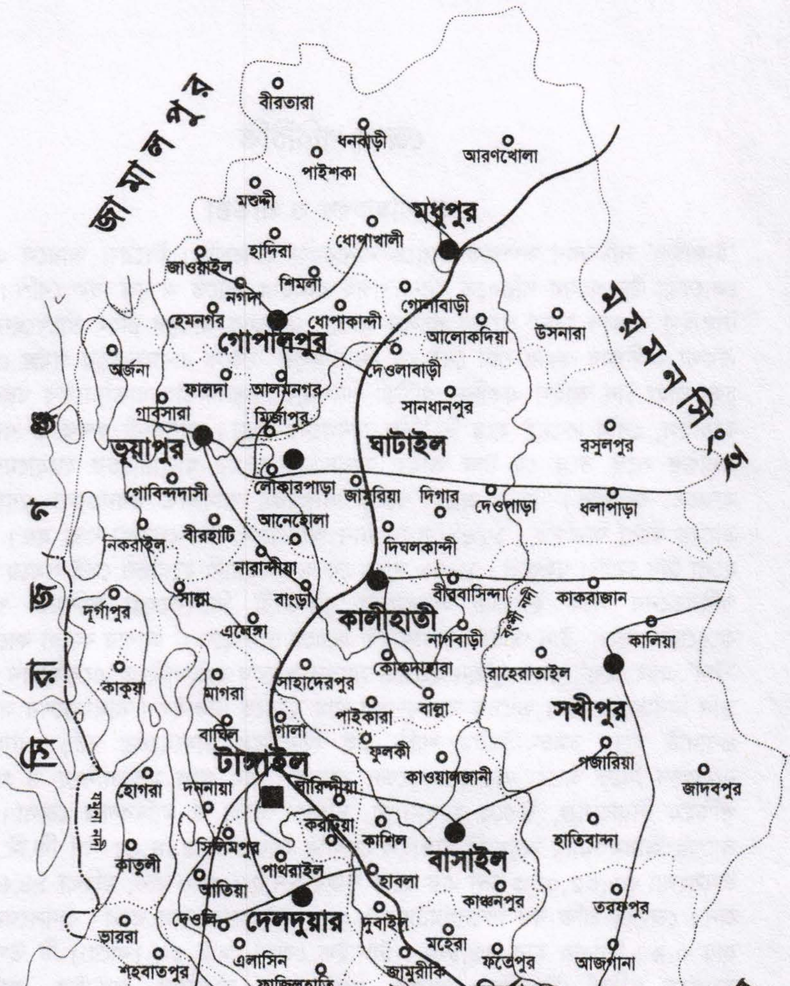

টাংগাইল জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় ১টি পৌরসভা, ১১টি ইউনিয়ন এবং ২৮৫টি গ্রাম রয়েছে। মোট মৌজার সংখ্যা ২৫৬টি, হাট-বাজার ২৩টি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩,৪৭৭টি। শিক্ষার হার ৩৪.২৮%। সরকারি কলেজ ৩টি, মহিলা মহাবিদ্যালয় ২টি, সহশিক্ষা মহাবিদ্যালয় ৫টি, স্কুল এন্ড কলেজ ১টি, বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৪টি, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১০টি, কামিল মাদ্‌রাসা ১টি, সিনিয়র ও দাখিল মাদ্‌রাসা ১৫টি, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা ১১টি, সরকারি এতিমখানা ২টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৬টি, রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩১টি, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১টি, উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি, পি.টি.আই ১টি, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ১টি, ভোকেশনাল ১টি, সংযুক্ত ভোকেশনাল ৫টি, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় ১টি।

টাঙ্গাইল জেলার দক্ষিণে অবস্থিত উপজেলার নাম মির্জাপুর। এটি বাংলাদেশের প্রাচীন থানা হিসেবে পরিচিত। মির্জাপুরের নামকরণ নিয়ে দুধরনের বক্তব্য রয়েছে। প্রথমত জানা যায়, মোগল আমলে রাজস্ব কালেক্টর মির্জা হুসেন বর্তমান এলাকা লিজ নেন। মনে করা হয় মির্জা হুসেনের নামানুসারে এলাকার নাম হয়েছে মির্জাপুর।[৩] দ্বিতীয়ত ১৪০৯ সালে নবাব আলীবর্দী খানের দৌহিত্র মির্জা শওকত জং বাহাদুর নৌ-বিহারে পাটনা থেকে তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় আসেন। নদী-নালা, খাল-বিল, সবুজ-শ্যামল গ্রাম বাংলা তাকে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে এ এলাকাটি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি এখানে নোঙর করে রাত্রি যাপন করেন। এ ঘটনার পর থেকেই বংশাই-লৌহজং বিধৌত এই অঞ্চলটির নাম মির্জাপুর হয়।[৪] এই উপজেলার আয়তন ৩৬৭.২৫ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৩,৮২,৭৫০ জন। ১৮৯১ সালে এখানে থানা সদর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর প্রশাসনিক থানা হয় ১৯১২ সালে। ১৯৮২ সালে মির্জাপুর থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম উন্নীত থানা বা উপজেলা। ১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মির্জাপুর ফাঁড়ি থানাকে পূর্ণাঙ্গ থানায় রূপান্তর করা হয়। বর্তমান মির্জাপুর উপজেলা সদরে ১টি পৌরসভা, ১৩টি ইউনিয়ন ও ২২৩টি গ্রাম আছে।

মির্জাপুর উপজেলা ২৪°০১´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°১২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫৮´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০°১৪´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। মির্জাপুর উপজেলার উত্তরে বাসাইল ও সখিপুর উপজেলা, পূর্বে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর, দক্ষিণে ঢাকা জেলার ধামরাই, পশ্চিমে দেলদুয়ার ও নাগরপুর উপজেলা ঘিরে আছে।

পাকুল্লার মসজিদ, পাকুল্লার মঠ, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস ইত্যাদি হচ্ছে এ উপজেলার দর্শনীয় স্থান।

উত্তর টাঙ্গাইলের একটি উপজেলার নাম গোপালপুর। এটি ১৯২৮ সালে থানা হয় আর ১৯৮৩ সালে উপজেলা হিসেবে গঠিত হয়। মোগল আমলে দরবেশের বেশ-ধারণকারী কোনো এক আফগান গোপাল শাহ নাম নিয়ে এ স্থানে এসে আস্তানা গাড়েন। তার নামানুসারে স্থানের নাম হয়েছে গোপালপুর। অন্য জনশ্রুতি আছে গোপাল চক্রবর্তী নামে (চট্টগ্রাম থেকে আগত) কোনো এক লোক এ স্থানটি নাটোরের রাজার কাছ থেকে পত্তন আনেন এবং বসতি স্থাপন করেন। তার নামানুসারেই স্থানের

www.pathagar.com

নাম হয়েছে গোপালপুর।[৫] হেমনগর জমিদার বাড়ি এবং খামারপাড়া মসজিদ এ অঞ্চলের দর্শনীয় স্থান। ৭টি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভা নিয়ে গোপালপুর উপজেলা। এই উপজেলার আয়তন ১৯,৩৩৭ বর্গকিলোমিটার। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী গোপালপুর উপজেলার লোকসংখ্যা ৩,৪১,৩৭৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১, ২৮,৮৪৫ জন আর মহিলা ১,২৩,৯০২ জন। এর উত্তর ও পূর্বে মধুপুর এবং ঘাটাইল উপজেলা, দক্ষিণে ঘাটাইল এবং ভূঞাপুর, পশ্চিমে সরিষাবাড়ি উপজেলা ও জামালপুর জেলা। মৌজার সংখ্যা ১২৭টি। গ্রাম ১৫৫টি। ১৬টি হাট ও বাজার। প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৫টি। সরকারি ৭৪টি, বেসরকারি ৬১টি। কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫টি। এর মধ্যে এনজিও পরিচালিত ২টি। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪৪টি। বালক বিদ্যালয় ৩২টি এবং বালিকা বিদ্যালয় ১২টি। মাদ্রাসার সংখ্যা ২৩টি। সিনিয়র মাদ্রাসা ৭টি, দাখিল মাদ্রাসা ১৩টি এবং মহিলা মাদ্রাসা ৩টি। কলেজের সংখ্যা ৫টি। মহিলা কলেজ ১টি। স্কুল এন্ড কলেজের সংখ্যা ২টি। শিক্ষার হার ৪৩%।

টাঙ্গাইল জেলার মধ্যভাগে অবস্থিত একটি উপজেলার নাম কালিহাতী। পুখুরিয়া জইনশাহী, আতিয়া, আলিফশাহী প্রভৃতি পরগণার জমিদারেরা তাদের নিজ নিজ পাহাড়ি জঙ্গলা এলাকার খেদায় যেসব জঙ্গলি-হাতি ধরতেন তার বিশেষ অংশ তারা তাদের জমিদারি এলাকার খাজনা স্বরূপ প্রদান করতেন। সেসব হাতি জমা হতো এই কিল্লায়। ইংরেজ সরকার পুনর্বার যখন ভূমি জরিপ করে তখন কিলায়ে হাতি বা কিলাইহাতী পরিবর্তিত হয়ে কালিহাতীতে রূপান্তরিত হয়েছে।[৬] কিংবদন্তি হতে জানা যায়, এক সময় এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় তাদের কালীপূজা অত্যন্ত জাকজমকের সাথে উদ্‌যাপন করত। বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এখানে পূজা উদ্‌যাপন করতে আসত। সম্পদশালী ব্যক্তিরা হাতিতে আরোহণ করে এই পূজায় আসত। ফলে পূজা উপলক্ষে বহু হাতী এখানে জড়ো হতো। তাই সাধারণ বিশ্বাস মতে, কালী ও হাতি শব্দ দু'টি মিলে কালিহাতী নামের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয়।[৭]

১৭১৭ সালে পুরোপুরি বাংলা-বিহার উড়িষ্যা সুবার সুবাদারি হিসাবে নওয়াব নাজিম ঢাকা হতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরসহ সুবাহ জরিপ করে এর শাসনসৌকর্য ও আবাদ-সুবাদ আর খাজনা-খেরাজের সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করেন। তখন থেকে পুখুরিয়া, জইনশাহী, আতিয়া, আলিফশাহী, বড়বাজু, জাফরশাহী প্রভৃতি জলা-জঙ্গলা পাহাড়ি এলাকার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এলাকাগুলোর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হয়। হয়ত তখনই এখানে কিল্লাক (কিলআহ) স্থাপিত হয়। সম্ভবত এই কিল্লাহর প্রথম কিল্লাহদারের নাম ছিল সিকান্দার বা শাহ সিকান্দার। তাই নিকট অতীতেও কালিহাতীকে কেউ কেউ সিকান্দার কালিহাতী বলত।

কালিহাতী উপজেলার আয়তন ৩০১.২২ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৩,৭৬,৩৬০ জন। এই উপজেলায় দুইটি পৌরসভা, এগারটি ইউনিয়ন ও দুইশত আটাত্তরটি গ্রাম রয়েছে। ১৯২৮ সালে কালিহাতী থানা হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপান্তর হয়। এ উপজেলা প্রায় ২৪°১৭ ও ২৪°২৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৫ ও ৯০°০৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কালিহাতীর উত্তরে ভূঞাপুর ও ঘাটাইল উপজেলা, দক্ষিণে বাসাইল ও টাঙ্গাইল সদর, পূর্বে সখিপুর, পশ্চিমে যমুনা নদী, সিরাজগঞ্জ সদর ও বেলকুচি উপজেলা।

www.pathagar.com

যমুনা সেতু, কদিম হামজানি মসজিদ, বল্লা তাঁত শিল্প এলাকা, চারান বিল প্রভৃতি হচ্ছে কালিহাতী উপজেলার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

টাঙ্গাইল জেলার উত্তর সীমানার একটি উপজেলার নাম মধুপুর। ইহা একটি প্রাচীন জনপদ। মধু থেকে নাম হয়েছে মধুপুর। শালবন অধ্যুষিত মধুপুর জঙ্গলে এক সময়ে প্রচুর মধু পাওয়া যেত। এসব মধু সংগ্রহ করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করত। পরবর্তীতে মধুর প্রাকৃতিক আধার জঙ্গল ও টিলার এই দুর্ভেদ্য জনপদ মধুপুর নামে অভিহিত। আবার কারো কারো মতে বর্তমান মধুপুর পৌর শহরে মধুপুর গ্রামে মধু পাগলা নামে এক সাধুর আখড়া ছিল। এই মধু পাগলার নামানুসারে নাম হয় মধুপুর।[৮] ইতিহাসবিদগণ বলেন, মধু শব্দের মাধ্যমে আসর বা মদ বোঝানো হতো। রাজা ভগবত দত্ত মদ পান করে আমোদ-ফূর্তি করার জন্য এই অঞ্চলে একটি বিলাসবহুল পুরী (বাড়ি) বানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মধু বা মদ পান করার সেই পুরীটি মধুপুর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কালের বিবর্তনে সাধারণ মানুষের উচ্চারিত ভাষার পরিবর্তনে এই অঞ্চল মধুপুর বলে পরিগণিত হয়।[৯]

১৯১৫ সালে এখানে থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থানাটি ঘোষণা হয় ১৮৯৮ সালে। ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপান্তর হয়। মধুপুর উপজেলার আয়তন ৩৭০.৪৭ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২,৬৫,৮৬৭ জন। এই উপজেলার পশ্চিমে ধনবাড়ি ও গোপালপুর উপজেলা, দক্ষিণে গোপালপুর ও ঘাটাইল, পূর্বে ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া ও মুক্তাগাছা এবং উত্তরে মুক্তাগাছা ও জামালপুর সদর উপজেলা। এই উপজেলা প্রায় ২৪°৪৭″ ও ২৪°৩১″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°১৩″ও ৮৯°৫৭″ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। মধুপুর উপজেলায় ১টি পৌরসভা ও ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে।

সুলতানি আমলে হিন্দু সামন্ত-প্রধান ধনপতি সিংহের নামানুসারে এই জনপদের নাম হয়েছে ধনবাড়ি।[১০] ভিন্ন মতে, ধনুয়ার খাঁ নামক এক পাঠান যোদ্ধা ভূঞাপুর উপজেলার ফলদার রাজা যশোধরের সেনাপতি ছিলেন। যশোধরের মৃত্যুর পর ধনুয়ার খাঁ ধনবাড়িতে একটি স্বাধীন জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধনুয়ার খাঁর নামানুসারে নাম হয়েছে ধনবাড়ি।[১১] আরেকটি মত হলো মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ধনপতি ঠাকুর নামে একজন ব্রাহ্মণ পুখুরিয়া পরগণায় জমিদারি স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় ধনবাড়ি।[১২]

প্রশাসনিক-বিকেন্দ্রীকরণের ধারাবাহিকতায় টাঙ্গাইল জেলার সর্বশেষ (দ্বাদশ) উপজেলা হলো ধনবাড়ি। ২০০০ সালে এই ধনবাড়ি থানায় রূপান্তরিত হয়। তারপর ২০০৬ সালের ৬ই জুন ধনবাড়ি একটি পূর্ণাঙ্গ উপজেলার মর্যাদা পায়। ২০০৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলা হিসেবে এটির উদ্বোধন হয়।

এই উপজেলার আয়তন ১৩০.২০ বর্গকিলোমিটার। মতান্তরে ১২৭.৯৫ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২,০৩,২৮৪ জন। এই উপজেলার পূর্বে মধুপুর উপজেলা, উত্তরে জামালপুর সদর, দক্ষিণে গোপালপুর এবং পশ্চিমে সরিষাবাড়ি উপজেলা অবস্থিত। এটি প্রায় ২৪°৪৬″ও ২৪°৩১″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°১০″ও ৮৯°৫৬″পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ধনবাড়ি উপজেলায় ১টি পৌরসভা, ৭টি ইউনিয়ন ও ১৬৮টি গ্রাম রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান ধনবাড়ি মসজিদ, নবাব প্যালেস।

www.pathagar.com

ঘাটাইল নামকরণের পেছনে নানা ধরনের জনশ্রুতি রয়েছে। তবে *আকবরনামা*'র বিবরণ অনুসারে ঘাটাইল সদর সংলগ্ন টোক নদীর তীরে ভূঁইয়া বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঈশা খাঁর একটি নৌঘাঁটি ছিল। এই নৌঘাঁটির পরেই ছিল একটি উঁচু আইল। ঘাটের পরেই আইল, তাই এই স্থানের নাম ঘাটাইল হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।[১৩] ভিন্ন মতে জানা যায়, অতীতে ঘাটাইল যমুনা নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় তথ্য থেকে জানা যায়, এখানে একটি ঘাট ছিল, যার সাহায্যে লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরাজগঞ্জ থেকে আসা-যাওয়া করত। কৃষি জমির উঁচু সীমানা বা আইল ঘাটে যাওয়া আসার রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কালক্রমে এই ঘাট ও আইল শব্দ দুটির সমন্বয়ে এই জায়গার নাম হয় ঘাটাইল।[১৪]

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান যমুনা নদী এক সময় বটতলা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তখন বটতলা ঘাটে প্রচুর নৌকা বাঁধা থাকত এবং ঘাটের পরেই ছিল উঁচু আইল। তাই ঘাটের শেষে 'আইল' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ঘাটাইল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে সুধী মহলের ধারণা। 'ঘাট'-এর শেষে 'আইল' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ঘাটাইল' নামের উৎপত্তি।[১৫] টাঙ্গাইল জেলার উত্তরাংশে ঘাটাইল উপজেলা অবস্থিত। ঘাটাইল উপজেলার আয়তন ৪৫১.৭১ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা ৩,৪১,৩৭৯ জন। ১৯০৬ সালে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘাটাইল-ফাঁড়ি থানাকে পূর্ণাঙ্গ থানায় পরিণত করা হয়। এরপর ১৯৮২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ঘাটাইলকে প্রথমে থানায় এবং ১৯৮৩ সালে উপজেলার রূপান্তরিত করা হয়।

ঘাটাইলের উত্তরে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও মধুপুর উপজেলা এবং ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া, পূর্বে ময়মনসিংহ উপজেলার ফুলবাড়িয়া ও ভালুকা, দক্ষিণে সখীপুর ও কালিহাতী এবং পশ্চিমে কালিহাতী ও ভূঞাপুর উপজেলা অবস্থিত। এই উপজেলাটি প্রায় ২৪°২৩" ও ২৪°৩৫" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫২" ও ৯০°১৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ঘাটাইল উপজেলায় বর্তমানে ১টি পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়ন এবং ৪২৭টি গ্রাম রয়েছে।

সাগরদিঘী, ঝরকা, গুপ্ত বৃন্দাবন, পাকুটিয়া আশ্রম, ধলাপাড়া চৌধুরী বাড়ি, ঘাটাইল সেনানিবাস হচ্ছে এ এলাকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

টাঙ্গাইল জেলার পূর্বাংশে অবস্থিত উপজেলার নাম বাসাইল। বাসাইল নামকরণের ইতিহাসে বিভিন্ন ধারণা পাওয়া যায়, যা স্বতঃসিদ্ধ নয়। তবে টাঙ্গাইল জেলার অন্যান্য স্থানের নামকরণের সঙ্গে আইল এর একটি সংযোগ রয়েছে। যেমন– ঘাটাইল, ডুবাইল, নিকরাইল, পাথরাইল এমন অজস্র আইল নামের থেকেই হয়তো বাসাইল নামের উৎপত্তি। এছাড়া এ বিষয়ে আরো কয়েকটি জনশ্রুতি আছে। প্রচলিত ধারণা মতে আইলের দ্বারা পরিবেষ্টিত বাসস্থানই হচ্ছে বাসাইল। ভূমি গঠনের প্রাক্কালে বাঁশপুতে আইল নির্ধারণের কারণেই জায়গাটির নাম বাসাইল। সুলতানি আমলে পত্তনি জমি গ্রহিতার নাম অনুসারে স্থানের নাম হতো। যেমন– সাকের আলীর নাম অনুসারে সাকরাইল তেমনি বাশি মণ্ডলের নাম অনুসারে বাসাইল।[১৬] ভিন্ন মতে, জমির আইল উঁচু করে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকেই বাসাইল নামের উৎপত্তি। এসব উঁচু আইল বর্ষায় ভাসমান বলে প্রতীয়মান হয়। তাই ভাসা আইল

www.pathagar.com

থেকে বাসাইল।[১৭] এক সময় বাসাইল ও বাজার এলাকা ছাড়া প্রায় পুরো এলাকা পানিতে নিমজ্জিত ছিল। তখন মানুষ ভেসাল কিংবা ভাসাল জাল দিয়ে মাছ ধরত। ভাসাল জাল ব্যবহারের আধিক্যের কারণে এই স্থানটিকে ভাসাল বা বাসাইল বলা হয়।[১৮]

এই উপজেলার আয়তন ১৫৭.৭৮ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১,৫৫,৯০০ জন। ১৯১৩ সালে টাঙ্গাইল থানা থেকে ১০টি ইউনিয়ন নিয়ে নবরূপ লাভ করে বাসাইল থানা। ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৮৩ সালে বাসাইল থানাটি উপজেলার মর্যাদা পায়। বাসাইল উপজেলায় ৬টি ইউনিয়ন ও ১০৭টি গ্রাম রয়েছে। বাসাইল উপজেলা ২৪°০৭ ও ২৪°১৯ অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৯°৫৮ ও ৯০°০৭ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এ উপজেলার সীমানা উত্তরে কালিহাতী উপজেলা, দক্ষিণে মির্জাপুর উপজেলা, পূর্বে সখীপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা রয়েছে।

বাসুলিয়া, নখখোলা ব্রিজ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ এখানকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

টাঙ্গাইল জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত উপজেলার নাম সখিপুর। সখিপুরের নামকরণ সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে যে, একদল সখি তাদের হারানো প্রেমাসম্পদকে অন্বেষণের জন্য সখিপুর অঞ্চলে এসে আত্মাহুতি দেয়। সেই থেকে এ অঞ্চলের নাম হয় সখিপুর। সখি থেকে সখিপুর।[১৯] সখিপুরের বৃদ্ধরা বলেন, শুকলাল কোচ ছিল অত্যন্ত প্রতাপশালী ধনী ও তৎকালের পঞ্চায়েত। বর্তমান উপজেলায় ছিল তাঁর বাড়ি। তাঁর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সখিবালা অত্র এলাকা শাসন করত। ভীষণ প্রতাপশালী ছিলেন তিনি। তার এক লাঠিয়াল বাহিনী ছিল। প্রয়োজনে শাসন করার জন্য তাদেরকে ব্যবহার করত। সখিবালা নাম অনুসারেই সখিপুর হয়েছে।[২০] আবার স্থানীয় লোকজনের ধারণা, এই এলাকার মানুষ একে অপরের সাথে খুবই সৌহার্দ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। একে অন্যের সাথে দেখা হলে সখি (বন্ধু) বলে সম্বোধন করে। এই সখি থেকেই এক সময় এই জায়গার নাম হয় সখিপুর।[২১] আরেকটি মত হলো– মানুষের হাতে কোদাল দিয়ে যখন এ অঞ্চলকে বসতি স্থাপনের যোগ্য করে গড়ে তোলার অভিযান শুরু হয়, তখন এখানে গহীন বনের মাঝে একটি পুরোনো পুকুর আবিষ্কৃত হয়। ধারণা করা হয়, শ্রীকৃষ্ণ তার অষ্টসখী নিয়ে এ পুকুরে জলকেলীতে নিমগ্ন হতো। মূলত সেই সখি থেহৈ আজকের সখিপুর।[২২]

সখিপুর উপজেলার আয়তন ৪২৯.৭৮ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২,৪১,৫৬০ জন। এ উপজেলায় ১টি পৌরসভা, ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৩০ জানুয়ারি কালিহাতী থানার ৩টি ইউনিয়ন এবং বাসাইল থানার ৩টি ইউনিয়ন নিয়ে সখিপুর থানার জন্ম হয়। পরে ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট উপজেলার মর্যাদা লাভ করে। এই উপজেলার পশ্চিমে বাসাইল ও কালিহাতী উপজেলা, উত্তরে ঘাটাইল ও ভালুকা, পূর্বে ভালুকা এবং দক্ষিণে মির্জাপুর উপজেলা অবস্থিত।

পাহাড় কাঞ্চনপুর বিমান বাহিনীর ঘাঁটি হচ্ছে এখানকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

www.pathagar.com

দেলদুয়ার উপজেলা একটি প্রাচীন জনপদ। এই উপজেলার একটি গ্রাম আতিয়াকে কেন্দ্র করে মোগল আমলে শাসিত হতো টাঙ্গাইল অঞ্চল। কিংবদন্তি থেকে জানা যায় অতীতে একজন কামেল দরবেশ তাঁর কিছু অনুসারীসহ এই অঞ্চলের দেলবাড়ি নামক এক গ্রামে আসেন। দরবেশ এখানে একটি খানকাহ্ স্থাপন করে এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ইসলামি গজলের আসর বসাতেন। তাঁর পরিবেশিত গজলের মূল কথা ছিল 'দিলকা দুয়ার খোলা রাখো ভাই'। স্থানীয় জনগণ এই গজল শুনে মুগ্ধ হতো। সময়ের বিবর্তনে খানকাহ্ এলাকার গজলের নামানুসারে সংক্ষেপে দিলকা দুয়ার > দিলদুয়ার > দেলদুয়ার নামে এটি পরিচিত হয়।[২৩] অন্যমতে, দিল অর্থ মন, দুয়ার অর্থ দরজা। দিলদুয়ার অর্থ মনের দরজা। এ থেকেই এখানকার নাম হয়েছে দেলদুয়ার। ভিন্ন মতে জানা যায়, প্রায় সাড়ে চারশ বছর পূর্বে দেলদুয়ার বনজঙ্গলে ভরা ছিল। তখন দিলদার নামে এক আধ্যাত্মিক সাধক এখানে বসবাস শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে তার নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দিলদারের এলাকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ধারণা করা হয়, পরবর্তীতে কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রামটির নাম দেলদুয়ার রাখা হয়।[২৪]

দেলদুয়ার উপজেলার আয়তন ১৮৪.৫০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২,০২,২২০ জন। ১৯৮১ সালে দেলদুয়ার থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সালে থানাটি উপজেলায় রূপান্তর হয়। দেলদুয়ারের উত্তর-পশ্চিমে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে নাগরপুর উপজেলা, পূর্ব-দক্ষিণে মির্জাপুর উপজেলা অবস্থিত। দেলদুয়ার উপজেলায় ৮টি ইউনিয়ন ও ১৭০টি গ্রাম রয়েছে।

আতিয়া মসজিদ, বাবা আদম শাহ্ কাশ্মিরির মাজার, দেলদুয়ার জমিদার বাড়ি ইত্যাদি এখানকার দর্শনীয় স্থান।

টাঙ্গাইল জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের একটি উপজেলার নাম নাগরপুর। নাগরপুর চরাঞ্চল হলেও একসময় এখানে প্রচুর বন-জঙ্গল ছিল। সেখানে প্রচুর বিষধর সাপ বাস করত। সাপের ভয়ে মানুষ দিনের বেলায়ও চলাচল করত দলবেঁধে। এই সময় ভারতের পুরি থেকে 'নাগর মিয়া' নামে এক চিরকুমার বৃদ্ধ প্রায়ই এখানে আসতেন। তার গায়ে ছিল অস্বাভাবিক গন্ধ। তিনি যতোদিন এলাকায় থাকতেন ততোদিন সাপের উপদ্রব দেখা যেতো না। এই 'নাগর মিয়া' নামানুসারেই নাগরপুর নাম হয় বলে জনশ্রুতি আছে।[২৫] ভিন্ন মতে বলা হয়ে থাকে, অতীতে বর্তমান এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই জঙ্গল স্থানীয়ভাবে পরিচিতি নাগ-নাগিনী নামে এক ধরনের বিষাক্ত সাপে পূর্ণ ছিল। এই নাগ-নাগিনী থেকে এই জায়গার নাম হয় নাগরপুর।[২৬]

এ উপজেলার আয়তন ২৬৬.৭৭ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২,৫৮,৪৩১ জন। এখানে ১২টি ইউনিয়ন ও ২১৮টি গ্রাম রয়েছে। নাগরপুর উপজেলার উত্তরে টাঙ্গাইল সদর ও দেলদুয়ার উপজেলা, দক্ষিণে দৌলতপুর (মানিকগঞ্জ জেলা), পূর্বে মির্জাপুর, ধামরাই ও সাটুরিয়া, পশ্চিমে চৌহালী ও দৌলতপুর উপজেলা। এ উপজেলাটি ২৪°০৬´ ও ২৪°০৮´ অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫০´ ও ৯০°০০´ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ১৯০৬ সালে নাগরপুর থানা ও ১৯৮৩ সালে ১০ সেপ্টেম্বর উপজেলা উন্নীত হয়।

www.pathagar.com

উপেন্দ্র সরোবর, চৌধুরী বাড়ি, গয়হাটা মঠ, পাকুটিয়া জমিদার বাড়ি ইত্যাদি এখানকার দর্শনীয় স্থান।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

খাল-বিল, বাওর, নদী-নালা, পাহাড়ে বেষ্টিত একটি জেলার নাম টাঙ্গাইল জেলা। এই জেলাটির অতীত ইতিহাস খুবই গৌরবের। এটি প্রাচীন জনপদ হিসেবে পরিচিত। ইতিহাস সংস্কৃতি অতীত ঐতিহ্যের ক্রমধারার উত্তরাধিকারী। এ জেলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা। আর পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে রয়েছে যমুনা নদী। মাঝখানে খাল-বিল, বাওর ও শাখা নদীবেষ্টিত সমতল ভূমি। এই জেলাটির অবস্থান গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার প্রায় মধ্যভাগে। বাংলাদেশের জেলাসমূহের মধ্যে ১৯ তম জেলা টাঙ্গাইল। আগে এই জেলার ভূ-খণ্ডটি ছিল নাসিরাবাদ জেলা (বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলা)। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন টাঙ্গাইল আদিকালে আসাম কামরূপ জেলার অংশ ছিল। এখানে ১৮৬৯ সালের ৩রা মে মহকুমা স্থাপন হয়। ১৮৭০ সালের ১৫ই নভেম্বর আটিয়া থেকে টাঙ্গাইলে মহকুমাটি স্থানান্তর হয়। আর সেই মহকুমাটি ১৯৬৯ সালের ১ ডিসেম্বর জেলায় পরিণত হয়।[২৭]

টাঙ্গাইল জেলা ২৩°৫৯´৫০´´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°৪৮´৫১´´ উত্তর ও ৮৯°৪৮´৫০´´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০°৫১´২৫´´ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ জেলা উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ মাইল এবং প্রস্থে পূর্ব-পশ্চিমে ৩০ থেকে ৩৫ মাইল।[২৮] টাঙ্গাইল জেলার উত্তরে ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলা, পূর্বে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর, দক্ষিণে ঢাকা ও মানিকগঞ্জ, পশ্চিমে যমুনা নদী ও সিরাজগঞ্জ জেলা।[২৯] টাঙ্গাইল জেলার আয়তন ৩৪১৪৩৯ বর্গ কিলোমিটার। থানা বা উপজেলা ১২টি। পুলিশ স্টেশন ১৩টি। পৌরসভা ৮টি। ইউনিয়ন ১০৩টি। গ্রাম ২৭৪২টি। মৌজা ২১৯০টি। মোট জনসংখ্যা ৩৪,৯৬,৩৯১ জন ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী। পুরুষ ১৭,৭৯,৯৯৯ জন। মহিলা ১৭,১৬,৩৯২ জন। মোট জমি ৮৯২৫৪৮.৪৭ একর। বনভূমি ৪৭২৫৪ হেক্টর। মোট আবাদী জমি ৩৬৮০৫ হেক্টর। অনাবাদী জমি ২৩৩৮৮৭ হেক্টর।

শিক্ষার হার ২৯.৪২%। পুরুষ শিক্ষার ৩৬.০১%, মহিলা ২২.০৪%। টাঙ্গাইল জেলায় কলেজ ৫৪টি। এর মধ্যে সরকারি ৪টি, বেসরকারি ৪৯টি, ক্যাডেট কলেজ ১টি। টাঙ্গাইল জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৯৮টি। এর মধ্যে সরকারি ৫টি, বেসরকারি ২৯৩টি। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯৩টি। অনুদানপ্রাপ্ত ৫৩টি, অনুদানবিহীন ৪০টি। মাদ্রাসা মোট ১৭৪টি। দাখিল ১৩২টি, আলিম ১৮টি, ফাযিল ২৩টি, কামিল ১টি। প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪৩৪টি। সরকারি ৯৩৭টি, বেসরকারি রেজিঃ ৩৯৭টি, রেজিঃ বিহীন ১০০টি। তাছাড়া স্বল্পব্যয়ী (প্রজেক্ট) আছে ৮৬টি। প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ১টি। তাছাড়া কারিগরি শিক্ষা এবং কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। টাঙ্গাইল জেলায় হাসপাতাল আছে ১৫টি। ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৫৯টি। বেসরকারি হাসপাতাল ৪টি। তার মধ্যে জেনারেল হাসপাতাল ১টি, টাঙ্গাইল সদর। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১০টি। টিবি ক্লিনিক ১টি। স্কুল হেলথ্ ক্লিনিক ১টি। জেলকারা

www.pathagar.com

হাসপাতাল ১টি। পুলিশ হাসপাতাল ১টি। সিমিএস হাসপাতাল ১টি। বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে কুমুদিনী হাসপাতাল, মির্জাপুর অন্যতম। জলছত্র কুষ্ঠ হাসপাতাল ১টি। চক্ষু হাসপাতাল ১টি। যক্ষ্মা হাসপাতাল ১টি। শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন ১টি।[৩০] এগারটি উপজেলার সমন্বয়ে টাঙ্গাইল জেলা গঠিত। উপজেলাগুলো হলো– মির্জাপুর, নাগরপুর, বাসাইল, টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, গোপালপুর, ঘাটাইল, কালিহাতী, দেলদুয়ার, সখিপুর ও ভূঞাপুর। এগারটি উপজেলার মধ্যে জাতীয় সংসদে আসন রয়েছে আটটি। আসনগুলো হলো– টাঙ্গাইল-১: মধুপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল-২ : গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল-৩ : ঘাটাইল উপজেলা, টাঙ্গাইল-৪ : কালিহাতি উপজেলা, টাঙ্গাইল-৫ : টাঙ্গাইল সদর উপজেলা, টাঙ্গাইল-৬ : নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলা, টাঙ্গাইল-৭ : মির্জাপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল-৮ : বাসাইল ও সখিপুর উপজেলা।[৩১]

টাঙ্গাইল জেলার তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট। সর্বনিম্ন ৫৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট। গড় তাপমাত্রা ৫৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২২.৩৩ মিলিমিটার।[৩২]

গ. বনভূমি ও গাছপালা

টাঙ্গাইল বনবিভাগের অন্তর্গত বনাঞ্চল, ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া থানার অন্তর্ভুক্ত গোপীনাথপুর মৌজা বাদে, টাঙ্গাইল জেলার মধ্যে পড়েছে। এ বনএলাকা জেলার ২৪-১´ এবং ২৫-২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯-৫০´ এবং ৯১-১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বংশী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ধলাপাড়া রেঞ্জের বাট্টলী ও দেওপাড়া বীটের অধীন কাগমারী পরগণার বন ছাড়া টাঙ্গাইল জেলার অধিকাংশ বনই বংশী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। এই বন এলাকা ঢাকা ও মংমনসিংহের বন সংলগ্ন। বংশী নদীর পূর্ব তীরের বনের দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫ থেকে ১২ মাইল প্রস্থ। আবার বংশী নদীর পশ্চিম তীরস্থ বন উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১২ থেকে ১৪ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে এর প্রস্থ ৪ থেকে ৫ মাইল। ময়মনসিংহ বনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত মধুপুর ও রসুলপুর রেঞ্জের বনাঞ্চল টাঙ্গাইল জেলার মধ্যে পড়েছে।

টাঙ্গাইল জেলার বনভূমির অধিকাংশ উচ্চ সমভূমি নিয়ে গঠিত। এ এলাকা উত্তর থেকে দক্ষিণগামী, বন্ধুর–মাঝে মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে অসমতল মাটির স্তূপ যা স্থানীয়ভাবে 'চালা জমি' নামে পরিচিত। তবে এখানে যে সব উচ্চভূমি রয়েছে তাকে কোনোক্রমেই পাহাড় বলা চলে না। ভূপৃষ্ঠে থেকে এসব ভূমির সর্বোচ্চ উচ্চতা ২০ ফুট থেকে ২৫ ফুটের মধ্যে। ময়মনসিংহ বনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত মধুপুর ও রসুলপুর রেঞ্জের বন এলাকা সাধারণভাবে মধুপুর গড় অথবা গড় জোয়েনশাহী নামে পরিচিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে এই অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। টাঙ্গাইল বন এলাকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত উল্লেখযোগ্য নদীগুলো থেকে আবার শাখা নদী বেরিয়ে গেছে।

এখানকার মাটির রং হরিদ্রাভ এবং বন এলাকার সর্বত্রই এ ধরনের মাটি দেখা যায়। মধুপুর গড়ের মাটি ঈষৎ হলুদ বর্ণযুক্ত লাল ধরনের বেলে মাটি যাতে মধুপুর কাঁকড়ের মিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। টাঙ্গাইল বনবিভাগেও এ ধরনের মাটি দেখা যায়। এ মাটি শুকনো অবস্থায় বেশ দৃঢ় ও কঠিন, কিন্তু বৃষ্টির পানি পেলে তা নরম হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

এখানকার জলবায়ু মাঝারি ধরনের। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস সবচেয়ে গরম মাস বলে চিহ্নিত। এসমকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ১০০ ফারেণহাইট। কার্তিক থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত শীত মৌসুম এবং এসময়টা মনোরম। এসময়কার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫০ ফারেণহাইট। এখানে তুষারপাত একেবারই হয় না। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১০০। আষাঢ় মাস থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ পর্যন্ত সময়টাকে বর্ষাকাল ধরা হয়। অনেক সময় এপ্রিল-মে মাসেও খরার প্রকোপ অনুভূত হয়। বর্ষাকালে দক্ষিণ দিক থেকে আর শীতকালে (নভেম্বর- ফেব্রুয়ারি) উত্তর দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয়ে থাকে। মার্চের মাঝামাঝি থেকে মে মাস পর্যন্ত কালবৈশাখীর তাণ্ডব দেখা যায়। আবহাওয়া মাঝারি ধরনের।

টাঙ্গাইল বনবিভাগ ৬৭,৯৬০.২৬ একর অর্থাৎ প্রায় ১০৬.১৯ বর্গমাইল জুড়ে রয়েছে। টাঙ্গাইল, মির্জাপুর, নাগরপুর, বাসাইল, কালিহাতি, সখীপুর, ঘাটাইল, গোপালপুর থানাসমূহ এবং মধুপুর থানার লাউফুলা মৌজার কিয়দংশের উপর রয়েছে টাঙ্গাইল বনবিভাগের এক্তিয়ার। মধুপুর থানার অন্তর্ভুক্ত বন টাঙ্গাইল জেলার মধ্যে পড়লেও ময়মনসিংহ বনবিভাগই এর নিয়ন্ত্রণ করে।

টাঙ্গাইল জেলার শালবনের সাম্প্রতিক ইতিহাস অতিরিক্তি গাছ কাটার ইতিহাস। এভাবে যথেচ্ছ গাছ কাটা স্বল্প সময়ে বেশি টাকা অর্জনের একটা বিশেষ প্রবণতা মাত্র। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যাগী মালিকদের লোভের মাত্রা খুব বেড়ে যায় এবং এদেশ ত্যাগের প্রাক্কালে তারা ছোট-বড়ো যতবেশি পারা যায় গাছপালা বেঁচে যায়।

যদিও অতীতে টাঙ্গাইল বিভাগের বন এলাকায় শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগই শাল বা গজারি গাছ ছিল, বর্তমানে সে অবস্থা মোটেও নেই; এখন খুব অল্প গজারীর বন দেখা যায়। এ বনভূমিতে এখন বিবিধ তরুরাজির বন, কিছু কিছু জায়গায় খুব কম শাল গাছে ভরা বন, আবার কিছু কিছু জায়গায় একেবারে শালগাছ শূন্য বন রয়েছে। "মধুপুর গড়কে যদিও শালবন বলা হয়, সেখানে শালগাছই একমাত্র গাছ নয়। প্রতি একরে মোট ২৩৩টি গাছের মধ্যে ৮৭টি শাল গাছ আছে। বিবিধ তরুরাজির মধ্যে শাল গাছের শতকরা হার ৩৭.৫; বাকি ৬২.৫ ভাগ অন্যান্য ৩৩ ধরনের গাছে পূর্ণ"।

ফলে দেশ বিভাগের পরে বিরাট এলাকা রক্ষহীন হয়ে পড়ে। ১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিসন এণ্ড টেন্যান্সী এই পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাবেক বেসরকারি মালিকেরা আরো বিস্তীর্ণ এলাকার শাল গাছ কেটে পরিষ্কার করে ফেলে। এই ইচ্ছাকৃত ধ্বংসযজ্ঞের ফল এই দাঁড়ায় যে বন এলাকার অধিকাংশ জায়গাতেই বর্তমানে নতুন গজানো ঝোপ-ঝাড় ছাড়া কিছু নেই। এগুলোকে কেবল জ্বালানি এবং নিম্নমানের কাঠ হিসেবেই ব্যবহার করা চলে। গজারি বন এলাকায় কুটেশ্বর (Holarrhena antidysenterica); মানকতা (Randia dumentorum); কাঞ্চন (Bauhinia spp.); জারুল (Lagers troenia spp.); প্রভৃতি গাছ দেখা যায়।

টাঙ্গাইল বন এলাকায় দৃষ্ট বিভিন্ন তরুরাজির মধ্যে চম্বল (Artocarpus chaplass); যোগিনী চক্র (Gmelina aroborea); সিধা (Lagerstoremia parvivlora); আজুলী (Dillenia pantagyana); বাজ্না (Zathoryhum budrunga); হরিতকী (Terminalia

www.pathagar.com

chebula); সোনালু (Cassia fistula); আমলকী (Phyllanthus emblica); পলাশ (Butea frondosa) উল্লেখযোগ্য। বন এলাকার উত্তর দিকেই প্রধানত ছনগাছ দেখা যায়। এসব এলাকায় আসামলতাও প্রচুর। বর্ষাকালে এগুলো খুব ঘন-ঝোপের সৃষ্টি করে।

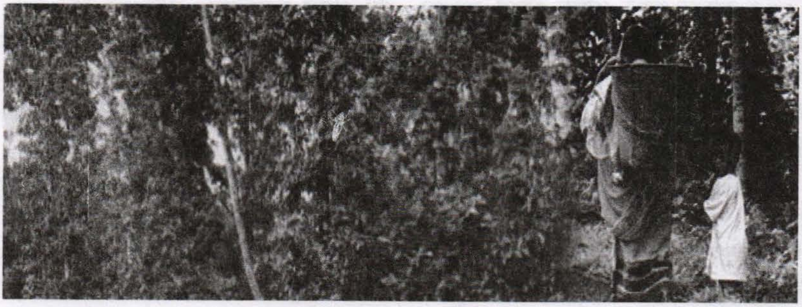

মধুপুর গড়, টাংগাইল

এ বন এলাকায় অসংখ্য বিনা স্বত্বের জমি ভোগদখল করা হচ্ছে। সাধারণত দেখা যায় বনজঙ্গল নিয়ে কারো ব্যথা নেই; টাঙ্গাইল বনভূমির বেলায়ও একথা খাটে। বন এলাকার মধ্যে আবাদি জমি এবং জনবসতি এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে যে এখানে অনধিকার প্রবেশের হাত থেকে লোককে ঠেকিয়ে রাখা খুবই মুশকিল। এসব অনধিকার প্রবেশকারীরা বনজ সম্পদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে থাকে।

বনবিভাগের কর্মচারীরা অবশ্য ইতিপূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বনের ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করে নিয়মিতভাবে নতুন গাছ লাগানো, চারাগাছের সংরক্ষণ ও তত্ত্বধানের কাজে হাত দিয়েছেন। বিস্তীর্ণ এলাকায় মূল্যবান শাল, সেগুন প্রভৃতি গাছের নতুন বন গড়ে তোলা হচ্ছে। ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত "বনবিভাগ ২,৩৫৩ একর এলাকা কৃত্রিম বনায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে; এর মধ্যে ২,১০০ একরে নতুন গজানো ঝোপঝাড়ে পূর্ণ করা হয়"।[৩৩]

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত টাঙ্গাইল শাসনতান্ত্রিকভাবে প্রাচীন আসামের অন্তর্গত কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিল। ১৭৭৬ সালে মীর কাসিম বাংলার নবাব হওয়ার পর খাজনা আদায়ের জন্য যে ভূমি বন্দোবস্ত করেন, তাতে আতিয়া, কাগমারী, বড়বাজু ইত্যাদি পরগণার নাম পাওয়া যায়, টাঙ্গাইলের নাম পাওয়া যায় না। ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্রে টাঙ্গাইলের উল্লেখ নেই। পলাশির যুদ্ধের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা গ্রহণের পর এদেশে সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ হয় ১৭৮৮ সালে। সেখানেও টাঙ্গাইলের উল্লেখ নেই। ১৮৪৫ সালে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য জামালপুর মহকুমা সৃষ্টিসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা হয় ১. সদর বিভাগ; ২. জামালপুর বিভাগ। উল্লেখ্য ময়মনসিংহ জেলা সৃষ্টি হয় ১৭৮৭ সালে। সদর বিভাগের অধীনের নাসিরাবাদ, গাবতলী, মধুপুর, নেত্রকোণা, ঘোষগাঁ, ফতেপুর,

গফরগাঁও, মাদারগঞ্জ, নিকলা ও বাজিত থানাসমূহ এবং জামালপুর বিভাগের অধীনে শেরপুর, হাজীগঞ্জ ও পিংনা থানাসমূহ রাখা হয়। আতিয়া পরগণার অঞ্চলসমূহ তখন ঢাকা জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৮৫০ সালে দ্বিতীয় ভূমি জরিপের সময়ও টাঙ্গাইলের উল্লেখ পাওয়া যায় না। রেনেলের মানচিত্রে আতিয়া পরগণার উল্লেখ ছিল। তখন বর্তমান টাঙ্গাইলের অধিকাংশ অঞ্চল আতিয়া পরগণার অধীনে ছিল। ১৮৬৬ সালে সরকার পারদিঘুলিয়া মৌজায় টান আইল (পরে নাম রূপান্তর হয়ে টাঙ্গাইল হয়) থানার পত্তন করেন এবং ১৮৬৯ সালে আতিয়া, পিংনা ও মধুপুর থানা সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় আতিয়া মহকুমা, ১৮৭০ সালের ১৫ নভেম্বর আতিয়া থেকে মহকুমা সদর স্থাপিত হলে 'টাঙ্গাইল' নামটির ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে।[৩৪]

টাঙ্গাইলের অধিকাংশ বাড়িঘর ইটের দালান কিংবা ইট ও টিনের তৈরি। মেঝে এবং দেয়াল ইটের কিন্তু চাল টিনের। এ রকম ঘরকে বলা হয় 'হাফ বিল্ডিং'। বিরাঞ্চলের বাড়িঘর অধিকাংশই টিনের তৈরি। কোনো কোনো ঘরের ডোয়া ইট দিয়ে পাকা করা। চরাঞ্চলের গৃহস্থের বাড়িঘর তৈরির উপকরণ বাঁশ, কাঠ, টিন ও ছন। তবে কুঁড়েঘর বা ছনের ঘর শতকরা প্রায় ৮ ভাগ এবং এটা সাধারণত চরাঞ্চলেই পরিলক্ষিত হয়। ভূঞাপুর অঞ্চলের ঘরগুলোর মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন– টিনের চারচালা ঘর, টিনের মনিপুইরা ঘর, টিনের দোচালা ঘর, টিনের একচালা ঘর ইত্যাদি। ছনের ঘর সাধারণত দোচালা হয়ে থাকে। আঞ্চলিকভাবে টিনের দোচালা ঘরকে 'গুদাম ঘর' এবং টিনের একচালা ঘরকে 'ছাপড়া ঘর' বলে। টিনের ঘরের খুঁটিগুলো বিরাঞ্চলের বেশিরভাগই রড-সিমেন্টের, চরাঞ্চলের- রড-সিমেন্টের কিংবা বাঁশের তৈরি হয়ে থাকে।

ঙ. জনবসতির পরিচয়

জেলার অধিকাংশ লোকের জাতিগত উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। জাতিবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত অকেকাংশে অনুমানভিত্তিক। কয়েকজন জাতিবিজ্ঞানী উপজাতীয়দের উৎপত্তি নিয়ে সযত্ন গবেষণা করেছেন। প্রাপ্ত মতবাদের ভিত্তিতে বলা যায় যে অধিকাংশ অধিবাসী তিব্বত-বর্মীদের মিশ্রণবিশিষ্ট প্রাক-আর্য অস্ট্রীক বা হেড্ডিড নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জাতিগত উপাদান এসেছে আলপাইন (Homo Alpinus) বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নরগোষ্ঠী থেকে। আদি নরডিক বা তথাকথিত আর্য জাতির রক্তধারার প্রভাব ক্ষীণ হলেও উজ্জল গাত্রবর্ণ, খাড়া নাক এবং কপাল, কোঁকড়ান ও নরম চুল এবং মাথার খুলির গঠন থেকে বোঝা যায় যে এ রক্তধারার কিছু প্রভাব এ জেলার অধিবাসীদের উপর পড়েছে। এর ফলে মুসলমান আমলে তুর্কী, ইরনি ও আরব দেশীয় রক্তধারার প্রভাব এ জেলার অধিবাসী বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট পড়েছে। তবে শেষোক্ত এই রক্তধারাও ছিল মিশ্র।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এখানে বিভিন্ন রক্তধারার সংমিশ্রণ হয়েছে এবং অবিমিশ্র কোনো রক্তধারার নিদর্শন পাওয়া যায় অসম্ভব ব্যাপার। নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি সামাজিক শ্রেণিবিভাগের সঙ্গে অভিন্ন বলা যায়, কারণ মুসলমান আমলের আগে এ জেলার অধিবাসীদের মধ্যে বর্ণবিভাগ ছিল তা বৃত্তিভিত্তিক হলেও মূলত ছিল

www.pathagar.com

নৃতত্তভিত্তিক। মুসলমান আমলে হিন্দু সমাজে সে ব্যবস্থাই প্রচলিত থাকে। মুসলমানদের বেলায় বিশেষ কোনো বর্ণবিভাগ ছিল না। তবে স্থানীয় ধর্মান্তরিত ও বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছুকাল ধরে আশরাফ-আতরাফের বিভেদটি বেশ প্রবল ছিল এবং তার পিছনে যে নৃতাত্ত্বিক কারণ কিছুটা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। জনগনের দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রনের দিকে ইঙ্গিত করে। এ জেলায় মধুপুর অঞ্চলে মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত কিছু লোক বাস করে। এদের রক্তধারা অনেকটা অবিমিশ্র এমনও বলা যেতে পারে।

জেলায় আদিম উপজাতি কিছু সংখ্যাক লোক বাস করে। সাবেক ময়মনসিংহ জেলার পাহাড়ি এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত গ্রামগুলোতে বেশীর ভাগ উপজাতীয়দেরই বাস। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড় এলাকায় বেশ কিছু উপজাতীয় লোক আছে। উপজাতীয় অধিকাংশই গারো। উপজাতীয়রা স্থানীয় জনসাধারণের থেকে জাতিগতভাবে সম্পুর্ণ ভিন্ন। গারো পাহাড়ের বিপরীতে অবস্থিত ভারতের আসাম অঞ্চলের উপজাতীয়দের সঙ্গে এদের সদৃশ্য আছে এবং এরা মঙ্গোলীয় জাতি থেকে উদ্ভূত।

মধুপুর বনাঞ্চল জেলার মধ্যে পাহাড়ি এলাকা এবং এটি মধুপুর গড় নামেই বিশেষ পরিচিত। এই এলাকা আশেপালে সমতল ভুমির মধ্যে অনেক দিক দিয়ে তফাত। এই জায়গা যথেষ্ট কাঠ, আঠা এবং নানান গাছ-পালায় পরিপূর্ণ।

উপজতীয়রা বনাঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বাস করছে। আবার শিল্প এলাকার কাছাকাছিও তারা নিজেদের উপজাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলছে।

গারো পাহাড়ের নিকটবর্তী বলে এই এলাকার আদিম অধিবাসীদের গারো বলা হয়। আঞ্চলিক গারো ভাষায় মান্তি অর্থ মানুষ বলে গারোদের মান্তাইও বলা হয়। প্রধানতঃ দুই শ্রেণির গারো আছে, যথা, আছিক বা পাহাড়ি গারো এবং লামদানি বা সমতলের গারো। পাহাড়ি গারোর জঙ্গালাকীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় বাস করে। এবং সমতলের গারোরা গারো পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে বাস করে। স্যার রবার্ট রিসলী, ড. জে, এইচ, হাটন, মেজর এ, প্লেফায়ার এবং কর্নেল ই টি ভ্যাটন প্রমুখ জাতিতত্ববিদদের মতে এই অধিবাসীরা ভারতের আসাম অঞ্চলে তাদের আদি বাসস্থান থেকে আগত। শারীরিক গঠনতত্বের গবেষণায় এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

গারোদের মধ্যে শ্রেণিভেদ আছে। পাহাড়ি গারোরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা- অউ, আবেঙ্গ এবং দুয়াল। সমতলের গারোরাও তিন শ্রেণিতে বিভক্ত, যেমন- মোমিন, মারাক এবং সাংমা। মেজর প্লেফেয়ারের মতে সমতলের গারোদের শ্রেণিভেদ পাহাড়ি গারোদের মতোই নামের পার্থক্য মত্র। অনেক অনুসন্ধান করেও এই নামগুলোর কোন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুমান করা যায় যে গোত্রের প্রতীকচিহ্নের বিশ্বাস থেকে নামগুলির উৎপত্তি হয়েছে।[৩৫]

ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গারোদেরকে সর্বপ্রাণবাদী (animist) বলা হয়। তাদের ধর্ম বিশ্বাস পূর্ব পুরুষ পূজা এবং প্রাকৃতিক শক্তি পূজার সমন্বয়। গারোদের প্রথম এবং প্রধান দেবতা বা পরমাত্মা হলো 'তাতারা-রাবুগা'। প্রায় একশ বছর পূর্বে সব গারোরাই এইরূপ সর্বপ্রাণবাদী ছিল। ১৮৭২ সালে প্রথম খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তর হয়। বর্তমানে গারোদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ খ্রিস্টান এবং অবশিষ্ট ৬০ ভাগ এখনও

www.pathagar.com

সর্বপ্রাণবাদী। গারো খ্রিস্টানদের মধ্যে শতভাগ ৬৭ ভাগ রোমান ক্যাথলিক, ১৮ ভাগ ব্যাপটিস্ট এবং ১৫ ভাগ এ্যন্‌গ্লিকান চার্চের অন্তর্গত।

উপজাতীয়দের সংস্কৃতি বেশ সমৃদ্ধ। তাদের নাচ গান খুব জনপ্রিয়। বিবাহের অনুষ্ঠানও খুব উৎসবমুখর এবং আনন্দদায়ক। প্রতি বছর তারা রাং চুং গালা নামক অনুষ্ঠান উদযাপন করে। ফসল কাটার সময় তার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে উৎসব পালন করে। এই উৎসবের নাম ওয়াঙ্গালা বা পাবন।

গারোদের মধ্যে সামাজিক গঠন মাতৃতান্ত্রিক। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মা থেকে মেয়ে এইভাবে উত্তরাধিকার সূত্র চলতে থাকে। ছেলে কোনো সম্পত্তির অধিকারী নাও হতে পারে, যদি না সে তার নিজের পরিশ্রমে কিছু অর্জন করতে পারে। কোনো পুরুষ মানুষই কোনো অবস্থাতে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনো সম্পত্তি পেতে পারে না। বিয়ের পর ছেলে পিতা-মাতাকে ছেড়ে স্ত্রীর পরিবারে চলে যায় এবং স্ত্রীর সম্পত্তি দেখাশোনা করে। গারোরা বেটে কিন্তু শক্তসমর্থ গড়নের।

এদের জীবন যাত্রা এবং সংস্কৃতি অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছে। এখন সমতলের সাধারণ লোকদের মতো উপজাতীয় পুরুষরা প্রায়ই ধুতি এবং মেয়েরা শাড়ী ব্লাউজ পরছে। কিন্তু উপজাতীয় ছেলে মেয়েরা খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে উদারনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। এই ছেলে মেয়েরা উপজাতীয় পোষাক সম্পূর্ণ বর্জন করেছে। খাদ্যের বেলায় গারোরা সর্বভুক বলে পরিচিত।

চ. নদ-নদী ও খাল-বিল

যমুনা

তিব্বতের মানস সবোরর হতে উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্যদিয়ে কুড়িগ্রামের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তারপর ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করে। জামালপুরের নিকটবর্তী হবার পর ব্রহ্মপুত্র দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই নদীর দক্ষিণ দিকে যে অংশ টাঙ্গাইল-সিরাজগঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে যায় তার নাম হয় যমুনা।

যমুনা নদী

www.pathagar.com

এবং যে অংশ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় তার নাম পুরাতন ব্রহ্মপুত্র। টাঙ্গাইল জেলার সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে রয়েছে যমুনা নদী।

বৈরান

বিরান শব্দ থেকেই বুঝা যায় এক সময় বৈরান নদীর কতোটা তেজ ছিল। বর্ষাকালে এই নদী এত খরস্রোতা ছিল যে দুপাশের বাড়িঘর, গাছপালা স্রোতে বিরান করে দিত। তাই এই নদীর নাম হয়েছে বৈরান।

বৈরান নদী, গোপালপুর

গোপালপুরবাসীকে পলি মাটি দিয়ে শস্য সুফলা করে তুলতো এই বৈরান নদী। এটি ব্রহ্মপুত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে জামালপুর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মধুপুর হয়ে গোপালপুর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভূয়াপুর দিয়ে যমুনা নদীর সাথে সংযোগ হয়েছে।[৩৬]

ধলেশ্বরী

অধ্যাবধি বহমান প্রাচীন নদীগুলোর মধ্যে ধলেশ্বরী অন্যতম। অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছুপূর্বে এ নদীর খাত বড়বাজু পরগণার পূর্বপাড়ের পশ্চিম অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্রমে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়েছে। দু'শ বছরের মধ্যে এ নদী একাধিক বার গতি পরির্বতন করেছে। ধলেশ্বরী নদীটি এলাসিন দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে কেদার পুরের নিকট দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। দক্ষিণ দিকের অংশ মানিকগঞ্জের নিকট কালিগঙ্গা নাম ধারণ করেছে। আর পূর্ব দিকের অংশ ধলেশ্বরী নাম দিয়েই মির্জাপুরের দক্ষিণাংশ দিয়ে ঢাকার কাছে গিয়ে বুড়িগঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে।

বংশাই/বংশি

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে জামালপুরের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পৌঁছে। তারপর বানার নদীর ও ঝিনাই নদীর একটি শাখার সাথে মিলিত হয়। আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের নিকট হয়ে গাজীপুরের

www.pathagar.com

কালিয়াকৈরে দুইভাগ হয়ে মূল ধারা তুরাগ নামে ধারণ করে। তারপর মীরপুর হয়ে বুড়িগঙ্গায় পতিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধারাটি কালিয়াকৈর হতে দক্ষিণমুখী হয়ে ধলেশ্বরীতে পড়েছে।

ঝিনাই

জামালপুর জেলার সন্ন্যাসীগঞ্জ থেকে উৎপন্ন হয়ে বর্তমান গোপালপুর এবং ভূঞাপুর থানা সদরের উত্তরে পাঁচটিকরি নামক স্থানে এসে লৌহজং নদীর সাথে মিশে গিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছে।[৩৭]

ঝিনাই নদী, গোপালপুর

লৌহজং

লৌহজং যমুনার শাখানদী, ভূঞাপুর থানা সদরে গাবসারা হয়ে উৎপন্ন হয়ে ভূঞাপুর থানা সদরের এক.কি.মি উত্তরে পাচঁটিকরিতে ঝিনাইর সাথে মিশে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হয়েছে। এই নদী টাঙ্গাইল, করটিয়া পাকুল্যা, মির্জাপুর প্রভৃতি স্থানে অতিক্রম করে ঢাকার কাছে বংশী নদীতে পড়েছে।

শোলাকুড়ি দিঘি

শোলাকুড়ি দিঘি মধুপুর উপজেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্তের শোলাকুড়ি ইউনিয়নে অবস্থিত। এটি বারতীর্থের দীঘি নামেও পরিচিত। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ দিঘিতে পূণ্য স্নানের উৎসব হয়। এ সময় দিঘির পাড়ে গ্রাম্য মেলা বসে। এ দিঘিটি অতি প্রাচীন। শোনা যায় রাজা ভগদত্ত নামে কোনো এক হিন্দু জমিদার মায়ের নির্দেশে এটি খনন করেন। এ দিঘির পাড়ে তিনি একটি মন্দিরও তৈরি করেছিলেন। সেই থেকে এ দিঘিতে চলে আসছে পূণ্য স্নানের উৎসব। কাল পরম্পরায় মন্দিরটি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও দিঘিটি এখনও রয়ে গেছে এবং পূণ্য স্নানের রেওয়াজ আজও বহাল রয়েছে।

www.pathagar.com

ঘাটাইল উপজেলার উল্লেখযোগ্য বিলগুলো হলো : গৌরীশ্বর বিল, কইয়া বিল, চৈরাবিল, মালদহ।

গোপালপুর উপজেলার উল্লেখযোগ্য বিলগুলো হলো : হেলেংকা বিল, ডগা বিল, গাংগাপাড়া বিল, শাকুরকুরা বিল, বাইটকামারী বিল, কইচা বিল, নটা বিল, বাঘমারা বিল, কাতলা বিল, চেচুইরা বিল, বরশীলা বিল।

নিকলা বিল, আমুলা দহ, তেরিল্লা বিল, গুজাবিল, হাড়ি বিল, মলাদহ, গাবতলী বিল, জোলাকুড়ি বিল, ধুলাকুড়িবিল, ধরবিল, কাড়াইল বিল, তাড়াইদহ ইত্যাদি হচ্ছে ভূঞাপুর উপজেলার উল্লেখযোগ্য বিল।

কালিহাতী উপজেলার উল্লেখযোগ্য বিলসমূহ হচ্ছে : চারান বিল, পোয়াতি বিল।

চাপড়া বিল, কাউলজানি বিল, বনিকিশোরী বিল, বালিয়া বিল, ময়তা বিল, চাকদহ বিল ইত্যাদি হচ্ছে বাসাইল উপজেলার উল্লেযোগ্য বিল।

নাগরপুর উপজেলার উল্লেখযোগ্য বিলসমূহ হচ্ছে : শুনসি বিল, কুষ্টিয়া বিল, পাকুটিয়া বিল, মাইলজানি বিল, বারাপুষিয়া বিল ইত্যাদি।

মির্জাপুর উপজেলার উল্লেখযোগ্য বিলসমূহ হচ্ছে : মাশাজানের রাখ (বিল), কুমুল্লীর বিল, কড়াইলের বিল, গ্রামাটিয়ার বিল, পথহারার বিল।

দেলদুয়ার উপজেলার উল্লেখযোগ্য বিলসমূহ হচ্ছে : সিংহরাগীর রাখ (বিল), ভবানীপুরের রাখ (বিল), (কোনড়ার রাখ (বিল)।

ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

সরকারি সাদত কলেজ

জেলার কলেজসমূহের মধ্যে করটিয়া কলেজ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৯২৬ সালে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ও অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খানের যুক্ত প্রচেষ্টায়।

সরকারি সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, করোটিয়া

www.pathagar.com

জমিদার ওয়াজেদ খান পন্নী তাঁর দাদা সাদত আলী খান পন্নীর নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার মধ্যে এটাই মুসলমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ। বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলমান জাতিকে শিক্ষিত করার মানসে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সে ইচ্ছা পূরণও হয়েছিল। এজন্য সাদত কলেজকে বাংলার আলীগড় বলা হয়। বর্তমানে সাদত কলেজটিতে প্রায় বিশ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে।[৩৮]

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সন্তোষের জমিদার বাড়িতে অবস্থিত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সন্তোষের জমিদারগণ দেশত্যাগ করেন। পরে মওলানা ভাসানী পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সন্তোষ হতে এই বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরের বোর্ড বাজারে স্থানান্তর করা হয়। শাহ আজিজ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গাজীপুর হতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কুষ্টিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সন্তোষের সেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ের পরিত্যক্ত জায়গায় মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।[৩৯]

মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ

মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ টাঙ্গাইল শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে কাগমারীতে অবস্থিত। এটি এম.এম আলী কলেজ নামে পরিচিত। তবে এটি কাগমারী কলেজ নামেই অধিক পরিচিত। প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ভাসানী তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু ও খিলাফত আন্দোলন এর নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলীর নামে কলেজটির নামকরণ করেন মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন-এ কলেজটি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। একটি পরিত্যক্ত সরকারি ভবনে কলেজের অফিস ও ক্লাসরুম চালু করা হয়। কলেজটি ১৯৭৫ সালে সরকারিকরণ করা হয়। বর্তমানে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

কলেজ। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) পর্যায়ে পাঠদান ছাড়াও এখানে ১৫টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। কলেজে বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা ৪৪ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪,০০০। কলেজে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে। এছাড়া কলেজের ১৫টি বিভাগে সেমিনার লাইব্রেরি (বিভাগীয় লাইব্রেরি) গড়ে উঠেছে। ছাত্রদের জন্য রয়েছে একটি হোস্টেল। কলেজটি শুরু থেকেই গরীব ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও মেধা বিকাশে কাজ করে আসছে।

বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

কালিহাতিতে বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলা তাঁতসমৃদ্ধ হওয়ায় এ কলেজটি বিশেষ অবদান রাখবে।

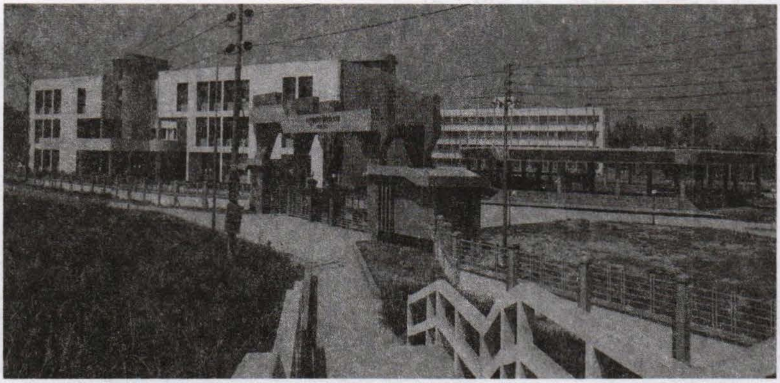

বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

কুমুদিনী কলেজ

কুমুদিনী কলেজের একটি উজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। দেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা (আর,পি, সাহা) ১৯৩৩ সালে তাঁর মায়ের নামে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কলেজটিকে উচ্চ মাধ্যমিক হিসেবে শুরু করা হয় এবং পরে ১৯৪৭ সালে ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করা হয়। কুমুদিনী ওয়েলফার ট্রাষ্ট (নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত) কলেজের সকল ব্যয়ভার বহন করে। ১৯৬২ সালে ভারতেশ্বরী হোমস্ ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের যে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা খোলা হয় পরে সেটি এই কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

কুমুদিনী মহিলা মেডিক্যাল কলেজ

প্রতিষ্ঠাতা রনদা প্রসাদ সাহার পৌত্র রাজীব সাহা। মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতাল সংলগ্ন অংশে প্রতিষ্ঠা করা হয় কুমুদিনী মহিলা মেডিক্যাল কলেজ। বাংলাদেশে এটাই একমাত্র মহিলাদের সংরক্ষিত মহিলা মেডিক্যাল কলেজ। রনদা প্রসাদ সাহার ইচ্ছা ছিল কুমুদিনী হাসপাতাল সংলগ্ন অংশে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা। রাজীব সাহা রনদা প্রসাদ সাহার সেই অভিলাস পূরণ করেছেন।

www.pathagar.com

মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ

মির্জাপুর উপজেলার গোড়াইতে অবস্থিত। সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ক্যাডেট কলেজের ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। এই কলেজে সপ্তম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত আসন সংখ্যা ৫২।

মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ

হেমনগর ডিগ্রী কলেজ

হেমচন্দ্র চৌধুরীর পিতা কালিচন্দ্র চৌধুরী তদানীন্তন ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর থানার অর্ন্তগত আম্বারিয়া এস্টেটের জমিদার ছিলেন। হেমচন্দ্র চৌধুরী আম্বারিয়া হতে যমুনা নদীর পূর্বতীরে গোপালপুর থানার সুবর্ণখালী নামক গ্রামে দ্বিতীয় বাড়ী নির্মাণ করেন।

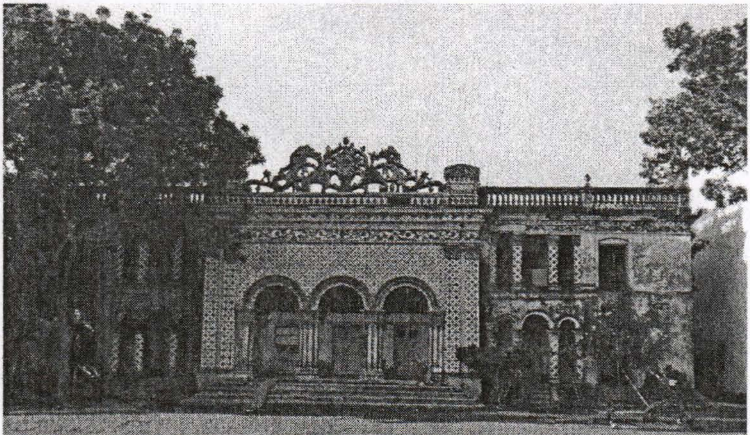

হেমনগর ডিগ্রী কলেজ

www.pathagar.com

সুবর্ণখালীতে দীর্ঘদিন বসবাস করার পর যমুনার নদীভাঙ্গনের কবলে পড়লে তিনি সেখান থেকে ১৮৯০ সালে বর্তমান অবস্থান শিমলাপাড়া গ্রামে নতুন বাড়ী নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। তার নামানুসারে গ্রামের নামকরণ করা হয় হেমনগর। যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর কারুকাজ করা হেমবাবুর জমিদার বাড়ির দ্বিতল ভবনটি আজও সেই পুরনো ঐতিহ্য নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সামনে বিরাট মাঠ। একশ কক্ষ বিশিষ্ট এই বাড়িটি প্রায় ত্রিশ একর জমির উপর নির্মিত। মাঠের সামনে এবং বাড়ির পেছনে বড়ো দুটি পুকুর রয়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশে জমিদার পরিবারের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। তিনি টাঙ্গাইল জেলায় বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী ১৯৫২ সালে ভারতের কাশিতে মৃত্যুবরণ করেন। জমিদারের এই বিশাল পরিত্যক্ত বাড়িতে ১৯৭৯ সালে এলাকাবাসীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা হয় হেমনগর ডিগ্রী কলেজ।[৪০] ফলে বহুকালের পুরনো ইতিহাস নির্বিচারে ধ্বংসের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পেয়েছে।

গোপালপুর কলেজ

গোপালপুর কলেজ উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। এই কলেজটি তৎকালীন সময় থেকে উত্তর টাঙ্গাইলের মধ্যে একমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল। কলেজটি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা দেয়া হয়।

গোপালপুর কলেজ

১৯৯০ সালে গোপালপুর কলেজ জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। উত্তর টাঙ্গাইলের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃত। কলেজটিতে দৃষ্টিনন্দন তোরণ, বাগান ইত্যাদি সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলামের সফল প্রচেষ্টায় বর্তমানে কলেজটি ডিজিটালাইজড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত করেছেন। এখানে সকল ক্লাস এবং পরীক্ষাসমূহ সিসি টিভির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়।[৪১]

বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি স্থায়ী অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়। পরবর্তীকালে একে একটি বহুমুখী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে এখানে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ বছরই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। বিদ্যালয়টিকে দ্বিমুখী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় এবং এখানে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালে এ বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি রাজস্ব থেকে ৮৩,৪০০.০০ টাকা ব্যয় করা হয়। বর্তমানে এটি একটি পূর্ণ সরকারি বিদ্যালয়।

ভারতেশ্বরী হোমস

ভারতেশ্বরী হোমস মেয়েদের একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতেশ্বরী হোমস ঢাকা নগরী থেকে ৬৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে ৩০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে মির্জাপুর থানা সদরে অবস্থিত। নারীকে আপন ভাগ্য জয়ের অধিকার প্রদানের লক্ষ্যেই দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা প্রপিতামহী ভারতেশ্বরী দেবীর নামে ভারতেশ্বরী হোমস প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েদের চরিত্রবান, সৎ ও আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলা, তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা জাগ্রত করা। সংস্থাটি পারস্পরিক সহনশীলতা ও ত্যাগের মানসিকতা-সম্পন্ন মানুষ তৈরি করে সুস্থ সমাজ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

www.pathagar.com

রণদা প্রসাদ সাহা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষাই জাতির উন্নতির সোপান। যে সমাজের নারীরা অগ্রগামী নয় ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সে সমাজ কখনোই বিকশিত হতে পারে না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারতেশ্বরী হোমস-এ শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও শরীরচর্চা একটি অপরিহার্য বিষয়।

ভারতেশ্বরী হোমস

ভারতেশ্বরী হোমস বাংলাদেশের প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৬২ সাল থেকে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা খোলা হয়। ১৯৭৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং ১৯৮৩ সালে তা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। নিয়মিত পড়শোনার পাশাপাশি ছাত্রীরা প্রতি সপ্তাহে নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষাদান ছাড়াও আছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব এবং আলোকিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শাখা। ১৯৯৭ সালে ভারতেশ্বরী হোমস-এ দেশের সর্ববৃহৎ শিশু-কিশোর ও তরুণদের সংগঠন হিসেবে গার্ল-ইন-স্কাউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহেরা পুলিশ ট্রেনিং স্কুল

মির্জাপুর উপজেলার মহেরা জমিদার বাড়িতে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের ছয়টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের মধ্যে মহেরা অন্যতম।

সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়

১৮৭০ সালে টাঙ্গাইলের সন্তোষ ছয়আনির জমিদার শ্রীমতি জাহ্নবী চৌধুরানী অত্র এলাকার জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে জমিদারীর অর্থে নিজ বসতবাড়ীর আঙ্গিণায় প্রায় ৪.৫০ একর জায়গায় তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠা করেন সন্তোষ

www.pathagar.com

জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়। এটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার দ্বিতীয় এবং টাঙ্গাইল জেলার সুপ্রাচীন উচ্চ বিদ্যালয়। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ ও পরিকল্পনা মোতাবেক ৩শ ফুট দীর্ঘ চুন সুরকীর ২৪″ দেওয়ালে ২০৯ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য মনোরম পাকা অট্টালিকা নির্মাণ করেন যা আজও ঐতিহ্য ও বিস্ময়ের নিদর্শন।

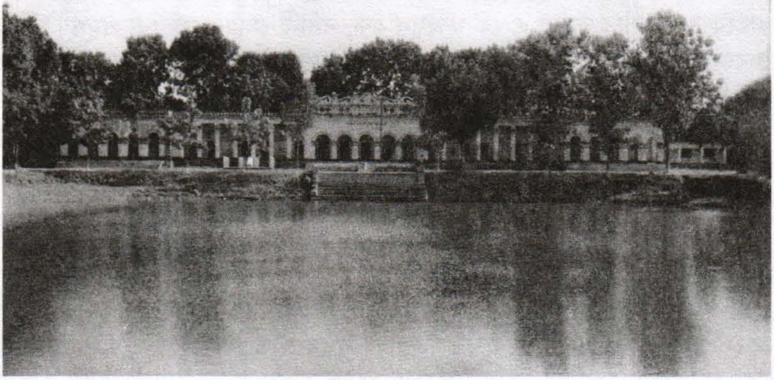

সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়

বিশাল দিঘি এবং এর পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বহু পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিদ্যালয়ের অবস্থানকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের স্বাচ্ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে জানালাবিহীন এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর সমান্তরালভাবে স্থাপিত ৯৯টি বিশালাকৃতির দরজাবিশিষ্ট প্রাসাদোপম ইমারতটি সেকালের মতো আজও কাছের ও দূরের শিক্ষিত জনসাধারণের দর্শণীয় বিদ্যাপীঠ।[৪২]

শ্রীমতি জাহ্নবী চৌধুরাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির স্থায়ীত্ব রক্ষাকল্পে পরবর্তী সময়ে তাঁরই পুত্রবধু জমিদার শ্রীমতি দীনমনি চৌধুরানী আজ থেকে শত বছর পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন মোমেনশাহী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাবু রমেশ চন্দ্র দত্তকে চেয়ারম্যান করে "বৈকুণ্ঠনাথ দীনমনি ট্রাস্টি ফান্ড" নামে একটি ফান্ড গঠন করেন। উক্ত ফান্ডে সর্বমোট তিন লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই টাকা কলকাতার ইম্পারিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া শাখায় জমা ছিল এবং উক্ত টাকার লভ্যাংশ ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয় ফান্ডে জমা হয়েছিল। এভাবেই ব্রিটিশ আমলের সর্বশেষে সময় পর্যন্ত কোনো রকম সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই জাহ্নবী স্কুলে অর্থের প্রয়োজন মিটানো হতো।

এই বিদ্যালয় থেকে ১৮৯৬ সালে মহিম চন্দ্র ঘোষ এন্ট্রাস পরীক্ষায় ১ম স্থান, ১৯২৬ সালে দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ মেট্রিক পরীক্ষায় ১ম স্থান, ১৯৬৫ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে নিতাই দাস পাল এস.এস.সি. পরীক্ষায় ১ম স্থান এবং ১৯৬৯ সালে আশীষ কুমার পাল এস.এস.সি. মানবিক বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন।

www.pathagar.com

১৯৭১ সনের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনী টাঙ্গাইল প্রবেশের প্রথম দিনে রাস্তা থেকে এটিকে কোনো দূর্গ মনে করে বিদ্যালয়ের অনেকগুলো দরজা ভেঙ্গে ভিতরে অগ্নিসংযোগ করে। এতে অনেক মূল্যবান আসবাবপত্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ সময় বিদ্যালয়ের অনেক রেকর্ডপত্র বিনষ্ট হয়।

দেশ বিদেশের বহু মনীষী এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন– তাদের মধ্যে রয়েছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রমেশ চন্দ্র দত্ত, মীর মোশারফ হোসেন, কবি কায়কোবাদ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, নলীনী মোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ। সুবিখ্যাত ও বহুল পরিচিত গ্রন্থ *ঠাকুরমার ঝুলি* লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়ের এই বহুল পরিচিতির মূলে রয়েছে জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষাঙ্গণে এর অবিস্মরণীয় গৌরবোজ্জল সাফল্য এবং এর ফলশ্রুতিতেই প্রতিষ্ঠার পরপরই বিদ্যালয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্থায়ীভাবে অনুমোদন লাভ করে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাই স্কুল

১৯৬৮ সালে গোপালপুর উপজেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত হয় সূতি জিন্নাহ মোমোরিয়াল মডেল হাই স্কুল। এই স্কুলের নাম জিন্নাহর নামে প্রতিষ্ঠিত হোক তা গোপালপুরবাসী এবং গোপালপুর-ভূয়াপুর থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব হাতেম আলী তালুকদার কিছুতেই মানতে পারেন নি।

সূতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উচ্চ বিদ্যালয়

তাই তার উদ্যোগে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মেমোরিয়াল নাম পরিবর্ত করে বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবের নামে স্কুলটির নামকরণের জন্য ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নাম পরিবর্তনের আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অনুমোদন চেয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে পত্র দেয়। পত্রটি সঙ্গে নিয়ে সংসদ সদস্য হাতেম আলী তালুকদার বঙ্গবন্ধুর সামনে উপস্থাপন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে মন্তব্য লিখলেন– 'আমার নামের পরিবর্তে মরহুম হোসেন

www.pathagar.com

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নাম সন্নিবেশিত করলে অত্যন্ত খুশি হবো।' (৩০.৫.১৯৭২ সাল প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার)। তখন থেকেই হয় সূতি জিন্নাহ মোমোরিয়াল মডেল হাই স্কুলের নাম পরিবর্তন করে সূতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উচ্চ বিদ্যালয় নামকরণ করা হয়। ২০১৪ সালে শিক্ষা বোর্ডের মেধা তালিকায় টপ টেন এর মধ্যে সপ্তম স্থান লাভ করে। লেখাপড়ার মান এবং সহশিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার ও আধুনিক পাঠাগার রয়েছে। জেলা প্রশাসন বেশ কয়েকবার এই স্কুলটিকে প্রতিষ্ঠানকে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সনদ দিয়েছেন।[৪৩]

সূতী ভি এম পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

গোপালপুর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সূতী ভি এম পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, অন্যতম বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিচিত।

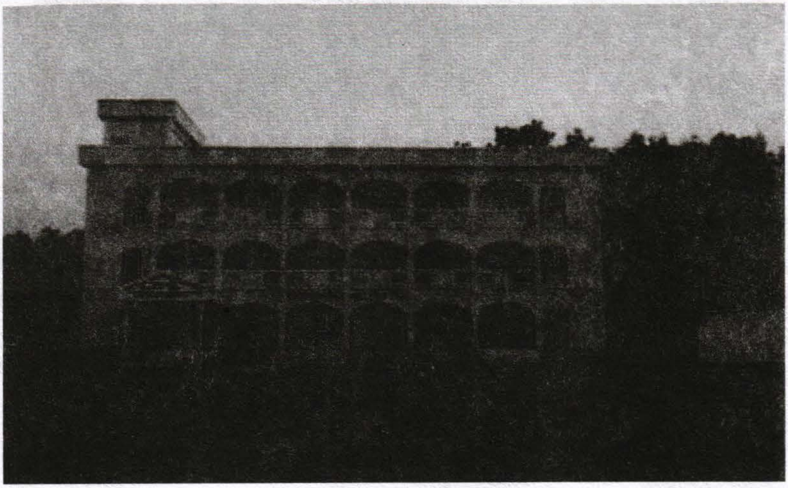

সূতি ভি এম পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

১৯২০ সালে হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী গোপালপুর সূতী ভি এম পাইলট হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠার সময় জমি ও নগদ অর্থ দান করেন। তারই প্রচেষ্ঠায় এবং উদ্যোগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি উত্তর টাঙ্গাইলের মধ্যে অন্যতম স্কুল হিসেবে পরিচিত। এই বিদ্যালয়টি ফলাফলের দিক থেকে স্কুলটি সেরা।

এম আজহার মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়

১৯৩১ ইং সালে লাউহাটীর প্রাণকেন্দ্রে এম আজহার মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় নামে এম আরফান খান প্রতিষ্ঠা করেন স্বনাম ধন্য বিদ্যাপিঠ। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অকাল প্রয়াণে শোকে মুহ্যমান ভ্রাতৃগণ তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করতে সিদ্ধান্ত নেন একটি স্কুল স্থাপনের। ফলশ্রুতিতে ১৯৩১ ইং সালের ১লা জানুয়ারী স্থাপিত হয় লাউহাটী এম,

www.pathagar.com

আজহার মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে একটি মাত্র টিনের ঘর নিয়ে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে ০৩টি সুরম্য অট্টালিকা রয়েছে।

লাউহাটী এম আজহার মোমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়

বরাটী নরদানা বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়টি যার অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিনি হলেন শ্রী দুঃখীরাম রাজবংশী। শ্রী দুঃখীরাম রাজবংশী হলেন এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। নরদানা গ্রামের ধলু মিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শ্রী দুঃখীরাম রাজবংশী ১৯৪৮ সালে বরাটী নরদানা বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন বিদ্যালয়টির নাম ছিল

বরাটী নরদানা বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়

www.pathagar.com

বরাটী নরদানা পাকিস্থান উচ্চ বিদ্যালয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'পাকিস্থান' শব্দের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' করা হয়েছে। বরাটি ও নরদানা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তখন ছিল অশিক্ষা এবং কুসংস্কারে জর্জরিত। শ্রী দুঃখীরাম রাজবংশীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই বিদ্যালয়টি জেলা শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মৈশামুড়া বসন্ত কুমারী উচ্চ বিদ্যালয়

মির্জাপুর উপজেলার মৈশামুড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মৈশামুড়া বসন্ত কুমারী উচ্চ বিদ্যালয় একটি খ্যাতনামা বিদ্যালয়। ১৯২০ সালে ক্ষেত্রনাথ বোস তার স্ত্রীর নামে নিজ গ্রামে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। নিরক্ষর এলাকায় এই বিদ্যালয়টি শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

মৈশামুড়া বসন্ত কুমারী উচ্চবিদ্যালয়

জামুর্কী নবাব স্যার আবদুল গনি উচ্চ বিদ্যালয়

টাঙ্গাইল জেলার প্রাচীন বিদ্যাপিঠের একটি জামুর্কী নবাব স্যার আবদুল গনি উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯১৪ সালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ তাঁর দাদার নামে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। টাঙ্গাইল জেলার বাইরেও অনেক শিক্ষার্থী এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে।

জামুর্কী নবাব স্যার আবদুল গনি উচ্চ বিদ্যালয়

www.pathagar.com

এম. জিয়ারত আলী প্রধান শিক্ষক হিসাবে ৩১ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। মূলত তাঁর সময়েই বিদ্যালয়টি অত্র অঞ্চলের মধ্যে নামকরা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

জ. ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্থাপনা

টাঙ্গাইলের ভূখণ্ডে কয়েকটি মুসলিম ঐতিহ্য এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ও উপজাতির ঐতিহ্যও রয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্যে আটিয়ার মসজিদ, ধনবাড়ির মসজিদ ও মাজার, কদিম হামজানির মসজিদ, খামার পাড়ার মসজিদ ও মাজার প্রভৃতি। হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে গুপ্ত বৃন্দাবন, পাকুটিয়ার সৎসঙ্গ আশ্রম, বারো তীর্থ, আননদ মঠ ইত্যাদি। আর টাঙ্গাইলের গারোদের ওয়ানগালার ঐতিহ্যও কম নয়।

টাঙ্গাইলের জনপদে রাজা-জমিদারদের বাড়িরও একটা ঐতিহ্য আছে। একেক রাজা-জমিদার তাদের মনের মাধুরী দিয়ে তার বাসস্থান নির্মাণ করেছেন। শুধু তাই নয় বাঙালিদেরকে শিক্ষাদান করতে টাঙ্গালের জমিদারদের অবদান অপরিসীম।

পাল, সেন আমলে প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য টাঙ্গাইল অঞ্চলে লুকায়িত রয়েছে। যেমন কালীদাস গ্রামে কালিদাস পণ্ডিতের পুকুর। আর বায়ান্ন খাদা জমি নিয়ে রাধাকৃষ্ণ গোপিনীদের লীলাভূমি গুপ্ত বৃন্দাবন। এখনো সাদৃশ্য ঐতিহ্যবাহী তমাল গাছ আর কাঠের যুগল রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি। পাশেই প্রাচীন পুকুর। প্রবাহিত ঝর্না ধারার পাশে এখনো এখনো বিরাট পাথরের স্তুপ জেগে আছে। কৃষ্ণ বিরহে আজও বিরহী রাধার আকৃতি প্রতিধ্বনিত হয় এই গুপ্ত বৃন্দাবনে। তাছাড়া কালিয়া, মহানন্দপুর, কীর্ত্তন খোলা, প্রতিমা বংশী, দাড়িয়াপুর, শহর গোপিনাথপুর, রতনগঞ্জ, বেহুলা লক্ষিন্দর, গড় গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানগুলো ঐতিহ্যের শিরোনাম।

নবাব বাড়ি মসজিদ

নবাব বাড়ির ঐতিহাসিক মসজিদটি ধনবাড়ি মসজিদ হিসেবেই পরিচিত। মোগল আমলের স্থাপত্যশৈলীর এক অনবদ্য নিদর্শন এটি। অনুমান করা হয় এটি শায়েস্তা খানের আমলে নির্মিত হয়েছিল। আগ্রার তাজমহলের আদলে ঢাকার সিদ্দিক রাজ এটি নির্মাণ করেছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ছোট বড়ো মিলে এতে রয়েছে চৌত্রিশটি গম্বুজ। এককালে এতে ঝাড়বাতি ও হাড়িবাতির ব্যবস্থা ছিল। নবাব বাড়ির নান্দনিক শিল্পকর্মের অনন্য নিদর্শন এটি। নবাব বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরীর আমলে মসজিদটির পিছনের অংশ বর্ধিত করা হয়। মসজিদ সংলগ্ন দীঘিতে একটি পাকা ঘাট এবং ঘাটের উপরের প্রান্তে একটি তোরণ নির্মাণ করেন নওয়াব আলী চৌধুরী। তোরণের দু'পাশে দুটি গম্বুজ রয়েছে। তোরণের উল্টো পাশের গম্বুজের নিচে তিনি নিজের কবরের স্থান নির্দেশ করে যান। মৃত্যুর পর তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। তাঁর কবরের পাশে সর্বক্ষণ কোরান তেলাওয়াতের কথা বলে যান। ১৯২৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আজও সেখানে কোরান পাঠ এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয়নি। অবশ্য মৃত্যুর দুই বছর আগে থেকেই তিনি এ কাজটি শুরু করে গিয়েছিলেন। এ মসজিদকে ঘিরে এ অঞ্চলের মানুষের রয়েছে নানা কৌতূহল। লোকজন এখানে মানত করে। প্রতিদিন শতশত মানুষ এখানে আসে। মিষ্টান্ন ও শিরনি বিতরণ করে মানত পূর্ণ করে।

www.pathagar.com

মসজিদের পাশে নবাব বংশের শ্রেষ্ঠ সাধক সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ এর সমাধি রয়েছে। তাঁর জন্যেই মানুষের মনে এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি রয়েছে। মসজিদে নারী পুরুষ সকলে এসে নফল নামাজ আদায় করে।[৪৪]

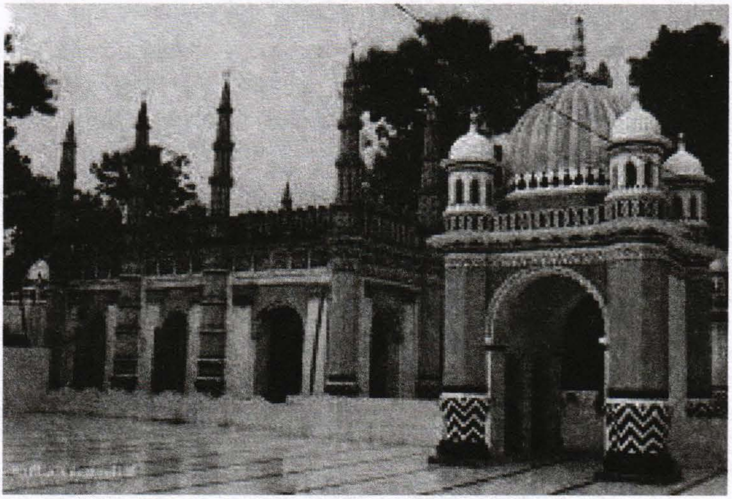

ধনবাড়ির নবাব বাড়ির মসজিদ

আইলাজোলা মসজিদ

মধুপুর উপজেলা সদরের অদূরেই মসজিদ চালা গ্রামে অবস্থিত কথিত 'আইলাজোলা' নামক মসজিদটি। এ মসজিদটি অতি প্রাচীন। মসজিদটিকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে রয়েছে নানা কিংবদন্তি। কে কখন এ মসজিদটি তৈরি করেছিল কেউ বলতে পারে না। জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় এলাকাবাসি মসজিদটি আবিষ্কার করে। তারপর এটিকে সংস্কার করে নামাজ পড়ার উপযুক্ত করে। প্রচলিত আছে যে আইলাজোলা নামক কোনো এক ব্যক্তি তার জোলা উপাধি ঢাকতে এ মসজিদটি তৈরি করেছিল। মসজিদ তৈরি হওয়ার পর উপাধি আরও জোরদার হয়। লোকে মসজিদটির নাম রাখে আইলাজোলার মসজিদ। মনের দুঃখে লোকটি একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এ গল্প লোক মুখে শোনা যায়। প্রাচীন এ মসজিদটিকে পরবর্তীতে সংস্কার করতে গিয়ে এর প্রচীনত্ব নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। বহু পরে মসজিদের পাশে সাড়ে সাত হাত লম্বা একটি কবর আবিষ্কার করা হয়। পুরোনো ইটের স্তুপ সরাতে গিয়ে প্রথমে একটি সুরঙ্গ বের হয়। সুরঙ্গ দিয়ে মিষ্টি গন্ধ বের হতে থাকে। লোকে ভয়ে সে সুরঙ্গ তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়। সাধারণের ধারণা এটি কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তির কবর। তারপর থেকে সাধারণ মানুষ এ কবরের পাশে এসে নানা মানসিক করতে শুরু করে। এখনও মানুষ এখানে এসে মানত করে, শিরনি দেয়। লোকবিশ্বাস রয়েছে যে এখানে মানত করলে খুব দ্রুত ফল পাওয়া যায়।[৪৫]

www.pathagar.com

আটিয়া মসজিদ

টাঙ্গাইল জেলায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন আছে। টাঙ্গাইল থানার অন্তর্গত আটিয়ায় পির শাহ বাবা কাশ্মিরীর দরগার উপর একটি জামে মসজিদ আছে। তিনি ১৫০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পুত্র সাঈদ খান পন্নী কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয় ১০১৮ হিজরি (১৬০৯ সালে)। আয়তক্ষেত্রাকার এই মসজিদটি দৈর্ঘে ৫৯ ফুট, প্রস্থে ৪০ ফুট, ৭ ফুট পুরু দেওয়াল, একটি গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রাকার কক্ষ এবং তিন গম্বুজবিশিষ্ট বারান্দা নিয়ে গঠিত।

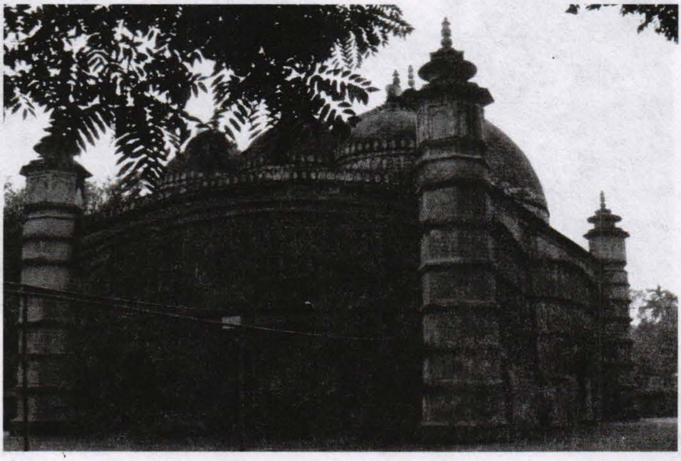

আটিয়া মসজিদ

চার কোণে আটকোণবিশিষ্ট উচ্চ মিনার, মাঝে মাঝে কারুকার্যের বেষ্টনী, সর্বোপরি আস্তর করা আধুনিক চূড়া মণ্ডিত এই মসজিদ। পূর্ব দিকে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশদ্বার, এক প্রবেশদ্বার অন্যটি থেকে বহু প্যানেল দ্বারা পৃথক। ওপরের অংশ খোদাই করা লিখিত ফলক ছাড়া আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলে বিভক্ত। কার্নিসের ওপরিভাগ গভীরভাবে খোদিত এবং দেওয়াল ছিদ্রযুক্ত। পিপাকৃতি সছিদ্র ভিত এবং কারুকার্য-খচিত তলদেশ বিশিষ্ট গম্বুজগুলির শীর্ষদেশ খুব উচু। মসজিদটি মোগল স্থাপত্য রীতির কিছু উপাদানের সঙ্গে মোগল-পূর্ব রীতির চমৎকার সংমিশ্রণের নিদর্শন বলা যায়। বিখ্যাত পির আলী শাহেন শাহ বাবা কাশ্মীরীর সম্মানার্থে সাঈদ খান পন্নী আটিয়াতে ১৬০৯ সালে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মাজারের খোদিত লিপিতে দেখা যায় যে পির সাহেব ১৫০৭ সালে ইন্তেকাল করেন। এখানে স্থানীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত আর একটি মসজিদ রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। এ মসজিদের সম্মুখস্থ একটি ইটের তৈরি কবরের ধ্বংশাবশেষ এ সুলতানের কবর বলে মনে করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

২০১ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ২০১ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ-এর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিবিএ সভাপতি জনতা ব্যাংক। টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার নগদাশিমলা ইউনিয়নের দক্ষিণ পাথালিয়া গ্রামে দর্শনীয় মসজিদটির নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এখনই দুর-দুরান্তর থেকে অনেক দর্শনার্থী এই মসজিদ দেখতে আসেন। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দর্শনীয় স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।[৪৬]

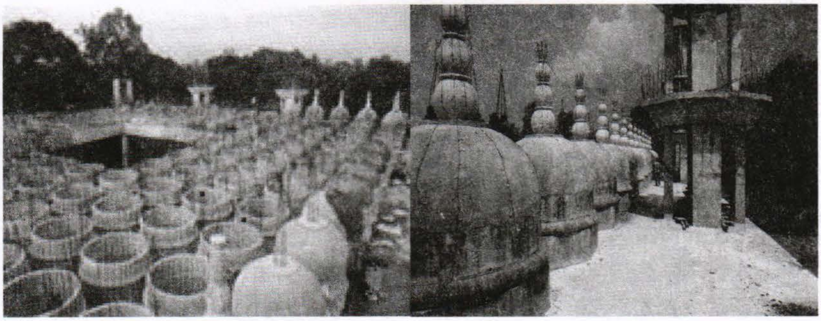

২০১ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ

মদন গোপালের মন্দির

মধুপুর মদন গোপালের আঙ্গিণায় অবস্থিত এই গোপাল মন্দিরটি। কৃষ্ণের আরেক নাম গোপাল। আসলে মন্দিরটি একটি কৃষ্ণ মন্দির। বৈষ্ণব ভক্ত ও উপাসক তৎকালীন রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার নারী জমিদার শ্রীমতি মহারানি হেমন্ত কুমারী দেবী এটি নির্মাণ করেন। এ অঞ্চলে হেমন্ত কুমারী দেবী আরও অনেক সেবামূলক কাজ করেন। মধুপুরের নিত্যানন্দ সেবাশ্রম নির্মাণের জন্যেও তিনি জমি দান করেন।

আনন্দমঠ

মধুপুর উপজেলা সদরের তীর ঘেঁষে বয়ে চলা বংশাই নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল ঐতিহাসিক 'আনন্দমঠ'। সন্ন্যাস বিদ্রোহের নেতা আনন্দগীর এই মঠ নির্মাণ করেছিল। পরে তাঁর নামানুসারেই এটি আনন্দমঠ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। বংশাই নদীর পশ্চিম পাড়ে বর্তমান খাদ্য গুদামের উত্তর দেয়াল সংলগ্ন ছিল

www.pathagar.com

আনন্দমঠের অস্তিত্ব। এখানে শিব পূজার্চনা করা হতো। নদীর পূর্ব তীরে মঠ সোজাসুজি ছিল আনন্দ আশ্রম। এই আনন্দ আশ্রমে সন্ন্যাসীরা অবস্থান করত। আনন্দমঠ এবং আনন্দ আশ্রমের মধ্যে নদীর তলদেশ দিয়ে একটি সুরঙ্গ যোগাযোগ ছিল। এ সুরঙ্গ পথ ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণের সময় বিকল্প রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মঠটি কেবল সন্ন্যাসীদের শিব পূজার্চনার জায়গা ছিল না; এটি ছিল তাদের আন্দোলনের প্রতীক। মূলত পুরো আশ্রমটি ছিল একটি ছদ্ম দুর্গ। সন্ন্যাস বিদ্রোহের ইতিহাসের সঙ্গে এ আনন্দমঠের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মধুপুরের ঐতিহ্য ও গৌরব গাথার এক উজ্জ্বল এবং অনন্য নিদর্শন এটি। কালের বিবর্তনে মঠটির অস্তিত্ব আজ বিলীন তবু ইতিহাস টিকে আছে। কিছুদিন আগেও মঠটির ধ্বংসাবশেষ টিকে ছিল। কিন্তু তা ভূমিদস্যুদের কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।[৪৭]

আম্বাড়িয়া জমিদার বাড়ি

মধুপুর উপজেলার মির্জাবাড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত বংশাই নদীর তীর ঘেঁষে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আম্বাড়িয়া জমিদার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। এক সময় এই জমিদার বাড়ির শান শওকতের অন্ত ছিল না। এখানকার প্রখ্যাত জমিদার ছিলেন হেমচন্দ্র চৌধুরী। হেমচন্দ্র চৌধুরীর চার ছেলে– প্রফুল্ল চন্দ্র, শশাঙ্ক চন্দ্র, জোগেশ চন্দ্র ও হেমচন্দ্র। এদের মধ্যে হেমচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন জ্যেষ্ঠ। জমিদারি দেখার দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত ছিল। শোনা যায় হেমচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন প্রজা হিতৈষী জমিদার। তিনি প্রজাদের জন্য গ্রামে একাধিক পুকুর খনন করে দিয়েছিলেন। জমিদার বাড়ির পাশেই ফলদ বৃক্ষের বাগান করেছিলেন। এখনও সেখানে দশটি পুরোনো লিচু গাছ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গাপূজার সময় তিনি বাড়ির সামনে মেলা বসাতেন। এই মেলা প্রজাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতেন। প্রজাদের বিনোদনের জন্য মেলা প্রাঙ্গণে যাত্রাগানের ব্যবস্থা করে দিতেন। জমিদার বাড়ির পাশেই তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি ডাকঘর ও একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। বাড়ির সামনে বংশাই নদীতে তিনি একটি পাকা ঘাট তৈরি করেছিলেন। তিনি নিজে এ ঘাটে স্নান করতেন। এর ভগ্নাবশেষ আজও চোখে পড়ে। এটি এখনও রাজঘাট নামেই পরিচিত। ঘাটের গোড়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির এর ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। আম্বাড়িয়ার পরিত্যক্ত বাড়িটি স্বাধীনতার পরও ভালভাবেই টিকে ছিল। পরবর্তীতে জমিদারের নায়েব যোগেশ চন্দ্র দাস ও তৎকালীন চেয়ারম্যান অমূল্য গুহ নিয়োগী মিলে বাড়িটি লুটপাট করে ধ্বংস করে দেয়। এখন শুধু বাড়িটির দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে।[৪৮]

হেমনগর জমিদার বাড়ি

হেমচন্দ্র চৌধুরী ১৮৮০ সালে মধুপুর উপজেলার আমবাডিয়া রাজবাড়ি ত্যাগ করে গোপালপুর উপজেলার ঝাওয়াইল ইউনিয়নের সুবর্ণখালি গ্রামে নতুন রাজবাড়ি নির্মাণ করেন। সেখান থেকেই জমিদারী চালানো শুরু করেন। তখন বাংলার রাজধানী ছিল কোলকাতা। আর সুবর্নখালি ছিল যমুনা তীরের বিখ্যাত নদী বন্দর। কোলকাতার সাথে

www.pathagar.com

নদীপথে সহজেই যোগাযোগ করা যেতো। আসাম ও কোলকাতার স্টীমার ভিড়তো তখন সুবর্ণখালিতে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ১৯০৫ সালে হেমচন্দ্র চৌধুরীসহ কয়েকজন হিন্দু জমিদারের প্রচেষ্টায় ১৯০৫ সালে ময়মনসিংহ থেকে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণ করা হয়। এখান থেকে স্টীমারে যমুনা পাড়ি দিয়ে সিরাজগঞ্জের মাধ্যমে কোলকাতা পর্যন্ত রেলপথ কানেক্ট করা হয়। ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ-ঢাকা রেলপথ চালু থাকায় ঢাকা টু কোলকাতা যাতায়াত সহজতর হয়। সরিষাবাড়ি উপজেলার জগন্নাথগঞ্জ ঘাট থেকে হেমচন্দ্র চৌধুরীর সুবর্ণখালির দূরত্ব ছিল মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। সড়কের এ অংশটুকু হেরিংবন্ড করে জগন্নাথগঞ্জঘাটের রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত টমটম অথবা পালকিতে যাওয়াআসার সুবন্দোবস্ত করেন হেমচন্দ্র চৌধুরী। এ হেরিংবন্ড সড়কটিই গোপালপুর উপজেলার ইতিহাসে প্রথম পাঁকা সড়ক। এদিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যমুনা নদী বাঁক পরিবর্তন শুরু করলে ভাঙ্গণে সুবর্ণখালি বন্দর বিলুপ্ত হয়। হেমচন্দ্র চৌধুরীর রাজবাড়িও নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। হেমচন্দ্র চৌধুরী সুবর্ণখালি থেকে তিন কিলো পূর্ব-দক্ষিণে শিমলাপাড়া মৌজায় ১৮৯০ সালে নতুন একটি দ্বিতল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। নাম পরীদালান। ভবনের মূল অংশে উড়ন্ত দুই পরীর ভাস্কর্য ছিল। সামনের অংশে লতাপাতা আর কাব্যিক ডেকোরেশন ছিল চোখে পড়ার মত। দামি কড়ি আর পাথরে মোড়াই ছিল রাজবাড়ির মূল অংশ। উঁচু আর পুরু দেয়ালে ঘেরা রাজবাড়ির উঠান চত্বর শেষে ছিল প্রশস্ত দীঘি। এর শানবান্দা ঘাট সাদা পাথরে মোড়াই করা। রাজবাড়ির আশপাশে আত্মীয় স্বজনের জন্য একাধিক দীঘি ও পাঁকাবাড়িঘর নির্মাণ করে দেন তিনি। রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ প্রান্তে গড়ে উঠে বিশাল বাজার। কালক্রমে হেমচন্দ্রের নামানুসারে নাম হয় হেমনগর। হেমচন্দ্র চৌধুরীর তিন বোনসহ এ সভ্রান্ত পরিবারের সবাই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং মার্জিত রুচির পরিচায়ক। এদের উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ে পুরো পূর্ব বঙ্গ জুড়ে সুনাম ছিল। হেমচন্দ্রের সুযোগ্য ভগ্নীরা হলেন স্বর্ণময়ী দেবী স্বামী নীলকান্ত গাঙ্গুলী, ক্ষিরোদা সুন্দরী দেবী স্বামী গোবিন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী এবং বারোদা সুন্দরী দেবী স্বামী রজনী কান্ত গাঙ্গুলী। এদের মধ্যে স্বর্ণময়ী দেবীর পুত্র ছিলেন শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী। শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলীর পুত্র কেদারনাথ গাঙ্গুলী। আর কেদারনাথ গাঙ্গুলীর পুত্র হলেন কমল গাঙ্গুলী। কমল গাঙ্গুলীর সুযোগ্য কণ্যা হলেন পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী পৌলমী গাঙ্গুলী। কমল গাঙ্গুলীর কণ্যা ওপার বাংলার এ গুণী শিল্পী পৌলুমী গাঙ্গুলী সম্প্রতি পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি দেখার জন্য সম্প্রতি কোলকাতা থেকে হেমনগর রাজবাড়ি পরিদর্শনে আসেন। তিনি হেমনগর রাজবাড়ি, রাজকাচারী, রাজদীঘিসহ প্রতিটি স্থান ঘুরে দেখেন। বাবা ও ঠাকুরদাদার মুখে গল্প শোনা জমিদার বাড়ির সেই ঐতিহ্য হাতড়ে বেড়ান। এদিকে ৭০ বছর পর হেমনগর জমিদার পরিবারের সদস্যের রাজবাড়ি পরিদর্শনের খবরে এলাকায় সাড়া ফেলে। তাকে একনজর দেখার জন্য মানুষের ভিড় জমে। হেমনগর ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার আব্দুস সালাম জানান, হেমচন্দ্র চৌধুরি ছিলেন দারুন শিক্ষানুরাগী। ১৯০০ সালে হেমনগরে বিমাতার নামে ২০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা করেন শশীমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। গোপালপুর সূতী ভি এম পাইলট হাই স্কুল এবং পিংনা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি জমি ও অর্থ দান করেন।

www.pathagar.com

আনন্দমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠায় শিলালিপিতে দশজন দাতার তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে তার নাম। হেমচন্দ্র চৌধুরী ১৯২৫ সালে কাশীতে মারা যান।[৪৯]

হেমনগর জমিদার বাড়ি, গোপালপুর (হেমচন্দ্র জমিদার-এর নাতনি পৌলমী গাঙ্গুলী)

ধনবাড়ির নবাব বাড়ি

নবাব বাড়িটি বর্তমান ধনবাড়ি উপজেলা সদরে অবস্থিত। নবাব বাড়ির ইতিহাস নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে রয়েছে নানা কিংবদন্তি। শোনা যায়, সম্রাট আকবরের আমলে ইসপন্দিয়া খা ও মনোয়ার খা নামে দু'জন পির বাগদাদ থেকে ধনবাড়িতে আসেন। তাঁদের সঙ্গী হয়ে নবাব বংশের পূর্ব পুরুষও এখানে আসেন। এই ব্যক্তির নাম শাহ সৈয়দ খোদা বক্শ। তৎকালীন কিসমত মৌজার (বর্তমান ধনবাড়ি) জমিদার ছিলেন ধনবত সিংহ। ধনবত সিংহের নামেই বর্তমান ধনবাড়ির নামকরণ করা হয়েছে। ধনবত সিংহ ছিলেন অত্যাচারী জমিদার। বাগদাদ থেকে আগত পিরগণ স্থানীয় লোকদের নিয়ে জমিদারের সাথে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করেন। কেউ বলে ধনবত সিংহ যুদ্ধে মারা যান আবার কেউ বলে এখান থেকে কুমিল্লায় পালিয়ে যান। পরে ঘটনাক্রমে জমিদারির ভার আসে নবাব বংশের পূর্ব পুরুষ শাহ সৈয়দ খোদা বক্শের ওপর। খোদা বকশ এখানে বিয়ে করেন এবং তাঁর ঔরশে জন্ম হয় একাব্বর আলী খানের। শোনা যায় এ বংশে পরবর্তীকালে শাহ মামুদ চৌধুরী নামে একজন সিদ্ধ পুরুষের জন্ম হয়েছিল।[৫০]

প্রকৃত ইতিহাস হলো এ বংশের পূর্ব পুরুষ হযরত শাহ আতিকুল্লাহ বাগদাদ থেকে প্রথমে দিল্লিতে আসেন। সম্ভবত দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর মুরিদ হন এবং বাংলাদেশে তাঁকে জায়গির দান করেন। তিনি দিল্লি থেকে পাবনার নাকালিয়া আসেন। তারপর এ বংশের উত্তর পুরুষগণ পর্যায়ক্রমে ঢাকার হাসমিলান ও টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়িতে আসেন। উল্লেখ্য, গেলজুক তুর্কীদের জমিদারি ছিল ধনবাড়িতে।

ধনবাড়ির নবাববাড়ি

এ বংশের জমিদার রাজা আলী খার সাথে বিয়ে হয় নবাব বংশের পূর্ব পুরুষ শাহ সৈয়দ খোদা বকশের কন্যা সৈয়দা তালিবুন্নেসার। এদের কোনো সন্তান ছিল না। রাজা আলী খার মৃত্যুর পর তালিবুন্নেসা তার বাবা শাহ সৈয়দ খোদা বক্‌শকে জমিদারি পরিচালনার জন্যে ঢাকা থেকে ধনবাড়িতে নিয়ে আসেন। সে হিসেবে শাহ সৈয়দ খোদা বক্‌শই ধনবাড়ির নবাব বংশের প্রথম নবাব। খোদা বকশের পুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ (রা.) নবাব বংশের শ্রেষ্ঠ সাধক পুরুষ ছিলেন। সৈয়দ মুহাম্মদের পুত্র সৈয়দ জনাব আলী চৌধুরী। জনাব আলী চৌধুরীর পুত্র সৈয়দ বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী। নওয়াব আলী চৌধুরীর দুই পুত্র সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরী ও সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী। বগুড়াতেও নবাবদের জমিদারি ছিল। সেখানে নওয়াব আলী চৌধুরীর বড়ো ছেলে আলতাফ আলী চৌধুরীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আলতাফ আলী চৌধুরীর পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। নবাব বাড়িটি এখনও জৌলুস ও চাকচিক্য নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে আছে।

করোটিয়া জমিদার বাড়ি

করটিয়ার জমিদার ছিলেন ওয়াজেদ আলী খান পন্নী। তিনি আটিয়ার চাঁদ বা চাঁদ মিয়া নামেই বেশি পরিচিতি ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনামলে স্বরাজ, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী তাঁর সমস্ত জমিদারি সমাজের হিতার্থে দান করে যান।[৫১]

www.pathagar.com

করোটিয়া জমিদার বাড়ি

ঝ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল টাঙ্গাইল। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনেকটাই ছিল ময়মনসিংহকেন্দ্রিক। টাঙ্গাইলের মাটিতে জন্ম নিয়েছেন বহু গুণী ব্যক্তি এবং রাজনীতিবিদ। রাজনীতির উত্তরণে ৪৭ পূর্ব প্রতিরোধ– কৃষক বিদ্রোহ, ভারত ছাড় আন্দোলন, ফরায়েজি আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন এখানকার বহু সংগ্রামী নেতা এবং সাধারণ মানুষ। আবার ৪৭ পরবর্তী ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে ভাষা-আন্দোলন, আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন, ছয়-দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এ জেলার অনেক সাধারণ মানুষ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তন্মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

মৌলভী মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন (১৮৩২-১৯০৮)

মৌলভী মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন ১৮৩২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সুরুজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপমহাদেশের মুর্শিদাবাদ, এলাহাবাদ, জৈনপুর, বিহার, আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি স্থানের দেশবরেণ্য বিখ্যাত আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদের নিকট থেকে ইলমে শরীয়ত ও ইল্‌মে মারেফাত বিদ্যা আয়ত্ত্ব করেন। মৌলভী মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ বাংলায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া বোখারী শরীফ আনুবাদ করে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'আখবারে এছলামিয়া' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া মৌলভী মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন ছোটো বড়ো মিলিয়ে প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হলো– *জোব্দাতুল মাসায়েল* (১৮৯২), *এনসাফ* (১৮৯২), *এজবাতে আখেরেজ্জোহর* (১৮৮৭), *ফতোয়ায়ে আলমগীরী* (১৮৯২) *কালমাতুল কোফর* (১৮৯৭) ইত্যাদি।

www.pathagar.com

সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)

সৈয়দ নওয়াব আলী টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার ধনবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি টাঙ্গাইলের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অন্যতম। সৈয়দ নওয়াব আলী পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত, বাংলা প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন ১৯১২ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত, ভারতীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত। ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রথম রিফরমড কাউন্সিলের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯২১ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত। তিনি বঙ্গীয় কৃষি ও শিল্প বিভাগের দায়িত্বেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি বেঙ্গল একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন এবং আমৃত্যু সে পদে বহাল থাকেন। সৈয়দ নওয়াব আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯০৬ সালে 'খান বাহাদুর', ১৯১১ সালে 'নবাব', ১৯১৮ সালে 'সি.আই.ই' এবং ১৯২৪ সালে 'নবাব বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন।

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী

রনদা প্রসাদ সাহা (১৮৬৯-১৯৭১)

রণদা প্রসাদ সাহা সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী ও দানবীর ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে আহতদের সেবা-শুশ্রুষা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের

www.pathagar.com

জন্যে তাঁকে ১৯১৬ সালে কমিশন র‍্যাংক দেওয়া হয়। পরে রণদা প্রসাদ সাহা লবনের ব্যবসা করে দুইটি জাহাজ ও বহু বার্জের মালিক হয়েছিলেন। তিনি প্রপিতামহী ভারতেশ্বরী দেবীর নামে মির্জাপুরে ভারতেশ্বরী হোমস, মায়ের নামে মির্জাপুরে কুমুদিনী হাসপাতাল, টাঙ্গাইলে কুমুদিনী মহিলা কলেজ এবং পিতার নামে মানিকগঞ্জে দেবেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দানশীলতায় সন্তুষ্ট হয়ে তৎকালীন ইংরেজ সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। রণদা প্রসাদ সাহা ১৯৭১ সালের ৭ই মে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

রণদা প্রসাদ সাহা

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (১৮৭১-১৯৩৬)

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছিলেন করটিয়ার জমিদার। তিনি আটিয়ার চাঁদ বা চাঁদ মিয়া নামেই বেশি পরিচিতি ছিলেন। ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ১৯২৬ সালে তাঁর দাদা সা'দত আলী খান পন্নীর নামে করটিয়ায় সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি ব্রিটিশ শাসনামলে স্বরাজ এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। আন্দোলনে তাঁর অনমনীয় মনোভাব ও দৃঢ়তার জন্য ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত তাঁর তৈল চিত্রের নিচে লেখা আছে “One who defeated the British”. করটিয়াতে তিনি হাফেজ মাহমুদ আলী ইনস্টিটিউশিন এবং রোকেয়া হাই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্বে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী তাঁর সমস্ত জমিদারি সমাজের হিতার্থে দান করে যান।

www.pathagar.com

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী

আবদুল করীম গজনবী (১৮৭২-১৯৩৯)

দেলদুয়ারের খ্যাতিমান জমিদার। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা আফগানিস্থানের গজনী থেকে এসেছিলেন বলে জানা যায় এবং এ কারণে তারা গজনীন ও পরবর্তীতে গজনবী নামে পরিচিত হন। তিনি রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও লেখক ছিলেন।

আবদুল করীম গজনবী

www.pathagar.com

তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয় ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইতালিতে। আবদুল করিম গজনবী ছিলেন সরকারপন্থি রাজনীতিক। আবদুল করিম গজনবী ব্রিটিশ আমলে জাতীয় প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, ১৯২৪ সালে বাংলা সরকারের কৃষি, বন ও স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'নওয়াব বাহাদুর' উপাধি পান। তিনি 'স্যার' খেতাবেও ভূষিত হন। আবদুল করিম গজনবী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।

আবদুল হালীম গজনবী (১৮৭৬-১৯৫৩)

আবদুল হালিম গজনবী ছিলেন আবদুল করিম গজনবীর ছোটো ভাই। তিনি একজন হিতৈষী জমিদার এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোসহ কলিকাতা সিটি কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন।

আবদুল হালিম গজনভী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না বলে রাজনৈতিকভাবে দুই ভাই দুই মেরুতে অবস্থান করেছেন। তাই পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর ফুলার আবদুল করিম গজনবীকে "রাইট গজনবী" এবং আবদুল হালিম গজনবীকে "রং গজনবী" বলে আখ্যায়িত করেন। ব্রিটিশ আমলে ১৯২৬ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি 'স্যার' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন।

আবদুল হালীম গজনবী

www.pathagar.com

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা, মহান সংগঠক, জাতীয় মুক্তির পথ প্রদর্শক, ধর্মীয় কণ্ঠস্বর। ১৮৯৩ সালে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করেন। ১৮৯৭ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পির সৈয়দ নাসির উদ্দিন বোগদাদীর সাথে আসাম পৌঁছেন। ঐখানেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত। ১৯০৮ সালে তিনি আসামের কুখ্যাত 'লাইন প্রথার' বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন। হজব্রত পালন করার পর তিনি কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে দশ মাস কারারুদ্ধ থাকেন।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯২৪ সালে আসামের ধুবড়ি জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চরে কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। তখন তাঁর অনলবর্ষী ভাষণের জন্য ভাসানী নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে আসামের আন্দোলনের কারণে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতি দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন। ১৯৪৯ সালে কারারুদ্ধ হন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি মজলুম মানুষের সাথে সহমর্মিতার কারণে কারাবরণ করেছেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে ঐতিহাসিক সম্মেলন করেন। এবং এই সম্মেলনে তিনি স্বাধীনতার কথা প্রচ্ছন্নভাবে উচ্চারণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'হক কথা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। মওলানা ভাসানী কাগমারীতে খেলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলীর নামে 'মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। আসামের ধুবড়ি শহরে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়াও জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবিতে প্রতিষ্ঠা করেন

www.pathagar.com

'মহিপুর হাজী মহসীন সরকারি কলেজ'। এই রাজনৈতিক ব্যক্তি ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর বুধবার দিবাগত রাত ৮টায় মৃত্যুবরণ করেন।

মহামহোপধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ (১৮৮৭-১৯৭৬)
মহামহোপধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ ১৮৮৭ সালে দাইন্যা, সদর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। কাশীর সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। পরে ঐ কলেজেরই সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্র ও দর্শনের সমস্ত শাখায় এবং বৌদ্ধ ধর্মে তার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ১৯৩৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেয়। ১৯৪৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট, ১৯৬৪ সালে 'পদ্মভূষণ' ১৯৬৫ সালে উত্তর প্রদেশ সরকার 'সাহিত্য বাচস্পতি' এবং ১৯৭৬ সালে বিশ্ব ভারতী তাকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেন। তিনি দর্শন ও সাধনা বিষয়ের বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

আবদুল হামিদ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৬৮খ্রি.)
জমিদার, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পিকার ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট, ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভারতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি পদে অধিষ্ঠিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশ আমলে তিনি বাংলা প্রদেশ থেকে নিখিল ভারত শ্রম উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়াও প্রজাবৎসল জমিদার হিসেবে এলাকার তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি ১৯৬৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)
প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ ১৮৯৪ সালে বিরামদি, ভূয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাবিদ ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি করটিয়ার সা'দত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল। সে সময়ে বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় তিনিই একমাত্র মুসলিম প্রিন্সিপাল।

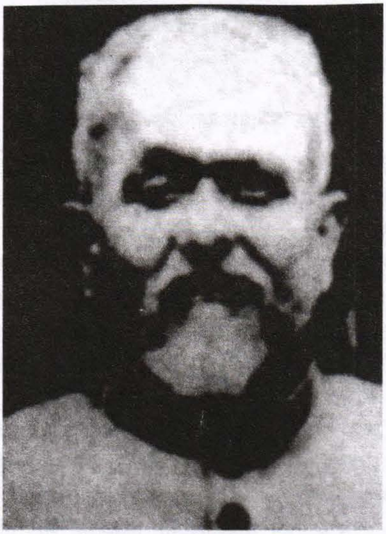

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

www.pathagar.com

এজন্য তিনি 'প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ' বলে খ্যাত ছিলেন। শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্য চর্চা ও সমাজ সেবামূলক কাজে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। তাছাড়া তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যও ছিলেন। প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ ভূঞাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ভূঞাপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ইবরাহীম খাঁ কলেজ ও মীরপুর বাংলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন। তিনি 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৬৩) ও 'একুশে পদক' (১৯৭৭) লাভ করন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম– *বাতায়ন, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, জঙ্গী জীবন, হিরক হার, ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র* ইত্যাদি।

প্রিন্সিপাল বেগম ফজিলাতুন্নেছা (১৮৯৯-১৯৭৭ খ্রি.)

বেগম ফজিলাতুন্নেছা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে ১৯২৭ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েট। এবং উপমহাদেশের মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলেত থেকে ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। কলকাতার বেথুন কলেজে বেগম ফজিলাতুন্নেছা অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হাতেম আলী খান (১৯০৪-১৯৭৭ খ্রি.)

হাতেম আলী খান বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও কৃষক নেতা ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৮ সালে এম এ পাস করেন। হাতেম আলী খান গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের একত্রিত করে তিনি জমিদারদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি 'ন্যাশনাল লীগ' নামে একটি বিপ্লবী দলও গঠন করেছিলেন। হাতেম আলী খান সমস্ত জীবন নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি কমরেড মনি সিংহ ও বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মোজাফফর আহমদের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করে এমপি হয়েছিলেন।

পি সি সরকার (১৯১৩-১৯৭১ খ্রি.)

পি সি সরকার ১৯১৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের আশেকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম প্রতুল চন্দ্র সরকার। আমেরিকা, সেভিয়েত ইউনিয়ন, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে জাদু প্রদর্শন করে তিনি বিপুল সুনাম অর্জন করেন। পি সি সরকার জাদুবিদ্যায় দুইবার নোবেল পুরস্কার বলে খ্যাত "দি ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড" লাভ করেন। পি সি সরকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 'জাদু সম্রাট' উপাধি লাভ করেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নির্দেশে তিনি জাপানে গিয়ে জাদু প্রদর্শন করে 'আজাদ হিন্দু ফৌজ'কে সাহায্য করেন। পি সি সরকার ১৯৫৭ সালে লন্ডনে বিবিসি টেলিভিশনে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে তরুণী দ্বিখণ্ডিত করার খেলাটি প্রদর্শন করেন। তাঁর খেলার মধ্যে শূন্যে ঝুলন্ত কংকাল, এক্স-রে চক্ষুর খেলা, জ্যান্ত হাতি অদৃশ্য করা, মোটর গাড়ি অদৃশ্য করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার পি সি সরকার কে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

www.pathagar.com

যাদুসম্রাট পি.সি. সরকার

আবু সাঈদ চৌধুরী (১৯২১– ১৯৮৭ খ্রি.)

আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯২১ সালে ৩১ জানুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার নাগবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : আবদুল হামিদ চৌধুরী, মাতা : শামসুন নেছা চৌধুরী। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

আবু সাঈদ চৌধুরী

www.pathagar.com

আইনজীবি, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে ১৯৪৭ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭১ সালে উপাচার্য পদে ইস্তফা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ও জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।

শামসুল হক (১৯২৩-১৯৬৩ আনুমানিক)

শামসুল হক করটিয়ার সা'দত কলেজ ছাত্র সংসদের প্রথম ভি পি। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুবলীগ' এর নেতা ছিলেন। ১৯৪৯ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শামসুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের প্রাদেশিক উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। শামসুল হক রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

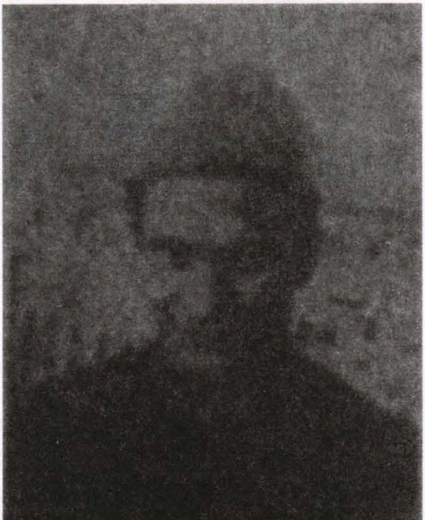

শামসুল হক

www.pathagar.com

ড. আলীম আল রাজী (১৯২৫-১৯৮৫ খ্রি.)

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার লাউহাটি গ্রামে ড. আলীম আল রাজীর জন্ম। আলীম আল রাজী আইনজীবি, সুপণ্ডিত ও লেখক ছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ইতিহাস ও আইন শাস্ত্রে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। আলীম আল রাজী 'বার এ্যাট-ল' ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৩ সালে ঢাকা হইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে দেশে প্রথম আইন কলেজ প্রতিষ্ঠাতা করেন। তিনি তৎকালীন লিখিল পাকিস্তান বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) কলেজ শিক্ষা সমিতির সভাপতি ছিলেন। আলীম আল রাজী সাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মেম্বার ছিলেন। তিনি ঢাকা 'ল' কলেজ ও নাগরপুর ডিগ্রী কলেজ এবং লাউহাটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা করেন। *আরাকানের পথে* তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

ড. আলীম আল রাজী

ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-)

ড. আশরাফ সিদ্দিকী ১৯২৭ সালে টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার নাগবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লোকবিজ্ঞানী। ১৯৬৬ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে ফোকলোরের আধুনিক পঠন-পাঠন ও গবেষণার ধারার তিনিই সূচনা করেন। কর্ম জীবনে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা, বাংলা উন্নয়নের পরিচালক, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রেস

www.pathagar.com

ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. আশরাফ দিদ্দিকী বহু গ্রন্থের রচয়িতা। *লোকসাহিত্য* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

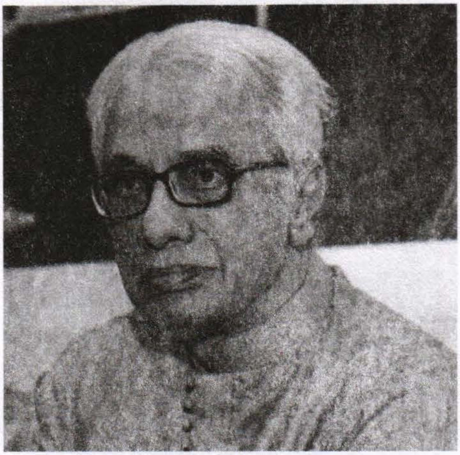

ড. আশরাফ সিদ্দিকী

আবদুস সাত্তার (১৯২৮–)

আবদুস সাত্তার ১৯২৮ সালে কালিহাতি উপজেলার গোলরায় জন্মগ্রহণ করেন। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সম্পাদক হিসাবে অবসর নিয়েছেন। ইংরেজী, আরবি, ফার্সি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ। তিনি বহু দেশ ভ্রমন করেছেন। প্রায় একশত গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। বিশেষ করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ক বইগুলো উল্লেখযোগ্য। যেমন : *আরন্য জনপদে, আরন্য সংস্কতি, ট্রাইবাল কালচার ইন বাংলাদেশ* ইত্যাদি।

আবদুল মান্নান (১৯২৯-২০০৫ খ্রি.)

আব্দুল মান্নান দেশের নন্দিত রাজনীতিবিদ। স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে যাদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান রয়েছে আবদুল মান্নান তাঁদের অন্যতম। তিনি ১৯২৯ সালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার যমুনা ও ধলেশ্বরী বিধৌত চরাঞ্চলের কাতুলী ইউনিয়নের গালুটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে টাঙ্গাইলের মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং পরবর্তীতে টাঙ্গাইলের জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে আব্দুল মান্নান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু এবং কারারুদ্ধ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মুক্তি লাভের পর অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আহুত গোল টেবিল বৈঠকের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি। তিনি ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে টাঙ্গাইল থেকে বিপুল ভোটে এম এন এ

www.pathagar.com

নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর তিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পরে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জননেতা আব্দুল মান্নান মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলা সরকারের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে আবদুল মান্নানকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সফলভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনা করে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি মুজিবনগর সরকারের একমাত্র মুখপত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

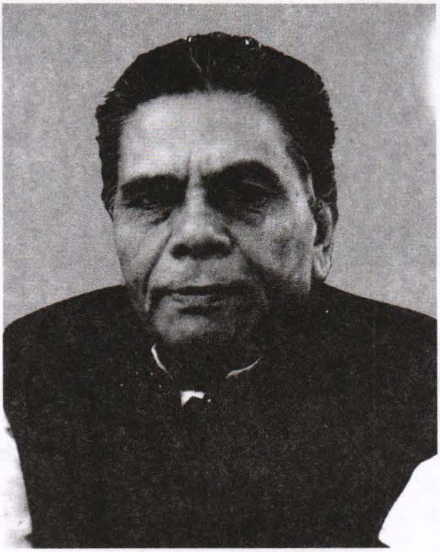

আব্দুল মান্নান

তিনি ১৯৭৩ সালে পুনরায় টাঙ্গাইল সদর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৬ সালে তৃতীয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এবং একাধিকবার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা, তা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থক, সর্বোপরি দেশবাসীর কখনো ভোলার নয়। তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত সাহসী ও নিয়ামক ভূমিকা পালন করতেন। রাজনৈতিক কলা-কৌশল নির্ধারণে ও সংলাপে তাঁর বিচক্ষণতা ছিল ঈর্ষণীয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় যুগপৎ আন্দোলনের লিয়াজোঁ কমিটি সভার সভাপতিত্ব করেছেন তিনি। '৯০-এ স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং ১৯৯১ সালে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। তিনি বাংলাদেশ ইনকামট্যাক্স ল-ইয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।[৪৮]

www.pathagar.com

একজন আদর্শ শিক্ষানুরাগী হিসেবে জননেতা আব্দুল মান্নান বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। টাঙ্গাইলের সন্তোষে অবস্থিত মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অপরিসীম। নারী শিক্ষার প্রতি জননেতা আব্দুল মান্নানের ছিল বিশেষ আগ্রহ। নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি টাঙ্গাইলের প্রাণকেন্দ্রে শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয় ও টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলায় আতিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এছাড়া সিলিমপুরে পাকুল্লা হাই স্কুল ও চরাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রসারে প্রতিষ্ঠা করেন কাতুলী হাই স্কুল। স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল। মির্জাপুরের মহেড়া জমিদার বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর সঙ্গে মিলিত প্রয়াসে গড়ে তোলেন টাঙ্গাইল মাহফিল, যা বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলা সমিতি, ঢাকা নামে পরিচিত। তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ২০০৫ সালে ৪ঠা এপ্রিল ৭৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রফিক আজাদ (১৯৪১-)

কবি রফিক আজাদ ১৯৪১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার গুণী গ্রামের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সলিম উদ্দিন খান ছিলেন একজন প্রকৃত সমাজসেবক এবং মা রাবেয়া খান ছিলেন আদর্শ গৃহিণী। দুই ভাই-এক বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। প্রকৃতার্থে তারা ছিলেন তিন ভাই-দুই বোন।

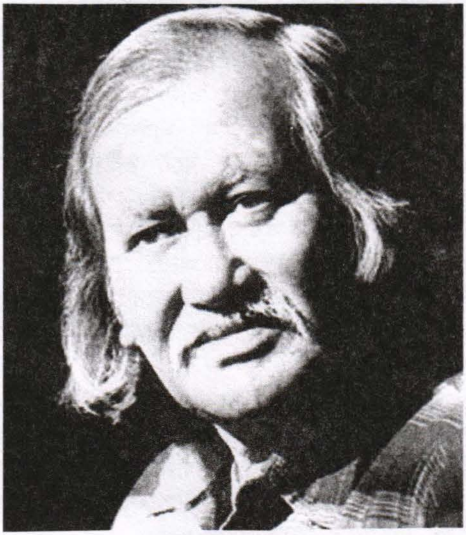

কবি রফিক আজাদ

কিন্তু তার জন্মের আগে মারা যায় সর্বজ্যেষ্ঠ ভাই মাওলা ও তৎপরবর্তী বোন খুকি। রফিক আজাদ যখন মায়ের গর্ভে তখন অকাল প্রয়াত বড় বোন অনাগত ছোট ভাইয়ের নাম রেখেছিলেন 'জীবন'। রফিক আজাদ 'জীবনের'ই আরেক নাম। ১৯৫২ সালের

www.pathagar.com

২২ ফেব্রুয়ারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র রফিক ভাষা শহিদদের স্মরণে বাবা-মায়ের কঠিন শাসন অস্বীকার করে খালি পায়ে মিছিল করেন। ভাষার প্রতি এই ভালোবাসা পরবর্তী জীবনে তাকে তৈরি করেছিল একজন কবি হিসেবে, আদর্শ মানুষ হিসেবে।

১৯৫৬ সালে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় একবার বাবার হাতে মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ির থেকে। উদ্দেশ্য, পিসি সরকারের কাছে ম্যাজিক শেখা। ময়মসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ স্কুলের হেডমাস্টার তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে পাঠান। কৈশোরে লাঠি খেলা শিখতেন নিকটাত্মীয় দেলু নামক একজনের কাছে। তিনি সম্পর্কে রফিক আজাদের দাদা। দেলু দাদা ছিলেন পাক্কা লাঠিয়াল। গ্রামে নানা কিংবদন্তির প্রচলন ছিল তার নামে। সলিম উদ্দিনের চেয়ে তিনি বয়সে বড় হলেও গা-গতর দেখলে পালোয়ান বলেই মনে হতো। দেলু দাদা খুব আদর করতেন রফিক আজাদকে। বার-বাড়িতে শিক্ষা দিতেন লাঠি খেলা। এছাড়া গুণী গ্রামের পাশেই মনিদহ গ্রাম। এখানকার ষাট শতাংশ অধিবাসী ছিল নিম্নশ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতার, ধোপা, দর্জি, চাষা ইত্যাদি। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাই ছিল রফিক আজাদের শৈশব-কৈশোরের বন্ধু। সাধুটী মিডল ইংলিশ স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশ করে ভর্তি হলেন কালিহাতি রামগতি শ্রীগোবিন্দ হাই ইংলিশ স্কুলের নবম শ্রেণিতে। বাড়ি থেকে প্রায় তিন-চার মাইল দূরত্বে স্কুল। কালিহাতি সংলগ্ন গ্রাম হামিদপুরের এক দরিদ্র গেরস্থের বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসেবে তিনি পড়াশোনা করেন। হামিদপুরে আগের মতো আর সেই বিধিনিষেধ নেই। কালিহাতি হাই স্কুলে পড়ার সময় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সতীর্থ মাঈন উদ্দিন আহমদের সঙ্গে। সে ছিল ক্লাসের ফার্স্ট বয় এবং অত্যন্ত মেধাবী। সাহিত্যপাঠে আগ্রহ ছিল তার। এই মাঈনই রফিক আজাদের আড্ডার প্রথম গুরু। হামিদপুরে তার সঙ্গে শুরু হয় তুখোর আড্ডা। তার মুখেই প্রথম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনেন। দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি প্রভৃতি উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হন। মাঈন একদিন সন্ধ্যাবেলা ফটিকজানি নদীর তীর ঘেঁষা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্পপ্নভঙ্গ' কবিতাটি পুরো আবৃতি করে শুনিয়েছিলেন তাকে। সেই কবিতা শুনে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন কিশোর রফিক আজাদ। অবাধ স্বাধীনতা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় পড়ে নবম শ্রেণিতে ভালোভাবে পাশ করতে পারলেন না আড্ডাপ্রিয় রফিক আজাদ। মাঈনও প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানে চলে আসে। আড্ডার অন্য বন্ধুদের অনেকেই একাধিক বিষয়ে ফেল করে বসল। অবশেষে ব্রাহ্মণশাসন হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন।

তিনি বাংলা একাডেমির মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *উত্তরাধিকার* এর সম্পাদক ছিলেন। *রোববার* পত্রিকাতেও রফিক আজাদ নিজের নাম উহ্য রেখে সম্পাদনার কাজ করেছেন। তিনি টাঙ্গাইলের মওলানা মুহম্মদ আলী কলেজের বাংলার প্রভাষক ছিলেন। রফিক আজাদের প্রেমের কবিতার মধ্যে নারীপ্রেমের একটা আলাদা বৈশিষ্ট আছে। রফিক আজাদ ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

মামুনুর রশীদ (১৯৪৭-)

মামুনুর রশীদ ১৯৪৭ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার পাইকড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত নাট্যকার,

www.pathagar.com

অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের মঞ্চ আন্দোলনের পথিকৃত। তার নাট্যকর্মে প্রখর সমাজ সচেতনতা লক্ষণীয়। শ্রেণিসংগ্রাম তার নাটকের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। তিনি টিভির জন্যেও অসংখ্য নাটক লিখেছেন এবং অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে, শ্রেণিসংগ্রাম, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার আদায়ের নানা আন্দোলন নিয়ে নাটক রচনা ও নাট্য পরিবেশনা বাংলাদেশের নাট্য জগতে মামুনুর রশীদকে একটা আলাদা স্থান করে দিয়েছে। মামুনুর রশীদ এর জন্ম ২৯ ফেব্রুয়ারি। লিপইয়ার হওয়ায় দিনটি ৪ বছর পরপর আসে।

১৯৬৭ সালে তিনি তদানীন্তন পুর্ব পাকিস্তানে টেলিভিশনের জন্য নাটক লিখতে শুরু করেন যার বিষয়বস্তু ছিল মূলত পারিবারিক। সেসময় কমেডি নাটকও তিনি লিখতেন। নাট্যশিল্পের প্রতি তাঁর প্রকৃত ভালবাসা শুরু হয় টাঙ্গাইলে তাঁর নিজ গ্রামে যাত্রা ও লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের সূত্র ধরে। তার যাত্রার অভিনয় অভিজ্ঞতা তাঁর নাট্যভাবনাকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং জড়িত হন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে। সেই সময়টাও তাঁর নাট্যচর্চায় প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ১৯৭২ সালে কলকাতা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে তিনি তৈরি করেন তাঁর আরণ্যক নাট্যদল।

মামুনুর রশীদ

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম হলো– ওরা কদম আলি, ওরা আছে বলেই, ইবলিশ, এখানে নোঙ্গর, গিনিপিগ, জয় জয়ন্তী, সংক্রান্তি, রাঢ়াঙ্গ, সুন্দরি, এখানের নোঙ্গর, ইতি আমার বোন, অর্পণ, পুত্রদায়, অলসপুর ইত্যাদি। নাট্যজন মামুনুর রশীদ বাংলা একাডেমি, একুশে পদক, আলাউল সাহিত্য পুরস্কার ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি সত্যেন সেন সম্মাননা পদকে ভূষিত হয়েছেন এবং পশ্চিম বাংলায়ও বেশ কয়েকটি পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

www.pathagar.com

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আবুল কাশেম বয়াতি

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার করটিয়া গ্রামে ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চান মাহমুদ ফকির। পিতার উৎসাহে বাউল গানের জগতে প্রবেশ করেন। বাউল গান গেয়ে তিনি বাংলাদেশের একজন অন্যতম গায়কে পরিণত হয়েছিলেন। তার গান রেডিওতে প্রচার হতো। গান গেয়ে তিনি অনেক পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। আবুল কাশেম বয়াতি ১৯৯৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার অনেক শিষ্য প্রতিষ্ঠিত বাউলে পরিণত হয়েছে।

নিশান আলী বয়াতি

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বেড়াবোচনা গ্রামে বাংলা ১৩০০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে নিজ গ্রামের ওস্তাদ নাদের আলীর কাছে সংগীতের হাতেখড়ি নেন। পরবর্তীতে তিনি জারিগানের ওস্তাদ মিয়া চান সরকারের কাছে এবং কবিগানের ওস্তাদ তালেব সরকারের তালিম নেন। নিশান আলী বয়াতির সংগীত জগতে অনেক খ্যাতি ছিল। ১৯৭৬ সালে টাঙ্গাইল ভাসানী হলে অনুষ্ঠিত 'সুরের নদী বংশাই' অনুষ্ঠানে তাঁর গান রেডিও বাংলাদেশ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

আমীর আলী সরকার

টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার হাজরাবাড়ি গ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জমসের আলী। নবম শ্রেণি পাস। ধুয়াগানের রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন। প্রায় এক হাজার ধুয়াগান রচনা করেন। শ্রেষ্ঠ ধুয়াগানের বয়াতির জন্য বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই খ্যাতিমান ধুয়াগানের শিল্পী ১৯৭৯ সালের ২৭ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

মো. মছলিম উদ্দিন বাউল

টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার সুন্দর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বছির উদ্দিন। বয়স ৬২ বছর। পঞ্চম শ্রেণি পাস। তিনি বাউলগান ও জারিগান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার ওস্তাদের নাম নূর মোহাম্মদ। বাউল ও জারিগানের সময় মছলিম উদ্দিন দোতারা বাজিয়ে গান পরিবেশন করেন। গান গেয়ে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন।

গণেশ রক্ষিত

টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার শাখারিয়া গ্রামে ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গিরিশ চন্দ্র রক্ষিত। নবম শ্রেণি পাস। তাঁর বর্তমান বয়স ১১১ বছর। কবিগান ও ধুয়াগানের বয়াতি। তিনি প্রচুর সংখ্যক ধুয়া, বিচার ও ভোজন গান লিখেছেন। টাঙ্গাইল জেলায় তার যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে।

নিবারণ চন্দ্র ভৌমিক

টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার (বর্তমান ভূঞাপুর উপজেলার) পশ্চিম ভূঞাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুরেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক। নিবারণ চন্দ্র ভৌমিক

www.pathagar.com

সার্কাস শিল্পী ছিলেন। 'রয়েল টাইগার সার্কাস' নামে একটি সার্কাস পার্টির পরিচালক ছিলেন নিবারণ চন্দ্র ভৌমিক। সার্কাস পার্টিটি সারা বাংলায় জনপ্রিয় ছিল।

খন্দকার মকবুল হোসেন (মৃত্যু- ১৯৯৯ খ্রি.)

খন্দকার মকবুল হোসেন টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার গোপিনাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবীতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সাঁইতত্ত্ব, মুর্শিদি, মারফতি, বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য গানের স্রষ্টা ও শিল্পী। জীবনের শেষ সময়ে তিনি সিরাজগঞ্জের মীরপুর বসবাস করতেন। তার লেখা বিখ্যাত একটি গানের মুখপরায় উল্লেখ করছি।

'চলতে চলার পথে হুসে চলো
ডান পা ফেলিতে আল্লাহ সুখেতে
বাম পা ফেলিতে হু বাঁশি তোল
চলতে চলার পথে হুসে চলো।

হায়দার আলী জামাদ্দার (মৃত্যু ২০০৭ খ্রি.)

টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার গাবসারা ইউনিয়নের রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হায়দার আলী জামাদ্দার। ধুয়াগানের স্রষ্টা ও শিল্পী হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শেষ জীবনে ভিক্ষাবৃত্তি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। নদীভাঙ্গন নিয়ে তার লেখা একটি ধুয়াগানের মুখপয়ার উল্লেখ করছি।

'পাগলা নদী রে
ভাঙ্গিয়া করিলা দেশান্তরি
কারুর ভাঙ্গলা দালান বাড়ি
কারুর ভাঙ্গলা টিনের চৌরি
কারুর ভাঙ্গলা নবীন পীরিতি।'

বাহাদুর আলী খান

বাহাদুর আলী খান ১৩২৩ বঙ্গাব্দে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার বামনহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাহাদুর আলী খান তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। বাহাদুর আলী খান অসংখ্য ধুয়াগান ও জারিগান রচনা করেছেন। এবং সেসব গানের সুরারোপ করেছেন নিজেই। বিভিন্ন আসরে গেয়েছেন এসব গান।

বাহাদুর আলী খান নিজেই একটি গানের দল গঠন করেন। সদাহাস্য বাহাদুর আলী খান ভূঞাপুর অঞ্চলের লোককবিদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নাম।

কাসেম বয়াতি

কাশেম আলী বয়াতি (মৃত্যু- ২০০৯ খ্রি.), পিতা : মৃত ইমান আলী, গ্রাম : রামপুর, ডাকঘর : গাবসারা রামপুর, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। কাশেম আলী বয়াতি জারিগানের স্রষ্টা ও শিল্পী ছিলেন।

মেধু বয়াতি (মৃত্যু- ১৯৬২ খ্রি.)

গ্রাম : ভারই, ডাকঘর : ভারই, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। মেন্দু বয়াতি ধুয়াগানের স্রষ্টা ও শিল্পী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়ে তার লেখা বেশ কয়েকটি ধুয়াগান এখনো এলাকায় প্রচলিত রয়েছে।

www.pathagar.com

ট. মুক্তিযুদ্ধ

ব্রিটিশের শাসনকাল থেকেই টাঙ্গাইলের জনগণ বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রামের সাথে জড়িত ছিল। আজও তা অব্যাহত আছে। ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় মুসলিম জাগরণের সূত্রপাত। ভারতীয় মুসলমানেরা ব্রিটিশদের দ্বারা অতিমাত্রায় শোষণ নির্যাতনের শিকার হয়। এই শোষণ ও নির্যাতনের হাত হতে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য মুসলমান জমিদারগণ 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠন করেন। এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বে ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও নবাব আলী চৌধুরী। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমান জমিদারদের নিয়ে ঢাকায় সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনেই 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। আর সম্মেলনের ব্যয়ভার বহন করেন ত্রিপুরা ও করটিয়ার জমিদারগণ।

১৯০৫ সালের 'বঙ্গভঙ্গ'-কে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বকীয়তা সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গের পক্ষের ছিলেন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, ধনবাড়ির জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী ও করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী প্রমুখ।

অপর দিকে বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, দেলদুয়ারের জমিদার স্যার আবদুল হালিম গজনবী ও স্যার আবদুল করীম গজনবী এবং সন্তোষের জমিদার মন্মথ রায় চৌধুরী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পক্ষ বিপক্ষের প্রথম সারির পাঁচজন নেতার মধ্যে চারজনই ছিল টাঙ্গাইলের। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। দেলদুয়ারের জমিদারগণ যদি নবাব স্যার সলিমুল্লাহর পক্ষ অবলম্বন করতেন তাহলে বাংলার ইতিহাস হয়ত ভিন্ন হতো। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় সলিমুল্লাহ হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। দুঃখ ও বেদনায় সলিমুল্লাহ ১৯১৬ সালে প্রাণত্যাগ করেন। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। নবাব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর ধনবাড়ির নওয়াব আলী চৌধুরীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে ১৯২১ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে পূর্ববাংলা হতে সবচেয়ে কম বয়সী যে নেতা যোগদান করেছিলেন তিনি শামসুল হক। শামসুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুইটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানী ও শামসুল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন মওলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, কোষাধ্যক্ষ হলেন এ আর খান। এঁরা তিনজনই টাঙ্গাইলের বাসিন্দা। আওয়ামী মুসলিম লীগের মেনোফেস্টো 'মূলদাবী' রচনা করেন সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলে উপনির্বাচন হয়। এই উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী ছিলেন করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী। আর আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন শামসুল হক। শামসুল হকের নিকট খুররম খান পন্নী বিপুল ভোটে পরাজিত হয়। এটাই উভয় পাকিস্তানে মুসলিম লীগের প্রথম পরাজয়। এরপর

www.pathagar.com

পাকিস্তান সরকার আর কোনো উপনির্বাচন দেয় নাই। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক গ্রেফতার হন। ১৯৫৪ সালে হক ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে।

১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে সরকারের সাথে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

মওলানা ভাসানী চেয়েছিলেন স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি। অর্থাৎ পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি কোনো রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন হবে না। অপরদিকে পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থনপুষ্ট পররাষ্ট্রনীতি। কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী বলেন, 'পাকিস্তানিদের সাথে আর তিক্ততা বাড়িয়ে লাভ নেই। আসসালামু আলাইকুস। অর্থাৎ পাকিস্তানিদের বিদায় জানান। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন কাগমারী সম্মেলনের মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। কাগমারী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গভঙ্গ শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ভাগ হয়ে ন্যাপ গঠিত হয়।

১৯৬৯ সালে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। অনেক সরকারি কর্মচারী সরকারের পক্ষাবলম্বন করছে। হরতাল চলাকালীন সময়ে অফিস করায় নাগরপুরের সার্কেল অফিসারকে উত্তেজিত ছাত্র জনতা হত্যা করে। এটাই সরকারি কর্মচারীদের ওপর ছাত্রজনতার সরাসরি প্রথম আক্রমণ। এই খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে সরকারি কর্মচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তখন তাদের মধ্যে সরকারের পক্ষ ত্যাগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে টাঙ্গাইল জেলার নাম চিরদিন নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবে। একাত্তরের রক্তঝরা দিনগুলোতে বাংলাদেশের সর্বত্র অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধরা দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের যে অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনীর ইতিহাস সেই অজস্রযুদ্ধের মাঝখানে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এবং আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। পৃথিবীর বহু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশংসিত যে অধ্যায়গুলো আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনীর ইতিহাস কোনোদিক থেকেই সেপ্রসঙ্গে অনুজ্জলতো নয়ই বরং গঠন প্রক্রিয়া, বিন্যাস, সঠিক রণনীতি ও সফল রণকৌশলের প্রয়োগ এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্বের প্রথম শ্রেণির মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত হবার দাবিদার। এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনী যা কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনী নামে খ্যাত কাদের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবদুল কাদের সিদ্দিকী এই উপমহাদেশেই নয় বরং পর্যবেক্ষণরত উৎসুক বিশ্ববাসীর কাছে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল।

২৫শে মার্চের ঘৃণ্য ও পৈশাচিত হত্যাযজ্ঞের অনেক আগে থেকেই টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ কর্মীদের নিয়ে গঠন করা হয় জয়বাংলা বাহিনী। বুলবুল খান মাহবুব ও এম এম রেজার নেতৃত্বে মওলানা ভাসানীর অনুসারী কৃষক সমিতির সদস্য এবং বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরাও সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হয়। সংগঠিত হয় হামিদুল হক মোহনের নেতৃত্বে বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীবৃন্দ ও আল

www.pathagar.com

মুজাহিদীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় লীগের কর্মীবৃন্দ। খন্দকার বাতেনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

২৫শে মার্চের কালো রাত্রির নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর টাঙ্গাইল এসে পৌছানোর পর সবাই যার যার পরিমণ্ডলে তৎপর হয়ে ওঠেন। একটি সর্বদলীয় হাই কমান্ড গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আওয়ামী লাগ নেতা নূরুল ইসলাম এডভোকেট সাহেবের আদালত পাড়াস্থ বাস ভবনে সর্বদলীয় বৈঠক বসে।

অনেক আলোচনা ও বির্তকের পর টাঙ্গইল জেলা 'স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। বদিউজ্জামান খান চেয়ারম্যান ও আবদুল লতিফ সিদ্দিকী আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ন্যাপের সৈয়দ আবদুল মতিন, পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা হাবিবুর রহমান খান ওরফে হবি মিঞা, শামসুর রহমান খান, শাজাহান এডভোকেট নূরুল ইসলাম, আলী আকবর খান, কালো খোকা, বীরেন্দ্র কুমার সাহা, ফজলুর রহমান খান ফারুক, তোফাজ্জল হোসেন মুকুল, জাতীয় লীগের আল মুজাহিদী এবং বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের হামিদুল হক মোহন। সমন্বয় কমিটির নেতা কৃষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক বুলবুল খান মাহবুব, ন্যাপ নেতা এস এম রেজার নেতৃত্বে কৃষক সমিতি। বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীবৃন্দ আলাদা একটি হাইকমাণ্ড গঠন করে স্বতন্ত্র কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কমিটিতে জনাব রফিকুল ইসলাম তারা, আহমদ রেজা, গোপালপুরের শোভা, আশরাফ গিরানী, হাজেরা সুলতানা, শফিকুল ইসলাম সোনা, গোলাম সরোয়ার ছানা, গোলাম আম্বিয়া নূরী, মোয়াজ্জেম হোসেন মিঠু, লেবু, দুলাল, খন্দকার নাজিম উদ্দিন, কৃষক নেতা মালেক মিয়া, দরিদ্রদের বন্ধু হিসাবে খ্যাত জেলা কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি ও একসময়ে বাংলা আসামের ধনী জোতদার মহাজনদের ত্রাস দস্যু সম্রাট দেওয়ান কছিমুদ্দীন (কেইছা দেওয়ান নামে খ্যাত) শ্রমিক নেতা দাইন্যার আবদুর রহমান প্রমুখ অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। কবি মাহবুব সাদিক মাহবুব হাসান, আনোয়ার হোসেন, শামীমসহ বেশ কিছু কর্মীও এই কমিটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

দুটি কমিটি পৃথকভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করলেও সর্বদলীয় কমিটি প্রশাসনিকভাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বিপ্লবী হাইকমাণ্ডের বুলবুল খান মাহবুব ও এস এম রেজার সঙ্গে সর্বদলীয় নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত গণমুক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে সৈয়দ আবদুল মতিনের আলোচনার প্রেক্ষিতে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম তারাকে প্রতিনিধি হিসাবে সর্বদলীয় কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রাদেশিক সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান এ সময় টাঙ্গাইলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে গণমুক্তি পরিষদের উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়।

১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল গোরান সাটিয়াচড়ার যুদ্ধ হয়। পরবর্তীতে কালহাতী প্রতিরোধের যুদ্ধের পর গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বের অবসান ঘটে। একটির অধিকাংশ সদস্য পূর্বেই ভারতে গিয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। আবদুল লতিফ সিদ্দিকী শেরপুর থেকে ফিরে এসে ছত্রভঙ্গ ইপিআর ও স্থানীয় তরুণদের নিয়ে কালিহাতী যুদ্ধে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাব চেষ্টা করলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতার অভাব, শৃংখলার অনুপস্থিতি এবং পরিকল্পনাহীনতায় অভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কালিহাতী যুদ্ধে পাকবাহিনীর একজন মেজরসহ বহু হানাদার সৈন্য নিহত হলেও কাদেরিয়া বাহিনীর গড়ে ওঠার আগে এটাই ছিল তাদের বিরুদ্ধে টাঙ্গাইলের শেষ যুদ্ধ। এরপর আবদুল লতিফ সিদ্দিকী ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলে ২৬ মার্চ ১৯৭১ টাঙ্গাইলে যে গণমুক্তি পরিষদ গঠন করা হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য কোনো নেতা আর দেশের অভ্যন্তরে রইল না। অবসান হলো একটি অধ্যায়ের।

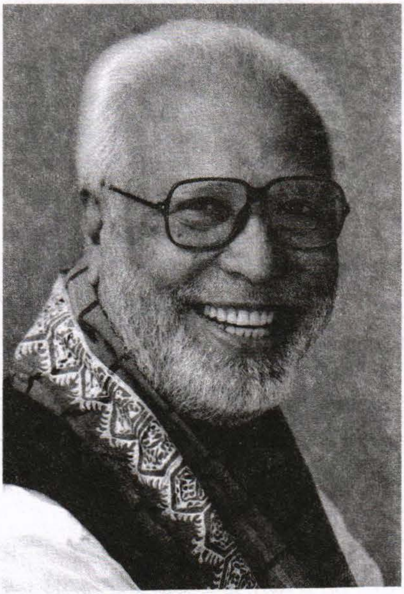

বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম

কাদেরিয়া বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া যখন চলছিল তখন টাঙ্গাইল জেলার অন্যান্য অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি মুক্তি বাহিনী গড়ে ওঠে। টাঙ্গাইল শহর পাক হানাদার বাহিনীর অধিকারে চলে যাবার পর বুলবুল খান মাহবুব ও এস এম রেজার নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী হাইকমাণ্ডের সদস্যরা তাদের সংগৃহীত অস্ত্র, সাইক্লোস্টাইল মেশিন ও বোমা বানানোর সরঞ্জাম নিয়ে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি এলাকায় চলে যায়। গোরান সাটিয়াচড়ার যুদ্ধের পূর্বরাত্রে বুলবুল খান মাহবুব একটি টয়োটা জীপসহ সেনাবাহিনীর চাকরি ত্যাগ করে এসে বাম রাজনীতিতে সক্রিয় কর্মী গোলাম সরোয়ার ছানা ও অপর একজন সাথী নিয়ে জয়দেবপুর অস্ত্র কারখানা থেকে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তা ধরে অগ্রসর হন এবং কালিয়াকৈর তাদের পৌছে দিয়ে টাঙ্গাইল ফিরে আসেন। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান সালু, কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবর খান রনো তখন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলোচনার জন্য টাঙ্গাইল আবস্থান করছেন। ৩ এপ্রিল টাঙ্গাইল শহরের পতন হবার পর পাকবাহিনী মওলানা ভাসানীর

৬—

www.pathagar.com

সন্তোষস্থ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। বদিউজ্জামান খানের বাড়ি ও খন্দকার আসাদুজ্জামান এর বাড়ি ডিনামাইন্ড দিয়ে গুড়িয়ে দেয়। আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর বাড়িয়ে আগুন দেয়।

শাহজাহান সিরাজ

মওলানা ভাসানী সন্তোষ ও বিন্যাফৈর ত্যাগ করে নৌপথে অন্যত্র চলে যান। খন্দকার আব্দুল বাতেন নাগরপুর এলাকায় মুক্তিবাহিনীর গঠন করার জন্য মরিয়া হয়ে কাজ করেন। এস এম রেজা এবং তার ছোট ভাই আহমেদ রেজাকে কিছু রসদ ও সঙ্গীসহ ময়থা গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। রাশেদ খান মেনন ও রফিকুল ইসলাম তারাকে নিয়ে জামালপুর হয়ে তাঁর গন্তব্যে চলে যান। হায়দার আকবর খান রনো ও আতিকুর রহমান সালু কৃষক নেতা ও বিপ্লবী হাইকমান্ডের সদস্য মালেক মিয়ার বাড়িতে চলে যান।

সাটিয়াচড়া যুদ্ধের পর টাঙ্গাইল শহরে পাকবাহিনী প্রবেশ করার সময় বুলবুল খান মাহবুব মঙ্গলহোড় গ্রামে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ শুরু করেন। কয়েক দিনের মধ্যে অসামান্য সাহসী মহিলা কর্মী হাজেরা সুলতান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে একটি যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বুলবুল খান মাহবুব মালেক মিয়ার বাড়িতে হায়দার আকবর খান রনো, আতিকুর রহমান সালু, কইছা দেওয়ান, কৃষক কর্মী রইনা শেখকে নিয়ে বৈঠক করে অবিলম্বে মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং নৌপথে চরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করে অস্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কর্মীদের একত্র করা প্রচেষ্টা শুরু করেন। কিছু দিন নদীপথে ঘুরে মওলানা ভাষানীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ভাড়রা গ্রামে একজন কর্মীর বাড়িতে বসে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

হায়দার আকবর খান রনো এবং আতিকুর রহমান খান ইউছুফজাই হাঁটা পথে ঢাকার দিকে চলে যাবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক রক্ষিত বেশ কিছু অস্ত্র টাঙ্গাইলে পাঠিয়ে দিবে। বুলবুল খান মাহবুব ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনী গঠন শেষ করে থানা আক্রমণের মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ শুরু করেন। বুলবুল খান মাহবুব মঙ্গলহোড় গ্রামে অবস্থান করে এস এম রেজা ও তার অন্য সাথীদের সাথে যোগাযোগের জন্য সংবাদ পাঠান। কিন্তু খবর আসে টাঙ্গাইল শহরে লুকিয়ে রাখা পার্টির কিছু দলিল বোমা বানানোর সরঞ্জাম গোপনে আনতে গিয়ে এস এম রেজা, তাঁর ছোট ভাই আহমদ রেজা, খন্দকার নাজিম উদ্দিন ও আবদুল হালিম নামক কর্মী পাকবাহিনী ও পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

ইতিমধ্যে গোলাম সারোয়ার ছানা পাকবাহিনী অধিকৃত জয়দেবপুর অস্ত্র কারখানা থেকে অস্ত্র উদ্ধারে দুঃসাহসী অভিযান শেষে সঙ্গী লেবুসহ দুটি নতুন চাইনিজ রাইফেল ও বেশ কিছু গুলি উদ্ধার করে আনে। গোলাম সারোয়ার ছানা ও লেবুকে নিয়ে বুলবুল খান মাহবুব কাদের সিদ্দিকীর নিজ গ্রাম ছাতিহাটিতে চলে যায়। হাজেরা সুলতানার বাড়ীও সেই গ্রামে। হাজেরা সুলতানার সঙ্গে যোগাযোগ হলেও কাদের সিদ্দিকী তখন পাহাড়ি এলাকায় অজানা ঠিকানায় মুক্তিবাহিনী গঠনে ব্যস্ত। ফলে তাঁর সঙ্গে বুলবুল খান মাহবুবের দেখা হলো না।

মোয়াজ্জেম হোসেন মিঠুর কাছে রক্ষিত দুইটি চাইনিজ রাইফেল, বেশ কিছু গুলি নিয়ে তাঁরা আবার সয়াচাকতা গ্রামে মালেক মিয়ার বাড়িতে চলে আসে। সেখানে চরাঞ্চলে ঘাঁটি করে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে আশরাফ গিরানী দুরমুজ খাঁ, গোপালপুরের শোভা ও অন্যান্যদের যোগাযোগের জন্য রফিকুল ইসলাম তারা, লেবু, ছানা ও বুলবুল খান মাহবুব তার গ্রাম ঘাটাইলের দিঘলকান্দীতে চলে যায়। আশরাফ গিরানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পর নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়।

সর্বপ্রথম ভূঞাপুর থানা আক্রমণ করেন। সেখান থেকে কিছু রাইফেল সংগ্রহ করেন। এরপর আশরাফ গিরানী সিরাজগঞ্জে এসডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু গুলি ও গ্রেনেড নিয়ে আসে।

এদিকে আবদুল কাদের সিদ্দিকী ও আবদুল বাতেন পৃথক পৃথক বাহিনী গঠন করে যার যার সাধ্যমতো এক এক থানা থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে বাহিনীকে শক্তিশালী করেন। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা ছোট ছোট মুক্তিবাহিনীর দলগুলো কাদের বাহিনী ও বাতেন বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করেন। এর ফলে কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনী শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়। তারা বীরবিক্রমে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। এই দুই বাহিনীর মধ্যে কাদেরিয়া বাহিনী যুদ্ধে বেশি সুনাম অর্জন করেন।

মধুপুরের অরণ্য অঞ্চল ছিল কাদেরিয়া বাহিনীর ঘাঁটি এলাকা। মহানন্দপুর ও সখীপুরে ছিল এই বাহিনীর হেড কোয়ার্টার। পশ্চিমাঞ্চলের সাব হেড কোয়ার্টার ছিল ভূঞাপুর। কাদেরিয়া বাহিনীর ছিল নিজস্ব গারাগার, হাসপাতাল, বেতার বার্তা প্রেরণ ও শত্রুর বেতার সংকেত ধরার জন্যে ওয়ারলেস সেন্টার, সাইক্লোস্টাইন যন্ত্রে মুদ্রিত সংবাদপত্র রণাঙ্গণ ও ট্রেনিং সেন্টার। ফিল্ড টেলিফোন ব্যবস্থা সংবাদ আদান-প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তালিকাভূক্ত হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও কাজ

www.pathagar.com

পরিচালনার জন্য তাদের নির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল। প্লাটুন ও কোম্পানিতে বিভক্ত কাদেরিয়া বাহিনীর প্রতিটি কোম্পানিকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর থেকে নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলতে হতো। প্রত্যেক কোম্পানি কমান্ডারকে অপরাধীর বিচার থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হতো। গোলাবারুদ ও অস্ত্রের সঠিক তালিকা এবং অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব সংরক্ষণ ও সব রেকর্ড নিয়মিত হেডকোয়াটারে পাঠাতে হতো। প্রতিনিয়ত যুদ্ধের মধ্যে থেকে এবং রাজধানী ঢাকা শহর সংলগ্ন জেলায় শত্রুর সর্বশক্তি নিয়োগের মোকাবেলা করে এমন একটি বিশাল বাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে কাদের সিদ্দিকীর সাফল্য তাকে মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তিতে পরিণত করেছিল। যুদ্ধের পাশাপাশি জনসংযোগের জন্যে নিয়মিত জনসভা ও জনগণের সঙ্গে একাত্মতা কাদেরিয়া বাহিনীতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

যুদ্ধের প্রথম কয়েকমাস দেশের অন্যত্র বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর তেমন কোনো তৎপরতা না থাকায় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী তার সর্বাধুনিক ও ভারী অস্ত্রসহ কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনীর উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পায়। তারপরও টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধারা পরাজয় মেনে নেননি। তারা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে।

কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা প্রায় সতের হাজার। এদের সহযোগী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংখ্যা ছিল বাহাত্তর হাজার। কাদেরিয়া বাহিনীর যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল ৫টি সেক্টরে বিভক্ত। ৫টি সেক্টরের ছিল ৫টি সদর দফতর। ৯৭টি কোম্পানিতে বিভক্ত ছিল কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্যারা কোম্পানিগুলোরও ছিল পৃথক পৃথক সদর দফতর। দফতরগুলো ছিল ভ্রাম্যমান। কাদেরিয়া বাহিনী টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ ও সিরাজগঞ্জের কিছু অংশসহ প্রায় ১৫শ বর্গমাইল এলাকা মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই বাহিনীর ছোট বড় যুদ্ধের সংখ্যা প্রায় তিনশতাধিক। তার মধ্যে মাটিকাটার যুদ্ধ, ভূঞাপুর, গোপালপুর মধুপুর, নাগরপুর বাসাইল, পাথরঘাটা, মাকড়াই, ধলাপাড়া ও কামুটার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাটিকাটার জাহাজ ধ্বংসের যুদ্ধ শুধুমাত্র কাদেরিয়া বাহিনীই নয় সমগ্র দেশের সব যুদ্ধের মধ্যে ছিল একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদের যেমনি ব্যাপক ক্ষতি হয় তেমনি কাদেরিয়া বাহিনীর সৈন্যদের প্রচুর লাভ হয়। কারণ জাহাজে প্রায় একুশ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ছিল যা সবই খোয়া যায় হানাদারদের নিকট হতে। আর খোয়া যাওয়া অধিকাংশ অস্ত্রই কাদেরিয়া বাহিনীর হাতে চলে আসে। এই অস্ত্র কাদেরিয়া বাহিনীর হাতে চলে আসাতে কাদেরিয়া বাহিনীর ব্যাপক শক্তিশালী হয়। কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকগুণ উৎসহ উদ্দীপনা নিয়ে হানাদারদের ওপর বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। কাদেরিয়া বাহিনীর আক্রমণে একসময় পাকবাহিনীর সৈন্যরা কোনঠাসা হয়ে যায়। কাদেরিয়া বাহিনীকে হানাদার বাহিনী তাদের যমদূত মনে করে।

কাদেরিয়া বাহিনীর উল্লেখযোগ্য কোম্পানি কমান্ডার ও সহকারী কোম্পানি কমান্ডার হলেন– ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান, মনিরুল ইসলাম মনি, শওকত মোমেন শাজাহান, লোকমান হোসেন, হাবিবুর রহমান, আবদুল গফুর, আবদুস ছবুর খান, লাবিবুর রহমান, সরোয়ার, হুমায়ুন বাঙ্গাল, আবদুল খালেক, সাইদুর রহমান, বকুল, ফজলুল

www.pathagar.com

হক, খোরশেদ আলম, ইদ্রিস হোসেন, নবী নেওয়াজ, আফসার উদ্দিন, হাবিবুল হক খান বেনু, মোকাদ্দেছ আলী, ইউনুস, খন্দকার হাবিবুর রহমান, আসাদুজ্জামান আরজু, বায়জিদ আলম, জহুরুল হক চান মিঞা, মোহাম্মদ আলী, মাইনুদ্দিন, রেজাউল করিম, ফেরদৌস আলম, রঞ্জু, এন এ খান আজাদ, মোঃ লৎফর রহমান, আবদুল হাকিম, আঙ্গুর তালুকদার, আনিছুর রহমান, আবদুল কদ্দুস, সামাদ গামা, রবিউল আলম গেরিলা প্রমুখ।

কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক দপ্তরের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন- আনোয়ার উল আলম শহীদ, হামিদুল হক, আমজাদ মাস্টার, ফারুক আহমেদ, মাহবুব সাদিক মাহবুব হাসান, আলী আসগর খান, দাউদ, সোহরাব আলী খান আরজু সোহরাওয়ার্দী, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আতাউর রহমান, বর্মন, আবদুল্লাহ, আজিজ বাঙ্গাল, আবদুল আউয়াল সিদ্দিকী, লালমোহন সানু, রাঙ্গা খলিলুর রহমান, আবদুল আলীম তালুকদার , আবদুল হামিদ ভোলা প্রমুখ।

টাঙ্গাইলে মুক্তিযুদ্ধে বাতেন বাহিনীর অবদানও উল্লেখ করার মতো। দক্ষিণ টাঙ্গাইলের কনোরা গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এই বাহিনীর যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল সমগ্র দক্ষিণ টাঙ্গাইলসহ ঢাকা জেলার কিছু অংশ গাজীপুর জেলার কিছু অংশ, মানিকগঞ্জ জেলার উত্তর অঞ্চল এবং পাবনাও সিরাজগঞ্জ জেলার ব্যাপক অংশ।

বাতেন বাহিনীতে চার হাজারের মতো সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। একুশটি কোম্পানিতে তারা বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বাতেন বাহিনীর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধের মধ্যে ছিল মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানা আক্রমণ, দৌলতপুর থানা আক্রমণ, ঘিওর থানা দখল, সাটুরিয়া থানা দুইবার আক্রমণ, চৌহালী অভিযান, নাগরপুর থানা মুক্ত করা, ধল্লার ব্রিজ আক্রমণ, মানিকগঞ্জের জাব্রালব্রিজের নিকট হানাদারদের গান বোট আক্রমণ ও মাসকাউলিয়ার রাজাকার নিধন।

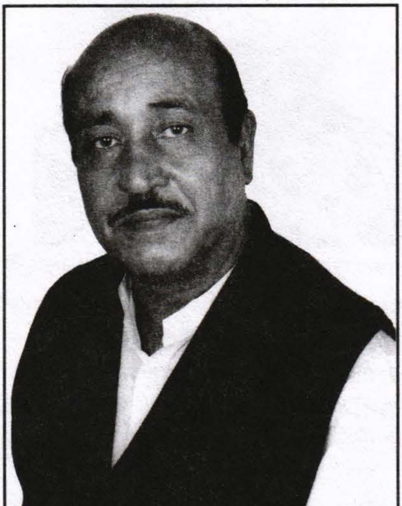

খন্দকার আবদুল বাতেন

www.pathagar.com

এই বাহিনীর তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। সেগুলো হলো ১. মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার অন্তর্গত তিল্লী গ্রাম, ২. টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার অন্তর্গত লাউ হাটি, ৩. টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার অন্তর্গত শাহজানির চর।

বাতেন বাহিনীও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বেসামরিক বিভাগকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করেছিল। যেমন- ১. নিরাপত্তা বিভাগ, ২. খাদ্যবিভাগ, ৩. অর্থবিভাগ, ৪. বিচার ও গণসংযোগ বিভাগ, ৫. রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ বিভাগ।

বাতেন বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু তাহের নায়েক হুমায়ন কবীর খান, নায়েক আবদুস সামাদ, নায়েক সিরাজুল হক খান, নায়েক ওয়াজেদ আলী খান, নায়েক আবুল খায়ের, সুবেদার আলমগীর, মোঃ দেলোয়ার হোসেন হারিজ, মোঃ ইন্তাজ আলী, এম.এ. রশিদ, মোঃ বেলাল হোসেন, মোঃ নূরুল ইসলাম, আমিনুর রহমান খান, মোঃ আফজাল হোসেন, মোঃ আল্লাদ খান, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আবু কায়সার, মোঃ কফিল উদ্দিন সুবেদার মেজর আবদুল বারী ছিলেন বাতেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার। প্রশিক্ষণ বিভাগে ছিলেন সুবেদার মেজর আবু তাহের, সুবেদার আবদুল বারী, নায়েক ওয়াজেদ আলী খান, নায়েক আবুল খায়ের ও সুবেদার আলমগীর। বাতেন বাহিনীর কোয়াটার মাস্টার ছিলেন খন্দকার আবদুল করিম।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আবদুল লতিফ সিদ্দিকী

বাতেন বাহিনীর বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ হলেন বাবু উপেন্দ্রনাথ সরকার বি এস সি খন্দকার আবদুস ছালাম, মীর শামসুল আলম, শাহজাদা, আমিনুল ইসলাম খান, মোঃ সহিদুল ইসলাম, আবদুল আলীম খান সেলিম, আলীম খান সেলিম, শহিদুল হক খান মল্লিক, মোঃ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ, খালেদ খান যুবরাজ, মোঃ ইউনুস খান, মোঃ শামসুল আলম, মোঃ মেজবাউদ্দিন নয়ন, মোঃ আবদুল গফুর খান, মোঃ নূরুল ইসলাম, এস এম শামসুল হুদা, মোঃ আজগর আলী, খন্দকার ফজলুল হক, মোঃ খলিলুর রহমান, আবদুর রশীদ, মোঃ রোস্তম আলী, মোঃ মানিক, মোঃ শাহজাহান, মোঃ

www.pathagar.com

রেজাউল বারী খান, খন্দকার এজাজ রসুল, মোঃ হাসমত আলী খান, মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, আবুল হাসেম খান, ঠান্ডা, আলী হাসান, মোঃ সাইদুল ইসলাম খান, মোঃ শাহজাহান মাস্টার, মোঃ শাহজাহান গ্যান্ডা, বাবু বৈষ্ণব বিশ্বাস, মোঃ আলী জিন্না, মোঃ আফতাব হোসেন আরজু, খন্দকার লৎফর রহমান মিন্টু, শ্রীগৌর চন্দ্র সাহা, মোঃ বেনজির আহমেদ, আল মাসুদ, আবদুল করিম খান, আমিনুর রহমান খান (মজিবর), মোঃ শাহজাহান খান, মোঃ বজলুর রহমান খান সাবু, মোঃ শরিফ উদ্দিন, মোঃ আফতাব উদ্দিন, বাবু নূপুর পোদ্দার, আনন্দ মোহন দাস, মোঃ জোসন আলী, ড. মোঃ শাহজাহান, অরুন কুমার বোস, আবদুর রাজ্জাক, আবদুর রৌফ, আলী আকবর খান ডলার, মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান চারু, মোঃ সেলিম খান, ডাঃ জহিরুল ইসলাম, ডাঃ বসন্ত কুমার সাহা, ডাঃ লিখিল চন্দ্র সাহা, আঙ্গুরী রানী সরকার প্রমুখ। বাতেন বাহিনীর সংবাদপত্রের নাম ছিল অগ্নিশিখা।

কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা ৩ এপ্রিল এর প্রতিরোধ যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাদের আওতাভূক্ত এলাকায় বীর বিক্রমে হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে প্রায় যুদ্ধেই বিজয়ী হয়েছে। তারা টাঙ্গাইল অঞ্চলকে মুক্ত করে বিজয়ী বেশে ঢাকায় এসে হানাদার বাহিনীর নেত্রী স্থানীয় অফিসারদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে। বিশেষ করে কাদেরিয়া বাহিনী ও মিত্র বাহিনীর যৌথ অভিযানের ফলে আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পরাজয় মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ দলিলে সই করে প্রানে বেঁচে যান। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। পায় একটি মানচিত্র খচিত নতুন ভূ-খণ্ড এবং লাল সবুজের পতাকা।

খন্দকার আসাদুজ্জামন

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে কাদিরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনীর যেমনি অবদান রয়েছে, তেমনি টাঙ্গাইলের প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের ও অবদান কোনো অংশে কম নয়। টাঙ্গাইলের বীর সন্তানরা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের স্বনামধন্য সংগঠক ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেশের ভেতরে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে বিশেষ অবদান রেখে শহিদ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কুমিল্লার জেলা প্রশাসক এ কে এম শামসুল হক খান ও সিরাজগঞ্জের এস ডি ও বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে বৈঠক করেছেন। কর্নেল এ কে শামসুদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। এই সংগঠকদ্বয় স্বাধীনতাযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন।

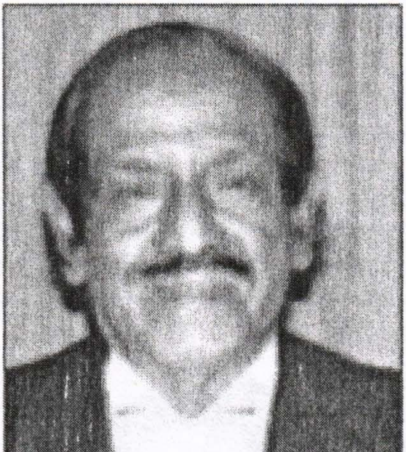

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ব্যারিস্টার শওকত আলী খান

মুজিবনগর সরকারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন টাঙ্গাইলের কয়েকজন বীর সন্তান। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুজিবনগর সরকারের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্ব জনমত সংগঠনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিশেষ ভূমিকা রাখেন। জননেতা আবদুল মান্নান মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলা সরকারের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে আবদুল মান্নানকে মন্ত্রীর পদ মর্যাদায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দেন। তিনি সফলভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করেন। খন্দকার আসাদুজ্জামান মুজিবনগর সরকারের অর্থসচিব ছিলেন। শামছুর রহমান খান শাহজাহান উত্তর পূর্ব জোনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনিভাবে হুমায়ন খালিদ, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, সৈয়দ আবদুল মতিন, হাতেম আলী তালুকদার, ফজলুর রহমান খান ফারুক, আবদুল বাছেত, আবুল ফজল শামসুজ্জামান রাফিয়া আকতার ডলি প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় শাহজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন। মুজিব বাহিনী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শাহজাহান সিরাজ

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী 'চার খলিফা'র মধ্যে ছিলেন অন্যতম। এরকম বহু কৃতি সন্তানে ভূমিকা রয়েছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে।

দেশ স্বাধীন হবার পর টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনীর বীর সেনারা হাতিয়ার জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক ক্ষেত্র তৈরি করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্দীশালা থেকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তি পেয়ে লন্ডন দিল্লী হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন স্বদেশ ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুকে টাঙ্গাইল এনে কাদেরিয়া বাহিনী বিশাল জনসভা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট কাদেরিয়া বাহিনীর অস্ত্র জমা দেন।

আজ প্রায় চার দশকের বেশি সময় হয়েছে দেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সেই রক্তঝরা দিনগুলির কথা এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু যতদিন স্বাধীন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন থাকবে বাঙ্গালি জাতির অস্তিত্ব, মক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনি। আর অসাধারণ রণনৈপুণ্যের অধিকারী সেই সব মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের অধিনায়কের নাম।

তথ্যনির্দেশ

১. খন্দকার আবদুর রহীম, টাঙ্গাইলের ইতিহাস (তৃতীয় বর্ধিত প্রকাশ), পৃ. ৮২।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।
৩. মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ* ও ঐতিহ্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮৮।
৪. খান মাহবুব, মাহমুদ কামাল, আলম তালুকদার সম্পাদিক- *টাঙ্গাইল জেলার স্থান নাম বিচিত্রা*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২২৩
৫. মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০৭, পৃ. ১৮৬।
৬. খান মাহবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ২২৪।
৭. মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮৭।
৮. খান মাহবুব, টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি, পলল প্রকাশন, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৯৮।
৯. মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০৭, পৃ. ১৮৬।
১০. খান মাহবুব, মাহমুদ কামাল, আলম তালুকদার সম্পাদিক- *টাঙ্গাইল জেলার স্থান নাম বিচিত্রা*, জেলা পরিষদ, টাঙ্গাইল- ২০০৮, পৃ. ১৫।
১১. মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮৬।
১২. খান মাহবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৯২।
১৩. মোঃ লুৎফর রহমান, *ঘাটাইলের গুণীজন*, ছায়ানীড় প্রকাশনী, টাঙ্গাইল-২০০৫, পৃ. ৭।
১৪. মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০৭, পৃ. ১৮৭।
১৫. জুলফিকার হায়দার, *ঘাটাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, জলসা প্রকাশনী, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল-২০০২, পৃ. ১৫।

www.pathagar.com

১৬. খান মাহবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ২২৯।
১৭. মইন উদ্দিন আহমদ, *বাসাইল নামের উপজেলা*, বটমূল, ঢাকা- ২০০৬।
১৮. খান মাহবুব, মাহমুদ কামাল, আলম তালুকদার সম্পাদিত- *টাঙ্গাইল জেলার স্থান নাম বিচিত্রা*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৫৯।
১৯. খান মাহবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ২৫২।
২০. আলহাজ্ব কাজী নূরুল ইসলাম, *টাঙ্গাইলের হাজার বছরের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা-২০১১, পৃ. ৩০১।
২১. মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮৮।
২২. খান মাহবুব, মাহমুদ কামাল, আলম তালুকদার- (সম্পাদিত) *টাঙ্গাইল জেলার স্থান নাম বিচিত্রা*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৫৯।
২৩. মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮৮।
২৪. খান মাহবুব, মাহমুদ কামাল, আলম তালুকদার সম্পাদিত- *টাঙ্গাইল জেলার স্থান নাম বিচিত্রা*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৯২।
২৫. খান মাহবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ২৪৭ ও ২৪৮।
২৬. মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮৯।
২৭. মামুন তরফদার, *লোকসাহিত্যে টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, গতিধারা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ১৭।
২৮. *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার*, টাঙ্গাইল- ১৯৯০, পৃ. ১।
২৯. মামুন তরফদার, *লোকসাহিত্যে টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, গতিধারা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ১৮।
৩০. মুহাম্মদ বাকের, (সম্পাদিত) *টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬৩-৪৬৫।
৩১. ড. মোঃ আবদুল করিম মিঞা, *টাঙ্গাইল অঞ্চলের বাউল গান : স্বরূপ ও দর্শন*, বাংলা একাডেমী-২০০৯, পৃ.১।
৩২. মামুন তরফদার, *লোকসাহিত্যে টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, গতিধারা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ১৮।
৩৩. *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার*, টাঙ্গাইল- ১৯৯০, পৃ. ৯৭, ৯৮, ১০৮, ১০৮।
৩৪. খান মাহবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা- ২০০৯, প্রাক কথন চার।
৩৫. *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার*, টাঙ্গাইল- ১৯৯০, পৃ. ৫১, ৫৬, ৫৭, ৫৮।
৩৬. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা: গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৩৭. মোঃ আঃ ছালাম, বয়স : ৪৮, কমিশনার ৭নং ওয়ার্ড, গোপালপুর পৌরসভা, গোপালপুর, ২৪.১১.২০১১
৩৮. তারিক ফেরদৌস খান, শিক্ষা : এম.এ. পেশা : চাকরি, গ্রাম : হুগড়া, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৪.১১.২০১১
৩৯. মোঃ নজরুল ইসলাম, শিক্ষা : এম.এ, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪০, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৪.১১.২০১১

www.pathagar.com

৪০. অধ্যাপক বাণীতোষ চক্রবর্তী, বয়স ৬৫, গ্রাম ও ডাকঘর : ডুবাইল, থানা- গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৮.৭.২০১১।
৪১. মোঃ নুরুজ্জামান, শিক্ষা : বি.এ, বয়স : ৬২, গ্রাম : ডুবাইল (আটাপাড়া), ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, ২৪.১১.২০১১
৪২. তারিক ফেরদৌস খান, শিক্ষা : এম.এ. পেশা : চাকরি, গ্রাম : হুগড়া, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৪.১১.২০১১
৪৩. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানাঃ গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৪৪. মুফতি মোঃ ইদ্রিস হোসাইন, বয়স : ৫০ বছর, শিক্ষা : কামিল, গ্রাম : প্রজাপুর, পো : দত্তবাড়ি, মধুপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৪.১১.২০১১
৪৫. মোঃ হাসেন আলী, বয়স : ৭৬ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : মসজিদ চালা, পো : রাধানগর, মধুপুর, টাঙ্গাইল ২৫.১১.২০১১
৪৬. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানাঃ গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৪৭. হারাধন চন্দ্র দাস, বয়স : ৪৫ বছর, শিক্ষা : বি.এ, গ্রাম+পো : আম্বাড়িয়া, মির্জাবাড়ি, মধুপুর, টাঙ্গাইল ২৪.১১.২০১১
৪৮. প্রাগুক্ত।
৪৯. অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিক ও কলামিস্ট। সভাপতি গোপালপুর প্রেসক্লাব, গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.১১
৫০. মোঃ জামিনুর রহমান, পিতা : মৃত আনিসুর রহমান, পেশা : চাকরি, গ্রাম : মোমিনপুর, ডাকঘর : উখারিয়াবাড়ী, উপজেলা : ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৫১. তারিক ফেরদৌস খান, শিক্ষা : এম.এ. পেশা : চাকরি, গ্রাম : হুগড়া, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৪.১১.২০১১।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

টাঙ্গাইল জেলা লোকসাহিত্যে খুবই সমৃদ্ধ। চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬), দীনেশ চন্দ্র সেন (১৮৮৬-১৯৩৯), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭), কবি জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), রওশন ইজদানী, ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-) প্রমুখ গবেষক ময়মনসিংহ অঞ্চল হতে লোকসাহিত্যের অনেক মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করে দেশি-বিদেশি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চল হতে লোক-সাহিত্যের অনেক উপাদান সংগ্রহ হলেও টাঙ্গাইল জেলা হতে লোকসাহিত্যের উপাদান তেমন সংগৃহীত হয়নি। যা সংগৃহীত হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। ড. আশরাফ সিদ্দিকীর *লোকসাহিত্য* (১৯৯৫) এবং *কিংবদন্তির বাংলা* (১৯৯১) গ্রন্থে টাঙ্গাইল জেলার বহু লোকঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অনার্য ও আর্য জাতির লোক সংস্কৃতি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন আরেক লোকবিজ্ঞানী আবদুস সাত্তার তাঁর *আরণ্য জনপদ* (১৯৬৬) গ্রন্থে। টাঙ্গাইল জেলার গারো ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীসহ বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে রয়েছে আবদুস সাত্তারের কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ।

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ'র (১৮৯৪-১৯৭৮) স্মৃতিচারণমূলক *বাতায়ন* (১৯৬৭) গ্রন্থে টাঙ্গাইলের লোকসংগীত, লোকবিশ্বাস, ধাঁধা ও ছড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। মফিজুল ইসলাম সম্পাদিত *টাঙ্গাইলের লোকসাহিত্য* (১৯৯০), মো. আবদুল করিম মিঞার (১৯৬৪) *টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীত* (২০০১), মামুন তরফদারের *ভূঞাপুরের খেলাধুলার ইতিহাস* (২০০১), *টাঙ্গাইল জেলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি* (২০০২), এস.এ.এ.স মোহাম্মদ জাকারিয়ার (১৯৩১ *কিংবদন্তির ঘাটাইল* (২০০৩), সরকার নূরুল মোমেন সম্পাদিত *টাঙ্গাইল জেলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি* (২০০৪), মো. হায়দার আলী খানের *টাঙ্গাইল জেলার কিংবদন্তি ও জনজীবনের কিছুকথা* (২০০৫), মামুন তরফদারের *টাঙ্গাইলের ছড়া* (২০০৬), *টাঙ্গাইলের লোকঐতিহ্য* (২০০৬), *লোকসাহিত্যে টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (২০০৯), মো. আবদুল করিম মিঞার *টাঙ্গাইল অঞ্চলের বাউলগান স্বরূপ ও দর্শন* (২০০৯), শফিউদ্দিন তালুকদারের *ভুঞাপুরের জনজীবন ও সংস্কৃতি* (২০০৪) এবং *টাঙ্গাইল জেলার লোকসঙ্গীত ও লোককবি* (২০১২) গবেষণামূলক গ্রন্থ। লোকসাহিত্য বিষয়ক এসব গ্রন্থে টাঙ্গাইল জেলার বহু লোকজ উপাদান, লোকসংগীত, আচার অনুষ্ঠান ওঠে এসেছে। এযাবতকালের প্রকাশিত গ্রন্থগুলো এর ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতার তুলনায় কম। এ বিষয়ে আরো বিস্তর গবেষণা ও সংগ্রহের প্রয়োজন।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭) লোককাহিনি সংগ্রহের পথিকৃৎ। ড. আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাকুরমার ঝুলি* (১৯০৮) *ঠাকুরদাদার ঝুলি* (১৯৯১) গ্রন্থের বহু গল্প টাঙ্গাইল থেকে সংগৃহীত।[১] আশরাফ

www.pathagar.com

সিদ্দিকীর এ কথার সমর্থন মিলে আবদুর রাজ্জাকের কথায়, পশ্চিমে ময়মনসিংহ (টাঙ্গাইল, জামালপুর) দিয়েছে অসংখ্য রূপকথা আর উপকথা। আকাঙ্ক্ষিত নায়কের প্রতীক্ষায় উন্মুখ, সততা ও নিষ্ঠা দিয়ে লাঞ্চনাকে জয় করার সাধনায় নিবেদিত, সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি ছুঁয়ে প্রাণ সঞ্চারের আনন্দে বিহ্বল, স্বপ্নে অনুসরণ তার পরতে পরতে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঝুলি বোঝাই করেছে তারা। শুধু দেশে নয় আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে টাঙ্গাইলের লোককাহিনি প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে। Dr. Ashraf Siddique Tun Tuni and other tales- New York 1962, Bombol Dad- New York ১৯৫৭ এবং Tales from Asian country- Japan ১৯৫৮ এসব লোককাহিনির মধ্যে আন্তর্জাতিক মটিভ ও টাইপ পাওয়া গেছে।[২]

লোকসাহিত্যের উপর ভৌগোলিক প্রভাব অপরিসীম। পরিবেশগত কারণে মানুষের মন মেজাজ ও রুচি ভিন্ন হয়। ভিন্ন হয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। টাঙ্গাইল জেলার লোকসাহিত্যের উপাদান বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ। লৌকিক জীবন ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন এখানে একাকার হয়ে আছে। তাই এ জেলায় লৌকিক জীবনে চিত্তবিনোদনের খোরাক হলো এই লোকসাহিত্য।

ক. লোকগল্প/কাহিনি/ কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া মানুষ গল্প প্রিয়। তারা অবসর সময়ে নানা রকম গল্প করে আনন্দে সময় কাটায়। তাদের গল্পে রয়েছে বিভিন্ন রকমের রসবোধ। টাঙ্গাইল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত আবহমান বাংলার কয়েকটি লোকজ গল্প নিম্নে দেওয়া হলো।

১. রাজকন্যা ও ভিখারির ছেলে

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার ছিল একটি কন্যা। দেখতে দেখতে কন্যাটি বড়ো হয়ে গেল। এক দিন রানি রাজাকে বলল, মেয়ে তো এখন বড়ো হয়ে গেছে। তাকে বিয়ে দিতে হবে। এই কথা শুনে রাজমন্ত্রি, সেনাপতি, সৈন্য– সামন্ত সবাইকে রাজ দরবারে ডেকে আনল এবং বলল, রাজ্যময় ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে দাও আমার রাজ প্রাসাদের পাশে যে কচুরিপানা ভর্তি পুকুর আছে সেই পুকুরে সূর্য অস্ত থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত, পৌষ মাসের শীতের ভেতরে যে নেমে থাকতে পারবে তার সাথে আমার কন্যার বিয়ে দেব। এই কথা শুনে রাজ্যের সকল ছেলে এসে পুকুরে নামল। কিন্তু শীতের ঠাণ্ডা পানিতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় পানিতে কেউ অবস্থান করতে পারল না। পরিশেষে এক ভিখারির ছেলে এসে বলল, 'হুজুর আমাকে যদি অভয় দেন, তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।' একথা শুনে রাজা একটি ছড়া কাটল–

কত হাতি ঘোড়া গেল তল
চামচিকা বলে কত জল।

এই কথা শোনার পর সেই ভিখারির ছেলে গিয়ে পুকুরে নামল। সারারাত সে পুকুরের পানিতে অবস্থান করল। সূর্য উদয়ের পর সে পুকুরের পানি থেকে উঠে আসল। রাজা তো মনে করছিল সে কখনোই পানিতে থাকতে পারবে না। সকালে যখন উজির নাজির সকলে রাজাকে ডেকে বলল, হুজুর এই ভিখারির ছেলে তো সারারাত

www.pathagar.com

পানিতে ছিল। এই কথা শুনে রাজা হিংস্র বাঘের মতো রেগে উঠে বলল, কোথায় ভিখারীর ছেলে? তাকে ধরে নিয়ে আস। একে তো বেচারা পানি থেকে উঠে এসে শীতে কাঁপছিল। তারপর আবার হুকুম শুনে ভয়ে কেঁপে কেঁপে সামনে হাজির হয়ে বলল, 'আমি আমার কাজ করেছি, আপনি আপনার ওয়াদা রক্ষা করুন। তখন রাজা বলল, তুই কিভাবে ঐ পানিতে নেমেছিলি? তার বর্ণনা দে। তখন ছেলেটি বলল, আমি যখন পানিতে নেমে ছিলাম তখন মণ্ডলের বাড়িতে সভা হচ্ছিল। সভাতে হেজাক বাতি জ্বলছিল। আমি ঐ বাতির দিকে তাকিয়ে সারারাত কাটিয়েছি। ছেলেটি এ কথা বলতেই রাজা একটি ফন্দি পাকাল। তাহলে তো ঐ বাতির আলো তোর গায়ে এসে তাপ দিয়েছে। এই কথা বলে রাজা বলল, এই মুহূর্তে তুই আমার রাজ্য হতে দূর হয়ে যা। তা না গেলে কেটে টুকরো টুকরো করব। রাজার কথা শুনে ছেলেটি কেঁদে কেঁদে রাজবাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। যখন এসে বিলের ধারে পৌছলো তখন এক শিয়াল পণ্ডিত তাকে ডেকে বলল, এই কাঁদছিস কেন রে? ছেলেটি তার কথা শিয়ালকে খুলে বলল। শিয়াল পণ্ডিত সকল কথা শুনে ছেলেটিকে বলল, তুই রাজাকে গিয়ে বল 'হুজুর আপনার কথা আমি মেনে নিয়েছি, কিন্তু আমার একটি কথা আপনার শুনতে হবে।'

এই কথা শুনে রাজা বলল, বল কি কথা তোর, আমি সাত গ্রামের সালিশ ডাকব। সালিশে আমার যেটি রায় হয়, আমি সেটি মাথা পেতে মেনে নেব। আর এই সভা পরিচালনা করবেন এক শিয়াল পণ্ডিত। রাজা হেসে বলল, শিয়াল আবার কিসের সালিশ করবে রে? সে তো ভয়েই পালাবে। দেখেন হুজুর আমাকে একটু সময় দিয়েই দেখেন। তখন রাজা বলল, যা শিয়ালের কাছ থেকে সময় জেনে আয়। এ কথা শুনে ছেলেটি শিয়ালের কাছে চলে গেল। ছেলেটি বলল, পণ্ডিত মশাই, রাজা আপনার সালিশের সময় জানতে চেয়েছে? শিয়াল বলল, যা গিয়ে বল, আগামীকাল দশটার সময় তার রাজ বাড়িতে সালিশ হবে। এ কথা শুনে ছেলেটি রাজার কাছে গিয়ে সময়ের কথা বলল। রাজা ছেলেটির কথা শুনে রাজ্যের সকলকে ঢোল পিটিয়ে বলার জন্য বলল, আগামীকাল দশটার সময় আমার বাড়িতে এক সালিশের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভা পরিচালনা করবেন শিয়াল পণ্ডিত।

শিয়াল পণ্ডিতের কথা শুনে আগের দিন হতেই লোকজন এসে রাজার বাড়িতে ভিড় জমাতে লাগল। পরের দিন দশটার সময় ছেলেটি তার মাকে নিয়ে রাজার বাড়িতে উপস্থিত হলো। কিন্তু দশটা বেজে ১১টা বেজে যাওয়ার সময় হয়ে গেল কিন্তু শিয়াল পণ্ডিতের কোনো খোঁজ নেই। রাজা ছেলেটিকে বলল, এই ভিখারির ছেলে? কই তোর শিয়াল পণ্ডিত? এ কথা বলে রাজা উজিরকে হুকুম দিল, এই ছেলেটিকে টুকরো টুকরো করে ফেল। ইতিমধ্যে শিয়াল পণ্ডিত এসে বলল, হুজুর আমি হাজির। রাজা রেগে গিয়ে বলল, তোরই তো জবান ঠিক নেই। শিয়াল পণ্ডিত বলল, হুজুর শোনেন। রাজা বলল, বল কি বলতে চাস? শিয়াল বলল, হুজুর কি বলব? আমি তো ঠিক সময় মতোই আসতে চেয়েছিলাম। বাগেরবাড়ি কদরের বাপে বিলে মাছ ধরতে গিয়েছিল বুন্দা নিয়া। সেই বুন্দার আগুন পানিতে পড়ে বিলের পানি সব পুড়ে শেষ হয়ে মাছগুলো সব শুকনায় পড়েছিল। আমি খেতে খেতে সময় নষ্ট করে ফেলেছি। তখন রাজা বলল, এই বেকুব শিয়ালের বাচ্চা বুন্দার আগুনে আবার পানি পুড়ে? শিয়াল বলল, হুজুর তাই যদি

www.pathagar.com

না হয়। মণ্ডলের বাড়ি এখান হতে দুই মাইল দূরে। সেখান থেকে পানিতে হেজাকের তাপ লাগল কি করে? এই কথা শুনে সালিশের সকল লোক হেসে দিয়ে বলল, এটা তো ঠিক কথা। এতদূর থেকে তো তাপ ছেলেটির গায়ে লাগতে পারে না। রাজার কথা মতো অর্ধেক রাজ্যসহ রাজার মেয়েকে ছেলেটির হাতে তুলে দিতে হবে, এটি সকলের দাবি। রাজা বোকা হয়ে সকলের কথা মতো রাজ্য ও রাজকন্যাকে ঐ ছেলেটির হাতে তুলে দিল এবং ছেলেটি তার মাকে নিয়ে রাজ্য গ্রহণ করল ও শাসন কাজ চালাতে থাকল।[৩]

২. গৃহবধূ রাক্ষসী

এক দেশে ছিল এক চাষি। তার একটি মেয়ে ছিল। চাষি যে গ্রামে বাস করত, সেই গ্রামে বাস করত ভাসু নামে এক কামার। সে যা রোজগার করত, তা প্রয়োজন মতো খরচ করে বাকি টাকা তার কোমরে রেখে দিত। সে ছিল খুব কৃপণ। যাই হোক, একদিন চাষির মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল দুই তিন গ্রামের পরের গ্রামে এক চাষির ছেলের সাথে। একদিন চাষির মেয়ে গ্রামের গৃহবধূদের সাথে নদীতে গোসল করতে গেল। সবাই যখন গোসল করছে এমন সময় তারা দেখতে পেল যে, একটি মরা মানুষের লাশ পানিতে ভেসে যাচ্ছে। এই লাশটি দেখে মেয়েটি চিনতে পারল যে এই লাশটি ভাসু কামারের। সে আরও জানত যে, ভাসু কামার যা রোজগার করত, তা সে তার কোমরে বেধে রাখত। তাই সে আস্তে আস্তে ভেসে যাওয়া লাশটির কাছে গেল এবং তার কোমরের বেঁধে রাখা টাকা পয়সাগুলো খোলার চেষ্টা করল কিন্তু অনেক চেষ্টা করার পরও মেয়েটি এটি খুলতে পারল না। তাই মেয়েটি তাঁর দাত দিয়ে কোমরের বাধন খুলতে চেষ্টা করল। এই দেখে তার সাথে যারা গোসল করতে এসেছে তারা ভাবল যে, মেয়েটি একটি রাক্ষুসী, তাই সে মরা মানুষ খাচ্ছে।

তারা মেয়েটির স্বামী ও শ্বশুরকে সংবাদটি জানাল এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে এসে দেখল যে, মেয়েটি আসলেই মরা মানুষকে কামড় দিচ্ছে। এই দেখে তারা শ্বশুর তার স্বামীকে বলল যে, ওকে ওর বাপের বাড়ি রেখে আয়। যেই কথা সেই কাজ। তার স্বামী তাকে বাপের বাড়িতে রেখে আসার জন্য রওনা হলো। মেয়েটি বলল, আমার গায়ে ভেজা কাপড়। আমাকে দয়া করে একটি শুকনো কাপড় পড়তে দাও। কিন্তু তার স্বামী কথা শুনল না। তাই মেয়েটি স্বামীর সাথে চলতে লাগল। বনের মধ্য দিয়ে গিয়ে যখন খেতের পাশের পথ দিয়ে যাচ্ছে। তখন মেয়েটি বলল—

এক চদু ভাসু কামার
এক চদু তুই
আরেক চদু ক্ষেতআলা
পথ বানাইছে দুই।

তখন তার স্বামী মেয়েটিকে বলল এই কথার মানে কি? মেয়েটি বলল, কিছুই না। তার স্বামী বলল, এই কথার অবশ্যই কোনো মানে আছে? আগে বলবি যে ভাসু কামার কে, আমি কেন চদু, আর খেতআলাই কেনই বা চদু? তা না হলে আমি এক পাও নড়ব না। তখন মেয়েটি বলে, খেতআলাকে বলছি কারণ খেতআলা যদি এই আইল এ বেড়া না

দিত তাহলে খেতের মধ্যে দিয়ে আর একটি রাস্তা হতো না। তার স্বামী বলল ঠিক আছে, খেতআলার কথা বুঝলাম, কিন্তু আমার এবং ভাসু কামারের কথা বল। তখন মেয়েটি বলল যে, যে লোকটি মারা গেছে তার নাম ভাসু কামার। সে আমাদের গ্রামে বাস করত। সে ছিল খুব কৃপণ। সে যা কিছু উপার্জন করেছেন তা সব তার কোমরে বেঁধে রাখতেন, সেটি আমি জানতাম। তাই আমি তার টাকার আশায় তার কোমরের টাকার ব্যাগ মুখ দিয়ে খুলেছিলাম। আর তোমাকে চদু (বোদাই বা বোকা) বলেছি কারণ, তুমি আমার কোনো কথা না শুনে আমাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ। এই কথা শুনে তার স্বামী বলল, আমার ভুল হয়ে গেছে। চল আমরা অন্য রাজ্যে গিয়ে বসবাস করি। তখন তারা ভাসু কামারের টাকা পয়সা নিয়ে অন্য রাজার রাজ্যে গিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।[৪]

৩. সাত রানির নাক কাটাইলো টুনটুনি

এক রাজার বাড়ীতে ছিল একটি তেঁতুল গাছ। গাছে ছিল একটি টুনটুনির বাসা। রাজা যখন দুপুরের পারস (খেতে) করতে যান। তখন টুনটুনি মহারাজাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'রাজার নেই যে ধন, আমার আছে সেই ধন'। এইভাবে প্রতিদিন মহারাজা যখন দুপুরের পারস করতে বসে, সেই মুহূর্তে টুনটুনি একই কথা প্রতিদিনই বলতে থাকে। একদিন মহারাজ তার ঘোড়ার ঘাসিকে বলল– দেখতো ওই টুনটুনির বাসার মধ্যে কি? তখন ঘাসি গাছে উঠে দেখতে পেল বাসার ভিতরে একটি সুই। মহারাজ বাসায় একটি সুই। রাজা বললেন– সুইটি নিয়ে আস। তিনি সুইটি মহারাজার নিকট জমা দিলেন। পরদিন রাজা পারস করার সময় টুনটুনি বলতে লাগল– 'টুনির ধন নিয়ে রাজা চিত্তর' (মানে রাজা ধনী)। এই কথা শুনে রাজার খুব রাগ হলো। ঘাসিকে দিয়ে সুইটি আবার বাসায় রেখে দিল। পরদিন টুনটুনি রাজার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, 'মহারাজ সম্পদ গোপন করতে না পেরে ফিরত দ্যায়।' রাজার মনে খুবই ক্ষোভ, মাত্র একটি সুই আমি রাজা গোপন করতে পারব না বলেই সেই ছেলেটিকে টুনটুনিকে ধরে আনার জন্য বলল। বলার সাথে সাথে সেই ঘাসি গাছে উঠে বাসা থেকে টুনটুনিকে ধরে এনে রাজার হাতে দিল। রাজার সাত রানি। বড়ো রানিকে ডেকে পাখিটি হাতে দিয়ে বলল, দুপুরের পারসের সময় ওর মাংস দিয়ে পারস করব। এই কথা বলেই মহারাজ বিচারালয়ে চলে গেল। বড়ো রানি টুনটুনি পাখিটি হাতে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। আর টুনটুনি দেখার জন্য সাত রানি একত্র হয়ে বড়ো রানির হাত থেকে এক রানি, দ্বিতীয় রানির হাত থেকে তৃতীয় রানি, তৃতীয় রানির হাত থেকে চতুর্থ রানি এইভাবে দেখতে দেখতে হাতের ফাঁক পেয়ে ফুরৎ করে উড়ে গেল। টুনটুনি উড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সাত রানির মুখে আর পানি নেই। রানিগণ সব পরামর্শ করতে বসল। বড়ো রানি সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, খাওয়ার সময় হয়ে গেল মহারাজার। উপায় খুঁজে বের কর।

হঠাৎ ছোটো রানি বলিল, উপায় আমি পেয়েছি। সব ব্যবস্থা আমি করছি। বলেই ঘরের কোণা থেকে একটি কোণু ব্যাঙ ধরে জবাই করে, সুন্দর করে রান্না করে ঠিক করে রাখল। দুপুরে মহারাজ পারস করতে বসল। সব রানিগণ মহারাজার চারিপাশে বসল। রাজা বলল, প্রথমে টুনটুনির মাংস দাও। যেই বাটি থেকে টুনটুনির মাংস চামচ

www.pathagar.com

দিয়ে রাজার প্লেটে দিল। এই সময় গাছের উপর থেকে টুনটুনি বলিয়া উঠল 'মহারাজ টুনি ছেড়ে দিয়ে কোণু ব্যাং খায়।'

মহারাজ তখন তাকিয়ে দেখতে পেল; গাছের ডালে সেই টুনটুনি বসে রয়েছে; তখন রাজা রানিদের ডেকে বড়ো রানিকে বলল, রানি টুনটুনি গাছে বসে, আমাকে কিসের মাংস খেতে দিয়েছ। বল? বড় রানি বলল- হুজুর পাখি আমার হাতে দেওয়ার সাথে সাথে টুনটুনি দেখার জন্য এক রানির হাত বদল করতে করতে টুনটুনি এক ফাঁকে উড়ে যায়। সাত রানি একত্র হয়ে ছোটো রানি এর সমাধান দেয়। ঘরের কোণা থেকে একটি কোণু ব্যাঙ ধরে তার মাংস রান্না করে। তখন মহারাজ রাগে ক্ষেপে সাত রানির মাথার চুল, নাক কেটে বাড়ি থেকে বিদায় করে দিল। তখন টুনটুনি গাছের ডালে নাচতে লাগল, সাথে বলতে থাকল–

'এক টুনি টুনটুন গাইল
সাত রানির নাক চুল কাটল।'[৫]

৪. ষাইটা শেখের গল্প

এক নদীর পাশ দিয়ে একটি মহিলা যাচ্ছিল। সে নদী পার হয়ে নাইওর যাবে। নদী পারাপার করার জন্য একটি নৌকা ছিল। সে নৌকায় লোকদের নদী পার করার জন্য বলল। তারা বলল, 'আপনার কাছে টাকা আছে?' মহিলাটি বলল, 'আমার কাছে কোনো টাকা নেই?' তারা আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার স্বামীর নাম কি?' মহিলাটি বলল–

'তিন তের দিয়া বার
নয় দিয়া যোগ কর
আমার স্বামীর এই নাম
পার কইরা দাও নাইওর যাম।'

তখন তারা মহিলাটিকে পার করে দিল, কিন্তু ভাবতে লাগল এই কথার মানে কি? তার একটু পরে তারা দুইজনে এই কথা নিয়ে চিন্তায় চিন্তিত হয়ে পড়ল। তখন একজন লোক বলল–

'কি করো ভাই আনাগোনা
এখান দিয়ে গেছে কি
দুই পায়া তিনজনা।'

এই কথা শুনে তারা বলল, 'ভাই আপনি আবার কি বলছেন? এমনিতে আমরা একটি কথা নিয়ে চিন্তিত আছি। এক মহিলা আমাদের চিন্তিত করে গেছে। লোকটি বলল, কি বলেছে সে? তারা বলল, মহিলাটি বলেছে–

'তিন তের দিয়া বার
নয় দিয়া যোগ কর
আমার স্বামীর এই নাম
পার কইরা দাও নাইওর যাম।'

www.pathagar.com

এই কথাটি শুনে লোকটি বলল, 'আরে আমি অই মহিলার স্বামী। আমার নাম ষাইট শেখ। তারা বলল, 'কিভাবে আপনার নাম হলো?' লোকটি বলল, 'তিন তের ৩৯। ৩৯ কে বার দিয়ে যোগ করলে হয় ৫১। আবার ৯ যোগ করলে হয় ৬০। যেহেতু আমার নাম ষাইটা শেখ। সেহেতু তার কথা ঠিক।' তারা আবার বলল, তাহলে আপনি সেটি বললেন, সে বলল, দুই পায়া তিনজনা কারণ, সে একজন, তার কোলে একজন আর তার পেটে একজন। এই তিনজন। তারা বলল, এইবার বুঝলাম। তারা লোকটিকে পার করে দিয়ে আবার খেয়া পার করতে গেল।[৬]

৫. উজানির গল্প

এক দেশে ছিল এক চাষি। তার ছিল একটি বউ। চাষি বউকে যা করতে বলত, তার বউ তার বিপরীতে কাজ করত। একদিন চাষি খেতে বসেছে। তার খুব পানি পিপাসা লেগেছে। সে তার বউয়ের কাছে পানি চাইল। সে পানি না দিয়ে এক বাটি দুধ এনে দিল। চাষি রেগে মেগে বলল, 'তুই জীবন ভরা উজালী। মরলেও তুই উজান দিকে যাবি।' আসলেও চাষি বউ যে কোনো কাজ বা কথা নিয়ে সব সময় উজানি করত। একদিন চাষি বউ নদীতে নেমেছে। অনেক স্রোতের মধ্যে নেমে সে আর উঠতে পারেনি। তাই সে মারা যায়। চাষি তার বউকে নদীর উজানের দিকে খোঁজছে। কয়েকটি ছেলে চাষিকে জিজ্ঞেস করল, উজানে খোঁজছেন কেন? ভাটির দিকে গিয়ে খোঁজেন। চাষি বলল, 'আমি ভাটিতে খোঁজেছি। কোথাও নাই। চল একটু খোঁজে দেখি। তখন সবাই খোঁজতে লাগল। দেখে আসলেই চাষির বউ উজান দিকে যাচ্ছে। সে যে বোয়াল মাছকে আঘাত করেছিল। মাছের শরীরে লোহার শিক লেগে আছে। আর ঐ শিকের সাথে চাষির বউয়ের কাপড় আটকে গেছে। তাই বোয়াল মাছ যেদিকে যাচ্ছে, চাষির বউ সে দিকে যাচ্ছে। ছেলেরা চাষিকে জিজ্ঞেস করল। আপনি জানলেন কি করে যে আপনার বউ উজান দিকে যাবে? চাষি বলল, শালী সারা জীবন আমার সাথে উজানি করেছে, এজন্য আমি জানতাম সে উজান দিকে যাবে।[৭]

৬. কাক ও চড়ুই

এক বুড়ি একদিন ধান ও চিনা শুকাতে দিয়েছিল। একটি কাক ও একটি চড়ুই পাখি ধান ও চিনা খেতে উঠানে নামল। কাক ও চড়ুই ধান ও চিনা খেতে শুরু করল। তখন চড়ুই পাখি বলল– কাক ভাই, তুমি ধান খাও, আমি চিনা খাই। কাক পাখি বলল– যার আগে খাওয়া শেষ হবে। সে তার তা খেয়ে দিবে। চড়ুই বলল– ঠিক আছে। কাকের আগে খাওয়া শেষ হলো। কাক বলল– এখন আমি তোমার গোঁজ খাব। চড়ুই বলল– তুমি কত গু, মুদ খাও, পানি দিয়ে তোমার ঠোঁটটি ধুয়ে এসো।

কাক বলল– ঠিক আছে– অমনি উড়ে চলে যায় নদীর কাছে। গিয়ে নদীকে বলে–

নদী ভাই নদী ভাই
দিবা জল ধুব ঠোঁট
তারপর খাব চড়ুই এর গোঁজ।

নদী বলল– তুমি কত গু, মুত খাও। কুমার বাড়ি গিয়ে একটা খুঁটি নিয়ে এসো। কাক কুমার বাড়ি গিয়ে কুমারের কাছে বলল–

www.pathagar.com

কুমার ভাই কুমার ভাই
দিবা খুটি ভরব জল
ধুব ঠোঁট
তারপর খাব চড়ুই এর গোঁজ।

কাকের কথা শুনে কুমার বলল– আমার কাছে খুটি তৈয়ার করার মতো মাটি নাই। তুমি গিয়ে মাটি নিয়ে এসো। আমি খুটি তৈয়ার করে দেব।

কাক মাটির কাছে গিয়ে বলল–

মাটি ভাই মাটি ভাই
দিবা মাটি বানান খুটি
ভরব জল ধুব ঠোঁট
তারপর খাব চড়ুই এর গোঁজ।

কাকের কথা শুনে মাটি বলল– তুমি গু, মুত খাও। তাই ঠোঁট দিয়ে মাটি খুততে পারবা না, তুমি কামার বাড়ি গিয়ে একটা পাচুন নিয়ে আস। কাক উড়ো গেল কামার বাড়ি। তারপর কামারকে বলল–

কামার ভাই কামার ভাই
দিবা পাচুন খুতবো মাটি
বানাব খুঁটি ভরব জল
ধুব ঠোঁট
তারপর খাব চড়ুই এর গোঁজ।

কাকের কথা শুনে কামার বলল– কি দিয়ে বানাব পাচুন। আমার কাছে আগুন নাই। তুমি গিয়ে আগুন নিয়ে আস। কাক কামারের কথা শুনে আগুন আনতে গেল। আগুনের কাছে গিয়ে বলল–

আগুন ভাই আগুন ভাই
দিবা আগুন বানাব পাচুন
খুতবো মাটি বানাব খুটি
ভরব জল ধুব ঠোঁট
তারপর খাব চড়ুই এর গোঁজ।

কিন্তু কাক পাখির তো আগুন আনা সম্ভব নয়। তাই আগুন আনতে কাক পুড়ে মারা গেল এবং কাকের আর চড়ুই পাখির গোঁজ খাওয়া হলো না।[৮]

৭. আশেক নূরীর কিস্সা

সানপুর শহরে এক ফকির ছিলেন তাঁর নাম হলো সান ফকির। তাঁর কোনো বেটা-পুত্র নাই। বেটার শোকে সান ফকির আল্লাহর দরবারে জার জার হয়ে কাঁদিতে লাগিল,

একটি পুত্র দাও আল্লাহ দয়া কইরা আমারে গো,
কামাই খাবার আশা নাই মরিলে দিব মাটি গো,

www.pathagar.com

মরণ শেষে পূত্রধনে মোরে নিব কান্দে করে গো,
পূত্রধন থাকিব আল্লা আমার সিখানে প্রহরী গো।

পুত্রের শোকে মায়ে পাগল, বাপে হয় ফকির। ধনদৌলত ধুলা-মাটি, ছাই, ছেলে সন্তান না থাকিলে কিসের বাদশাই?

আঁচল পাতিয়া মায়ে কাঁদিতে লাগিল।
কি অপরাধ করেছি আল্লাহ তোমার দরবারে।
একটি পুত্র দাও আল্লাহ আমার ঘরে।
অঞ্চল পাতিয়া তুলিয়া নিব কোলে করে।

ফকিরের কাঁন্দনে গাছে কাঁদে টিয়া, ডালে কাঁদে পাখি, আমার মাথা আমি পাষাণে ভাঙ্গি। একটি মাছের পিছে লক্ষ লক্ষ পোনা, আমার ঘরে বেটা দিতে কে করিছে মানা। হালুয়ার পুত্র নাই হাল বাইয়া দিব, জালুয়ার পুত্র নাই জাল বাইয়া দিব। উক্তা কইরা লিখলা বিধি, বিধির ও বিধি কলমে নাই কালি। ফকিরের কাঁদার চোটে আল্লাহর আরশ মওলা ঢলিতে লাগিল। আল্লাহ বলছেন, ও জিবরাঈল দেখ না চাহিয়া, পুত্র শোকে কাঁদছে ফকির সেজদায় পড়ে। বেহেস্ত হতে আল্লাহর আশেক নবীর নূর এই নামে একটা দুলদুল ফুল পাঠাল। জিবরাঈল গিয়া ফকিরকে বলতে লাগল, এই দুলদুল খাওয়ালে তোমার স্ত্রী একটা কন্যা সন্তান দিবে। সে সন্তানরে আশেক নূরী নাম রাখবে।

ফকির স্ত্রীর যখন দশ মাস দশ দিন পুরা হলো। ফকির একটা দাই ডেকে আনল।

সান ফকিরের স্ত্রীর একটা কন্যা সন্তান জন্ম নিল। বাবা-মায়ে খুশি হয়ে কন্যা সন্তানের নাম আশেক নূরী রাখল। আশেক নূরীর জন্মের পর তার কপালে রাজটিকা ঝলমল করতে লাগল। আশেক নূরীর কপালের চোটে মানিক, মুক্তা, স্বর্ণ, রূপা, জহরত, হীরা, কাঞ্চন বাড়ি ভরে গেল। তা দেখে ফকিরের বউ খুশি হয়ে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বলিতে লাগল স্বামী গো আমার বাড়িতে এগুলো কি ওঠল।

স্বামী স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলল, আমার মেয়ের কপালের গুণে আমি এই সম্পদ হীরা, কাঞ্চন, মনি, মুক্তা পাইছি।

সান ফকির গরীব ছিল। ধন সম্পদের জোরে সান বাদশা হয়ে গেল। আশেক নূরীর বার যখন বছর বয়স হলো। আমিরপুর শহরে আমির বাদশা ছিল। বাদশা স্বপ্নে দেখল, আল্লাহ জিবরাঈলকে কি যেন বলে গেল। বাদশা তখন চেতন হয়ে লোক-লস্কর ও উজিরকে ডাকতে লাগল।

উজির এসে মাথা নত করে বলল, বাদশা নামদার হুকুম করুন।

আমির বাদশা বলল, আমার বিয়ে ঘটক নিয়ে সানপুর শহরে, সান বাদশার বাড়ি চলে যাও।

উজির তখন ঘটক সেজে সানপুর শহরে গেল। বাদশার কাছে গিয়া বলতে লগিল, বাদশা নামদার আপনার একটি মেয়ে আছে। আমি তার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

তখন বাদশা বলতে লাগল, কোথায় তার বাড়ি? ছেলের নাম কি?

ছেলের নাম আমির বাদশা।

সান বাদশা বলিল, মেয়ে বিয়া দেওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

তখন ঘটক বাধ্য হয়ে মন খারাপ করে বাড়ির পথে রওনা হলো। তখন সান বাদশার বেগম এগিয়ে এসে বলতে লাগল, ঘটক সাব ছেলে কি বিয়ে-সাদি করেছিল?

তখন ঘটক বলল, ছেলে তো না, ছেলের বাপে বিয়ে করেছে।

ও আচ্ছা।

শুন রানি আমার এমন ভাগ্যবান মেয়েকে আমির বাদশার কাছে বিয়ে দেওয়া চলবে না।

বাধ্য হয়ে ঘটক মন খারাপ করে চলে গেল। রাজ্যে ফিরে গিয়ে আমির বাদশাকে বলতে লাগল, সান বাদশার মেয়েকে আপনার কাছে বিয়ে দিবে না।

শুনে আমির বাদশা রাগান্বিত হয়ে বলল, যাও উজির দশ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে সান বাদশার মেয়েকে ধরে আন।

এই আগ্রহ করে আমির বাদশা সৈন্য-সামন্ত লোকজন ঘোড়া নিয়ে অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে তারা প্রস্তুত হলো।

গান

ও আমার পাগলা ঘোড়ারে
কই থেকে কই নিয়া যাস।
কত পাহাড় কত নদী পার হয়ে যায়।
চতুর দিকে চেয়ে দেখি হায় রে মেঘ কালা।
এই মেঘ পয়দা করেছে আবে খোদাতায়ালা।
বনে ডাকে বনের কোকিল ডালে ডাকে টিয়া,
শালিক পাখি দিল যে ফাঁকি গান গাহিয়া।

আমির বাদশা সৈন্য-সামন্ত ঘোড়া নিয়ে সানপুর শহরে পৌঁছল। আমির বাদশার খবর পেয়ে সান বাদশা বিবির সঙ্গে বলতে লাগল, বিবি আমার তো খুব সাহস। আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে মরা পাতায় বেজে আছার পড়ি। ওই যে ফেছা পাখি ফেছ ফেছাইতেছে। নিশ্চয় আমার অমঙ্গল হবে। আমি দৌড়ায়ে পালিয়ে যাই। তুমি বড় সাহসী লেংড়া দাও হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়াও। দেখি কে আমার মেয়েকে ধরে নেয়।

বাদশার মেয়ে বাবা-মায়ের কথা শুনে দৌড়ে এসে বলল, মা ঘোড়ার উপর রাজমুকুটপরা ওই লোকটি কে?

রানি বললেন, ওনি আমির বাদশা তোমাকে বিয়ে করেতে আসছে।

তখন রাজকন্যা বলল—

মা আমি আলতা লিপিস্টিক, কাজল, কালি, শাড়ি, গয়না নিয়া।

বাবা মুখে কালিমা তোমার মুখে ছাই, আমি রাজকুমারের পাছে পাছে যাই।

একথা শুনে বাবা-মায়ে অবাক হলো রাজকন্যা আমির বাদশার কাছে গেল। আমির বাদশা রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করল, রাজকন্যা তোমার নাম কি?

আমির বাদশার রূপে পাগল রাজকন্যা বলল—

আমার নাম আশেক নূরী। রাজকুমার আমি আপনার ঘোড়ার পিঠে চড়ি।

তাহলে উঠ রাজকন্যা, চল যাই বাড়ি।

www.pathagar.com

এই বলে আমির বাদশা রাজকন্যাকে নিয়ে রওনা হলো। খুব তাড়াতাড়ি আমিরপুর শহরে গিয়ে পৌঁছল। আমির বাদশা দাসি-বান্দিকে বলল, এই রাজকন্যা ধরে আনলাম, এখন বিয়ে পড়াতে হবে। আশেক নূরীকে সানেবান্দা ঘাটে নিয়ে গোসল করাও।

আগে দাসি-বান্দি মধ্যে রাজকন্যা চলল। কত দূরে যায় তারা শুধু এক মন, সানে বান্দা ঘাটে গিয়া দিল দরশন। কচা জলে নেমে কন্যা কচা মইল করে। গিরু জলে নেমে কন্যা গিরু মইল করে, কোমর জলে নেমে কন্যা কোমর মইল করে। বুক জলে নেমে কন্যা বুক মইল করে, গলা জলে নেমে গলা মইল করে, মাথা জলে নেমে কন্যা মাথা মইল করে। গোসল শেষে কন্যা বাড়ি চলে গেল। প্রথমে পিন্দিল শাড়ি নামে রিধর। সে শাড়ি বানাতে লাগে একটি বছর। সে শাড়ি পছন্দ হয় না দাসি-বান্দিকে পড়ায়। অনেক শাড়ির শেষে বউরানি শাড়ি পিন্দিয়া বেস ধরে চায়। শাড়ি পিন্দিয়া কন্যা মুখে দিল পান, ঘরে থেকে বাহির হল পূর্ণিমার চাঁন। সমস্ত গয়না পড়াল, তারপর রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। এই কথা রইল মধুর রসের বাণী, সানপুর শহরের ঘটনা কিছু শুনি।

সানপুরের সান বাদশা ছিল আবার সে অভাবী হলো। আশেক নূরীকে বিয়ে দিয়ে সে আবার ফকির হলো। তার বিবি স্বামীর কাছে বলতে লাগল, ঘরে খাবার কোনো খাবার চাল-ডাল নেই।

তখন সান ফকির বলল, মেয়ে বিয়ে দিব না। তা তুমি চক্রান্ত করে দিয়েছ, এখন তুমি ভিক্ষা করতে যাও। আমি ভিক্ষা করতে পারব না।

সান ফকিরের স্ত্রী বলল, মেয়েটা অনেকদিন হলো চলে গেছে। মেয়েটাকে দেখে আস আর কিছু খেয়ে আস।

একথা শুনে সান ফকির হাতে লাঠি কাঁধে ঝোলা, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া লুঙ্গি, ভাঙ্গা ছাতা নিয়া মেয়ের বাড়ি গেল। বিরাট বড় আমির বাদশার বাড়ি। গেটের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, এটা কার বাড়ি?

দারোয়ান বলল, এটা আমির বাদশার বাড়ি।

এই বাড়ি আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

দারোয়ান বলল, ঠাট্টা করার জায়গা পাও না। ফকির ভিক্ষা নিয়ে দূরে চলে যাও।

না আমি মিথ্যে বলিনি।

ফকির তুমি দাঁড়াও তোমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করে আসি।]

দারোয়ান এসে বলল, রানি মা আপনার বাবা এসেছে। কিছু খাবার আর এক নজর দেখে আসুন।

আশেক নূরীকে বার বার বিরক্ত করায় একটা বড় খাইট্টা দারোয়ারের হাতে দিয়ে বললেন, এই খাইট্টা দিয়া ফকির বেটার মাথায় বারি দাও গিয়ে।

তখন দারোয়ান এসে ফকিরকে প্রচণ্ড মারল। তখন সান ফকির আল্লাহর দরবারে হাত উঠায়ে বলল, হে আল্লাহ যে আমায় কলিজায় হানা দিল। আল্লাহ তুমি তার বিচার কর। আমিরপুর শহরে এসে মা তোরে করে গেলাম মানা। আল্লাহর দরবারে তা কবুল হয়ে গেল। রক্তে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল।

www.pathagar.com

রক্তমাখা জামা নিয়ে ফকিন্নির কাছে গেল। ফকিন্নির কাছে সমস্ত কিছু ভাইঙ্গা কইল। ফকিন্নি শুনিয়া জার জার হইয়া কাঁদতে লাগল। এই অভিশাপ ফিরিয়ে দাও গো আল্লাহ। দশ নয় পাঁচ নয় এক অঞ্চলে নূরী, তারে হারিয়ে যাব কার বাড়ি। কার ছেলে দেখে কোলে তুলে নেব। একটি মাত্র কন্যা ছিল ঘরে তাও হারায়ে গেল। এই দুনিয়ায় গর্ভধারিণী মেয়ে তার বাবার মাথায় দিল বারি। কি লিখন লেখেছে বিধি আমার কপালে। উক্তা কইরা লিখছে বিধি কলমে নাই কালি। সান ফকির অনেক কষ্টে মারা গেল। পাড়া-প্রতিবেশী এক জেঠা ছিলেন। উনি আশেক নূরীর কাছে গেলেন। সমস্ত কিছু ভাইঙ্গা বললেন, তোমার বাবা মারা গেছে।

আশেক নুরী তখন একটি রশি হাতে দিয়ে বলল, বাবার গলায় রশি লাগিয়ে নদীতে ফেলে দাও।

এই শুনিয়া উনি চলে গেল। ফকিরের লাশ দাফন করিল। তাই ফকিন্নি বাড়ি এ কথা শুনে জেঠা বাড়ি চলে গেল। মনের দুঃখে ফকিন্নি একটি গান গাইল,

মেয়ের মতো বান্ধব আর তো কেহ নাই। ফকিন্নির কাঁন্নায় পানির মাছ কাঁদে, বনের কাক কাঁদে, চালে কাঁদে টিয়া। গাছ বৃক্ষের পাতা ঝরে ফকিন্নির কাঁদনের লাগিয়া। উদরের মেয়ে হয়ে বাবার মাথায় দিল বারি। একমুঠ্ঠ খেতে দিল না, দয়াল নিষ্ঠুর হলে। আপন মেয়ে পর হয়ে গেল। এমন মেয়ে দেখি নাই জীবনে। ফকিন্নি অভিশাপ করল আল্লাহর দরবারে। আমার আশেক নূরী ছেলে সন্তানের মুখ দেখবে না জীবনে।

আশেক নূরী কিছুই বুঝতে পারল না। এই কথা রইল মধুর রসের বাণী, আমিরপুর শহরের ঘটনা কিছু কিছু টানি। আমির বাদশা বলল, স্ত্রী তোমাকে বার বছর হলো বিয়ে করেছি কোনো সন্তান হলো না। তাই তোমাকে বিদায় দিলাম।

বিদায় দিবেন না আমি পির ওলির দরবারে একটু আরজ করে দেখি ছেলে দেয় কি না।

তখন আশেক নূরী বাবুল পাহাড়ে গেলেন, এক আউলিয়ায় দেখে বললেন, তোমার কোনো ছেলে সন্তান হবে না। মেয়ে হয়ে বাপের মাথায় বারি মেরেছ, তোমার বাবা আল্লাহর দরবারে অভিশাপ করেছে। এখন বাড়িতে চলে যাও তোমার বাবার কবর পারে যাও।

আশেক নূরী বাবার কবরে গিয়ে মাথার খাপরি উঠায়ে, শরীরের রগ দিয়ে শলতা বানাল। তারপর এশকের আগুন জ্বালায়ে আশেক নুরী আল্লাহর দরবারে কাঁদতে লাগল। যে অপরাধ করেছি আল্লাাহ মাফ কর আমারে। বাবার মাথায় বারি দিয়েছি বাবা মাফ কর আমারে। না বুঝিয়া ভুল করেছি বাবা মাফ কর আমারে।

এভাবে আশেক নূরী বাবার কবরের পাশে বার বছর কাঁদতে লাগল। দুই দিন বাকি থাকতে আল্লাহর হুকুমে এশকের আগুন নিবে গেল। বাধ্য হয়ে আশেক নূরী বাড়ি গিয়ে বলল, আপনি মাফ করে দিন স্বামী। আমার কাজ হয়নি। তাহলে তুমি আমার বাড়ি হতে চলে যাও।

তখন আশেক নূরী বলল, আর একটু দেন আবার বাবুল পাহাড়ে যাব।

www.pathagar.com

পুনরায় পিরের দরবারে গিয়ে অনুরোধ করল। তখন পির বলল, তোমাকে তো একবার বলেছি তোমাকে সন্তান কিছুই দিব না। আরেক কাজ করতে হবে, অকুল দরিয়ায় জায়নামাজ বিছায়ে নামাজ পড়তে হবে।

আশেক নূরী তা শুনে বাড়ি চলে গেল। জায়নামাজ নিয়ে কহর দরিয়ায় হাজির হলো। পানির উপর জায়নামাজ বিছাইয়া নামাজ পড়তে লাগল। বিধি এই ছিল আমার কপালে, উক্তা করে কি লিখলে বিধি কলমে ছিল না কালি। একটা পুত্র দাও, আল্লাহ তুলে নিব কোলে। পুত্র শোকে হয় পাগল মায় পুত্র শোকে বাবা। দালান-কোঠা পাকা বাড়ি ধুলা মাটি ছাই, ছেলে সন্তান না থাকলে কিসের বাদশাই।

তাই বার বছর নামাজ পড়ল। দুই দিন বাকি থাকতে জায়নামাজ ডুবে গেল। আশেক নূরী কাঁদতে লাগল। ভাসতে ডুবতে একবার কিনার পেল। এরপর বাড়ি চলে গেল। গিয়ে আমির বাদশাকে বলল, আমার সাধনা সফল হয়নি। কয়দিনের মধ্যে তোমাকে তালাক দিয়ে দেব। এই শুনে আশেক নূরী কাঁদতে লাগল আর বলতে লাগল,

কালা তোর পিরিতে এত জ্বালা আগে তো জানি না।
আগে পিছে না জানিয়া যেজন পিরিত করে,
তার মতো দুঃখী কাঙ্গাল নাই এই সংসারে।
বাড়ির শোভা বাগান বাগিচা, ঘরে শোভা ডোয়া,
নারীর শোভা ঘরের স্বামী যেজন পাইছে কাছে।
আরে ও শ্যাম কালা তোর পিরিতে এত জ্বালা।
পিরিত রতন, পিরিত যতন, পিরিত কারে কয়।
পিরিত হয় যার যার নয়নের দেখা।
ওপার বসে বাজায় বাঁশি এপার বসে শুনি।
কেমন করে ধরব সাঁতার সাঁতার নাহি জানি।
আগে যদি জানতাম বন্ধু যাইবা রে ছাড়িয়া,
দুই চরণ বান্দিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়া।
কালা কালা সবাই বলে কালাই গলার মালা।
কালার নিগে ভাবতে ভাবতে দেহ করলাম কালা।
তুমি আমার প্রাণনাথ গো, আমি তোমার দাসী,
মাফ করে দাও গো স্বামী তোমায় ভালোবাসি।

আশেক নূরী পিরের দরবারে গিয়ে সালাম করল। তখন পির বলল, তোমার ছেলে সন্তান হতে পারে। আরেকটি কাজ করতে হবে।

পির বাবা কি কাজ?

মক্কাশরিফ যেতে হবে। যত হাজিগণ আছে তাদের ওযুর পানি দিতে হবে। হাজিরা হাত তুলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে। এই দোয়ায় তোমার ছেলে সন্তান হতে পারে।

তখন আশেক নূরী স্বামীর কাছে চলে গেল,
দয়া কর ওহে আল্লাহ দয়া কর মোরে,
তুমি বিনে কে দয়া করতে পারে।

www.pathagar.com

আশেক নূরীর কাঁন্নায় বৃক্ষের পাতা ঝরে। বনের পাখিরাও কাঁদতে লাগল, স্বামীরও দয়া হলো। তখন আমির বাদশা বলল, যাও তুমি মক্কায় চলে যাও। যদি তোমারে একটা সন্তান দেয়। তা শুনে স্বামীর পায়ে সালাম করে বাড়ির পথে রওনা হলো।

কত পাহাড় কত নদী পার হয়ে গেল। চট্টগ্রামে হাজিগণের অফিসে পৌঁছল। আশেক নূরী বিনয়া শুবার কাছে বয়াত পড়ল। বিননা শুবাই আশেক নূরীর পির হলো। চার কালেমা পড়ে তরিকাভক্ত হলো। হাজিগণের সঙ্গে আশেক নূরী জাহাজে চড়ল। জলের মধ্যে বৈঠা ফেলে টানে। এভাবে নদী পার হতে লাগল। হঠাৎ জাহাজের তলা ফেটে পানি উঠতে লাগল। সবাই আল্লাহর নাম নিয়ে কাঁদতে লাগল। আর এক হাজী বলতে লাগল, যার যার পিরের নাম লও। বিননা শুবাই কি কাজ করল, তাড়াতাড়ি গিয়ে জাহাজের তলায় ঢুকল, তখন জাহাজের পানি উঠা বন্ধ হলো। সব হাজিগণ বিপদ থেকে উদ্ধার পেল। নদীর কিনারে গিয়ে জাহাজ ভিড়ল। আশেক নূরী পিরের জাহাজে গেল। আল্লাহর কাছে শুকুর জানাল। এই আশেক নূরীর উছিলায় আমরা সবাই বেঁচে গেলাম।

বিশ্বাস করে বিননা শুবার সঙ্গে আশেক নূরী মক্কাশরিফ গেল। হাজি গো ওযুর পানি দিল। বার বছরের দুই দিন বাকি থাকতে পানি বন্ধ হয়ে গেল। আশেক নূরী মক্কা শহরে পানি পেল না। হাজগণের কাছে বলল। হাজিগণ আল্লাহর দরবারে দোয়া প্রার্থনা করল। হাজীদের দোয়ায় আবে জম জম কুপের পানি এসে গেল। তখন আশেক নূরী হাজীদের ওযুর পানি এনে দিল। তোমার সাধনা সিদ্দি হয়েছে। যাও একটা মোহনী মন্ত্র দিলাম। এই মুহূর্তে চলে যাও তোমার আপন ঘরে। গিয়ে স্বামীরে বল, আপনাকে একদিন সাত গ্রামে ভিক্ষা করতে হবে, তাহলে একটা সন্তান দিব ঘরে।

আশেক নূরীর কথা শুনে বাদশা ধমক দিয়ে বলল, আমি ভিক্ষা করতে পারব না।

তখন আশেক নূরী মোহনী মন্ত্র ঘোরান দিলে বাদশা রাজি হয়ে গেল। লাঠি ঝোলা হাতে নিয়ে সবাই পথে রওনা দিল। যত দেশ ঘুরল ততবারই নিজের বাড়ির কাছে রইল। এটা বিধি ছলনা করেছিল। ভিক্ষা করতে করতে স্বামী-স্ত্রী একত্র হলো। আশেক নূরী মোহনী মন্ত্র ঘুরাল। তখন রাজা বিবিকে চিনতে পেরে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এত ছলনা করছ। এখন দশ মাস পুরা হলো।

তারপর আশেক নূরীর গর্ভে সন্তান এল। তখন রাজা দাইয়ের ব্যবস্থা করল। একটি সন্তান হলো তাহার নাম সোনার একদিল রাখল। বেহেস্তে ছিলেন তিনি আল্লাহর হুকুমে মায়ের গর্ভে আসল। আশেক নূরীর যত ভুল ক্ষমা হয়ে গেল। আশেক নূরীর গর্ভে একদিলের জন্ম হলো। কিন্তু একদিল মায়ের স্তনের দুধ পান করল না। মায় শিশু বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করল, দুধ না খাইলে কি দাবি করতে পারব।

তখন শিশু বাচ্চা বলল, হাশরের দিন পাবা মোরে, একদিল নাম ধরে ডাক দিলে। তোমার ছেলে তুমি পাবা। দুধ খেইলাম না তোমার উদ্দরে।

হাসি মুখে আম্মা বিদায় দাও মোরে। এই বলে মায়ের কোল হতে শিশু বাচ্চা গায়েব হয়ে গেল। আশ্চার্য কথা বাবা মা চেয়ে দেখল তার ছেলে গায়েব হয়ে গেল। এই পর্যন্ত আশেক নূরীর পালা শেষ হলো।[৯]

www.pathagar.com

খ. কিংবদন্তি

সাগরদিঘি

ঘাটাইল উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের সাগরদিঘি বাজারের পূর্ব পাশে অবস্থিত বিশাল দিঘিটির নাম হচ্ছে 'সাগরদিঘি'। এ দিঘির নামেই সাগরদিঘি বাজারের নামকরণ করা হয়েছে। দিঘিটি অনেক পুরোনো। উত্তর দক্ষিণে লম্বা। জনশ্রুতি রয়েছে সাগর রাজা নামে কোনো এক জমিদার এ দিঘি খনন করে। এ দিঘিকে ঘিরে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে নানা কিংবদন্তি। রাজা দিঘি খনন করার পর স্বপ্নে দেখল যে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে দিঘিতে বিসর্জন না দিলে দিঘিতে পানি উঠবে না। স্বপ্নের নির্দেশ মতো রাজা তার স্ত্রীকে নিয়ে দিঘিতে অবতরণ করে। কি একটা কাজের কথা বলে রাজা দিঘি থেকে উপরে উঠে আসে আর তখনি দিঘি জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। রাজার স্ত্রী জলের নিচে তলিয়ে যায়। প্রচলিত আছে ঐ দিঘিতে নাকি গভীর রাতে সোনার নৌকা ভেসে উঠত এবং তাতে বসে থাকত রাজার বউ। এলাকায় কোনো ব্যাপারের আয়োজন করলে এ দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে বাসন কোসন চাইলে নাকি বাসন দিঘির পাড়ে উঠে আসত। প্রাপ্ত বাসন ঠিক মতো ফেরত না দিলে সে ব্যক্তি মারা যেত। এ দিঘির জলে কেউ ভয়ে নামত না। বিশেষ করে দক্ষিণ পাশে নামলে নাকি সে আর তীরে উঠে আসতে পারত না। কোনো এক ব্যক্তি গোয়ার্তুমি করে দক্ষিণ পাশে নেমে বহাল তবিয়তে পাড়ে উঠে এসে বাহদুরি করতে থাকে। কিন্তু তার পায়ের আঙুলের সাথে যে একটি সুতার মতো শিকল বাঁধা আছে তা সে দেখতে পায়নি। শিকল দেখার পর সে শিকল কাটার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। লোকটি সারাদিন শিকল টানে আর শিকল উঠতেই থাকে তবু শেষ হয় না। সন্ধ্যা লাগার সাথে সাথে শিকলসহ লোকটি দিঘির জলে পড়ে যায়। তার লাশও কেউ কোনোদিন খুঁজে পায়নি। এ দিঘির পূর্ব পাশে রাজা আরও একটি দিঘি খনন করেছিল। দিঘি দুটি আজও বর্তমান রয়েছে।

নাওডোবা টিলা

মধুপুরের আধা কিলোমিটার দক্ষিণে রানিয়াদ গ্রামের কোল ঘেঁষে 'শাইলবাইদ' নামক একটি নিচু ভূ-ভাগ রয়েছে। বাইদটিকে দেখলে মনে হবে প্রাচীনকালে হয়ত এটি কোনো নদীর গতিপথ ছিল। এ এলাকার লোকদের ধারণাও সে রকমই। তারা মনে করে এ নদীর নাম ছিল 'শাইলনদ' এবং এটি ছিল যমুনার একটি শাখা নদী। যমুনার গতিপথ বদলে যাওয়ার কারণে নদীটি মরে গিয়ে বাইদে পরিণত হয়েছে। এখানে যখন নদী ছিল তখন এ নদী দিয়ে অনেক বাণিজ্য তরী চলাচল করত। একদিন এক বণিক নৌকা বোঝাই সোনা নিয়ে কোথাও বাণিজ্য করতে যাচ্ছিল। বর্তমান শাইলবাইদ নামক স্থানে পৌছলে নৌকাটি হঠাৎ ডুবে যায়। যে স্থানটিতে নৌকা ডুবে যায় তার নাম 'নাওডোবা টিলা'বলে খ্যাত হয়। কালক্রমে সেই স্থানে একটি ঢিবি বা টিলা জেগে ওঠে। এই টিলা গাছ-গাছড়া ও ঝোঁপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সবার ধারণা এখানে নৌকা ডুবেছিল এবং এ স্থান দেওদানবের আবাসস্থল। এ টিলায় কেউ সাহস করে কোদাল দিয়ে কোপ দিতে যায় না। এমনকি কেউ এর ধারে কাছেও যায় না। কিংবদন্তি আছে এখানে কে বা কারা একবার কোদাল দিয়ে কোপ দিয়েছিল এবং বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর নাক মুখ দিয়ে রক্ত উঠে তার মৃত্যু ঘটেছে। চারদিকের সমতল ভূমির

www.pathagar.com

মাঝখানে টিলাটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। এখনো জনসাধারণের মাঝে টিলাটি সম্পর্কে পূর্বোক্ত ধারণা কার্যকর রয়েছে।

কাহিনি ১

করটিয়া থেকে প্রায় পাঁচ কি. মি. দূরে এক গ্রাম আছে যার নাম বীর নাহালি। এই বীর নাহালি গ্রামসহ আশেপাশের মোট সাতটা গ্রামে এক রাত্রের মধ্যে সাতটা পুকুর হইছিল। যখন বিয়ে হয় বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান হয় তার আগে পান সুপারি দিয়ে পূজা দিলে সেই অনুষ্ঠানে যা যা লাগত তা ঐ পুকুর দিয়ে দিত। এই সাত পুকুরের একটা পুকুরকে সাতটা মেশিন দিয়ে পানি সেচ দেওয়া হয়েছিল। এখান থেকে পানি তুলে অন্য পুকুরে দেওয়া হলেও পানি কমেনি, নিচ থেকে বেড়ে যায়। এরপর হঠাৎ করেই জিনিষ পাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ জানা যায়নি। জেলেরা এই পুকুরগুলোতে রাত্রে মাছ ধরতে যেত। একবার এক জেলেকে সাত দিন আটকে রেখেছিল। পরে জীবিত অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেয়। প্রতি বছর জেলো পাঠা বলি দিয়ে মাছ ধরতে নামে। সেই পুকুরগুলো এখনো আছে কিন্তু আগের মতো নেই।

কাহিনী ২

রতনগঞ্জ বাজার থেকে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত ধলাপাড়া। সেখানে একটি বিল (বা হাওরের মতো) আছে। সেই বিলের নাম চারান বিল। সেখানে কোনো গাছ ছিল না। তারপরে এক রাত্রের মধ্যে বিলের উত্তর পশ্চিম কোণে ৭টি হিজল গাছ হয়। কোনো জাদুকর এই গাছ চালান করেছিল বলে অনেকে মনে করে কিন্তু সঠিক কি কেউ বলতে পারে না। ওই গাছে যদি কেউ কোপ দিত তাহলে রক্ত বের হত। এখন আর বের হয় না। এখন ওই গাছের কয়েকটা (৩/৪) আছে। আগে মাঝিরা এই বিল পার হবার সময় সঙ্গে লবণ, চিনি নিত যাতে অপদেবতা ক্ষতি করতে না পারে।

কাহিনি ৩

ঘাটাইল থানায় যে সাগর দিঘি রয়েছে তার পাশেই রয়েছে গুপ্ত বৃন্দাবন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা গোপনে লীলা করতে এখানে এক গাছ সইরে আছিল। পঞ্চাশ বছর ধরে সইরে আছে। ঘড়ি-টড়ি ভাইজো নিত। পরে যখন কাই ফেলবো তখন আবার ভাবছে না কৃষ্ণ লীলা যেন করছে এই গাছটার মধ্যে এইটা হইল তামাল [তমাল] গাছ। পরে গাছটা আবার তাজা হয়ে গেছে। এখনও গাছটা আছে এবং তাজা। (বনোদিঘি থেকে এর অবস্থান ৩ মাইল দূরে।) এই গাছে কৃষ্ণের পায়ের ছাপ আছে।

কাহিনি ৪

ঘাটাইল থানার যেখানে সাগরদিঘি অবস্থিত তার আশেপাশে পানি ছিল না। তখন প্রজারা রাজাকে বলে একটা দিঘি কাইটে দেন। আমরা সবাই পানির জ্বালা মরতাছি। সেই রাজার নাম ছিল সাগর রাজা। রাজা দিঘি কাটে। পানি উঠে না তহন রাজা ভগবানের কাছে প্রার্থণা করে। তহন রাজা স্বপ্নে দেখে যে তোমার বউ যদি ওই দিঘির মধ্যে তলিয়ে যায় তাহলে পানি দিমু। তখন রাজা রানিকে বলে যে এই ঘরে প্রজারা তোপানির জ্বালায় মরতাছে। তখন তুমি দিঘির মাঝখানে বইয়া থাক তাহলে পানি

www.pathagar.com

উঠব। রানি নাম ছিল দুবলা সুন্দরী। রাজা রানিকে একরম জোর করে দিঘির মাঝখানে সবাইলো। তোরাণী বলল তুমি আমাকে এইখানে বসাচ্ছ আমি কিন্তু আর আসব না। কিন্তু রানির আবর ছিল দুধের বাচ্চা। তখন রাজায় বলে তাহলে এই দুধের বাচ্চার কি অবস্থা হবে। তখন রানি বলে বাচ্চায় যদি কান্দে তাহলে বাচ্চারে নিয়া দিঘির ঘাটে নিয়া আসবা কিন্তু আমারে ধরার চেষ্টা কইরো না। আমারে যদি কুনোদিন ধরো তবে আমি আর আসমু না। তো রানি যখন দিঘির মাঝখানে নামছে তখন আস্তে আস্তে পানি উঠতাছে। পানি যখন মাঝামাঝি হইছে তখন রানি বলছে আমারে নাও। আবর পানি যখন মাথা ছুইছে তখনও কইছে কিন্তু রাজায় নেয়নি। পরে বাচ্চায় কাঁদলে রানি আসত।

এভাবে অনেকদিন পর রাজা আর থাকতে পারেনি। একদিন রানি ধইরে বলছে তুমারে আর আমি যাইতে দিবো না। কিন্তু রানি আর রাজার কথা শুনেনি চইলে গেছে আর ফিরেও আসেনি। ওই দিঘির পানি কখনো শুকায় না। আগে ওই দিঘির একপাশের পানি পরিষ্কার অন্য পাশের পানি ঘোলা থাকত। এখন মাছ চাষ করে পানির গুণ নষ্ট করে ফেলেছে। রাজ স্মৃতিচিহ্ন এখনো আছে।

কাহিনি ৬

বনো রাজা হলো সাগর রাজার পুত্র। বনো রাজার দিঘি সাগর দিঘির কিছুটা পাশেই অবস্থিত। বনো রাজা সাগর দিঘিতে গোসল করত। তো একদিন সাগর রাজায় বলছে তোর মা এই দিঘিতে মরছে তুই এইখানে গোসল করিস ক্যান। তো এতে বনো রাজা বাগ করে ঘোড়ায় উঠে ঘোড়াকে ছুট দিছে। ঘোড়া এক ছুটে সেখান থেকে যতদূরে গেছে ঠিক সেই খানেই বনো রাজা তার দিঘি খনন করে। [দিঘি থেকে প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে বলে কথিত] এই দিঘির নাম সেজন্য বনো দিঘি। এই দিঘি সাগর দিঘির চেয়েও বড় কিন্তু তাতে বেশি পানি থাকে না।

কাহিনি ৭

বনো দিঘির খানিকটা পাশেই একটা বিরাট পুকুর আছে। বনো দিঘি খোড়ার জন্য যেসব কামলা নিযুক্ত করা হয়েছিল। তরাই এই পুকুরের সৃষ্টা। বনো দিঘি খননের পূর্বে সেটি একটা ছোট ডোবা ছিল। তো প্রতিদিন কাজ শেষে কামলারা সেখানে কোদাল ধোয়ার জন্য যেত। গিয়ে প্রতিদিন তারা প্রতেক্যে সখ করে একটু একটু করে/এক, দুই কোদাল মাটি উঠাইতো এইভাবে কাটতে কাটতেই সেই ডোবা বিরাট পুকুরে পরিণত হল। তাই সেই পুকুরের নাম কোদাল ধোয়া পুকুর।

কাহিনি ৮

পূর্বে রতনগঞ্জে ধনী লোকের বসবাস ছিল। নারায়নগঞ্জের ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ব্যবসা করত। পাট-সরিষা প্রভৃতির ব্যবসা। এখানে এসে তাদের ভাল আয় হতো। রতন (অর্থাৎ রত্ন) পাবার মধ্যে [রতন পেলে মানুষ যত টাকার মালিক হয় সেরূপ] টাকা আয় করত বলে তারা নাম রেখেছিল রতনগঞ্জ। এই ঘটনা ২-৫ শত বছর পূর্বের। রতনগঞ্জের উপর দিয়ে বসে চলেছে বংশাই নদী। আগের আমলে ১২-১৫ জাহাজ এই বংশই নদীতে একেক সময় আসত। বিরাট পাটের অফিস ও পাটকল ছিল এখানে বর্তমানে এর কিছুই নেই।

www.pathagar.com

কাহিনি ৯

ঘাটাইল থানার নন্দনগাতি গ্রামে হেমরার বাড়িতে এক মন্দির ছিল। নাম গোষ্ঠ খোলা মন্দির। মেলা হতো এখানে। মেলার নাম ছিল নন্দনগাতি গোষ্ঠ খোলা মেলা। এই মেলা চৈত্র মাসে এক মাসব্যাপী হতো। মন্দিরটা এখনো আছে, কিন্তু ছাদ নেই। ছাদ ভাঙ্গতে গিয়ে পাঁচ-ছয় জন মরছে। ইট খুলতে গেলে রক্ত বের হয়, এখনো বের হয়। মন্দিরে এখন পূজা হয় না। কেউও যায়ও না। এই মন্দিরের পাশে এক পুকুর আছে (এখনো আছে)। পূজার যে বাসনপত্র লাগত সেটা এই পুকুর থেকে পাওয়া যেত। ঠাকুর গলায় গামছা দিয়ে বলে আসত আমার এই সব বাসন দরকার, সেগুলো টানে (পাড়ে) উঠে আসত। সেগুলো আবার পরে ফেরত দিয়ে আসতে হতো। সেই পুকুরের খানিকটা বর্তমানে ভরাট হয়ে গেছে। এই পুকুরের নাম গোষ্ঠ খোলার পুকুর। নিয়ম ছিল যেগুলো পুকুর থেকে পাওয়া যাবে সেগুলোর সবই ফেরত দিতে হবে। কিন্তু এক মালীর একটা জিনিস খুবই পছন্দ হয়েছিল সেটি সে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সেই মালী সেই রাতে মারা গেছে এবং তারপর থেকে আর জিনিসও উঠে না। গ্রামের অনেকেই এই পুকুরে বিশাল বড় বড় মাছ দেখেছে কিন্তু কেউই মাছ ধরতে পারেনি। স্থানীয় অধিবাসী আব্দুল রাজ্জাক বলেন তিনি স্বচক্ষে পুকুরে বড় পিড়ি ভেসে উঠতে দেখেছেন। তিনি খানিকটা পানিতে নেমে গিয়ে ছিলেন। তখন পিড়ি চলে গিয়েছিল। (গোষ্ঠখোলা মন্দিরের কাহিনি)

কাহিনি ১০

আতিয়া মাসজিদ সংলগ্ন যে সুড়ঙ্গ রয়েছে সে সম্বন্ধে কাহিনি প্রচলিত রয়েছে যে মোগল আমলে বিচার কার্য সম্পন্ন করার জন্য কোনো ব্যক্তি যদি মিথ্যা বলতো তাকে ঐ সুরঙ্গ এর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হতো যদি সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যা বলত তখন তার মৃত্যু হতো সুরঙ্গ এর মধ্যে এবং তার মাথা ভেসে উঠত পুকুরে কিন্তু, তার শরীরের কোনো অংশ পাওয়া যেতো না। আর যদি সেই ব্যক্তি সত্যি বলত তবে তার কোনো কিছু হতো না এবং সে সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে আসত। আতিয়া মসজিদে মোগল আমলে যে সকল পির আউলিয়া থাকত তখন মসজিদে যদি কোনো উৎসব হতো তখন উৎসবের যাবতীয় হাড়ি পাতিল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পুকুরে ভেসে ওঠত, এবং অনুষ্ঠান শেষে ফেরত দিয়ে দিতে হতো। তবে, জনশ্রুতি আছে যে, কোনো ১ বার উৎসব শেষে কোনো একজন ব্যক্তি ১টি চামচ ভুল করে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রেখে দিয়েছিল নিজের কাছে ফেরত দেয়নি পুকুরে, তারপর থেকে ঐ পুকুরের অলৌকিক এই ঘটনাটি বন্ধ হয়ে যায়। আতিয়া মসজিদের উত্তর পাশে বাঁশের ভাড়ে একটি কাঠামো গড়ে ওঠে মসজিদের আকারে, তবে যেদিন গড়ে উঠছিল সেদিন এক ব্যক্তি দেখে ফেলেছিল, পরে তাকে স্বপ্নে দেখানো হয় এবং বলা হয় সে যেন কাউকে একথা না বলে, কিন্তু সেই ব্যক্তি সকলকে বলে দেয়, ফলে তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় এবং সে মারা যায়। ফলে, মসজিদ আর গড়ে ওঠেনি। যতটুকু গড়ে ওঠেছিল, সেই অবস্থাতেই রয়েছে। আতিয়া জামে মসজিদের পাশে একটি বট গাছ আছে। সে বটগাছের কেউ পাতা ছিড়লে বা গাছ কাটার চেষ্টা করলে তার ক্ষতি হতো। আজও এটি বিশ্বাস করা হয়।

www.pathagar.com

গ. লোকছড়া

সাহিত্যের প্রাচীন মাধ্যম ছড়া। আবার কেউ কেউ ছড়াকে বাংলা সাহিত্যের আদি মাধ্যমও বলেছেন। আহমদ সাকীর ভাষায় 'ছড়া বাংলা সাহিত্যের আদি মাধ্যম একথা অনস্বীকার্য।' ড. আশরাফ সিদ্দিকীর *লোকসাহিত্য* ও ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *লোকসাহিত্য* বিষয়ক গ্রন্থে প্রচলিত প্রাচীন ছড়া নিয়ে যথেষ্ট পর্যালোচনা করেছেন। ড. নীলিমা ইব্রাহীম তাঁর 'মেয়েলী ছড়া' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন– 'ছড়া লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দশন।

ছড়া শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'ছট' বা 'ছটা' শব্দ থেকে এর অর্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। ছড়ার সঠিক সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। কারো মতে 'মৌখিক আবৃত্তির জন্য মুখে মুখেই যাহা রচিত হয়, তাহাই ছড়া।' আবার অন্যভবে বলা যায়, 'ছড়িয়ে আছে বলেই ছড়া।'

লোকজ ছড়ার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। নিম্নে ছড়ার শ্রেণি বা বিভাগ অনুসারে ছড়ার উদাহরণ দেয়া হলো।

১.

(খেলার ছড়া)

(বাংলাদেশ খেলা)

হাত মেলো
ছিল ছিল
কি ছিল
লেবু ছিল
কি লেবু
বাতাবি লেবু।
হাত মেলো
ছিল ছিল
কি ছিল
বাতি ছিল
কি বাতি
মোম বাতি
কি মোম
সাদা মোম
কি সাদা
দুধ সাদা
কি দুধ
ফেনা দুধ
সাবান ফেনা
কি সাবান

www.pathagar.com

বল সাবান
কি বল
ফুটবল
কি ফুট
সেন্টার ফুট
কি সেন্টার
বাঁর সেন্টার
কি বাঁর
মরিচ বাঁর
কি মরিচ
লাল মরিচ
কি লাল
রক্তলাল
কি রক্ত
মানুষের রক্ত
কি মানুষ
স্বাধীন মানুষ
কি স্বাধীন
দেশ স্বাধীন
কোন দেশ
বাংলাদেশ।

২.
আড়া[১] মুদে[২] ক্যাড়া[৩] রে!
সখিনা
কী মাছ মারো গো
দারকিনা[৪]।
কচু পাতার শাড়ি
আমি পিন্দিনা[৫]
রেলগাড়ি ছাড়া
আমি চড়ি না।[১০]

৩.
তাই তাই তাই
মামার বাড়ি যাই।
মামা দিল দুধ ভাত
পেট ভইরা খাই।
মামী আইল[৬] লাঠি নইয়া[৭]
পলাই পলাই[৮]।[১১]

www.pathagar.com

৪.

চিকা আইল চিক চিকাইয়া
এন্দুর[৯] আইল ধাইয়া।
আয় রে চিকা বাইত[১০] যাই
নেনজুর[১১] ঘুমাইয়া[১২]।[১২]

৫.

কানা বাজায় বানা
মুতুলা বাজায় ঢোল
কানার বউয়ে রাইন্দা[১৩] থুইছে
সাড়ে চাইরডা[১৪] ওল[১৫]।
না খাও না খাও
বাঐ[১৬] আকপার[১৭] যাও।
বাঐ দিছে ঠোক্কর
কানার চোখের পানি
পড়ে টব্বর টব্বর।[১৩]

৬.

ইছন বিছন দাইরকা নাচন
উইড়া আইলো বাওর তুফান।
আম কুড়াইনা মাঐ কই গো
আমার ছাতি ধরো গো।
ছাতির উপর ঘুঘুরা
নাইচ্যা উঠে শুক্কুইরা॥[১৪]

৭.

তালগাছ কাটি তালগাছ কাটি
তালের ডাইগ্যা[১৮] দিয়া
আত্তি[১৯] আইলো ঘোড়া আইলো
পান সুপারি নিয়া॥[১৫]

৮.

হাসের বাচ্চা চৈ চৈ
এই ছেরা তোর বাড়ি কই।
আমার বাড়ি রামপুর
আমি বেচি চানাচুর।
চানাচুরের দাম কত
মণ করা একশত।
ও বাড়িতে যামু না
ইলিশ মাছ খামু না।

www.pathagar.com

ইলিশ মাছ গন্দ
হাই ইস্কুল বন্দ।
হাই ইস্কুলে যামু না
বেতের বারি খামু না।
বেত গেল ভাইঙ্গা
আফা দিলো কাইন্দা॥[১৬]

৯.

মিষ্টিরে মিষ্টি
তোর বলে বিয়ে
কে কয় কাকে
ঐ বাড়িগর টিয়ে।
মরার টিয়ে মরল না
হলুদ বাঁটা হলো না।
হলুদ ঘর বাসী
আসি ট্যাকার খাসি।
নব্বই ট্যাকার মইচ[২০]
তোর নানীর নানা আইলে[২১]
আমার কাছে কইস॥[১৭]

১০.

মিতা রে মিতা
চুলে পরে ফিতা।
কানে পরে দুল
ভালবাসার ফুল।
বাসর ঘরে শিরিনা
তার সাথে খেলি না।
তার সাথে আড়ি
যাই না দাদার বাড়ি।
দাদার বাড়ি দোতালা
কাক ডাকে ভোর বেলা।
মাগো তোমার পায়ে পড়ি
পুতুল দেও খেলা করি।
পুতুলের মাথায় বাবরি চুল
কে দিব আমায় গোলাপ ফুল।
গোলাপ ফুলের গোন্দে[২২]
মৌমাছি কান্দে।
মৌমাছির পোকা
ডাক্তার সাহেব বোকা।[১৮]

www.pathagar.com

১১.

ঐ যে একটা টিনের[২৩] গাড়ি
দিল্লি যাবো তাড়াতাড়ি।
ও ভাই তুই বাঙ্গালি
পুঁটি মাছের কাঙ্গালী।
খইলসা[২৪] মাছের লাকাঝাকা
ফুল ফুটিবো থোকা থোকা।
ফুলের আগায় কড়ই[২৫]
ধর ঝাইক্কা বরই॥[১৯]

১২.

আইলা জাইলা পাকিস্তান
দেশে আইলো ইরি ধান।
ইরি ধানের গন্দে
নয়া ভাবী কান্দে।
নয়া ভাবীর কান্দনে
নদীর কূল ভাঙ্গনে।
ও ভাবী তুই কান্দস ক্যান
তোর ভাইয়ে মারল ক্যান।
মাইরা সাইরা[২৬] জিজ্ঞাস করে
ডাক্তার আইনা বেন্ডিস করে।
গায়ে আমার কালা জ্বর
খেতা[২৭] দিয়া যাইতা[২৮] ধর॥[২০]

১৩.

ইকি বিকি চাম চিকি
শোয়া পড়ে ঘ্যাগের বিচি।
ছোট ছোট ভাই রে
কান্দে ছাতি ধর রে।
ছাতির উপর ঘুঘুরা
নাইচ্যা উঠে মেঘেরা।
এলের হাত বেলের হাত
তুইলা ফালাও সোনার হাত।[২১]

১৪.

হলদি কুটি চাক চাক
জামাই আইলো ঝাঁকঝাঁক।
ও ক্ষীর খামু না
ম্যায়া[২৯] বিয়া দিমু না।
ম্যায়ার মাথায় ঘোন চুল

গুইনজা[৩০] দিলাম জবা ফুল।
জবা ফুলের গোন্দে
জামাই আইছে আনন্দে।[২২]

১৫.

টুনটুনি ভাই পাখি
নাচো তো একটু দেখি।
না রে বাবা নাচব না
পড়ে গেলে বাঁচব না।
বড় আপার বিয়া
কসকো সাবান দিয়া।
কসকো সাবান গন্ধ
হাই ইস্কুল বন্ধ।

১৬.

ভাইয়ে গেছে মাছেরে
কালা গেঞ্জি গতরে।
ভাবীর অইছে[৩১] পোলা
ভাইয়ে দিছে মেলা[৩২]।[২৩]

১৭.

হাবেল কাবেল দুই ভাই
পথে পাইলো মরা গাই।
হাবেল কয় থুইয়া[৩৩] যাই
কাবেল কয় নইয়া[৩৪] যাই।[২৪]

১৮.

সাইকেল বাজে কিড়িং কিড়িং
বাবুর দোকানে
আমার দিদির বিয়ে হবে
পাক্কা দালানে।
মায় দিব গয়না
বাপে দিব শাড়ি
শ্বশুরের তা পিন্দা
জামাই আইবো শ্বশুর বাড়ি।[২৫]

১৯.

ঘুম আলা পাখি রে
ঘুম দিয়া যা
আইচা[৩৫] ভইরা ক্ষুদ দিমু
নাইচা নাইচা খা

www.pathagar.com

আমগো[৩৬] খোকার চোখে মুখে
ঘুম দিয়া যা।[২৬]

২০.

মরার বুড়ি মরে না
চুনের খুটি ভাঙ্গে না।
চুনের খুটি ভাঙ্গমু
মরণ ডাইকা আনমু[৩৭]।
বুড়ি যেইদিন মরব
রেলের গাড়িত চড়ব।
রেলের গাড়ি ঝাকাঝাকা
ঘুরতে যামু কলিকাতা।
রেলের গাড়ি বন্ধ
আমগো[৩৮] কপাল মন্দ।[২৭]

২১.

আলালী রে আলালী
কাইন্দা দুইচোখ ফুলাইলি।
জামাই গেছে হাটে
তাইতে পরাণ ফাটে।
আর কান্দন কান্দিস না।
বেড়া গোড়া ভাঙ্গিস না।
বেড়া গোড়া ভাঙ্গলে
মুরগী নিবো শিয়ালে।
মুরগীর বাচ্চা ঘরে তোল
জামাই আইছে দুয়ার খোল।[২৮]

২২.

ওয়ান টু থিরি
পাইলাম একটা বিড়ি।
বিড়ির নাই আগুন
পাইলাম একটা বাগুন।
বাগুনের নাই বিচি
পাইলাম একটা ক্যাচি।
ক্যাচির নাই ধার
পাইলাম একটা হার[৩৯]।
হারের নাই ওল[৪০]
পাইলাম একটা ডোল।
ডোলে নাই ধান
পাইলাম একটা পান।

www.pathagar.com

পানের নাই গুয়া[৪১]
পাইলাম একটা কুয়া।
কুয়ার নাই পানি
পাইলাম একটা নানী।
নানীর নাই নানা
এই তুরি[৪২] আমার জানা।[২৯]

২৩.

দোলে রে দোলে
ডালিম গাছের তলে।
সাপ কিলবিল করে
ঘাসের আগা নড়ে।
সাপের পেটে আণ্ডা
আমগো[৪৩] বাবু ঠাণ্ডা।[৩০]

২৪.

লেংটা ভুতুনি
খালে যাবি নি?
একটা ব্যাটা বইয়া রইছে
বিয়া ববি[৪৪] নি?
ভুতুনি যদি জানত
পাটি বিছাইয়া কানত।
পাটির নিচে আণ্ডা
ভুতুনির মাথা ঠাণ্ডা।[৩১]

২৫.

আগের দিনে হুকনা[৪৫] দিয়া
নাও বাইয়া যায়
পাকনা বুড়ি চাইয়া থাহে[৪৬]
পান সুপারি খায়।
ওরে বুড়ি নাতিন নইয়া
কোনো দেশে যাও
তোমার খসম[৪৭] গেছে মইরা
তারে খুইজা[৪৮] পাও।

২৬.

(খেলাধুলার ছড়া)
ছোট ছোট বড়ই গাছে
অনেক বড়ই ধরে
টিয়া পাখি ঠোকর দিলে

www.pathagar.com

ঝুম ঝুমাইয়া পরে।
হাইস্কুলের মেয়েদের
লম্বা লম্বা চুল
চুলের আগায়[৪৯] লেখা আছে
ভালোবাসার ফুল।

২৭.

(ঢেঁকির ছড়া)
কে বলেরে স্বর্গে সুখ
দুঃখে ঢেঁকি কয়
স্বর্গে এসেও আমার কিন্তু
ধান ভানতে হয়।
পৃথিবীর ঢেঁকিগুলো
আছে মহাসুখে
ম্যাশিনেতে ধান ভানে
তারা চেয়ে দেখে।

২৮.

(মলম বিক্রির ছড়া)
খাইজানি[৫০] রে ভাই খাইজানি,
হায় রে সাধের খাইজানি।
দিনে খাইজায়[৫১] যেমন তেমন,
রাইতে খাইজায় ব্যাকখানি[৫২]।
রাজা খাইজায় রানি খাইজায়
আরো খাইজায় চাকরানি।
খেতার[৫৩] তলে খাইজানি
টিপলে বাইর অয় লাল পানি।
হায় রে সাধের খাইজানি,
নারানগঞ্জের কোম্পানি।[৩২]

২৯.

কুন দিয়া যামু গো
ব্যালতলা[৫৪] দিয়া
থাকো বুইন[৫৫] থাকো বুইন
চেত্‌তরখানা[৫৬] দিয়া
আষাঢ় মাসে নিবার আমু[৫৭]
জলিধান কাইটা
জলিধানের খই[৫৮]
গামছা পাইতা[৫৯] নই।
ভুর-রু-ত ॥

www.pathagar.com

৩০.

(মেয়েলি ছড়া)

ওপার দিয়া যায় রে
বিচাকলার ছড়ি
আংগো ভাই বিয়া করছে
বুলবুলা[৬০] ছেড়ি।
ছেড়ির দাঁতে মেশি
আংগো ভাই খুশি।
ভাত রান্দে তার চাইল[৬১] ফুটেনা
তরকারী রান্দে তার মিলায় না
এ্যাকদিন ভাই মারছিল
ছয়গাছ[৬২] চুড়ি ভাঙছিল।

৩১.

ছি- ছি- ছি-
মাইনষে[৬৩] কবো[৬৪] কি
দুলাভাই আইছে[৬৫] পানের নিগা[৬৬]
পানের উপায় কি?
বটেরও পাতা দিয়া
পান বানাইছি।

ছি- ছি- ছি-
মাইনষে কবো কি
দুলাভাই আইছে সুপারির নিগা
সুপারির উপায় কি?
বরইরও বিচি দিয়া
সুপারি বানাইছি।
ছি- ছি- ছি-
মাইনষে কবো কি
দুলাভাই আইছে খয়ারের নিগা
খয়ারের উপায় কি?
গরুরও কইলজা দিয়া
খয়ার বানাইছি।

ছি- ছি- ছি-
মাইনষে কবো কি
দুলাভাই আইছে জর্দার নিগা
জর্দার উপায় কি?

নাইয়ের মরা পাতা দিয়া
জর্দা বানাইছি।
ছি- ছি- ছি-
মাইনষে কবো কি
দুলাভাই আইছে চুনের নিগা
চুনের উপায় কি?
বগেরও গু দিয়া
চুন বানাইছি।
ছি- ছি- ছি-
মাইনষে কবো কি?

৩২.

ওয়ান- টু- থ্রি
পাইলাম একটা বিড়ি।
বিড়ির নাই আগুন
পাইলাম একটা বাগুন।
বাগুনের নাই বিচি
পাইলাম একটা কেঁচি।
কেঁচির নাই ধার
পাইলাম একটা হার।
হারের নাই লকেট
পাইলাম একটা পকেট।
পকেটে নাই টাকা
ক্যামনে যামু ঢাকা।
ঢাকায় নাই গাড়ি
ক্যামনে যামু বাড়ি।

৩৩.

(ঘ্যাঘের ছড়া)

ঘেগ্যা[৬৭] ঘেগী বারা ভানে
হিচ্চা উঠে ধান,
ওই ঘেগী তোর পায়ে ধরি
আস্তে বারা ভান।

এক জাতের ঘেগ দেইখাছি
টাঙ্গাইলের বাড়ি,
ঘেগের ওপর তুইল্যা থুইছে
রসগোল্লার হাড়ি।

আর এক জাতের ঘেগ দেইখ্যাছি
বৌরা বাঁশের[৬৮] মোথা,

পানি খাবার নইলে পড়ে
ঠেইক্যা পড়ে মাথা।[৩৩]

৩৪.

(কলমি লতার ছড়া)
কলমি লতা কলমি লতা,
থাকব কোথা, থাকব কোথা?
থাকব থাকব, কাঁদার তলে,
লাফিয়ে উঠব, বর্ষাকালে।[৩৪]

৩৫.

তেতুল গাছে উঠছিলাম,
চিত্তর[৬৯] অইয়া পড়ছিলাম।
কোনো মাগি ধরল না,
কোলে তুইল্যা নিলো না।

আল্লায় যুদি বাঁচায়,
মোরগ থুমু খাঁচায়।

হেই মোরগ বেইচ্যা,
বউ আনমু নাইচ্যা।

বউয়ের কোমরে ছুরানি[৭০]
পুত পুত পুত পাদুনী।[৩৫]

৩৬.

ঘরের চালে ঝিঙ্গারে
গাছে নাচে ফিঙ্গারে[৭১]
দেওরারে ঝিঙ্গা ছিড়া দিয়া যা।

বুজুরী বুজুরী[৭২] কাটবো বউ
তেলের মধ্যে ছাড়বো বউ
দেওরারে ছালুন[৭৩] চাইকা দিয়া যা।

তেতুইল্যা তেতুইল্যা পাতায়রে
বুম্বাই শাড়ি নামাইছেরে
দেওরারে শাড়ি কিন্যা দিয়া যা।

কুচিয়া কুচিয়া পিনবো[৭৪] বউ
ঢুলিয়া ঢুলিয়া হাটব বউ
দেওরারে তামাশা দেইখ্যা যা।[৩৬]

৩৭.

ওক্কুর ঝুক্কুর মৈশের টান,
ছিরকল[৭৫] ধইরা বারাভান।

আয়রে বুইড়া ঘরে যাই,
নাইওর গেছে ঝাও নাই।
কিনা কপাল করছিলাম,
বুইড়ার আতে পড়ছিলাম।[৭৬]
বুইড়া যদি বাঁচে
নথ গড়ামু পাছে।
পিতিলার নথ নাকে দিয়া,
ভাত বাইড়া দিমু ঝাকি দিয়া।[৩৭]

৩৮.

মৈশ আইলরে ভাই মৈশ আইল, ঘর দুয়ার ভাঙিল।
ঘর দুয়ার মুছমুছি বুড়া বুড়ির ক্যাচক্যাচি।[৭৭]
কাইল অইল পুষ মাস[৭৮] ও বুড়ি তোর ঘর ভাঙমু,
পুষ মাসের এক দিন, চন্দন ঘুরে বাড়ি বাড়ি।

এক চান্দের নাম জালুয়া,
আর এক চান্দের নাম হালুয়া।

আয় রে হালুয়া ভাই,
ফুলের বাগানে যাই।

ফুল ধইরা দিলাম টান,
ছিড়া আইল নক্কর খান।

হাসেন হোসেন ছিলিমপুর,
এমনি যাব ছিলিমপুর।
ছিলিম পুরের বাগডাসা
ঘোড়া অইল তেলচোরা।[৩৮]

৩৯.

ঘোড়ার গাড়ি টম টম লেচু বাগানে,
ফুলতুলি মালাগাঁথি বাবুর দোকানে।
আয়নামনি কাহই[৭৯] মতি সাহেব আলীর বিয়া,
সাহেব আলীর বিয়া অইব কলিকাতা গিয়া।

কলিকতার ছেরিগুলি[৮০] জলে নামিছে,
বেনির উপুর তিনডা ঘুঘু ডাক ছাড়িছে।
গুল বাড়ির পাতা দিয়া বাঁশি ফুয়াইছে,
মরা মাইনসের কাল্লাদিয়া নিশান উড়াইছে।[৩৯]

৪০.

আগে যে খেলছি
ধুলামাটি দিয়া,
একদিন যে মারছিল
আইল্যাপাজুন[৮১] দিয়া।

www.pathagar.com

আমি যে কানছিলাম
বাঁশ তলে বইয়া,
সেই কথা মুনে হয়
পরের বাড়ি যাইয়া।

আমার ভাইরে খবর দিও
জলপাই ধান কাইটা।[৪০]

৪১.

মামু গো বাড়ি গেছিলাম,
কাঠল[৮২] ভাইঙা লইছিলাম।
মামু খাইল রোয়াডি,
আমারে দিলো কেইত্তাডি।[৮৩]
কেইত্তা ফালাবার গেছিলাম।

ঘুঘুর ছাও[৮৪] ধরছিলাম,
চাইল খাওয়াবার লইছিলাম।
ফুরুত কইরা গেছেগা।[৪১]

৪২.

কে বগি তুই সুতা কাট,
কাইল অইল বর্গার আট।[৮৫]

নেংটা ভুতুম কিতাব পড়,
গোদার মায় রে বিয়া কর।

গোদা গেছে আটে,
গাই বিয়াইছে ঘাটে।[৮৬]

গাইয়ের নাম ধনী,
বাছুরের নাম টুনটুনি।[৪২]

৪৩.

ছোট ছোট ক্ষেতরে ভাই
বড় বড় ইটা,[৮৭]
দুলাই বিবির হাত থিকা[৮৮]
কাউয়ায়[৮৯] নিল পিঠা।

ছোট কাইল্যা[৯০] চেংরা বন্ধু
চেংরামী তোর মনে,
তুমি বন্ধু প্রেম জান না
বুঝলাম অনুমানে [৪৩]

৪৪.

একতারা ভাই কাটুম কুটুম,
দুইতারা ভাই লোহার কুটুম।

www.pathagar.com

তারারা কয় ভাই?
তারারা তিন ভাই।
বাইন্দা ফালামু,[৯১]
তারাদের বড় ভাই।
মানুষ মরে ভাতে,
গরু মরে ঘাসে।
আইজার রৌদে,
পৃত্তিম[৯২] ফাটে।[৪৪]

৪৫.

আটাইল্যা মাটি[৯৩] চন্দন গোটা,
গাই বিয়াইলে[৯৪] বাছুর মোটা।
বাইর বাড়ি গেছি চলার নিগা,
ভাসুর আইছে নিবার নিগা।
এলং পাইরা শাড়ি চাই,
তেইসেনা[৯৫] ভাসুর যাবার চাই।[৪৫]

৪৬.

উস্তা[৯৬] ভাজা চাক চাক,
জামাই আছে ঝাঁক ঝাঁক।
কাচা মেয়্যা[৯৭] দুধের সর,
কেমনে করবে পরের ঘর?
পরের বেটায় মারব,
গাছ ধইরা কানব।
মিয়া ভাই শুনব,
পালকি তুইল্যা আনব।[৪৬]

৪৭.

বাইর বাড়ি করাতি,
দুধের আওটা[৯৮] চড়াইছি।
দুধ থুইছি জুড়াইয়া,
কলা থুইছি এড়াইয়া।
আমাগো মিয়াভাই খাব গো,
পাড়া বেড়াইয়া।

৪৮.

গোবর ফালাবার কইলে বউ
গোঁফ ফুলাইয়া থাকে,
উঠান হুরবার[৯৯] কইলে বউ
ছম্মর ছম্মর[১০০] করে,
পানি আনবার কইলে বউ

www.pathagar.com

টাঙ্গন ঘোড়ায়[১০১] চড়ে,
বিছান করবার কইলে বউ
বালিশ নইয়া নাচে।[৪৭]

৪৯.

এই বাড়ির পাক্কা বুড়ি[১০২]
ওই বাড়ি যায়,
পথে পাইল মরা ইন্দুর
দুই হাতে কিলায়।
কিলাইতে কিলাতে বুড়ি
মলে দুটি কান,
এই ইন্দুরে খাইছে আমার
নাতিন জামাইর ধান।[৪৮]

৫০.

তারা হার নইয়া গেলা পতি
তারা হার আনলা না,
অল্প বয়সী পতি তুমি
তারা হার দিলা না।
আমার নাগাল মাগী[১০৩] তুমি
কিনতে পারবা না।[৪৯]

৫১.

হাঁসের বাচ্চা তৈ তৈ
ওই ছেড়ি তোর বাড়ি কই?
আমার বড়ি রংপুর,
আমি বেচি চানাচুর।
চানাচুর হস্তা চাইর আনা,
তার ওপর যাইমু না।
বোয়াল মাছ গন্ধ,
হাইস্কুল বন্ধ।
হাইস্কুলে যামু না,
বেতের বাড়ি খামু না।
বেত গেছে ভাইঙ্গা,
স্যার গেছে কাইন্দা।[৫০]

৫২.

ছেলে : এই ছেড়ি তোর নাম কি?
মেয়ে : সখিনা।
ছেলে : কি মাছ মারস রে?
মেয়ে : দারকিনা।

www.pathagar.com

ছেলে : রেলগাড়ি ছাড়া আমি চলি না।
মেয়ে : এলং পাইড়া শাড়ি আমি পিন্দিনা।[৫১]

৫৩.

ওপেনটি বাক্স,
টিনটিনা ট্যাক্স।
চুলটানা বিবিআনা,
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।

রাজবাড়িতে যেতে,
পান সুপারী খেতে।

পানের আগে মরিচ বাঁা,
ইস্কুল ঘরের চাবি আটা।

ছোট ছোট জাজমনি,
যাইতে হবে অনেক খানি।

আমার নাম মনিমালা,
গলায় দিলাম হিরার মালা।

৫৪.

(বৃষ্টির ছড়া)
আয় বৃষ্টি ঝেকে
ধান দিব মেপে
লেউ পাতা কমরার ছা
যা বৃষ্টি দূরে যা। (ঘাটাইল)

৫৫.

(মাছের ছড়া)
ইচায় কয় মিছা কথা,
চান্দায় কয় আমারে বাঁচা।
পানির তলে বানছি বাসা,
সেই আমার ঘর,
যে খাইছে ভাই পলর জাতা॥
সেই জানে খরর।

৫৬.

(ছেলে ভুলানো ছড়া)
ডুলে রে ডুলে[১০৪]
ডুলুন গাছের তলে
সাপ কিলবিল করে
সাপের প্যাটে আণ্ডা
আংগো গ্যাদা ঠাণ্ডা ॥

www.pathagar.com

৫৭.
(ছেলে ভুলানো ছড়া)
ঘুঘু মইলো ঘুঘু মইলো
আওলা চাইল খাইয়্যা
ঘুঘুর বিয়ায় যামু আমি
পদ্মা শাড়ি পিন্দা
মায় দিলো ত্যাল সুন্দরী
বাপে দিলো বিয়া
রাজার ব্যাটায় তুইলা নিলো
মালকাছা দিয়া।
ভুর-রু-ত ॥

ঘ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ

টাঙ্গাইল অঞ্চলে এক সময় পুথি পাঠের ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বল্প শিক্ষিত মুসলমান কৃষক পরিবারে কাজের অবসরে পুথি পাঠের আসর বসত। যিনি পুথি পাঠ করেন তিনি সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী হন এবং পুথি পাঠের বিশেষ ঢং তার আয়ত্বে থাকে। পুথি পাঠের আসরে শ্রোতারা বৃত্তাকারে বসে এবং পুথি পাঠক মাঝখানে বসে সুরে সুরে গায় পুথির করুণ কাহিনি। বিশেষ করে রাতের বেলাতেই পুথি পাঠের আসর জমে উঠত বেশি। এ সময় হাতে কোনো কাজ না থাকায় পুরুষদের পাশাপাশি বাড়ির মহিলারাও আসরে যোগ দিয়ে গভীর আগ্রহে শুনত পুথির পাঠ। আবেগের অশ্রুস্রোতে তাদের চোখ কখনো কখনো ছল ছল করে ওঠত। জোসনা রাতে মশালের আলোয় সারা উঠোন ঝলমল করত আর সে আলোয় চলত বিরামহীন পুথি পাঠ। এসব পুথির বিষয় ছিল ইসলামী ঐতিহ্য ও বীরত্ব ব্যঞ্জক কাহিনিতে ভরা। টাঙ্গাইল অঞ্চলে বহুল পঠিত পুথি সমূহের মধ্যে– জঙ্গনামা, আমীর হামজা, সোনভান, কারবালার যুদ্ধ, গাজী-কালু চম্পাবতী ইত্যাদি অন্যতম। উত্তর টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার অলিপুর গ্রামের মরহুম আব্দুল মোতালেব ছিলেন সুরেলা কণ্ঠের একজন পুথি-পাঠক।

(আগেকার মেলা কথা)
ভূমিকা
বিসমিল্লাহ বলিয়া আমি
খুলে নিলাম খাতা
সবার মাঝে বলে যাব
আগেকার দিনের কথা।
মনোযোগ দিয়া ভাই গো
শোনেন যে সবাই
সকলেরই দোয়া নিয়া
আমি কইয়া যাই।
বাঙ্গালিদের মূল ভাষায়

www.pathagar.com

গাইব যে চরণ
বাংলা শব্দ উইঠা অইল
আরেক ধরন।
বাঙ্গালিদের বাঙ্গালিত্বের
রাইখ যে স্মরণ
লুঙ্গিরে যে তফন কইছি
শার্টেরে পিরন।
কাঠারে[১০৫] যে চোবা কইছি
বৃষ্টিরে যে দেওয়া
নড়িরে যে পাজুন কইছি
সুপারি রে গুয়া।
মইয়ের ভিতর খিল লাগাইছি
তারে কইছি কোয়া
জামাই মইরা বিধবা অইছে
তারে কইছি বেওয়া।
ঘরের পিছন কাইনছাল কইছি
গরমেরে গুমা
আটুর উপর কাপড় পড়ছি
তারে কইছি ডুমা।
চুনে রে যে দই কইছি
লবণে রে নুন।
জামাইরে যে দামান কইছি
ভালো রে যে গুণ।
বারিন্দারে উসারা কইছি
মাচিরে[১০৬] উগার
ঝগড়ারে যে ফেসাদ কইছি
ধৈর্য্য রে সুমার।
ঠাণ্ডারে যে টেলকা কইছি
গরমেরে ততা
তামাক পাতারে হাদা কইছি
গাছের গোড়ারে মোতা।
বাতিরে যে হলক কইছি
অনেকেরে মেলা
ছিলিং এরে চাং কইছি
সূর্যরে বেলা।
পোলারে যে গেদা কইছি

www.pathagar.com

বাপেরে বা'জান
মাছ থাকছে মান্দা[১০৭] ভরা
গোলা ভরা ধান।
আদররে হোয়াগ কইছি
দোষেরে ছক্কল
শীতেরে যে জার কইছি
মাতাব্বররে মোড়ল।
তরকারিরে শালুন কইছি
রসারে[১০৮] যে ঝোল
সারি সারি নাও ভিড়াইছে
তারে কইছি কোল।
কত শোভা আছাল দেখছি
আমাগর[১০৯] গায়
ধুয়া গাইছি পাল্লা ধইরা
বাদাম তুলছি নায়।
নৌকা বাইচে জারি গাইছি
বৈঠা টানছি তালে
তামসগিরি তামসা[১১০] দেখছে
বইসা গাছের ডালে।
বন্যারে যে বান কইছি
ডিমেরে যে আণ্ডা
লাউরে যে কদু কইছি
ডাটারে যে ডাংগা।
কূপেরে ইন্দিরা কইছি
পয়টা[১১১] পরছি পায়
গোয়ালেরা গরু দাগাইছে[১১২]
ঘুরছে গায় গায়।
আত্মীয় রে ইষ্টি কইছি
খাইছি গুড়ের নই[১১৩]
হাইঞ্জা বেলায় হাঁস আহে নাই
করছি তই তই তই।
করল্লাকে উস্তা কইছি
রাগেরে দেমাগ
চুল ছাড়া মাথা দেখলে
তারে কইছি টাক।
মজলিস রে মেজবানি কইছি

www.pathagar.com

থালা কলার পাতা
বইসা বইসা শোনেন ভাই গো
আগেকারও কথা।
মেঝরে যে মাইঝাল কইছি
টাকি মাছরে ছাইতান
বিন্নি ধানের খই খাইয়া
পরে খাইছি পান।
পাখিরে যে পক্ষি কইছি
কাকেরে যে কাইয়া
নদীতে যে নাও চালাইছে
তারে কইছি নাইয়া।
মুরগীরে যে কুরকা কইছি
বকারে যে গাইল
কয়চান[১১৪] মাঠে লাঠি ফিরাইছি
তারে কইছি ঢাল।
দুধের পাইল্লা[১১৫] আওটা কইছি
গাভিরে যে গাই
মাইটা[১১৬] পাইল্লায় দুধ জাল দিছি
আরও খাইছি জাই।[১১৭]
দুধ থেকে তুইলা ননী
নিজের হাতে ঘি
কচা[১১৮] ডুবাইয়া দুধ খাইছি
এখন খাইতে পাই কী?
কাইজার দাগে[১১৯] কয়চান ডাকছে
লাইঠাল[১২০] আইছে ভাড়া
কার্তিক মাসের শেষের দিনে
খেলছি ভাড়াভূড়া।[১২১]
মাথাইল[১২২] পইড়া খেত নিড়াইছি
হুক্কায় মারছি টান
আইলাত নিছি[১২৩] ঘষির আগুন
ছাটায়[১২৪] গাইছি গান।
বাঁশের চুঙ্গায় তামুক নিছি
তফিলেতে[১২৫] টেকা
জালি দিয়া মাছ ধরছি
চিতল বোয়াল ফেকা।[১২৬]
মাগনা কামলা নিয়া ক্ষেতে
কাটছি কত ধান

www.pathagar.com

ধামা[১২৭] বোঝাই তেলের পিঠা
খাইছি হাচি পান।
মুইটা গুড়ের[১২৮] ক্ষির খাইছি
হাতে পাতা দই
পান্তা ভাতের খিচুরি খাইছি
ঢেপ শালুকের খই।
কত ফুলের মালা গাঁথছি
বিনা সুতায় গাঁথা
বিদায় বেলায় গুরুজনদের
তুইলা দিছি ছাতা।
কলা গাছের গেট করছি
কাগজেরই ফুল
বান আইলে খালের উপর
দিছি বাঁশের পুল।
মাংসরে যে গোস্ত কইছি
ভাঙ্গা চাউলরে কুন
সকালরে বিহান কইছি
ঝাড়ুরে হাছুন।
জামাইরে সোয়ামি কইছি
চইলা আইছে বিয়া
পান গুয়া কদমা[১২৯] আনছে
ধামা বোঝাই দিয়া।
শরীর রে গতর কইছি
সিনেমারে টগি
ঘোষরে যে গোয়াল কইছি
বড় থালারে বগি।
টিকটিকিরে আড়ইল কইছি
পাখারে বিচুন
বাইচের নৌকারে ছিব নাও কইছি
নায়ের টানছি গুণ।
পাছুনেরে ছেনি কইছি
আখেরে কুইশাল
লেংটি[১৩০] পইড়া ক্ষেত নিড়াইছি
ঢেঁকিত বানচি চাইল।
চিরুনিরে কাহই কইছি
খড়ম[১৩১] পরছি পায়
ফকির রে দেওয়ান কইছি

www.pathagar.com

ঘুরছে গায় গায়।
বাতাস খাইছি হাওদা[১৩২] দিয়া
খাইছি ভেদা মাছ
ঢেঁকি ছাটা চাইল খাইছি
নারকেল দিয়া হাঁস।
পাতিলেরে পাইল্লা কইছি
দিয়ার[১৩৩] পাতছি খালে
কত মাছ যে বাজছে[১৩৪] তাতে
মাছ শুকাইছি চালে।
পিংগিস নায়ে নাইওর গেছি
পাইল্লা ভড়া পিঠা
চিড়ার ছাতু রসাল গজা
থাকতো পানের বাঁা।
রেড়ুতে[১৩৫] গাইছে পল্লীগীতি
হাস্তর[১৩৬] কইছে নানি
নানা ভাই পান চাবাইছে
আমি হিচ্ছি পানি।

কিতাব পাঠ করছে নানা
নানি থাকছে বইয়া
নানির কোলে মাথা থুইয়া
আমি থাকছি শুইয়া।
লাঠি নিয়া হাইটা গেছে
তাদের কইছি গুজা
কীর্তন গাইছে ঢাক বাইড়াইছে[১৩৭]
হইছে কত পূজা।
মিঠাই খাইছি প্রসাদ খাইছি
খাইছি তিলের নাড়ু
হিন্দু মুসলিম সবাই খাইছি
খাইছি তালের তারু।[১৩৮]
বেহারারা ডুলি বাইছে
লম্বা লম্বা মোচ
লগি[১৩৯] দিয়া নাও চালাইছে
তারে কইছি খোজ।
চুলারে যে আইশাল কইছি
ঝড়েরে তুফান
রোদ্ররে যে অইদ কইছি

উপহাররে মাইন।
ঔষধেরে দাওয়াই কইছি
বোতলরে শিশি
খালারে যে মাসি কইছি
ফুপুরে যে পিসি।
আইচারে যে মালই কইছি
শর্তারে যে জাঁতি
ঢেড়স রে ভেরি কইছি
সোয়ামি রে পতি।
টকরে যে চুকা কইছি
কাদারে ভেদর
আওটা[১৪০] পাইল্লায় দুধ জাল দিছি
দুধে পড়ছে সর।
পাইল্লা চাইছা চাছি খাইছি
চাচ্ছি ঝিনুক দিয়া
খাবার বইছি ছোট বড়
সকলেরে নিয়া।
দিয়াশলাইরে ম্যাচ কইছি
চুলারে আইশাল
বৈঠা দিয়া ডেগ নাড়ছি
ওড়ন[১৪১] দিয়া ডাইল।
ঘুড়িরে চেলিঙ্গা কইছি
মিষ্টিরে মিঠাই
বিদ্যালয়রে মক্তব কইছি
লেখছি যে পাতায়।
কুইঞ্চা[১৪২] কাইটা কলম করছি
চাইল ভাইজা[১৪৩] কালি
চট বিছাইয়া পড়বার বইছি[১৪৪]
বিলে বাইছি জালি।
শিক্ষকরে গুরু কইছি
সবাই মানছে তারে
ভাঙ্গা ছাতা মাথায় দিয়া
আইছে গরম জারে।[১৪৫]
পানচি[১৪৬] গোটা খাইচি মোরা
খাইছি ছাগল নাদি
আরও খাইছি আনাই গোটা
খাবার ডাকছে দাদি।

www.pathagar.com

চিনার উঙ্গার[১৪৭] নাস্তা খাইছি
কাউনেরই মোয়া
রোজার মাসে রোজদাইরাতে[১৪৮]
সবাই করছে দোয়া।
হাটে নিয়া দুলাভাই
কিনা দিছে নই
বিয়ান বেলা বুজি[১৪৯] মোরে
খিলাইছে পাচই।[১৫০]
হাড়েরে যে আড্ডি কইছি
ভয়েরে যে ডর
বিদেশেরে বিলাত কইছি
প্যাটেরে উদর।
পিয়ারারে সরবি কইছি
ভর্তা রে চাসনাই
খাজ তেলে ভর্তা করছি
কেহই ছাড়ে নাই।
খেয়া নৌকারে গুদারা কইছি
পাটনি বাইছে নাও
মাঠ পারেতেই ছাইলায়[১৫১] থাকছে
ডর থাকে নাই তাও।
ঢেঁকিরে যে ঢেহি কইছি
নোটে[১৫২] দিছি ধান
ঝুক্কুর পাইরা[১৫৩] ভাড়া বানছি
কাতলায়[১৫৪] গাইছে গান।
হুক্কা টানছি নইচার[১৫৫] ভিতর
পড়ছে কত কাই[১৫৬]
একে একে সবাই খাইছি
আয়ুশ[১৫৭] মিটে নাই।
জীবন্তরে জিন্দা কইছি
নীচেরে যে তলে
ঝাকি জালরে তইরা কইছি
ফাঁসিরে যে শুলে।
মেঘেরে যে হাজ কইছি
কিনারারে মুড়া
মামারে যে মামু কইছি
দাদারে যে খুড়া।
বড় রে যে ভুত্তুইরা কইছি

www.pathagar.com

ছোটরে যে গুদা
সালুন ছাড়া ভাত খাইছি
তারে কইছি হুদা।
টিউবওয়েলরে টিপকল কইছি
মসজিদরে জুম্বা ঘর
দরজারে দুয়ার কইছি
ঘারেরে যে ধর।
বলদ গরুরে যে আড়িল কইছি
সাদারে যে ধলা
মাইটা জালায় ধান থুইছি
তারে কইছি কোলা।
বেশি খাইকারে আভাইতা কইছি
জণ্ডিস অলি পোক
বাঁশের পুলরে সাঁকো কইছি
মনে থাকছে সুখ।
অসুখেরে বেরাম কইছি
নতুনরে নয়া
হলুদরে অইলদা কইছি
পারের নাওরে খেয়া।
জালাতন রে আলুজা কইছি
জ্ঞানেরে যে হুশ
হারিকেন যে লণ্ঠন কইছি
আনন্দরে জুশ।
বিশ্রাম রে জিরান কইছি
ভিক্ষারে সোওয়াল
আঘাত রে চোট কইছি
ঘোষেরে গোয়াল।
কালা রে বয়ড়া কইছি
শীতরে যে জার
মগজেরে ঘিলু কইছি
প্রধানরে সর্দার।
ঝগড়ারে যে ফ্যাসাদ কইছি
জঙ্গলরে আড়া
দ্রুতরে যে জোর কইছে
দাঁত ছাড়ারে বুড়া।
অভাবরে আকাল কইছি
বওনিরে যে সাইধ

www.pathagar.com

ক্ষতিরে অনিষ্ট কইছি
বাঁকারে কাইত।
রাস্তারে যে সড়ক কইছি
পকেটেরে জিব
হা-ডু-ডু খেলতে নাইমা
জোরে মারছি ডিপ।
লেবুরে যে কাগুজী কইছি
ফিরারে যে পিঁড়ি
মাছ মারতে জারে ধরলে
টানছি পাতার বিড়ি।
শিশিররে নিহর কইছি
শাশুড়িরে হরি
মরিচরে যে লংকা কইছি
রশিরে যে দড়ি।
কুপিরে যে দোয়াত কইছি
নীচেরে যে তলে
ছাগিরে যে বকরি কইছি
ঝাপ্পুর[১৫৮] খেলছি জলে।
গাদম[১৫৯] খেলছি ছুট খেলছি
খেলছি কানা মাছি
বড় নাওয়ের বাদাম তুলতে
টাইনা ধরছি কাছি।
একত্ররে মোক্তা কইছি
কবররে গোর
উলঙ্গরে নেংটা কইছি
ঘোমটারে ঘোংগর।
বলেরে যে তাগদ কইছি
ধ্বংসরে পতন
এলাকারে ময়াল কইছি
মুখেরে বদন।
স্বপ্নরে যে খোয়াব কইছি
পঙ্গুরে আতুর
লেংরারে যে খোঁড়া কইছি
ধৈর্য্যরে সবুর।
ঘায়ে[১৬০] রে পচারি কইছি
চুলকানিরে খাইজানি
পায়খানারে আঘা কইছি

www.pathagar.com

ঘাইরারে[১৬১] উজানি।
বড় বুইন[১৬২] রে বুজি কইছি
বান্ধবিরে সই
বন্ধুরে যে মিতা কইছি
চিরুনিরে কাহই।
দোয়াতেরে ফিতা পইল্‌তা কইছি
সেন্ডেলেরে যে চটি
আমের ফুলরে বইল কইছি
লোটারে যে ঘটি।
আজামরে গোটকা কইছি
যুবকরে জুয়ান
উজ্জ্বলরে যে চটক কইছি
বক্তব্যরে বয়ান।
চেয়ারম্যানরে পঞ্চায়েত কইছি
নিকটরে বোগল
পেট ফুলারে নুন্দী কইছি
যন্ত্ররে যে কল।
লম্বারে যে দীঘলা কইছি
শক্তিরে গুমান
প্রশস্তরে ফারাগ কইছি
পৃথিবীরে জাহান।
রাজ্যরে যে মুল্লুক কইছি
ভিখারিরে কাঙ্গাল
রকমেরে কিছিম কইছি
অভাবরে আহাল।
উল্টারে যে উক্তা কইছি
তুলনারে পরতাল
ঝাকারে হাজি কইছি
ছিলরে আছাল।
বানা[১৬৩] দিছি গুদি[১৬৪] দিছি
থাকছি ছাইলার[১৬৫] তলে
শিয়াল ডাকছে হুক্কা-হুয়া
ডলনা[১৬৬] টানছি খালে।
দর্জালেরে খান্নাশ কইছি
মাইরে রে তাইশানী[১৬৭]
হাত কলে তেল বানাইছি
তারে কইছি ঘানি।

www.pathagar.com

আতপেরে আওলা কইছি
রশির গিটা গিরো
বেশি ছোট কিরিস্তি কইছি
একত্ররে জড়ো।
স্বচ্ছরে যে ফটিক কইছি
টেরা চোখরে কানি
শয়তানীরে পেতনী কইছি
মজলিশরে মেজবানী।
বোন জামাইরে মেজবান কইছি
আদররে আল্লাদী
গুলিরে যে ডেয়র[১৬৮] কইছি
বাদীরে ফৈরাদী।
স্থুল ভাগরে ডাঙ্গা কইছি
নৌকার ঢিবলা[১৬৯] পাইন
বিছুন ছিটাইয়া খেত বুনছি
তারে কইছি বাইন[১৭০]।
মুড়িরে যে উরুম কইছি
কমেরে নাজাই
নিজ ইচ্ছা আপত্তি কইছি
আশ্রয়রে যে ঠাঁই।
বুট কালাই চুরি করছি
আরও আনছি নাড়া[১৭১]
নিজ রাস্তারই মওরায় আইনা
কালাই দিছি পোড়া।
চুরি করছি বাঙ্গিরে ভাই
আরও আনছি কলা
মাতবরেরা বিচার করছে
খাইছিরে কান মলা।
কুরকা চুরি করছিরে ভাই
আর যে কুশাইল
কলার বাসনায়[১৭২] ঘর ভইরাছে
মায়ে পারছে গাইল।
আলই বাড়ির মিটাই চুরি
গাছে চইড়া ডাব
ধরা পইরা হায় হায় করছি
কইরা দিছে মাপ।
কিশোর আলু চুরি করছি

www.pathagar.com

বিলে ধরছি হাঁস
জোৎস্নার রাইতে নৌকা চুরি
জোরে দিছি বাইচ।
তারপরে যে জারী ধরছি
সুরে ধরছি তাল
বয়াতি তার বয়ান ধরছে
হাইলায় ধরছে হাল।
এমনিভাবে সারা রাত্রি
সঙ্গ দিছি দলে
কৃষক শ্রমিক ছাত্ররা সব
থাকছি সবাই মিলে।
সং দেখছি ঢং দেখছি
দেখছি বায়োস্কোপ
সব বাড়িরই উত্তর পার্শ্বে
থাকছে বাঁশের ছোব।
আগার পাগার খালে বিলে
করছিরে গোছল
ভেজাল ছাড়া খাদ্য খাইছি
দেহে থাকছে বল।
কারবলির সাবান ঘষছি
ঝামা দিয়া পাও
তিত পল্লার ছোবা দিয়া
ঘসছিরে ভাই গাও।
কণ্ঠ বালা কানে পড়ছি
নদ পরছি নাকে
ছায়া পড়ছি ঝুল দিয়া
ঘাগড়ি কইছি তাকে।
মাস কালাইর জিলাপি খাইছি
কইতরের তরকারি
রুই মাছের মুড়িঘন্ট
পচা ইলশার ঝুড়ি।
বাড়িত ঢুকতে দেউরি বেড়া
গোয়াইল ঘরে চারী
বাইর বাড়িতে খেরের পালা
আরও গোবর কারি।
থাকছেরে কাচারি ঘর
সব সময় খোলা

www.pathagar.com

গল্প গুজব কইরা মানুষ
কাটাইছে যে বেলা।
অনেক বেশি আবাঙ্গা কইছি
মাথারে যে ছের
পশুর গোবর উষ্টা কইছি
বেশিরে যে ঢের।
বিপরীতিরে উল্টা কইছি
গোপন রাখা গুম
বৈশাখ মাসে ক্ষেত বুনছি
মাটিত থাকবে পোম।
বাতাসা মাছরে বাইজা কইছি
উচ্চতারে জাগল
ভালবাসারে খাতির কইছি
কামলারে রাহল।
কেচকেচিরে কেল কেলানী
ডাইলা মাথা ন্যাড়া
উচ্চ স্বররে শোষ্যার কইছি
মন্ত্র ঠিকনাছাড়া।
টুকরারে যে বটলী কইছি
দায়িত্বরে দায়
বাইড়াবারীরে নাড়াই কইছি
উপার্জনরে কামাই।
জোরে সোরে ডৈট্টা কইছি
ঘায়ের পিকরে পুইজ
তৈজসপত্র বাসন কইছি
জিজ্ঞাসারে হইজ।
এক সঙ্গে ভাগে যোগে
পার্থক্য তফাৎ
দৌড়ে রে যে দাবাড় কইছি
মজারে যে স্বাদ।

(পুত্র শাসন)

সারারাইত যে দেখছি নাটক
দেখছি যাত্রা পালা
ওড়াওড়ি[১৭৩] বাইজা[১৭৪] গেছে
খাইছি কত ডলা।
নিটাল মাইরা[১৭৫] হুনছি গান

পোহাইয়া[১৭৬] যেতো রাইত
বিয়ান বেলা ঝাঁক ধইরা যে
সবাই গেছি বাইত।[১৭৭]
যাইয়া দেখছি বাপে আমার
মায়রে পারছে গালি
পোলা আছাল বাইত্তে কনে[১৭৮]
খোঁজ রাখছ কী শালি।
মায়ে থাকছে চুপ কইরা
পানি আইছে[১৭৯] চোখে
কথা কওয়ার[১৮০] জো ছিল না
কানছে ধুকে ধুকে।
ভয়ের চোটে ফুচকি[১৮১] পারছি
খাবার খাই নাই ঘরে
না খাইয়া যে বেলা কাটছে
মায়ে কানছে পরে।
ধীরে ধীরে মায়ের কাছে
পাইছিরে ভাই ঠাঁই
বাপের গর্জন কানে আইছে
রক্ষা বুঝি নাই।
রাগ দেখিয়া ভয়ের চোটে
বাপের ধরছি পায়
আর দেখমু না যাত্রাপালা
খোদারই দোহায়।
বাপে কইছে শালার বেটা
রাইতে ছিলি কুনু[১৮২]?
গরু দুইটা গাছ খাইছে
বাইন্ধা দিছে মুনু।
তোর মায়েরে কইয়া আমি
বন্ধ করমু ভাত
নইলে ভাংমু আইলা লড়ি[১৮৩]
মিটামু[১৮৪] তোর সাধ।
বাড়ি ছিল পাতলা পাতলা
আড়া ছিল বেশি
রাইতে চলছি মশাল নিয়া
মুখে ছিল হাসি।
শুকুর[১৮৫] ছিল বন জঙ্গলে
শকুন থাকছে গাছে

www.pathagar.com

কাইয়া[১৮৬] ডাকছে কা-কা কইরা
বিল ভরছে হাঁসে।

(রোগব্যাধি)

পান্তা নিছি থালি ভইরা
আরো পাটের শাক
দেউরি বেড়ার[১৮৭] কাছে আইয়া[১৮৮]
দেওয়ান[১৮৯] মারছে হাক।
শুকনা মরিচ পুইড়া নিছি
পিঁয়াজ নিছি সাথে
সোজা অইয়া আইটা গেছি[১৯০]
ধরে নাই তো বাতে।

ধরে নাই তো ডাইবেটিসে
হয় নাই তো ক্যান্সার
এইডস রোগের নাম ছিল না
ছিল ন্যায় বিচার।
কত রোগ যে আইল দেশে
এই না কলিকাল
যাহা কিনি তাহার মধ্যেই
খালি যে ভেজাল।

(বৃষ্টির সময়)

কত খেলাই খেলছি রে হায়
খেলছি মেঘা ভাই
বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হয় নাই
বৃষ্টিও আশায়।
সবাই মিলে খেলছি খেলা
খেলছি বাড়ি বাড়ি
পানি ঢালছি উঠান মাঝে
করছি উড়াউড়ি।
কেউ বা থাকছে নেংটারে ভাই
কেউ বা নেংটি[১৯১] পড়ে
ঘুরে ঘুরে গাইছি জারি
হাতে হাত ধরে।
কারো মুখে পাইল্লার কালি[১৯২]
কারো মুখে দাড়ি
কারো গলায় ভাঙ্গা পাইল্লা
কারো ভাঙ্গা থালি।

www.pathagar.com

রঙ্গ করে সঙ সেজে
গাইছি জারিগান
'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
জুড়াইক রে পরান।
কালুর মায় চিম পক্ষিলা
সর্বলোকে জানে
কুলার আগায়[১৯৩] তিনটা চাইল
গুইনা গুইনা আনে।
এ বাড়িগোর পানি নাই
কুয়া যে শুকাইছে
হাঁড়ি কলস শুকা দিয়া
ঘরে বসিছে।
ঢাকি নিয়া থাকছে একজন
সবাই দিছে চাইল
কেউবা দিছে মরিচ পিঁয়াজ
কেউবা দিছে ডাইল।
কেউবা দিছে পাটের শাক ভাই
কেউবা দিছে আম
খেলা শেষে খিচুরি খাইছি
গায়ে ঝরছে ঘাম।

(বাঙালির খাদ্য)

গুলাইলের পাতায়[১৯৪] কুইয়া মাছ[১৯৫]
লাগছে কত স্বাদ
মাইটা পাইল্লায় পাতার জালে
পাক[১৯৬] করছি যে ভাত।
খাইছি রে ভাই কদুর চুকা
ঢেকুর পাতার শাক
কচুর ডাটা ভর্তা খাইছি
আরো খাইছি বাগ[১৯৭]।
কত খাইছি আমসত্ত্ব[১৯৮]
খাইছি আলুর ঝুড়ি[১৯৯]
আরও খাইছি বিলাতির খাট্টা[২০০]
টানছি পাতার বিড়ি।
বার জাতের বাস ছিল
ছিলো না তফাৎ
গাই বিয়ালে গোয়াইল ঘরে
খাইছি আহল ভাত।[২০১]

বিয়ান বেলা গোয়াইল ঘরে
ভিজা কাপড়ে বইয়া
কলার পাতায় নিছি ফাপড়[২০২]
মুইটা গুড় দিয়া।
ভাত নিছি চিড়া নিছি
নিছি রে ভাই খই
আর নিছি নতুন পাইল্লার
হাতে পাতা দই।
খেজুর গাছের রস খাইছি
খাইছি ঝোলা গুড়
আরও খাইছি ফেনা খাজা
খাইছি আলুর ক্ষির[২০৩]।
দাঁত খিলানি গলায় থাকছে
ঠেংগে থাকছে গুল[২০৪]
ডেনায়[২০৫] থাকছে রূপার তাবিজ
মাথায় বাবরি চুল।
কাঠের ডাটির ছাতা নিছি
খড়ম পড়ছি পায়
চোখে দিছি কালো ছুরমা
আতর দিছি গায়।
কত রং বেরংগের
রুমাল নিছি হাতে
পায়ে দিছি গাছের কষ
মেশি[২০৬] দিছি দাঁতে।
ছিল না যে পাকা রাস্তা
ছিল না তো গাড়ি
ইষ্টি[২০৭] বাড়ি হাইটা[২০৮] গেছি
হাটছি তাড়াতাড়ি।
বিয়া শাদি হইছে গো ভাই
অনেক দূরে দূরে
বউ গেছে ডুলিত[২০৯] চরে
বর ডুলি ধরে।

(রমনিদের গালি)
কত কিছু ছিল রে ভাই
ভাববার কিছু নাই
পুরান দিনের কিছু কথা
আমি কইয়া যাই।
মেয়ে লোকে গালি দিছে

www.pathagar.com

গালির ছিল মান
পেশাকার[২১০] আর নটি[২১১] গালি
কইছে রে ছিলান।[২১২]
পুরুষ লোক বলছে শালা
চুতমারানি[২১৩] শালি
চুদির ভাই[২১৪] আর জাইরা শালা[২১৫]
এই ছিল যে গালি।

(দাম্পত্য কলহের কথা)

ভুল পাইলে পুরুষ লোকে
বউ করছে শাসন
মাইনা[২১৬] নিছে কয় নাই কথা
বকছে মনের মতোন।
বকা শুইনা মাইয়া লোকে
কানছে ঘোংগর[২১৭] দিয়া
বাবা মোরে মরবার নিগা
কেন বা দিছাল বিয়া।
উত্তর দিলে উপায় নাই গো
রাইগা[২১৮] আইছে জোরে
তেড়িভেরি[২১৯] যদি করস
ছাইড়া দিমু[২২০] তরে।
মনে মনে গুণ গুনাইয়া
কান্‌ছে ধীরে ধীরে
আইজকা ডেহর[২২১] কেন বা খেপচে
হুনমু[২২২] আমি পরে।
রাইতে[২২৩] থাকমু ঘুইরা হুইয়া
মুখ দেখুম না অর[২২৪]
দেখমু বান্দর কিবা করস[২২৫]
আর করমু না ডর।
কেন বা আল্লাহ নারীকূলে
জন্ম দিছাল মোরে
জীবন ভরা পুরুষ লোকে
চইড়া বেড়ায় ঘাড়ে।
কত কথাই কমু আমি
আইলে বাবার তরে
কান কথাতেই মাঝে মধ্যে
কত মারাই মারে।
থাকমু না আর স্বামীর ঘরে
আমায় নিয়া যাও
ধইরা মারে মাঝে মধ্যে

www.pathagar.com

কথায় মারে ঘাও।[২২৬]
শাশুড়ি যে কেটর কেটর[২২৭]
করে দিন রাইত
মাইর খিলামু[২২৮] আইজকা তোরে
পোলা আহুক[২২৯] বাইত।
কাপড় মাজায় বাইন্ধা
শাশুড়ি আহে ধাইয়া[২৩০]
আইজকা দেখমু তোরে মাগী[২৩১]
তুই কোনো ছিলানের মাইয়া।
যেই না জামাই তোমার আসে
চরা থেকে বাড়ি
সাথে সাথে বিয়াইন তোমার
কান করে তার ভারী।
কান কথা শুনিয়া ডেহর
দেরি নাহি করে
বাঘের মতোন গইজ্যা[২৩২] আইয়া
চুলের মুঠায় ধরে।
তারপরে যে বাইরায়[২৩৩] মোরে
আইলা নড়ি দিয়া
কুলাবার না পাইরা আমি
মাটিত পড়ি শুইয়া।
কতই কান্দাই কান্দি আমি
জীবনে না আর সয়
এরপরেও যে ননদ শাশুড়ি
আরও কিছু কয়।
শ্বশুর সাব যে শোনেন কানে
বইসা থাইকা ঘরে
একটি বারও দেয় না ধমক
শাশুড়িরও ডরে।
ভাব দেখিয়া বাচ্চা মেয়ে
ডরে কান্দে কোলে
কিছুই খায় না অসুধ[২৩৪] পাই না
তাবিজ বান্ধি গলে।
আর কতকাল থাকমু আমি
মেয়ের দিকে চাইয়া
এতকাল যে সহ্য করেছি
ছিলাম জাতের মাইয়া[২৩৫]।
বিয়ার দিন সাজ দিছিলাম
শাড়ি গয়না তেলে

www.pathagar.com

এখন আমি দুঃখে ভাসি
দুই নয়নের জলে।
শাড়ি চাই না গয়না চাই না
চাই না স্বামীর ভাত
মাইরের চোটে[২৩৬] মিটা গেছে
আমার বিয়ার সাধ।
দক্ষিণা বাতাসে হুইছি[২৩৭]
ঘুম অইছে রাইত ভর[২৩৮]
ঘরের দরজা খুইলা হুইছি
ছিল নাকো ডর।
হাটে গেছি কলকি টানছি
থাকছি লাইন ধরে
দুই টাকার বাজার করলে
ঢাকি[২৩৯] গেছে ভরে।

(ঘর দুয়ার)

জাবা বাঁশের বেড়ায় রে ভাই
থাকছি ছোনের ঘরে
দরজাতে খিরকি দুয়ার
আরো মনে পরে।
বৌড়া বাঁশ আর জিগা গাছে
ঘরে দিছি খাম[২৪০]
ডোল বোঝাই ধান থাকছে
কোলা[২৪১] বুঝাই আম।
খেড়[২৪২] বিছাইয়া শুইছিরে ভাই
নাড়ায়[২৪৩] থুইছি গরু।
ছাগল থাকছে ওসারাতে
মাইটা[২৪৪] পাইল্লায় নাড়ু।
ঝড়ের দিনে চালের উপর
দিছিরে ভূইনাছ[২৪৫]
বৌড়া বাঁশের আঠন[২৪৬] দিছি
ক্ষেতে পেকনা চাষ।
ভেড়া থাকছে কুরকা[২৪৭] থাকছে
থাকছেরে কইতর[২৪৮]
চালে থাকছে লাউ কুমড়া
দক্ষিণ মুখা ঘর।
পাট কূয়ার[২৪৯] পানি খাইছি
খাইছি বিচা কলা[২৫০]
দাদি খাইছে কড়কড়া ভাত[২৫১]
আমায় দিছে নলা।[২৫২]

www.pathagar.com

(বৈদ্য কবিরাজ)

বর্ষাকালে গাঙ্গে বিলে
আইছে বৈদ্যের নাও
দেখলে পরে মনে অইছে
এইটাই বুঝি গাও।
শত শত নাও আইছে
বৈদ্যেরও বহর
হাজার মানুষে ভইরা গেছে
তামাম বালুচর।
কেউ নিছে তাবিজ কবজ
কেউ লাগাইছে শিং[২৫৩]
কেউ বা নিছে সাপের শিবা[২৫৪]
কেউ তাড়াইছে জিন।
কেউ বা শিখছে সাপের মন্ত্র
কেউ বা শিখছে গান
বীণ বাঁশিরও সুরে মোদের
ভইরা গেছে প্রাণ।
বেহুলা লক্ষিন্দরের গানে
যেই না দিছে টান
কাল নাগিনী ফণা ধরছে
ভয়ে কাঁপছে প্রাণ।
মাঞ্জাতে কাপড় বাইন্ধা
বাইদ্যা নাচছে দুলে
নারী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ
দেখছে পরাণ খুলে।
দাঁত খসাই বিষ নামাই
নামাই মাঞ্জার রস[২৫৫]
দেই মোরা বিছনার মুতার
তাবিজ ও কবজ।
কষা কোমাই[২৫৬] বেদনা কোমাই[২৫৭]
কোমাই রে ভয় ডর
মাথা ধরা কোমাইরে ভাই
কোমাই কালাজ্বর।
আর ছাড়াই মইল্লারে[২৫৮] ভাই
ছাড়াই দাঁতের পোক[২৫৯]
বিয়ার তাবিজ দেই রে ভাই
কোমাই বুকের শোক।
ঘো কোমাই অস্থির কোমাই

www.pathagar.com

কোমাই পায়ের গোদ[২৬০]
নারীরও নষ্টামী[২৬১] কোমাই
মর্দার বাড়াই হোধ।
বারো মাইসা আমাশা[২৬২] কোমাই
সবল করি দেহ
স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া কোমাই
বাড়াই তাদের মোহ।
অর্শ্ব রোগ ভালো করি
কোমাই অলি পোক[২৬৩]
আরো কত ভালো করি
মাইস্তা ভরা মুখ।[২৬৪]
ধ্বজভঙ্গ ভাল করি
দেহে আনি বল
স্ত্রীর পেটে সন্তান ধরাই
গাছে আনি ফল।
চাইন্দা ছোলা[২৬৫] ভালো করি
কোমাই মাথার টাক
কবজ দিয়া উচা করি
বোচা মাইয়ার নাক।
রাতকানা ভালো করি
ভালো করি গুজ[২৬৬]
খাটা নারী দীঘলা করি
আরো বাড়াই হুশ[২৬৭]।
শিং লাগাইয়া মরা রক্ত
টাইনা নিছে মুখে
বকশিস যদি না দেস তুই
মরবি ধুকে ধুকে।
চোরের বেটা হারামজাদা
ভালো যদি চাস
তাড়াতাড়ি স্বীকার কর তুই
নইলে সর্বনাশ।
দক্ষিণে যাবি না তুই
মহাবিপদ তোর
জলেতে গড়ানে ভরা
বঙ্গোপসাগর।
পূবেতে যে মহাবিপদ
যাবি রে তুই মারা
সাপেতে সাপেতে ভরা

www.pathagar.com

কাল নাগিনী খাড়া।
উত্তরেতে তুষার পাহাড়
হারাবি তোর পথ
বরফে বরফে ভরা
হিমালয় পর্বত।
পশ্চিমেতে আরব রাজ্য
মরু সাহারা
অচিরেই তোর মহাবিপদ
হবি সর্বহারা।
হিমাংসু আর কালা নিধি[২৬৮]
আরও দিবজ রাজ
মগার[২৬৯] পোলা তাবিজ নি তুই
যদি বাঁচবার চাস।
ভয়ের চোটে তাবিজ নিয়া
দিছিরে ভাই চাইল
সোয়া পাঁচ আনা পয়সা দিয়া
আরো দিছি ডাইল।
জলি ধানের[২৭০] বাইন[২৭১] দিছি
কুরকা দিছি বাতে[২৭২]
আগুনেরই হাঞ্জাল[২৭৩] দিছি
মলন দিছি জোতে।[২৭৪]
খাড়[২৭৫] দিয়া কাপড় ধুইছি
নোটায়[২৭৬] আনছি জল
থাল বাসন তৈয়ার করছি
কাঁসা আর পিতল।

(বহু বিবাহ বিষয়ক)

এবার নানা নানির বহু বিবাহের
কিস্‌সা কমু[২৭৭] ভাই
ধৈর্য্য ধইরা বইসা থাইকা
শোনেন যে সবাই।
আগকারও দিনের কথা
কত কমু ভাই
যত কমু ততই আমার
মনে পইড়া যায়।
ডুপি[২৭৮] ভইরা পান্তা ভাত
নিয়া গেছি খেতে
রোদের মধ্যে হানকি[২৭৯] ভইরা
নানা বইছে খেতে।
আইলের উপর বইয়া নানা

www.pathagar.com

যেইনা মুখে দিছে ভাত
ক্ষিধার পেটে তিতা মুখে
নানার উঠছে রাগ।
নুন বেশি পান্তা ভাতে
তোর নানিরে কইস
টাল[২৮০] দিছিলাম বুইড়া কইরা
কোম পড়ছে কি মইচ[২৮১]।
রাইতে খাইছি ডাইলের চাপড়া[২৮২]
বিয়ান[২৮৩] বেলায় আলু
দুপুর বেলায় পান্তা ভাত
তার পরেও নাই শালুন[২৮৪]
বড্ডি[২৮৫] গেছে বাপের বাড়ি
মাইঝালাডিও[২৮৬] রোগা
এই কইরা কী সংসার চলে
তোর নানিরে কগা[২৮৭]।
কষ্ট আছাল[২৮৮] মোর কপালে
কপালের লিখন
এমন নারী আসবো ঘরে
ভাবছি কী কখন।
ঘুম অয় নাই সারা রাইত
ভাইবা দেখতো তোতা
তিনজন থাকপো[২৮৯] তিনভাবে
এই আছাল কি কথা?
মনে রাখছি পহেলা বউয়ের
অসুখ আছে পেটে
দেখতে শুনতে খুবই ভালা
আকারে সে বেটে।
মনে করছি উচবিচ[২৯০] করে
তেল অইছে তার পেটে
আমার কথা না ভাবিয়া
শয়[২৯১] সে অন্য ঘাটে।
দ্বিতীয় বার করলাম বিয়া
লম্বা দেইখা নারী
এসে দেখি আরেক বিপদ
শুধু কিনে শাড়ি।
বাচ্চা কাচ্চার খবর নাইতো
সাইজা গুইজা[২৯২] ঘুরে
পাড়া পড়শি সবাই আইসা

www.pathagar.com

ভাবি ডাকে তারে।
মনের রাগে একদিন তারে
কইষা[২৯৩] দিলাম বারি
তার পরে যে শুরু করল
থামাবার কি আর পারি।
ওরে ডেহর[২৯৪] নিরমুইশা[২৯৫] তুই
কবে ছাড়বি মোরে
আর করমু না তোর সংসার
বুঝবি হাড়ে হাড়ে।
আইজকাই[২৯৬] যামু বাপের বাড়ি
মাতব্বর ডাকমু গায়
তুই ভাবছস কি নিমুরাইদা
ছিকল দিমু পায়।
তৃতীয় বার করলাম বিয়া
আর তো চাই না শোভা
ঘরে যাইয়া দেখি আমি
বড্ডি[২৯৭] আমার বোবা।
চতুর্থবার করলাম বিয়া
কালা বোবা গুজা
বাসর রাইতে যাইয়া দেখি
বউটি আমার খোজা।[২৯৮]
কপালেতে থাপুর দিয়া
মনে করলাম পণ
বোঝা গেছে আমার ভাইগ্যে
নাই কোনো সন্তান।
পাইয়া মোরে সোজা মানুষ
একটু নাইকো ভয়
এই বারেতে বুঝামু যে
ভাতার[২৯৯] কারে কয়।
আমার খাইব আমার পরব
শোনবো না মোর কথা
চৌদ্দ পুরির[৩০০] খবর নিমু
ভাংমু দেমাগের মাথা।
এবার হাতের বাজু নাকের নথ
বেচমু[৩০১] তার হার
শিক্ষা দিমু তিন জনেরেই
ধারমু না আর ধার।[৩০২]
ভিন[৩০৩] খামু ভিন হমু
আর কমু না কথা

জার আইলে[৩০৪] ঠাউর[৩০৫] করব
টেলকা[৩০৬] কিবা খেতা।
সারাজীবন কষ্টে গেল
পাইলাম না তো সুখ
আত্মা ভইরা দেখবার চাইছি
পোলাপানের মুখ।
নিজের বাচ্চার খবর নাই তো
মন থাকে না ঘরে
পরের বাচ্চা দেখলে পরে
মন যে টেউ টেউ[৩০৭] করে।
পহেলা বউ আনার পরে
শান্তি আছাল ঘরে
ছয় মাসেরই মাথায় একদিন
ধরল তারে জ্বরে।
কত জল ঢাললাম মাথায়
ধরল আমার হাত
মধ্য রাইতে ভুরায়[৩০৮] চড়াইয়া
কবিরাজ আনলাম বাইত।
আইসা দেখি তোর নানি
গেছে অজ্ঞান হইয়া
চিক্কির[৩০৯] দিয়া বইয়া পরলাম
মাথায় হাত দিয়া।
তাড়াতাড়ি গরম তেল
মালিস করলাম গায়
বিরবিরাইয়া[৩১০] খালি কইল
মাপ কইরো আমায়।
ফু-দিল কবিরাজ সাব
মন্ত্র পড়ল জোরে
আরো করল ঘর বন্ধ
চতুর দিকে ঘুরে।
তার পরে যে ঘুমাইলো
আর টানল না শ্বাস
তখন আমি বুঝবার পাইলাম
আমার সর্বনাশ।
এরপরেও যে শান্তির আশায়
করলাম তিন খান বিয়া
শান্তি অইলো পান্তা ভাতে
নুন বেশি দিয়া।

তথ্যনির্দেশ

১. *লোকসাহিত্যে টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, মামুন তরফদার, ২০০৯, পৃ ১৭২-৭৩
২. আবদুর রাজ্জাক, *ময়মনসিংহের লোকসাহিত্য ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, জেলা বোর্ড, ময়মনসিংহ, ১৯৭৭, পৃ. ২৭০
৩. আব্দুল মজিদ, বয়স : ৩৬ বছর, গ্রাম : ফলদা হিন্দুপাড়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ, সংগ্রহ : ১০-০৬-২০১১।
৪. নুসরাত জাহান মিনা, বয়স : ৩৪ বছর, গ্রাম : ফলদা হিন্দুপাড়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, সংগ্রহ : ১৪-০৬-২০১১ ।
৫. মোঃ আবদুস সাত্তার শেখ, বয়স : ৫২ বছর, গ্রাম : ফসলান্দি, ডাকঘর : ভূঞাপুর, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ। সংগ্রহ : ১৫-০৬-২০১১ ।
৬. আবদুল মজিদ, পিতা : আবদুল হক, বয়স : ৩৬ বছর, গ্রাম : ফলদা হিন্দুপাড়া, ডাকঘরঃ ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ। তারিখ : ১০-০৬-২০১১
৭. ঐ
৮. মোছাম্মত সূর্য খাতুন, বয়স : ৭০ বছর, স্বামী- মোঃ সিদ্দিক মৌলভী, গ্রাম : বাণীপাড়া, ডাকঘর : হেমনগর, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ১৮-০৭-২০১১। অশিক্ষিত। পেশা : গৃহিণী।
৯. মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, বয়স : ৫২ বছর, পিতার নাম আব্দুল রহমান, গ্রাম : কামালপুর, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ১২.০৫.২০১২
১০. শাহজাহান আলী মিঞা, বয়স : ৫৮ বছর, গ্রাম : বামনহাটা, ডাকঘর : ভূঞাপুর, উপজেলা ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ ২৭-০৯-২০১১
১১. মোঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, টাঙ্গাইল, বয়স : ৬০ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, তারিখ : ৬.১২.২০১১
১২. মোঃ মোনছের আলী, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৬৫ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, তারিখ : ৬.১২.২০১১
১৩. মোঃ আঃ মজিদ, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৬১ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, তারিখ : ৭.১২.২০১১, সংগ্রাহক : মোহাম্মদ আবু তাহের, গ্রাম : অলিপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল।
১৪. মোঃ মধু মিয়া, গ্রাম : নরকোনা, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৬৫ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, তারিখ : ৭.১২.২০১১
১৫. ঐ
১৬. মো : আঃ মোতালেব, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৬০ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, তারিখ : ৬.১২.২০১১
১৭. হায়তন বেওয়া, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৭৫ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, তারিখ : ৬.১২.২০১১
১৮. লাইলী বেগম, গ্রাম : মালাউড়ি, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৫২ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, তারিখ : ৭.১১.২০১১
১৯. জালেমন বেওয়া, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৬৪ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, তারিখ : ১০.১২.২০১১

www.pathagar.com

২০. লাইলী বেগম, বয়স : ৫২ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : মালাউড়ি, পো : মধুপুর, থানা: মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৭.১১.২০১১
২১. জায়েদা বেগম, বয়স : ৬০ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৭.১২.২০১১
২২. ঐ
২৩. কদ বানু, বয়স : ৫৯ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৮.১২.২০১১
২৪. ঐ
২৫. বানু বেগম, বয়স : ৬১ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : দড়িহাতীল, পো : দড়িহাতীল, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৯.১১.২০১১
২৬. ঐ
২৭. ছবুরা খাতুন, বয়স : ৫৭ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৭.১২.২০১১
২৮. ঐ
২৯. তোতা মোগুল, বয়স : ৬২ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৭.১২.২০১১
৩০. সবুরা বেগম, বয়স : ৫৭ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৭.১২.২০১১
৩১. ঐ
৩২. হাজেরা বেগম, বয়স : ৫০ বছর, স্বামী-আব্দুল গনি মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল, সংগ্রাহক : স্বাধীন আজম। ৮.১১.২০১১
৩৩. সেলিনা বেগম বয়স : ৫৬ বছর, পিতা : সাকেদ আলী, গ্রাম : ছাফাকোট, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ১৫.১১.২০১১
৩৪. জরিনা বেগম বয়স : ৬০ বছর, স্বামী বাহাদুর মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ২৮.১১.২০১১
৩৫. জুয়েল সিকদার, বয়স : ১১, পিতা : জাহাঙ্গীর সিকদার, গ্রাম : মালাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ২৭.৮.২০১১
৩৬. মর্জিনা আক্তার, বয়স : ১৩ গ্রাম : চৈতারবাইদ উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। শিক্ষাগত যোগ্যত : সপ্তম শ্রেণি। ২৭.৮.২০১১
৩৭. সেলিনা বেগম বয়স : ৫৬ বছর, পিতা : সাকেদ আলী, গ্রাম : ছাফাকোট, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ১৫.১১.২০১১
৩৮. হাজেরা বেগম, বয়স : ৫০ বছর, স্বামী-আব্দুল গনি মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ৮.১১.২০১১
৩৯. ঐ
৪০. শুকুর জান বয়স : ৩৫, স্বামী : হযরত আলী, গ্রাম – চৈতারবাইদ, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২৪.১০.২০১১
৪১. আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, বয়স : ৩২ বছর, পিতা মওলানা হাসেন আলী মাস্টার, গ্রাম : বড় মেধার, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ১৪.০৫.২০১১
৪২. জরিনা বেগম, বয়স : ৬০, স্বামী বাহাদুর মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ৩.১১.২০১২
৪৩. সেলিনা বেগম, বয়স : ৫৬ বছর, পিতা : সাকেদ আলী, গ্রাম : ছাফাকোট, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ১৫.১১.২০১১

www.pathagar.com

৪৪. জরিনা বেগম, বয়স : ৬০, স্বামী বাহাদুর মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ৩.১১.২০১১
৪৫. সেলিনা বেগম বয়স : ৫৬ বছর, পিতা : সাকেদ আলী, গ্রাম : ছাফাকোট, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ১৫.১১.২০১১
৪৬. তন্বী, বয়স ১১ বছর, পিতা : তুষার সিকদার, গ্রাম : দক্ষিণ ধলাপাড়া, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ২৫.১০.২০১১
৪৭. সেলিনা বেগম বয়স : ৫৬ বছর, পিতা : সাকেদ আলী, গ্রাম : ছাফাকোট, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ১৫.১১.২০১১
৪৮. সেলিনা বেগম বয়স : ৫৬ বছর, পিতা : সাকেদ আলী, গ্রাম : ছাফাকোট, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ১৫.১১.২০১১
৪৯. ঐ
৫০. তাসলিমা বয়স : ১২ বছর, পিতা তারু মিয়া। গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। ১৫.১১.২০১১
৫১. ঐ

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : ১. আড়া- বন, জঙ্গল, ২. মুদে- মধ্যে, ৩. ক্যাড়া- কে, ৪.দারকিনা- ডানকিনে মাছ, ৫.পিন্দিনা- পরিধান করি না, ৬. আইলো-এলো, ৬. নইয়া-নিয়া, ৮. পলাই- পালিয়ে যাই, ৯. এন্দুর-ইঁদুর, ১০. বাইত- বাড়িতে, ১১. নেনজুর- লেজ, ১২. ঘুমাইয়া- নাড়িয়ে, ১৩.রাইন্দা-রান্না করে, ১৪. চাইরডা-চারটি, ১৫.ওল- অণ্ডকোষ, ১৬.বাঐ-বাবুই পাখি, ১৭.আকপার- চরাবার, ১৮. ডাইগ্যা- ডাল, ১৯.আত্তি- হাতি, ২০.মইচ- মরিচ, ২১. আইলে- এলে, ২২. গোন্দে-গন্ধে, ২৩. টিনের-ট্রেনের, ২৪. খইলসা-খলসে মাছ, ২৫. কড়ই-কুঁড়ি, ২৬. মাইরা সাইরা- মার শেষ করে, ২৭. খেতা- কাঁথা, ২৮. যাইতা- জাপটে, ২৯. ম্যায়া- মেয়ে, ৩০.গুইনজা- গুঁজে, ৩১. অইছে- হয়েছে, ৩২. মেলা-রওনা, ৩৩.থুইয়া- রেখে, ৩৪.নইয়া- নিয়ে, ৩৫. আইচা- নারকেলে খোসার তৈরি পাত্র, ৩৬. আমগো- আমাদের, ৩৭. আনমু- আনবো, ৩৮. আমগো- আমাদের, ৩৯. হার- ষাঁড়, ৪০. ওল- হোল বা অণ্ডকোষ, ৪১. গুয়া- সুপারি, ৪২. তুরি- পর্যন্ত, ৪৩. আমগো- আমাদের, ৪৪. ববি-বসবি,৪৫. হুকনা- শুকনা, ৪৬. থাহে- থাকে, ৪৭. খসম- স্বামী, ৪৮. খুইজা- খোঁজে, ৪৯. আগায়- অগ্রভাগে, ৫০. খাইজানি- চুলকানি ৫১. খাইজায়- চুলকায় ৫২. ব্যাকখানী- সমস্ত শরীর চুলকানো বুঝানো হয়েছে, ৫৩. খেতা- কাঁথা, ৫৪. ব্যালতলা- বেল গাছের নিচ, ৫৫. বুইন- বোন, ৫৬. চেত্তরখানা- নিশ্চিত ভাবে, ৫৭ আমু- আসবো, ৫৮. খই- মুড়ি, ৫৯. পাইতা- বিছিয়ে, ৬০. বুলবুলা- সুন্দরী, ফর্সা, ৬১. চাইল- চাল, চাউল, ৬২. ছয়গাছ- ছয়টি, ৬৩. মাইনষে- মানুষে, ৬৪. কবো- বলবে, ৬৫. আইছে- এসেছে, ৬৬. নিগা- জন্য, ৬৭. ঘেগা- গল গন্ড রোগী ৬৮. বৌরা বাঁশ- লম্বা জাতীয় বাঁশ, ৬৯.চিত্তর- চিত, ৭০.ছুরানি- চাবি, ৭১.ফিঙ্গা- ফিঙ্গে পাখি, ৭২.বুজুরী বুজুরী- কুচি কুচি করে কাটা, ৭৩.ছালুন চাইকা- তরকারীর স্বাদ পরীক্ষা করা, ৭৪.কুচিয়া কুচিয়া পিনবো- কুচি দিয়ে পরিধান করা, ৭৫. ছিরকল- শেকল, ৭৬. বুইড়ার আতে পড়ছিলাম- বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, ৭৭. ক্যাচক্যাচি-ঝগড়া-ঝাটি, ৭৮.পুষ মাস- পৌষ মাস, ৭৯. কাহই-চিরুনী, ৮০.ছেরিগুলি- মেয়েগুলো, ৮১. আইল্যাপাজুন- হালের গরু তাড়ানো জন্য লাঠি, ৮২. কাঁঠল-কাঁঠার ফল, ৮৩. কেত্তাডি- কাঁঠালের উচ্ছিষ্ট অংশ, ৮৪. ঘুঘুর ছাও-ঘুঘু পাখির বাচ্চা, ৮৫. আটে- হাটে ৮৬. বিয়াইছে-প্রসব করেছে, ৮৭. ইটা- ডেলা, ৮৮. হাত থিকা-হাত থেকে, ৮৯. কাউয়ায়- কাকে, ৯০. ছোট কাইল্যা- ছোট কালের, ৯১. বাইন্দা ফালামু- বেঁধে ফেলবো, ৯২. পৃত্তিম- পৃথিবী, ৯৩. আটাইল্যা মাটি- এঁটেল মাটি,

www.pathagar.com

৯৪. ভিয়াইলে– প্রসব করলে, ৯৫. তেইসেনা– তবে তো, ৯৬. উস্তা– করলা ৯৭. কাচা মেয়্যা– অল্প বয়সী মেয়ে, ৯৮. আওটা– চালের গুড়া মণ্ডতৈরির উদ্দেশ্যে পানি দিয়ে জ্বাল দেওয়া, ৯৯. হুরবার– ঝাড়ু দেওয়া ১০০. ছম্মর ছম্মর– গো গোা শব্দে বিরক্তভাব প্রকাশ ১০১. টাঙ্গন ঘোড়া– উচু ঘোড়া, ১০২. পাক্কা বুড়ি–বয়ো বৃদ্ধ বুড়ি, ১০৩. মাগী-নারী, ১০৪. ডুলে– টুলে, ১০৫. কাঠারে- ঝুড়িরে, ১০৬. মাচিরে- মাচাইল (বসার স্থান), ১০৭. মান্দা- বিলের নিচু ডোবা, ১০৮. রসা- কষানো, ১০৯. আমাগর- আমাদের, ১১০. তামসা- মজা, ১১১. পয়টা- কাঠ ও চামড়া দিয়ে তৈরি এক প্রকার জুতা, ১১২. দাগাইছে- ছেঁকা, ১১৩. নই- গুড়ের তৈরি মিষ্টান্ন, ১১৪. কয়চান- ঝগড়া, ১১৫. পাইল্লা- পাতিল, ১১৬. মাইটা- মাটির তৈরি ১১৭. জাই- ঝাউ, ১১৮. কচা-কবজি, ১১৯. দাগে- জমিতে, ১২০. লাইঠাল- লাঠিয়াল, ১২১. ভাড়াভুড়া- একটি, লোকজ খেলা, ১২২. মাথাইল-কৃষকের মাথাল, ১২৩. নিছি- নিয়েছি, ১২৪. ছাটায়- মাঠে একত্রে কাজ করা, ১২৫. তফিলেতে- তহবিল, ১২৬. ফেঁকা- এক প্রকার মাছ, ১২৭. ধামা-পাত্র, ১২৮. মুইটা গুড়-আখের রস জ্বাল দিয়া ছোট ছোট তৈরি পাটা গুর, ১২৯. কদমা- গুড় ও চিনির তৈরি দ্রব্য, ১৩০. লেংটি- টুকরা কাপড়, ১৩১. খড়ম-কাঠের তৈরি জুতা, ১৩২. হাওদা- বাতাস দেয়ার যন্ত্র, ১৩৩. দিয়ার-বাঁশের তৈরি মাছ ধরার এক প্রকার যন্ত্র, ১৩৪. বাজছে- আটকা পড়েছে, ১৩৫. রেডুতে- রেডিওতে, ১৩৬. হাস্তর- কিসসা, ১৩৭. বাইড়াইছে- বাজাইছে, ১৩৮. তালের তারু- তালের বিচি, ১৩৯. লগি-বাঁশের তৈরি নৌকা চালানোর যন্ত্র, ১৪০. আওটা- মাটির তৈরি দুধের পাত্র, ১৪১. ওড়ন- নারকেলের খুলি দিয়ে তৈরি এক প্রকার চামচ, ১৪২. কুইঞ্চা-কঞ্চি, ১৪৩. ভাইজা-ভেজে, ১৪৪. বইছি- বসছি, ১৪৫. জারে- শীতে, ১৪৬. পানচি- এক প্রকার ফল, ১৪৭. উঙ্গার- কাউন এবং চিনার তৈরি খাদ্য, ১৪৮. রোজদাইরাতে- রোজাদারদের আহারে, শব্দার্থ ১৪৯. বুজি- বোন, ১৫০. পাচই- ভাত পঁচিয়ে তৈরি করা এক প্রকার মিষ্টান্ন খাদ্য, ১৫১. ছাইলায়- কুঁড়ে ঘরে, ১৫২. নোটে- ঢেঁকির পাড় পড়ার গর্তে, ১৫৩. ঝুক্কুর পাইরা- ঝুঁকে ঝুঁকে, ১৫৪. কাতলায়- ঢেঁকি শূন্যে রাখার যন্ত্রে, ১৫৫. নইচার- হুক্কা খাওয়ার যন্ত্র, ১৫৬. কাই- কালসিটে, ১৫৭. আয়ুশ- সাধ, ১৫৮. ঝাপ্পুর- পানিতে ঝাপ দেওয়া, ১৫৯. গাদম- এক প্রকার গ্রাম্য খেলা, ১৬০. ঘায়ে- ঘা, পচড়ায়, ১৬১. ঘাইরারে- ত্যারা, ১৬২. বড় বুইন- বড় বোন, ১৬৩. বানা- বাঁশের তৈরি এক প্রকার মাছ ধরার যন্ত্র, ১৬৪. গুদি- মাছ ধরার ছোট খাদ, ১৬৫. ছাইলার- কুঁড়ে ঘরের, ১৬৬. ডলনা- এক প্রকার মাছ ধরার জাল, ১৬৭. তাইশানী- শাসন, ১৬৮. ডেয়র- জোরে শব্দ, ১৬৯. ঢিবলা- বার্শিশ, ১৭০. বাইন-ফসল বোনার সময়, ১৭১. নাড়া- ধান গাছের খড়ের গোঁড়া, ১৭২. বাসনায়- গন্ধে, ১৭৩. ওড়াওড়ি- পারাপারি, গোলমাল, ১৭৪. বাইজা- বেজে, ১৭৫. নিটাল মাইরা- চুপ করে, ১৭৬. পোহাইয়া- শেষ হয়ে, ১৭৭. বাইত- বাড়িত, ১৭৮. কনে-কোথায়, ১৭৯. আইছে- আসছে, ১৮০. কওয়ার- বলার, ১৮১. ফুচকি- আড়ে ঠাড়ে দেখাকে ফুচকি বলা হয়, ১৮২. কুনু-কোথায়, ১৮৩. লড়ি- লাঠি, ১৮৪. মিটামু- পূরণ করব, ১৮৫. শুকুর- শুকর, ১৮৬. কাইয়া- কাক, ১৮৭. দেউরি বেড়া- অতিরিক্ত বেড়া, ১৮৮. আইয়া-এসে, ১৮৯. দেওয়ান- ভিক্ষুক, ১৯০. আইটা গেছি- হেঁটে গেছি, ১৯১. নেংটি-এক টুকরো কাপড়, ১৯২. পাইল্লার কালি- পাতিলের নিচে জমা কালি, ১৯৩. আগায়- অগ্রভাগে, ১৯৪. গুলাইলের পাতা-এক প্রকার মসল্লা গাছের পাতা, ১৯৫. কুইয়া মাছ- মরে আধাপচে যাওয়া নরম মাছ, ১৯৬. পাক- রান্না, ১৯৭. বাগ- এক প্রকার কচু, ১৯৮. আমসত্ত্ব- আমভর্তা, ১৯৯. আলুর ঝুড়ি- আলু কেটে ফালি করে রোদে শুকিয়ে তৈরি করা এক প্রকার খাদ্য, ২০০. খাট্টা- চুকা জাতীয় খাদ্য, ২০১. আহল ভাত- গাই বিয়ানোর পর সেই গায়ের দুধ দিয়ে রাখালরা গোয়াল ঘরে যে খাদ্য খায়, ২০২. ফাপড়- কলা পাতা দিয়ে তৈরি করা থাল, ২০৩. আলুর ক্ষির- আলু দ্বারা তৈরি এক

www.pathagar.com

প্রকার মিষ্টি জাতীয় খাদ্য, ২০৪. গুল- বাত বিষের জন্য গ্রামে তৈরি করা এক প্রকার ঔষধ, ২০৫. ডেনায়- বাহুতে, ২০৬. মেশি- মহিলাদের দাঁতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার পাউডার, ২০৭. ইষ্টি- আত্মীয়, ২০৮. হাইটা- হেঁটে, ২০৯. ডুলিত- ডুলিতে, ২১০. পেশাকার- বেশ্যা, ২১১. নটি-বেশ্যা, ২১২. ছিলান-এক প্রকার মেয়েলি গালি, ২১৩. চুতমারানি- এক প্রকার গালি, ২১৪. চুদির ভাই-এক প্রকার গালি, ২১৫. জাইরা শালা- এক প্রকার গালি, ২১৬. মাইনা- মেনে নেওয়া, ২১৭. ঘোংগর- কাপড় দিয়ে ঘোমটা, ২১৮. রাইগা- রাগান্বিত হয়ে, ২১৯. তেড়িভেড়ি- উল্টাপাল্টা, ২২০. ছাইড়া দিমু- তালাক দিব, ২২১. ডেহর-এক প্রকার গালি, ২২২. হুনমু- শুনব, ২২৩. রাইতে- রাতে, ২২৪. অর- ওর, ২২৫. করস- করিস, ২২৬. ঘাও- খোঁচা, ২২৭. কেটর কেটর- সব সময় কথা বলা, ২২৮. মাইর খিলামু- মার খাওয়াবো, ২২৯. পোলা আহুক- ছেলে আসুক, ২৩০. আহে ধাইয়া- ধেয়ে আসা, ২৩১. মাগী- এক প্রকার গালি, ২৩২. গইজ্যা- গর্জে, ২৩৩. বাইরায়- বারী মারে, ২৩৪. অসুধ-ঔষুধ, ২৩৫. মাইয়া- মেয়ে, ২৩৬. চোটে- ঠেলায়, ২৩৭. হুইছি- শুয়েছি, ২৩৮. রাইত ভর- সারা রাত, ২৩৯. ঢাকি- বাঁশ বেতের তৈরি পাত্র, ২৪০. খাম-খুঁটি, ২৪১. কোলা- মাটির পাত্র, .২৪২. খেড়-খড়, ২৪৩. নাড়ায়-ধান গাছের খড়ের নিম্নাংশে, ২৪৪. মাইটা- মাটির তৈরি, ২৪৫. ভূইনাছ- ঘরের টানা, ২৪৬. আঠন- বাঁশের চিকন বাতী, ২৪৭. কুরকা- মুরগি, ২৪৮. কইতর- কবুতর, ২৪৯. পাট কূয়ার- পোড়া মাটির তৈরি কূয়া, ২৫০. বিচা কলা- বিচিযুক্ত কলা, ২৫১ কড়কড়া ভাত- ঠাণ্ডা ভাত, ২৫২. নলা- লোকমা, ২৫৩. শিং- শিঙ্গা, ২৫৪. সাপের শিবা- সাপকে বশীকরণ শিকড়, ২৫৫. মাজ্জার রস- কোমরে রস জমা, ২৫৬. কষা- ধাতৃ দুর্বল্য, ২৫৭. বেদনা- ব্যথা, ২৫৮. মইল্লা- অকাল মৃত্যু, ২৫৯. দাঁতের পোক- দাঁতের পোকা, ২৬০. পায়ের গোদ- পা ফুলা, ২৬১. নারীরও নষ্টামী- নারীর যৌন উৎশৃঙ্খলতা, ২৬২. আমাশা- আমাশয়, ২৬৩. অলি পোক- জণ্ডিস, ২৬৪. মাইস্তা ভরা মুখ-এক প্রকার দাগে ভরা মুখ, ২৬৫. চাইন্দা ছোলা- টেকো, ২৬৬. গুজ-কুঁজো, ২৬৭. হুশ- জ্ঞান, ২৬৮. কালা নিধি- এক প্রকার দেবতা, ২৬৯. মগা- হালকা পাতলা দূর্বল চিত্তের লোক, ২৭০. জলি ধানের- এক প্রকার ধানের, ২৭১. বাইন-ফসল বোনার উপযুক্ত সময়, ২৭২. কুরকা দিছি বাতে- বাচ্চা ফোটানোর জন্য মুরগি বসানো, ২৭৩. হাঞ্জাল-খড়, কুঁটোয় আগুন দিয়ে ধোয়া তৈরি করা, ২৭৪. মলন দিছি জোতে- কয়েকটি গরু একত্র বেঁধে ধান মারাই করাকে মলন বলা হয়, আর কয়েকটি গরু একত্রে বাঁধার রশিকে জোত বলে, ২৭৫. খার- কলাগাছ চিরাইয়ে রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই বানানো হয়, আর এই ছাইকে বলা হতো খাড়, সেই ছাই দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করা হতো, ২৭৬. নোটায়- কাঁসার তৈরি পাত্রে, ২৭৭. কমু- বলমু, ২৭৮. ডুপি- মাটির তৈরী ছোট পাত্র, ২৭৯. হানকি- মাটির তৈরি থালা, ২৮০. টাল- বাগান, ২৮১. মইচ- মরিচ, ২৮২. ডাইলের চাপড়া- ডাউল দিয়ে তৈরি পিঠা, ২৮৩. বিয়ান- সকাল, ২৮৪. শালুন- তরকারী, ২৮৫. বড্ডি- বড়জন, ২৮৬. মাইঝালাডিও- মেঝোটাও, ২৮৭. কগা- বলিস, ২৮৮. আছাল- ছিলো, ২৮৯. থাকপো- থাকবো, ২৯০. উচবিচ- ছনতাই, ২৯১. শয়- শুয়ে থাকে, ২৯২. সাইজা গুইজা- সেজেগোজে, ২৯৩. কইষা- জোরে, ২৯৪. ডেহর- এক প্রকার আঞ্চলিক গালি, ২৯৫. নিরমুইশা- এক প্রকার আঞ্চলিক গালি, ২৯৬. আইজকাই- আজকেই, ২৯৭. বড্ডি- বড়জন, ২৯৮. খোজা- সন্তান জন্মাতে অক্ষম মেয়ে, ২৯৯. ভাতার- স্বামী, ৩০০. চৌদ্দ পুরির- চৌদ্দ পুরুষের, ৩০১. বেচমু- বেচবো, ৩০২. ধার- তোয়াক্কা, ৩০৩. ভিন- আলাদা, ৩০৪. জার আইলে- শীত আসলে, ৩০৫. ঠাউর < ঠাহর- অনুভব, ৩০৬. টেলকা- ঠান্ডা, ৩০৭. টেউ টেউ- আফসোস, ৩০৮. ভুরায়- কলা গাছের তৈরী ভেলায়, ৩০৯. চিক্কির- কান্না করা, ৩১০. বিড়বিড়াইয়া- ফিসফিস করে।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

১. কাঁসা ও পিতল শিল্প

টাঙ্গাইলকে প্রসিদ্ধ করেছে কাঁসা ও পিতল শিল্প। এক সময় টাঙ্গাইলের সমৃদ্ধশালী ব্যবসা ছিল এটি। শুধু টাঙ্গাইল নয় বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পের সুনাম ছিল। টাঙ্গাইলের কাঁসা ও পিতলের তৈরি তৈজসপত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল সারাদেশে। দেশের চাহিদা মিটিয়েও কাঁসা ও পিতলের তৈজসপত্র বিদেশেও রফতানি হতো। বিশেষ করে এগুলো ছিল ভারত খ্যাত। আর সুদৃশ্য কারুকার্য ও অনুপম গুণগত মানের জন্যই টাঙ্গাইলের কাঁসা ও পিতলের তৈরি তৈজসপত্র এতটা প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

কাগমারী, বাঘিল, মগড়া ও সাকরাইল গ্রাম ছিল কাঁসা ও পিতল শিল্পের জন্য বেশি প্রসিদ্ধ। কাঁসা ও পিতলের অপূর্ব শিল্পকর্মের জন্য ব্রিটিশ সরকার কাঁসা শিল্পীদের মধ্যে নামকরা অনেককেই প্রশংসা ও পদকে ভূষিত করেছেন। এদের মধ্যে প্রয়াত মধুসূদন কর্মকার, গণেশ কর্মকার, বসন্ত কর্মকার, যোগেশ কর্মকার, হারান কর্মকার উল্লেখযোগ্য। টাঙ্গাইলের কর্মকারগণ অত্যন্ত সুনিপূণ কৌশলে নিরলস শ্রম দিয়ে আজও তৈরি করছে তামা, কাঁসা ও পিতলের থালা, বাটি, কলসি, গ্লাস, জগ, ঝারি, বদনা, ঘটি, লোটা, পঞ্চ প্রদীপ দান, মোমবাতি দান, আগরবাতি দান, কুপি, চামচ, কাজলদানি, ডেকচি, ডেগ, বোল, খুন্দি, সড়তা, বাটি, পুতুল, ঝুনঝুনি, করতাল, মেডেলসহ প্রভৃতি জিনিসপত্র। একসময় কাঁসা ও পিতলের তৈরি জিনিসপত্র বিয়ে, সুন্নতে খাতনাসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়া হতো। আজ বিয়ে-শাদি, অন্নপ্রাশন ও সুন্নতে খাতনা কিংবা সে ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে কেউ পিতলের কলসি, কাঁসার জগ, গ্লাস ও চামচ উপহার দেয় না। এখন উপহার হিসেবে দেওয়া হয় মেলামাইনের সামগ্রী।

এককালে টাঙ্গাইল অঞ্চলে জমিদার ও ভূ-স্বামীগণের বড় তৈজসপত্র ছিল এগুলো। এদেরই সহায়তায় এসব কারিগর- সমাজ নিত্য নতুন জিনিস তৈরি করেছে প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য। জমিদারগণও ছিলেন বৈচিত্র্য প্রয়াসী। তারাও চাইতেন নানা কারুকার্য্যখচিত কাঁসার বাসনপত্র। উপযুক্ত সহায়তা এবং সমাদরের অভাবে এই শিল্প অন্ধকারে ধুকছে।

টাঙ্গাইলের কাগমারী গ্রামের মহাদেব কর্মকার ও দুর্গাচরণ কর্মকার জানান, অনুন্নত কাঁচামালের উচ্চমূল্যের কারণে ধাতব পণ্য তৈরি দারুণভাবে ব্যহত হচ্ছে। মেলামাইনের সামগ্রী ব্যবহার জনজীবনে বেড়ে যাওয়ায় তামা, কাঁসা, পিতলের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। ফলে এই শিল্প এখন হুমকির মুখে রয়েছে। কাগমারীর দুলাল কর্মকার

www.pathagar.com

জানান, আমরা এ পেশায় জড়িত থাকলেও আমাদের সন্তানদের এতে কোনো আগ্রহ নেই।

কাঁসা শিল্প

হাজার বছরের পুরনো এ শিল্পের প্রমান আছে ইতিহাসে। গ্রাম সমবায়ে কাংস্যকার, কাংস্যবণিক ইত্যাদি বৃত্তিধারী শ্রেণি ছিল। পাঠান, মোগল ও ব্রিটিশ শাসনামলে কাংস্যকার যখন যে রূপ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, সেরূপ বিকাশ লাভ করতে পেরেছিল। কাগমারীতে যারা তামা, পিতল, কাঁসা শিল্পের সাথে জড়িত তাদের বংশগত উপাধি কর্মকার। কাংস্যকাররা কাংস্যবণিক বলে কাউকে কাঁসা শিল্পের সাথে জড়িত দেখা যায় না। তবে কাগমারী কাংস্য শিল্পের সুনাম ছিল এবং এখনো আছে। টাঙ্গাইলের বরাইল ও কাগমারীতে পিতলের কাজের প্রাধান্য রয়েছে। টাঙ্গাইলের কাগমারী ও মগরা দুটি গ্রামে উপরোল্লিখিত জিনিস ছাড়া আরো তৈরি হয় কাঁসার ঘন্টা, জয়ঢাক, তামার কুশাকুশি, টাট পুষ্পাধার ইত্যাদি। টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী এই লোকশিল্পটি আজ বিলুপ্তির পথে। কাঁসার তৈরি জিনিসপত্রের দাম বর্তমানে এত বেশি যে, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ফলে টাঙ্গাইলের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এ লোকশিল্পটি কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২. তাঁত শিল্প

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় টাঙ্গাইল জেলা সুপ্রাচীন এতিহ্যের উত্তরাধিকার। এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে এদেশের সংস্কৃতি। আর তাঁত শিল্প আমাদের অন্যতম এতিহ্যের ধারক ও বাহক। দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্পও এটি। টাঙ্গাইল জেলার তাঁত শিল্প সেই সর্ববৃহৎ শিল্পের অন্যতম অংশীদার।

প্রাচীনকাল থেকে টাঙ্গাইলের দক্ষ কারিগররা তাদের বংশ পরম্পরায় তৈরি করছে নানা জাতের কাপড়। আর কাপড় তৈরিতে লাগে সুতি সুতা। যা তৈরি হয় তুলা থেকে। টাঙ্গাইল জেলার প্রাচীন অঞ্চল মির্জাপুর উপজেলা বিখ্যাত গবেষক জেমস টেলর মির্জাপুরের তুলার কথা লিখেছেন। এখানে বাপ্তা হাম্মাম ও অন্যান্য পাঁচমিশালি বস্ত্রের

www.pathagar.com

সুতা কাটা হতো তুলা থেকে। তাছাড়া বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ কাহিনিতে টাঙ্গাইলের বস্ত্রশিল্প অর্থাৎ তাঁত শিল্পের উল্লেখ রয়েছে। সেদিক থেকেও বলা যায় টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন, এটি আমাদের হাজার বছরের এতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। বর্তমানে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির জন্যই টাঙ্গাইলের সুনাম বা পরিচিতি দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী।

তাঁত শিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে টাঙ্গাইলের সফট সিলক ও কটন শাড়ি। এই শাড়ি বুনন ও ডিজাইন দৃষ্টি কাড়ে। টাঙ্গাইলের শাড়ির বৈশিষ্ট্য হলো- পাড় বা কিনারের কারুকাজ। রেশমি সুতি মিশ্রনের সুতা দিয়ে শাড়ি ও লুঙ্গি প্রস্তুত হয়ে থাকে। এছাড়াও টাঙ্গাইলের তাঁতিরা শাড়ির, লুঙ্গি, গামছা ও চাদর তৈরি করে থাকে।

টাঙ্গাইলের তাঁতিরা একদা মসলিন শাড়ি বুনতেন বলে শোনা যায়। এক সময় দিল্লির মোগল দরবার থেকে ব্রিটেনের রাজপ্রসাদ পর্যন্ত এই মসলিনের অবাধ গতি ছিল। বিদেশি বণিক চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মসলিন কাপড় কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তার সার্থক উত্তরাধিকারী হয়ে টিকে রয়েছে টাঙ্গাইলের জামদানি, বেনারসি ও তাঁতের শাড়ি।

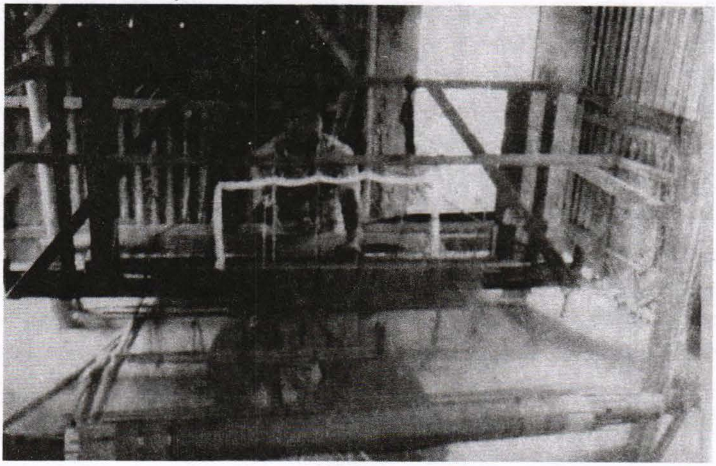

তাঁত শিল্প : জয়দেব, চামারি, ফতেপুর, টাঙ্গাইল

মুসলমান তাঁতিদেরকে বলা হতো জোলা। এই জোলা তাঁতিদের সংখ্যাধিক্য ছিল টাঙ্গাইল, কালিহাতী ও গোপালপুর এলাকায়। আবার যুগি বা যুঙ্গিদের নাথপন্থি এবং কৌলিক উপাধি হিসেবে দেবনাথ বলা হয়। ক্ষৌম বস্ত্র বা মোটা কাপড় বোনার কাজে এদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। সুতা কাটার চরকা এদের প্রত্যেক পরিবারেই ছিল এবং পুত্র কন্যাসহ পরিবারের নারী-পুরুষ সবাই সুতা কাটা ও কাপড় বুনতে সারাদিন ব্যস্ত থাকত। টাঙ্গাইল কালিহাতী ও গোপালপুর এলাকায় যুগি সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। যুগিরা ক্ষৌম, গামছা, মশারি তৈরি করে প্রায় স্বাধীনভাবেই ব্যবসা চালাত। আরো জানা যায় টাঙ্গাইলের হিন্দু তাঁতিদের মৌলিক উপাধি বসাক। বাজিতপুর ও নলসুন্দা

www.pathagar.com

গ্রামেই এদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু বল্লা ও রতনগঞ্জে মুসলিম কারিগর (জোলা) সংখ্যায় হাজার খানেক এবং অনেকেই বেশ সম্পদশালী।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিরাই হচ্ছে টাঙ্গাইলের আদি তাঁতি অর্থাৎ আদিকার থেকেই এরা তন্তুবায়ী গোত্রের লোক। এদেরকে এক শ্রেণির যাযাবর বলা চলে। শুরুতে এরা সিন্ধু অববাহিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে এসে তাঁতের কাজ শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া শাড়ির মান ভালো হচ্ছে না দেখে তারা নতুন জায়গার সন্ধানে বের হয়ে পড়েন, চলে আসেন বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে। সেখানেও আবহাওয়া অনেকাংশে প্রতিকুল দেখে বসাকরা দুই দলে ভাগ হয়ে একদল চলে আসে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, অন্যদল ঢাকার ধামরাইয়ে। তবে এদের কিছু অংশ সিল্কের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজশাহীতেই থেকে যায়। ধামরাইয়ে কাজ শুরু করতে না করতেই বসাকরা নিজেদেও মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভাগ হয়ে অনেক বসাক চলে যান প্রতিবেশি দেশের চোহাট্টা অঞ্চলে। এরপর থেকে বসাক টাঙ্গাইলে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানকার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুকূল হওয়াতে পুরোদমে তাঁত বোনার কাজে লেগে পড়েন। টাঙ্গাইলে বংশানুক্রমে যুগের পর যুগ তারা তাঁত বুনে আসছেন। এককালে টাঙ্গাইলে বেশিরভাগ এলাকা জুড়ে বসাকশ্রেণির বসবাস ছিল, তারা বসাক সমিতির মাধ্যমে অনভিজ্ঞ তাঁতিদেরকে প্রশিক্ষণ দান ও কাপড়ের মান নিয়ন্ত্রণ করতেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ভাগ ও ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অনেক বসাক তাঁতি ভারত চলে যান। এ সময় বসাক ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁত শিল্পের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। তারা বসাক তাঁতিদের মতোই দক্ষ হয়ে ওঠেন।

টাঙ্গাইল জেলার ১১ টি উপজেলা আর ১ টি থানার মধ্যে টাঙ্গাইল সদর, কালিহাতী, নাগরপুর, সখীপুর উপজেলা হচ্ছে তাঁতবহুল এলাকা। তাছাড়া ভূঞাপুর উপজেলায়ও তাঁত শিল্প রয়েছে। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার তাঁতবহুল গ্রামগুলো হচ্ছে– বাজিতপর, সুরুজ, বার্থা, বামনকুশিয়া, ঘারিন্দা, গোসাইজোয়াইর তারটিয়া, চন্ডি, নলুয়া, দেওজান, এনায়েতপুর, বেলতা, গড়াসিন, সন্তোষ, নলসুন্দা, কাগমারী প্রভৃতি।

কালিহাতী উপজেলার বর্‌লা, রামপুর, বাংরা, সহদেবপুর, ভূক্তা, আকুয়া, ছাতিহাটি, আইসরা, রতনগঞ্জ কোবডোরা প্রভৃতি।

দেলদুয়ার উপজেলা পাথরাইল, নলসোধা, চন্ডি, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি। এছাড়া গোপালপুর, ভূঞাপুর উপজেলার কিছু কিছু গ্রামে তাঁত শিল্প আছে। এ সকল গ্রামে দিন রাত শোনা যায় মাকুরের মনোমুগ্ধকর খটখট শব্দ। মাকুর খটখটির পাশাপাশি তাঁতিদের ব্যতিব্যস্ত হাতে নিপুণ শাড়ি বোনার দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। টাঙ্গাইলের তাঁতের সঙ্গে প্রায় পাঁচ লাখ লোকের জীবন জীবিকা জড়িত। আর টাঙ্গাইলে তাঁত রয়েছে লক্ষাধিক। এই লক্ষাধিক তাঁতের সবগুলোতেই আবার বিখ্যাত টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি হয় না। টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী শাড়ি তৈরি হয় প্রধানত বাজিতপুর, পাথরাইল, নলসুন্দা, চন্ডি, বিষ্ণপুর ও বিন্নাফৈর গ্রামে।

টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি তৈরি করতে হাতের কাজ করা হয় খুব দরদ দিয়ে, গভীর মনোসংযোগের সাথে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সুদৃশ্যভাবে। পুরুষেরা তাঁত বোনে আর

www.pathagar.com

চরকাকাটা, রং করা, জরির কাজে সহযোগিতা করে বাড়ির মহিলারা। তাঁতিরা মনের রং মিশিয়ে শাড়ির জমিনে শিল্প সম্মতভাবে নানা ডিজাইন করে বা নকশা আঁকে, ফুল তোলে।

টাঙ্গাইলের শাড়ির বৈশিষ্ট্য হলো– পাড় বা কিনারের কারুকাজ। টাঙ্গাইলের শাড়ি বোনার তাঁত দু-ধরনের। (১) চিত্তরঞ্জন (মিহি) তাঁত, (২) পিটলুম (খটখটি) তাঁত। এ দু-ধরনের তাঁতেই তৈরি করা হয় রং ও ডিজাইনের নানা নামের শাড়ি। যেমন– জামদানি বা সফ্‌ট সিল্কের দাম সবচেয়ে বেশি। জামদানি শাড়ি তৈরি করা হয় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্নভাবে। এ শাড়ি তৈরি করার জন্য তাঁতিরা ১০০ কাউন্টের জাপানি সুতা ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া অন্যান্য শাড়ি তৈরি করতেও ১০০ কাউন্টের সুতা ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে নারায়ণগঞ্জের সংযোগ শিল্পে প্রস্তুতকৃত ৮০,৮২ ও ৮৪ কাউন্টের সুতাও ব্যবহার করে থাকে।

দেশভাগের পূর্বে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির বাজার বসত কলকাতায়। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতিরা চারাবাড়ি ঘাট, পোড়াবাড়ি ঘাট, নলছিয়া ঘাট ও সুবর্ণখালী বন্দর থেকে স্টিমার লঞ্চ ও জাহাজে চড়ে কলকাতায় যেতেন। কলকাতা তথা পুরো পশ্চিমবঙ্গের শাড়ি ব্যবসায়ীরা কিনে নিত এসব সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের তাঁতের শাড়ি।

দেশভাগের পর হতে টাঙ্গাইল তাঁতের প্রধান হাট হচ্ছে টাঙ্গাইলের বাজিতপুর। বাজিতপুর হাট টাঙ্গাইল মূল শহর থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। সপ্তাহের প্রতি সোম ও শুক্রবার হাট বসে। ভোর হতে এখানে হাট শুরু হয়, সকাল ৯-১০টা পর্যন্ত চলে হাটের ব্যস্ততা এবং বেচাকেনা। এ হাটের বেশিরভাগ ক্রেতারাই মহাজনশ্রেণির। মহাজনরা এই হাট থেকে পাইকারি দরে কাপড় কিনে নিয়ে সারাদেশের বিভিন্ন বড় বড় মার্কেটে, শপিং মলে, ফ্যাশন হাউসগুলোতে সরবরাহ করেন। মহাজনদের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, আমলাদের স্ত্রী-কন্যারাও এ হাট থেকে তাদের পছন্দের শাড়ি কিনে নিয়ে যান। তবে ঢাকা ও বিভিন্ন বিভাগীয় শহরভিত্তিক ফ্যাশন হাউসগুলোই টাঙ্গাইল শাড়ির বড় ক্রেতা ও সরবরাহকারী।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, যেমন– ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, জাপান, সৌদিআরব, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসহ পশ্চিম বাংলায় টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির ব্যাপক কদর থাকলেও এ শাড়ি আন্তর্জাতিক বাজারে মার খাচ্ছে নানা কারণে- (১) দামের জন্য (কাঁচামালের সরবরাহের সহজলভ্যতা না থাকা, কাঁচামালসহ তাঁত মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে টাঙ্গাইল শাড়ি উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে যায়)। (২) ভারতীয় শাড়ির আগ্রাসন (সেখানে কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও সুতার স্বল্পমূল্যের জন্য টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ির চেয়ে ভারতের শাড়ি দামে সস্তা হয়ে থাকে বিধায় অনেক ক্রেতাই সে দিকে ঝুঁকে পড়েছে)। (৩) টাঙ্গাইল শাড়ি বিপণন ব্যবস্থাটি মহাজনি চক্রের হাতে বন্দি, ফলে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচেছ না। এছাড়া দেশভাগ, পাকিস্তান-ভারত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের পর টাঙ্গাইল ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়া বসাক তাঁতিরা সেখানে টাঙ্গাইল শাড়ির কারিকুলামে যে শাড়ি তৈরি করছে তা টাঙ্গাইল শাড়ির নাম ভাঙিয়ে বিশ্ববাজার দখলের

www.pathagar.com

চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে এত প্রতিকূলতার পরেও টাঙ্গাইলে তাঁতের শাড়ি তার হারানো বাজার পুনরুদ্ধারে সক্ষম হচ্ছে। কারণ টাঙ্গাইল শাড়ি মানেই ভিন্ন সুতায়, আলাদা তাঁতে তৈরি আলাদা বৈশিষ্ট্যের শাড়ি। এর নকশা, বুনন ও রঙের ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্যতা। অন্যান্য শাড়ি ১০ হাত থেকে সর্বোচ্চ ১১ হাত মাপে তৈরি হয়ে থাকে, আর টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি তৈরি হয়ে ১২ হাত মাপে। এ শাড়ি নরম মোলায়েম এবং পরতে আরাম, টেকেই অনেক দিন। এছাড়া সময় ও চাহিদার সাথে তাল রেখে দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে টাঙ্গাইল শাড়ির আকর্ষণ ও নকশার ব্যঞ্জনা।

টাঙ্গাইলের বাজিতপুর, নলসুন্দা, সন্তোষ ও কাগমারী গ্রামে প্রস্তুত হয় ধুতি, শাড়ি ও লুঙ্গি। কালিহাতীর বল্লা রতনগঞ্জ ও কোবডোহরা গ্রামে লুঙ্গি, গামছা ও ধুতি। কোকডোহরা, ধুতি মিহি ও মোলায়েম। গায়ের চাদর, বিছানার চাদর, আলোয়ান তৈরি হয় রতনগঞ্জ। বৈন্নাফৈর গ্রামে উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়। টাঙ্গাইলের রেশমি সুতি ও মিশ্রনের সুতার শাড়ি, লুঙ্গি প্রস্তুত হয়ে থাকে। তবে গামছা ও মশারি তৈরিতে যুগি বা দেবনাথ সম্প্রদায় আজো একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে পেরেছে।

টাঙ্গাইল শাড়ির নতুনত্বের অন্যতম সফল তাঁতিদের মধ্যে বাজিতপুরের আনন্দমোহন বসাক, সীতানাথ বসাক, চন্ডি গ্রামের নীল কমল বসাক, মনে মন্টু ; নলসুন্দা গ্রামের হরেন্দ্র বসাক, পাথরাইল গ্রামের রঘুনাথ বসাক, আনন্দ, গোবিন্দ, সুকুমার বসাক, খুশি মোহন বসাক এর নাম উল্লেখযোগ্য। তারা জানান টাঙ্গাইলের শাড়ি বুননের মূল কাজ একেবারেই আলাদা। অনেক পুরোনো একটা ঐতিহ্যে ও ধারায় চলে এ কাজ। সেই জ্ঞান ও নিষ্ঠা ছাড়া আসল টাঙ্গাইলের শাড়ি তৈরি করা যায় না। আসল টাঙ্গাইলের শাড়ি তৈরির জন্য এর তাঁতি বা কারিগরদের শিল্পী হয়ে উঠতে হয়। আমাদের টাঙ্গাইলে সেই শিল্পী তাঁতি আছে। তাই টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্প ও তাঁতের শাড়ির এত সুখ্যাতি।

৩. মিষ্টি শিল্প

টাঙ্গাইল জেলায় অনেক মিষ্টি তৈরি হয়। যেমন– চমচম, দানাদার, রসগোল্লা, আমৃত্তি, জিলাপি, সন্দেশ, বিভিন্ন প্রকার দই, খির, নই, টানা, খাজা, কদমা বাতাসা ইত্যাদি। কিন্তু টাঙ্গাইলের মিষ্টি শিল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমেই পোড়াবাড়ির চমচমের কথা বলতে হয়। মিষ্টির রাজা বলে খ্যাত টাঙ্গাইল জেলার পোড়াবাড়ি নামক স্থানের এই চমচম স্ব-মহিমায় মহমান্বিত। স্বাদ আর স্বাতন্ত্র্যেরও এর জুড়ি মেলে না। যার নাম শুনলেই অতুলনীয় স্বাদ ও অপূর্ব গন্ধের কথা মনে করে জিহবায় পানি এসে যায়। এই সুস্বাদু ও লোভনীয় চমচম মিষ্টি ও টাঙ্গাইলের একটি অন্যতম ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমল থেকে অবিভক্ত ভারতবর্ষসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পোড়াবাড়ির চমচম টাঙ্গাইলকে ব্যাপক পরিচিত করেছে। বাংলা, বিহার ছাড়িয়ে ভারতবর্ষ তথা গোটা পৃথিবী জুড়ে এর সুনাম রয়েছে। মিষ্টির জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন আকারের চমচমের বৈশিষ্ট্য অতি চমৎকার। এর বাহির দেখতে পোড়া ইটের মতো। লালচে রংয়ের এই সুস্বাদু চমচমের উপরিভাগে চিনির গুড়ো থাকে এবং ভিতরের অংশ রসাল নরম। লালচে গোলাপি আভাযুক্ত ভেতরের নরম অংশের

www.pathagar.com

প্রতিটি কোষ থাকে কড়া মিষ্টিতে কণায় কণায় ভরা। এই সুস্বাদু চমচম তৈরির মূল উপাদান খাঁটি দুধ, চিনি, পানি, সামান্য ময়দা ও এলাচদানা হলেও টাঙ্গাইলের চমচমের স্বাদ মূলত টাঙ্গাইলের পানির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ টাঙ্গাইলের চমচম তৈরির মূল রহস্য এখানকার পানির মধ্যে নিহিত। দেশের অনেক জায়গা থেকেই টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির কারিগর নিয়ে অনেকেই টাঙ্গাইলের চমচম তৈরির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হতে পারেনি। এই ঐতিহাসিক চমচমের গুণেই মূলত টাঙ্গাইল এটি জেলা হিসেবে জন্মলাভের পূর্বেই বিশ্ববাজারে পরিচিতি লাভ করে।

গবেষকদের মতে দশরথ গৌড় নামে এক ব্যক্তি ব্রিটিশ আমলে টাঙ্গাইলের যমুনা নদীর তীরবর্তী পোড়াবাড়িতে আসেন। আসাম থেকে আগত এই দশরথ গৌড় যমুনার সুস্বাদু মৃদুপানি ও এখানকার খাঁটি গরুর দুধ দিয়ে প্রথম চমচম তৈরি করেন। অতঃপর এখানে ব্যবসা শুরু করেন। তখন পোড়াবাড়ি টাঙ্গাইলের অন্যতম নদী বন্দর ছিল। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁ হযরত শাহ জামানকে আতিয়া পরগণার শাসক নিযুক্ত করলে তিনিই পোড়াবাড়ি গ্রামকে নদী বন্দর হিসেবে গড়ে তোলেন। সেই সময়কালে ধলেশ্বরীর পশ্চিম তীরে গড়ে উঠেছিল জমজমাট ব্যবসা কেন্দ্র পোড়াবাড়ি বাজার। তখন পোড়াবাড়ি ঘাটে ভিড়ত বড় বড় সওদাগরি নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার। ক্রমে ক্রমে পোড়াবাড়ি যখন জনসমাগমে প্রাণ চঞ্চলতায় ভরপুর–তখনই এখনই এখানে সুস্বাদু চমচম অর্থাৎ মিষ্টি শিল্প গড়ে ওঠে। রসগোল্লা আবিষ্কারে মিষ্টান্ন শিল্পের আসে নবজাগরণ, সমসাময়িককালে পোড়াবাড়ির চমচম ও মুক্তাগাছার মণ্ডার সুখ্যাতির শুরু। মণ্ডার সাথে পাল্লা দিয়ে শুরু হয় চমচমের ঐতিহ্যের যুগ।

টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে মাত্র ৩ মাইল পশ্চিমে এক ঘাট ছিল, এর নাম তালান ঘাট। সেখানেও ভিড়ত সওদাগরি নৌকা, জাহাজ ও লঞ্চ। সে সময় দেশি বিদেশি ব্যবসায়ীদের পদচারণায় পোড়াবাড়ি ছিল ব্যস্ত এক ব্যবসাকেন্দ্র। তখন চমচমের ব্যবসাও ছিল জমজমাট। প্রতি সপ্তাহে ১৫০ থেকে ২০০ মন চমচম তৈরি হতো পোড়াবাড়িতে। আবার কারো মতে সে সময় প্রতিদিন প্রায় এক দেড়শো মন চমচম তৈরি হতো পোড়াবাড়িতে। উত্তরোত্তর সাফল্য ও চাহিদার কারণে তখন পোড়াবাড়িতে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টি চমচম তৈরির কারখানা গড়ে উঠে যার সাথে প্রায় তিন শতাধিক পরিবারের জীবন ধারা আবর্তিত হয়। সে সময় চমচম মিষ্টি তৈরির সাথে জড়িত ছিল দশরথ গৌড়ের পর পরই রাজারাম গৌড়, কুশাইদের, লারায়ন, কাকন হালুই, শিবশংকর গৌড়, প্রকাশ চন্দ্র, মদন গৌড় ও মোহন লাল প্রমুখ। তার পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ চলমান সময়ে খোকা ঘোষ এবং গোপাল চন্দ্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা চমচম মিষ্টির ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেন। বর্তমানে টাঙ্গাইল শহরের পাঁচআনি বাজার এই মিষ্টি শিল্পের জন্য বিখ্যাাত।

চমচম এখন একটি উপাদেয় মিষ্টান্ন যা যে কোনো বয়সের লোকের কাছে লোভনীয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে, পূজায়, জন্মদিনে, পরীক্ষায় ফলাফলে, চাকরির প্রমোশনে, নির্বাচনে জয়ী হলে, নতুন চাকরি হলে, শ্বশুর বাড়ি বা আত্মীয় বাড়ি যাওয়ার সময় এই চমচমে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় এখনো সর্বমহলে প্রচলিত।

www.pathagar.com

টাংগাইলের বিখ্যাত পোড়াবাড়ির চমচম

কালের আবর্তে যমুনার শাখা নদী ধলেশ্বরীর বুকে অসংখ্য চর জেগে উঠে। এতে বন্ধ হয়ে যায় পোড়াবাড়ির নৌপথের ব্যবসা বাণিজ্য। ক্রমে জনবহুল পোড়াবাড়ি হতে থাকে জনশূন্য। এ ঐতিহ্যবাহী চমচম শিল্পকে কেন্দ্র করে যেসব লোক জীবিকা নির্বাহ করত, তারা বেকার হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা অন্য পেশায় চলে যায়। পোড়াবাড়ি বাজারের অবস্থা খুবই করুণ। এই বাজারের ৪ থেকে ৫টি চমচমের দোকান রয়েছে। যা ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করে চলেছে মাত্র। বাজার এবং আশেপাশে কয়েকটি বাড়িতে এখনো মিষ্টি তৈরি হয়। ঐ মিষ্টি রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে তা সরবরাহ করে থাকে। জয়কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, গোপাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ও টাঙ্গাইল পোড়াবাড়ি মিষ্টি ঘরে এখনো নির্ভেজাল পোড়াবাড়ির চমচম পাওয়া যায়। বর্তমানে টাঙ্গাইলের পাঁচআনী বাজার ছাড়াও টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি তৈরি ও বিক্রি হচ্ছে। যেমন আমিত্তি, রসমালই, রসগোল্লা, সন্দেশ, কালোজাম, জিলাপি, খাজা, বাতাসা, কদমা, নই, টানাবাদাম ইত্যাদি। মির্জাপুর উপজেলা জার্মুকীর সন্দেশ বিখ্যাত। নলিন বাজারের রসগোল্লার খ্যাতি রয়েছে। বাসাইল উপজেলার ফাইলা পাগলার মেলায় কদমার সুনাম আছে। এছাড়া টাঙ্গাইলের ঘোষ ও পাল সম্প্রদায়ের লোকেরা দানাদার, দই ও ঘি তৈরি করেন। এ দইয়ের খ্যাতিও কম নয়। বগুড়ার দইয়ের চেয়ে স্বাদে ও গন্ধে কোনো অংশে কম নয়। বরং কোনো কোনো ঘোষের দই বগুড়ার দইয়ের চেয়েও ভালো। যেমন- গোপালপুর নন্দনপুরের ধেবল

www.pathagar.com

ঘোষের দই, মোহনপুরের নিতাই চন্দ্র ঘোষের দই, আলমনগরের নীল কমলের দই, ফলদার খোকা ঘোষের দই ও ভূঞাপুরের রমজানের দইয়ের খ্যাতি রয়েছে।

মোহনপুরের বিখ্যাত দই

ঐতিহ্যেবাহী পোড়াবাড়ির চমচম আজ নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন। এই মিষ্টি নির্মাতারা ও ব্যবসায়ীরা আর্থিক লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। এভাবে হয়ত আমাদের ঐতিহ্যবাহী পোড়াবাড়ির চমচম একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মিষ্টি শিল্পে টাঙ্গাইলের ঘোষ ও পাল সম্প্রদায় বংশানুক্রমিকভাবে নিয়োজিত আছে। তবে দে, নাগ ইত্যাদি উপাধিধারীদের কোথাও কোথাও মিষ্টান্ন তৈরিতে নিয়োজিত দেখা যায়। টাঙ্গাইলের মোদক উপাধিপ্রাপ্তরাও মিষ্টি শিল্পের সাথে জড়িত ছিল, এখনো আছে। মোদক উপাধিধারী হিন্দুরা বংশগতভাবে গুড়, তেল, ময়দা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করে জিলাপি, কদমা, বাতাসা, গজা, খাজা, নই, টানা এবং চিনি সহযোগে খোরমা, মিস্ত্রী, চিনি বা গুড়ে সাজ, মুড়ির মোয়া, ঢেপের মোয়া, ঝুরি, জোয়ারের খইসহ বিভিন্ন উপাদানের তৈরি নাড়ু ইত্যাদি।

দুগ্ধজাত দই, ক্ষীর, ঘি, মাখন ইত্যাদি মিষ্টি দ্রব্য তৈরিতে টাঙ্গাইলের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। যে কথা আগেও বলা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতির নরদই, দেউপুর, নিচনপুর ও এলেঙ্গা। ভূঞাপুরের ফলদা ও ভূঞাপুর সদরে এবং গোপালপুরের মিষ্টি পট্টি, আলমনগর ও নলিন বাজারের সুস্বাদু এবং উত্তম দই, ক্ষীর, ঘি, মাখন তৈরির উল্লেখযোগ্য স্থান।

৪. পাটি শিল্প

বেতকে কেন্দ্র করে এক সময় এ অঞ্চলে গড়ে উঠে পাটিশিল্প। এ শিল্পে নিয়োজিত লোকেরা নিম্নশ্রেণির হিন্দু নাথ বা যোগী সম্প্রদায়। জীবন-জীবিকার জন্য এরা পাটি

www.pathagar.com

তৈরিকেই বেছে নেয় পেশা হিসেবে। এ শিল্পের লোকেরা যেসব পাটি তৈরি করে তন্মধ্যে নকশা করা বিয়ের পাটি, নামাজের পাটি, সাধারণ পাটি, বুকার পাটি, পিঠের পাটি ইত্যাদি অন্যতম। গাংগাইর, বেকারকোনা, কালামাঝি, রক্তিপাড়া, ঘাটাইলের পাকুটিয়া ও কালিহাতির বাঘুটিয়া অঞ্চলে এরা বসবাস করে।[১]

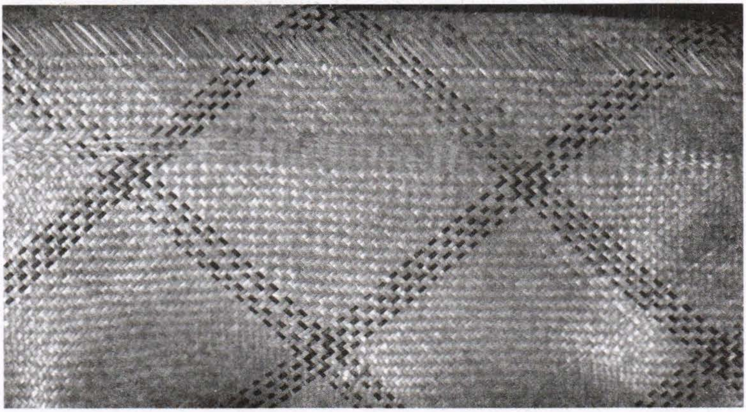

শীতলপাটি

৫. শিকা শিল্প

পাট ও রঙিন সুতার মিশ্রণে তৈরি করা হয় শিকা। ঘরের দাওয়ায় বা দেয়ালে শিকা টাঙিয়ে তাতে ঝুলিয়ে রাখা হয় নানা আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। পাটকেন্দ্রিক এ ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প অনেক প্রাচীন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'কারিতাসের' অর্থায়ন ও প্রণোদনায় এ প্রাচীন শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। কাকরাইদ, গোবুদিয়া, জলছত্র, জটাবাড়ি ও গাছাবাড়ি গ্রামে এ শিল্পের নারী শিল্পীরা বসবাস করে। নারীরাই একমাত্র এ শিল্পে নিয়োজিত।[২]

৬. বাঁশ শিল্প

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো টাঙ্গালের মধুপুর ও গোপালপুর এলাকায় বাঁশশিল্পের প্রচলন রয়েছে। লোকজীবনের নানাস্তরে বাঁশের তৈরি বিচিত্র গার্হস্থ্য জিনিসের প্রয়োজনে ঐতিহ্যগতভাবে গড়ে উঠেছে বাঁশ শিল্প। এ শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি পেশাজীবি শ্রেণি। এ পেশায় জড়িত রয়েছে যেমন অসংখ্য মানুষ তেমনি এর অনিবার্য চাহিদাও ব্যাপক। ঐতিহ্যিক এ পেশায় নিয়োজিত থেকে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা এ অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতিতে রাখছে বিরাট অবদান। বাঁশের তৈরি বুকশেলফ, বসবার মোড়া, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি যেমন দোয়ার, ধিয়ার, ঘুণি, চাক, খালুই ইত্যাদি বাঁশ শিল্পের প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া গার্হস্থ্য সামগ্রীর মধ্যে শস্য রাখার সুদৃশ্য বেড়, ডোল, গোলা, ঢাকি বা ধামা, কুলা, খাঁচা, ডালা, পাইছা বা টুকরি, ফুলদানী, ফুলের ঝাড়, কলমদানী, ঝাড়ু, চালুন ইত্যাদি বাঁশ নির্মিত শিল্প এখানে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রয়েছে। বাঁশের তৈরি চাটাই বা ধাড়ী বহুল

www.pathagar.com

প্রচলিত একটি পণ্য হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। এছাড়াও বাঁশ নির্মিত সুদৃশ্য সিলিং ঘরের শোভা বৃদ্ধি করে থাকে। এসব শিল্পের বাণিজ্যিক প্রসারে মধুপুর, ধনবাড়ি, মধুপুর ও গোপালপুরের যেসব এলাকা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে তন্মধ্যে রক্তিপাড়া, কালামাঝি, লাউফুলা, আলোকদিয়া, মলকা, কুড়াগাছা, রাধানগর, আম্বারিয়া, ভাইঘাট, উখারিয়াবাড়ি, নরিল্যা, সুতী ও ডুবাইল অন্যতম।[৩]

বাঁশের তৈরি পাইছা বা টুকরি, চালুন তৈরি করছেন কারিগর হায়দার আলী ও তার পরিবারবর্গ

পাইছা বা টুকরি, ঢাকি বা ধামা, কুলা, খাঁচা, ঝাড়ু, চালুন ইত্যাদি

www.pathagar.com

৭. নকশিকাঁথা

নকশিকাঁথা পল্লী বাংলার এক প্রাচীন ও সুনিপুণ লোকশিল্প। নারীরাই এ শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নারীর হৃদয়ের সৌন্দর্য-কল্পনার এক অনবদ্য প্রকাশ এ শিল্পে রূপ লাভ করে থাকে। গৃহকর্মের অবসরে নারীরা এ শিল্পে আত্মনিয়োগ করে নিজস্ব শিল্পবোধের পরিচয়ে ফুটিয়ে তোলে প্রতিটি সেলাইয়ের ফোঁড়। রঙিন সুতার ফোঁড়ে সাদা ক্যানভাসের বুকে ফুটিয়ে তোলে লতা-পাতা, ফুল-পাখি ও প্রকৃতির অনবদ্য আবহ। কখনো কাঁথার বুকে ফুটিয়ে তোলে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি। গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীকও কাঁথার বুকে ফুটে উঠে নিপুণ সৌকর্যে।

টাংগাইলের ঐতিহ্যবাহী নকশিকাঁথা তৈরি করছেন আছিয়া খাতুন ও কামনা

গ্রামীণ অশিক্ষিত নারী লোকশিল্পীদের অকৃত্রিম শিল্পবোধ ও সৃজনশীল শিল্পী সত্তার অপূর্ব প্রকাশে নকশিকাঁথাগুলো হয়ে উঠে এক অনন্য শিল্পমাধ্যম। আবহমান নারী জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দে-বেদনা ও ঘর-গৃহস্থালির না বলা বিচিত্র অনুভূতির চিত্রময় রূপ নকশিকাঁথার পরতে পরতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। নকশিকাঁথাগুলো যেন নারীর হৃদয়ের গোপন কথারই বাঙ্ময় প্রকাশ। সাদা ধূতি কাপড়, রঙিন সুতা ও নারীর কল্পনা বিলাসী মনের সংযোগে নকশিকাঁথার অবয়ব গড়ে উঠে। মধুপুরের গারোবাজার, মোটের বাজার, মহিষমারা, গোপালপুর, ঘাটাইলের সাগরদীঘি ও লক্ষ্মীন্দর এলাকায় নকশিকাঁথার প্রচলন রয়েছে।[৪]

www.pathagar.com

৮. মৃৎশিল্প

মাটির নিত্যব্যবহার্য উপকরণ তৈরির ইতিহাস অনেক প্রাচীন। তবে কখন থেকে টাঙ্গাইলে শুরু হয়েছে এরকম সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। টাঙ্গাইলের গোপালপুর সুতী, ডুবাইল পালপাড়ায় এ শিল্প গড়ে ওঠে। এ শিল্পের সাথে জড়িতদের কুমার বলা হয়। বয়োবৃদ্ধদের ধারণা সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার কারণে আজ এ শিল্প তার অতীত গৌরব হারাতে বসেছে। গত কয়েক বছর ধরে এই পেশার সাথে জড়িতরা কেউ অন্য পেশার দিকে ঝুকছে কেউ বা দেশে ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমিয়েছে। এখন যারা পেশাটিকে ধরে রেখেছেন তারা তাদের পুরোনো পেশাকে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর পুরুষের সাথে নারীরাও আছে সমান তালে। মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত রঘুনাথ পাল জানান, সাধারণত নদীর তীরের বা জমির মাটি থেকে সরা-হাঁড়ি-বাসন ও বিভিন্ন ধরনের খেলনা তৈরি হয়। মাটি থেকে ময়লা আবর্জনা আলাদা করে প্রথমে তা পা দিয়ে পিষে নরম করা হয়। এরপর তাতে পাটের আশ মিশিয়ে জিনিসপত্র তৈরির উপযোগী করা হয়। মাটি প্রস্তুত করতে দু-তিন দিন সময় লাগে।

মাটি তৈরির কাজ শেষ হলে বিভিন্ন সাজে ফেলে তা থেকে সরা-হাঁড়ি-বাসন ও বিভিন্ন ধরনের খেলনা তৈরি হয়। এরপর এগুলো রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকানোর পর খড়ি মাটি ও লাল মাটি গুলে তাতে রং দেওয়া এবং আবার রোদে শুকানো হয়। পরে তা পোড়ানোর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। শুকানো জিনিসপত্র আগুনের চুল্লিতে সাজানো হয়, স্থানীয় ভাষায় একে পুন বলা হয়। পরে একটানা তিনদিন আগুন জ্বালিয়ে তা পোড়ানো হয়। পরে পুন খুলে তা বিভিন্ন রঙে সাজানো হয়।

মৃৎপাত্র তথা হাঁড়ি-পাতিল নির্মাণ পুরোপুরি প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প। মৃৎপাত্র তৈরি করতে মাটি সংগ্রহ থেকে শুরু করে মাটি সংরক্ষণ, মাটি মিশানো, মাটি চাকে তোলা ও চাক ঘোরানো, হাতের কৌশলে পাত্র নির্মাণ, রৌদ্রে শুকানো, ভাটিতে তোলা ও আগুনে

মাটির পাতিল এবং অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করছেন একজন নারী মৃৎশিল্পী

www.pathagar.com

পোড়ানো ইত্যাদি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এসব কাজ পাল, কুমার প্রভৃতি পেশাজীবী শ্রেণি করে থাকে। এখনও বিকল্প কোনো শ্রেণি নেই।

পুন তৈরি : পুন তৈরি মৃৎশিল্পের একটি অন্যতম দিক। শুকানো জিনিসপত্র থরে থরে সাজিয়ে প্রথমে তা খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এরপর তাতে খাল থেকে বয়ে যাওয়া পলিমাটি দিয়ে প্রলেপ দেয়া হয়। পরে ধানের খড় গাছের ফালি দিয়ে বৃত্তাকারভাবে ঘিরে দিয়ে আবারও পলিমাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় এবং কাঠ বা কয়লা দিয়ে পুনে আগুন দেয়া হয়। এভাবে একটানা তিনদিন আগুন জ্বলার পর তা নিভিয়ে দিয়ে মাটির রং-বেরঙের প্রলেপ তুলে নেওয়া হয়। এরপর এগুলো ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে।[৫]

৯. দারুশিল্প

টাঙ্গাইল জেলায়ও অন্যান্য স্থানের মতো দারুশিল্প মানুষের মনে গভীরে গেঁথে আছে। কাঠের কোনো জিসিস তৈরি করলে তাতে খোদাই বা নকশা না করলে যেন সৌন্দর্য বাড়ে না। তাই দারুশিল্প এখানে বেশ প্রসার লাভ করেছে।

কারখানায় কর্মরত দারুশিল্পী

www.pathagar.com

এখানকার কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে– খাট, পালঙ্ক, আলমিরা, চেয়ার, টেবিল, সোফাসেট প্রভৃতি। তৈরি করার পর এসব আসবাপত্রে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বিভিন্ন নকশা আঁকা হয়। এসব নকশা অত্যন্ত নিখুঁত হাতে অঙ্কন করা হয়। বর্তমানে অনেক নকশা মেশিনের সাহায্যও করা হয়। বিশেষ করে খাট-পালঙ্কের ক্ষেত্রে কারুকার্য বেশি করা হয়। চেয়ার তৈরির ক্ষেত্রে কারুশিল্পী তাদের শৈল্পিক নিদর্শন ভালোভাবেই তুলে ধরে। চেয়ারে সাধারণত বিভিন্ন ফুলের নকশাই বেশি করা হয়।[৬]

কাঠের পাদুকা

আগের দিনে মানুষ পায়ে ব্যবহারের জন্য পাদুকা বা জুতা হিসেবে ব্যবহার করত খড়ম। দু-পায়ের জন্য দু-টুকরো কাঠ সুন্দর করে কেটে মাঝখানে কিছুটা চিকন করে রাবারের ফিতা বা কাঠ দিয়ে পায়ের দু-আঙ্গুল ঢুকানোর ব্যবস্থা করা হতো। কাঠের তৈরি এ খড়ম হাটে-বাজারে সহজলভ্য ছিল। বর্তমানে এর কোনো ব্যবহার নেই বললেই চলে।

গাছা

গাছা তৈরি করা হয় বাতি বা কুপি রাখার জন্য। এই গাছা এবং প্রদীপদানি সাধারণত রান্না ঘরেই বেশি ব্যবহৃত হয়। নিচে অপেক্ষাকৃত চেপ্টা কাঠ ব্যবহার করে মাঝখানে কাঠের একটি দণ্ড তারকাঁটা দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। সেটির উপরে একটি বাটির মতো বসানো হয়। ঘরে ঘরে বিদ্যুত আসার কারণে বর্তমানে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে।[৭]

তথ্যনির্দেশ

১. মো. দেলোয়ার হোসেন, প্রধান শিক্ষক, পশ্চিম ডুবাইল রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স : ৪৮ বছর, গ্রাম : নিচনপুর, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
২. সুবাস দেবনাথ, বয়স : ৪৯ বছর, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৩. মো. আ. করিম, প্রধান শিক্ষক, পাকুয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স : ৪৮ বছর, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৪. মোছা. আছিয়া খাতুন, বয়স : ৩৩, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৫. কে এম মিঠু, বয়স : ৩০, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানাঃ গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৬. বাবু, পিতা : মো. আ. ছালাম, বয়স : ২০, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘরঃ ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৭. মো. আ. ছালাম, বয়স : ৩৮, পেশা : চাকুরি, গ্রাম : লাউফুলা বাজার, ডাকঘর : লাউফুলা, মধুপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

টাঙ্গাইল জেলায় জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু প্রধান। তবে মধুপুর, ঘাটাইল উপজেলায় গারো সম্প্রদায়ের বাস। এরা আদিতে বৌদ্ধ থাকলেও বর্তমানে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান হয়েছে। কিন্তু তারা পূর্ব পুরুষের সংস্কৃতি এখনো বর্জন করতে পারেনি। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে পোশাক পরিচ্ছদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে পার্বণ উপলক্ষ্যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পোশাক পরে।

গ্রামে সাধারণ মুসলমানদের পোষাক বলতে একটি লুঙ্গি। গ্রীস্মকালে সাধারণত তারা শরীরের উর্ধ্বাংশে অন্য কোন আবরণ দেয় না। শীতকালে গেঞ্জী এবং চাদর (সাধারণত সুতীর) শীত নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। গরীবরা কেবল একটি গামছা পরে। মর্ধবিত্ত এবং বিত্তবান লোকেরা পায়জামা এবং শার্ট পছন্দ করে। মধ্যবিত্তদের জন্য জুতা সৌখিনতা এবং গরীব লোকদের জুতা ব্যবহার করার সামর্থ নেই। আগে প্রায় সবাই কাঠের খড়ম ব্যবহার করত। এখন খড়ম উঠে গেছে। এর স্থান অধিকার করেছে রাবার, প্লাস্টিক ইত্যাদির স্যান্ডেল। বর্তমানে সকল শ্রেণির লোকদের পোশাক ব্যবহারের অনেক পরিবর্তন এসেছে।

ঈদ উপলক্ষে পুরুষেরা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরিধান করে এবং শুক্রবার জুমআর নামাজেও তারা মাথায় টুপি আর পায়জামা পাঞ্জাবি পরে। মেয়েরা সাধারণত শাড়ি পরিধান করে। বিশেষ করে টাঙ্গাইলের তাঁদের শাড়ি সব রমণীদের পছন্দ।[১]

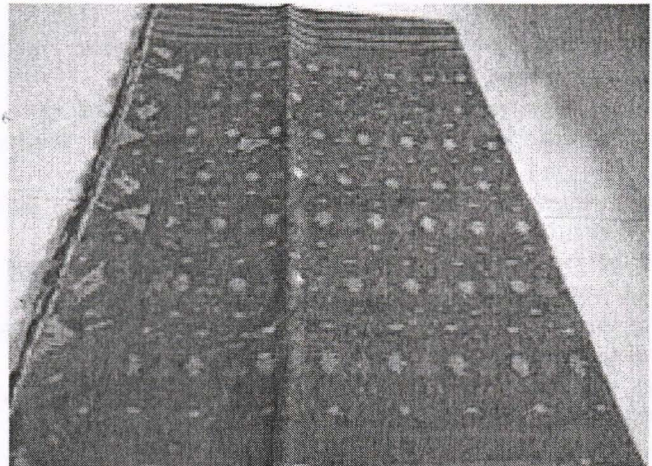

টাঙ্গাইলের জামদানি শাড়ি

www.pathagar.com

ইদানিং মুসলিম মেয়েদের মধ্যে সালোয়ার কামিজ পরার প্রবণতা বেড়েছে। পুরুষেরা লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিধান করে। আর যুবক ছেলেরা সার্ট-প্যান্ট পরিধান করে থাকে। তবে মুসলমান যুবতী মেয়েদের মধ্যে বোরকা পরার প্রবণতা বেড়েছে।

হিন্দু নারীরা শাড়ি পরিধান করে। পুরুষেরা লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরিধান করে। তবে ধর্মীয় উৎসবে ধুতি পাঞ্জাবি পরে। হিন্দু যুবক ছেলেরা মুসলমান যুবকদের মতোই সার্ট প্যান্ট পরে। আর মেয়েরা সালোয়ার কামিজ পরে।

এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক কোর্টপ্যান্ট, ব্ল্যাজার ও শেরওয়ানি ব্যবহার করে। সত্যি কথা বলতে পোশাক শুধু শরীর ঢাকে না; শৈল্পিক ও মার্জিত পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে।[২]

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ঘাটাইল উপজেলার কিছু অংশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গারো সম্প্রদায়ের বাস। গারো জাতি একদা চীনের হোয়াংহো ও সিকিংয়াং নদীর মধ্যবর্তী উঁচু স্থানে বসবাস করত। ১৯০৬ সালের আসামের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গারো জাতি গোষ্ঠী খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে পূর্ব আসামে এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের এই বসতি পর্যায়ক্রমে প্রসারিত হয়ে থাকে শ্রীবর্দী, কলমাকান্দা, বিরিশিরি ও বারহাট্টা হয়ে মধুপুর অঞ্চলে।

ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত নৃত্যরত গারো তরুণী

অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী হতে গারোদের পোশাকে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। মধুপুর অঞ্চলে বসবাসকারী গারো পুরুষেরা সাধারণভাবে গান্দো বা নেংটি পরে। আর মেয়েরা গারোদের মতোই দুই খণ্ড ডুমা ব্যবহার করে। বুকে এক টুকরো কাপড় বেধে তার ওপর নিমা পরে। বর্তমানে গারো মেয়েরা এক খণ্ড কাপড় বা একটু খাটো আকৃতির শাড়ি উল্টো পেঁচিয়ে পরে। এছাড়াও অনেক ধরনের ঐতিহ্যবাহী পোষাকের প্রচলন আছে গারো সমাজে। সেগুলোর মধ্যে পান্দ্রা, গান্দি গান্না, খফিং, রেকিং, জারন,

www.pathagar.com

আনপান, দকমান্দা, জাগিসিম ইত্যাদি। বর্তমানে গারোদের পোশাক বাঙ্গালিদের অনুরূপ।[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. মো. নজরুল ইসলাম, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪০, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
২. বাবু, পিতা : মো. আব্দুল ছালাম, বয়স : ২২, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৩. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা: গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

১. মাটির ঘর

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম। মানুষ অরণ্য থেকে যখন স্থায়ীভাবে বসবাসের বা গৃহী হবার চিন্তা করেছে তখন থেকেই ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকস্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে ঘরবাড়ির বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঘরবাড়িগুলো পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের সাধারণ মানুষেরাই নির্মাণ করেছে। প্রথমাবস্থায় গাছের পাতা বা খড় প্রভৃতির সাহায্যের নির্মাণ করেছে ঘরের চাল। আর পাটশলা ও নলখাগড়া এবং বাঁশের চাটাইয়ের সাহায্যে তৈরি করেছে বেড়া। চালের সঙ্গে মাটিতে পোঁতা খুটির উপর চাল বসিয়ে এবং বেড়া ঘেরা দিয়ে নির্মাণ করেছে বসবাসের উপযোগী ঘর।

মধুপুর অঞ্চলের মাটির ঘর

কালক্রমে পরিবেশের সঙ্গে খাপখাইয়ে মানুষ তৈরি করেছে মাটির দেয়ালের ঘর। পাশাপাশি কাঠের ও টিনের ঘরও পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করেছে তারা। বসবাসের জন্যে বা রান্না করার জন্যে বা গরু-ছাগল রাখবার জন্যে যেসব ঘর মানুষ নির্মাণ করেছে এগুলোতে লোকস্থাপত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। টাঙ্গাইল অঞ্চলে লোকস্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে এখনও নির্মিত হচ্ছে মাটির ঘর, টিনের ঘর কিংবা শনের ঘর। সৌখিনভাবে আটচালার ঘরও একসময় নির্মিত হয়েছে এ অঞ্চলে। ঘরের চালে

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়েছে শন বা টিন। বর্তমানে এ অঞ্চলে পাকা দালান ঘর নির্মিত হচ্ছে। রূপান্তর ঘটছে গৃহ নির্মাণের সামগ্রীর। তারপরও টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে খাপখাইয়ে নির্মিত হচ্ছে মাটির দেয়ালের এবং টিনের চালের ঘর, যা লোকস্থাপত্যের নিদর্শন।

মাটির দেয়ালের ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে মাটিকে মিহি করে গুলিয়ে নিয়ে তাতে কেচো উপাদান ব্যবহার করা হয় যাতে মাটি শুকানোর পর দেয়াল শক্ত থাকে। দেয়াল করার ক্ষেত্রে মাটিকে অনেকদিন ধরে শুকাতে হয় এবং পিটিয়ে দেয়াল করা হয়। মাটির ঘরগুলো গ্রীষ্মকালেও যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকে। সাধারণত এটেল মাটিই দেয়াল করার ক্ষেত্রে খুব উপযোগী। দেয়াল ঘর বিভিন্নভাবেই চাওয়া হয়। আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ মাটির দেয়ালের উপর চাল হিসেবে ব্যবহার করেন খড়, টিন কিংবা টালি প্রভৃতি। বর্তমানে আটচালা ঘরের ব্যবহার নেই বললেই চলে। দোচালা এবং চৌচালা ঘরের ব্যবহারই বেশি।

অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর খেয়াল রেখেও এ ধরনের ঘরগুলো নির্মাণ করা হয়। যে অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি সে অঞ্চলের অধিবাসীরা এসব ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয় কম করে থাকেন।[১]

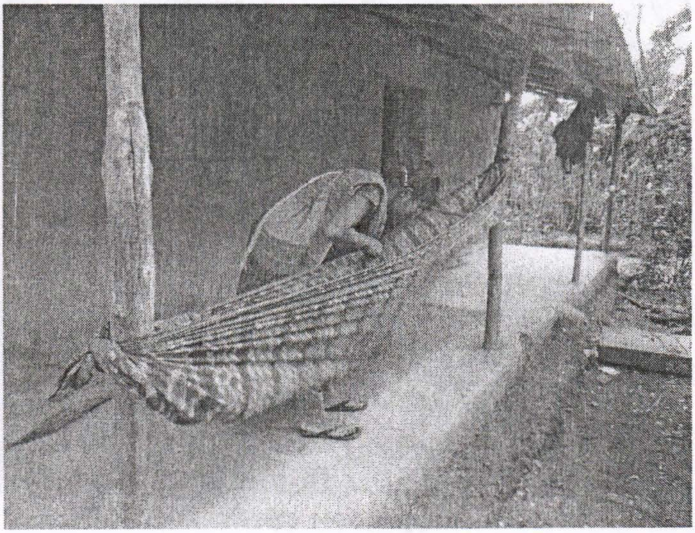

বারান্দাযুক্ত মাটির ঘর

২. দোচালা ছনের ঘর

এ ধরনের ঘর সাধারণত দোচালা আকৃতির হয় এবং এক দিকে বারান্দা থাকে। বারান্দাগুলি হয় বেশ উঁচু। কোথাও কোথাও শোলাকার বারান্দাও নজরে পড়ে। দোচালা ঘর সাধারণত নিম্নবৃত্ত কৃষকেরা থাকার ঘর হিসেবে ব্যবহার করেন। এই ঘরের চালাগুলি কাশ বা খড় নির্মিত। বাঁশের বিশেষ কাঠামো তৈরি করে তার উপর কাশ বা

www.pathagar.com

খড়গুলো বসানো হয়। এ ধরনের ঘরের বেড়ায় এবং মেঝেতে মাটির প্রলেপ দেওয়া থাকে। দোচালা মাটির ঘর তৈরিতে সময় লাগে কমপক্ষে দেড় থেকে দুই মাস। বর্তমানে এ ধরনের ঘর আর তৈরি হয় না।[২]

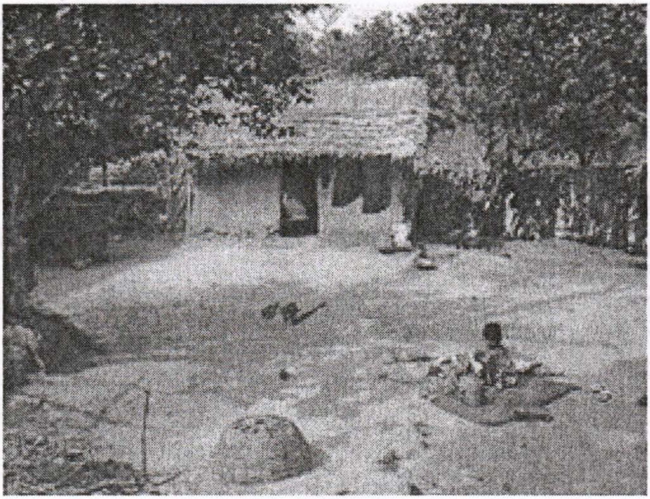

দোচালা ঘর

৩. খড়ের পুঞ্জি বা পালা

টাঙ্গাইল জেলার গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই খড়ের পালা দেখা যায়। ধান মাড়াইয়ের পর বাড়ির উঠানের এক পাশে খড়ের পালা দেওয়া হয়। এ অঞ্চলে একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো 'খড়ের পালায় মানুষ চেনায়'।

খড়ের পালা

www.pathagar.com

অর্থাৎ খড়ের পালা দেখে তার সাংসারিক ও পারিবারিক অবস্থা বোঝা যায়। যার বাড়ির খড়ের পালা যতো বড়ো সে গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা ততো ভালো। খড়ের পালার জন্য প্রথমে পরিমাণ মতো জায়গা গোল করে মাটি দিয়ে একটু উঁচু করা হয়, যাতে বৃষ্টি পানি নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে না পারে। এরপর সেখানে একের পর এক খড় বিছিয়ে উঁচু করা হয়। উপরের দিকে গিয়ে চারদিকেই ঢালু করা হয় যাতে বৃষ্টির পানি সহজেই গড়িয়ে পড়ে। একটি খড়ের পালা সাধারণত এক বছরের জন্য নির্মাণ করা হয়। আবার নতুন ধান আসার পর নতুন পালা দেওয়া হয়।[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. মিস্টার রেনু সমাদ্দার, সিএসসি, বর্তমান বয়স : ৪৩, প্রধান শিক্ষক, কর্পোস খ্রীষ্টি উচ্চ বিদ্যালয়, জলছত্র, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

২. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানাঃ গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

লোকসংগীত ও গাথা/গীতিকা

১. মেয়েলি গীত

বিয়ের গীত

(বিয়ের প্রস্তুতি)

চন্দন কাঠ পবিত্রতার প্রতীক। ধর্মীয় কাজসহ অন্যান্য কাজে চন্দন কাঠ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

১

ব্যার বাড়ি চন্দন গাছটি
সুতারে[১] কাইটা বানায় ফিড়িলো
সেই ফিড়িতে গোসল করব
রাজার বেটা জামাললো
ব্যার বাড়ি চন্দন গাছটি
সুতারে কাইটা বানায় ফিড়িলো
সেই ফিরিতে গোসল করব
রাজার বেটা জামাল করল ॥
গোসল আছল কইরারে পুত্র
কিসের সাজন সাজ রে
তোমার সঙ্গে দিমু আমি
একশ একজন লোক রে
অনেক দূরে যাইয়া পুত্র
হাওয়াই বাজি ছাইড়ো রে
দ্যাশের ম্যানষে দেইখা বলব
ভাগ্যমানের ব্যাটা রে
ব্যার বাড়ি চন্দন গাছটি
সুতারে কাইটা বানায় ফিড়িলো
সেই ফিড়িতে গোসল করব
রাজার বেটা জামাল রে
গোসল আছল কইরারে পুত্র
কিসের সাজন সাজ রে।[১]

২.

এই গানে কনের জন্য বরের কেনাকাটার চিত্র পাই। শাশুড়ি পাখির নিকট হতে হবু জামাতার খবর নিচ্ছে।

www.pathagar.com

উড় উড় পঙ্খি রে আসমান জুইড়া পঙ্খি উড় রে
বল পঙ্খি তুমি দামান্দেরি[২] খবর।
দামান দেইখ্যা আইলাম শহরে
দামান দেইখ্যা আইলাম শাড়ির দোকানে
উড় উড় পঙ্খি রে আসমান জুইড়া পঙ্খি উড়ে রে
বল বল পঙ্খি তুমি দামান্দেরি খবর।
দামান দেইখ্যা আইলাম শহরে
দামান দেইখ্যা আইলাম আমি আলতারই দোকানে।
উড় উড় পঙ্খি রে আসমান জুইড়া পঙ্খি উড় রে
বল পঙ্খি তুমি দামান্দেরি খবর।
দামান দেইখ্যা আইলাম শহরে
দামান দেখলাম আমি চুনুর দোকানে
উড় উড় পঙ্খি রে আসমান জুইড়া পঙ্খি উড় রে
বল পঙ্খি তুমি দামান্দেরি খবর।
দামান দেইখ্যা আইলাম শহরে
দামান দেখলাম আমি বিবির অন্তরে।[২]

৩.

(বরের জন্য পিঁড়ি বানানো)

চন্দন গাছটি কাটিয়ারে সুতার[৩]
বানাইও রঙের পিঁড়ি রে (২)
সেই পিঁড়িতে গোসল করবে
বাপের বাজন বেটা[৪] রে (২)

গোসল-আছল কইরা রে পুত্র
কিসের ভাবন ভাবছ রে (২)
গোসল-আছল কইরা রে পুত্র

লুঙ্গি লইও বাইছা[৫] রে (২)

গোসল-আছল কইরা রে পুত্র
শার্ট লইও বাইছা রে (২)
গোসল-আছল কইরা রে পুত্র
ওমাল[৬] লইও বাইছা রে (২)

গাসল-আছল কইরা রে পুত্র
মুকুট লইও বাইছা রে (২)
গোসল-আছল কইরা রে পুত্র
মোজা লইও বাইছা রে (২)

গোসল আছল কইরা রে পুত্র
জুতা লইও বাইছা রে (২)

www.pathagar.com

গোসল-আছুল কইরা রে পুত্র
কিসের ভাবন ভাবছ রে (২)
তোমার সঙ্গে দিয়া দিমু
একশ একজন লোকজন রে (২)
তোমার সাথে দিয়া দিমু
হাজার টাকার লাইঠাল[৭] রে (২)

কদ্দুর[৮] পথ যাইয়া রে পুত্র
মাইর লাইঠাল বারি রে (২)
হাত্তি আসে জাম্মুর-জুম্মুর
ঘুইরা আসে লাফে রে (২)

হাত্তির পিষ্টে বইসা রে পুত্র
মাইর জোরে বারি রে (২)
সেই না বারি যাইয়া লাগে
কন্যার মায়ের চুলে রে (২)

তাই না দেইখ্যা কন্যার মাইয়া
আন্দরে ফিট অয় রে (২)
না জানি কেমন আইতাছে
জমিদারের ছেলে রে (২)[৩]

৪.

(বরের চুল কাটানো জন্য নাপিতকে আমন্ত্রণ)

নাপিত ভাইয়া, নাপিত ভাইয়া,
আমার বাড়ি যাইও রে
সোনার নরৈল[৯] রূপার কেচি
সাথে লইয়া যাইও রে (২)

গাছ-বিরিক্ষের তলে বইস্যা
আমার বাজানরে[১০] কামাইও[১১] রে,
ভালা কইরা কামাও রে নাপিত
ভালা সিধা[১২] পাইবা রে (২)

মুন্দ কইরা কামাইলে রে নাপিত
জুতার বারি খাইবা রে,
ভালা কইরা কমাইলে রে নাপিত
নশার হওরী[১৩] পাইবা রে (২)

মুন্দ কইরা কামাইলে রে নাপিত
কানমলা খাইবা রে,

www.pathagar.com

ভালা কইরা কামাইলে রে নাপিত
নশার মামীরে পাইবা রে (২)[৪]

৫.

(মেহেদী তোলার গান)

মেন্দির জন্ম কোনো খানে?
আমার জন্ম ঐরাণ জঙ্গলে[১৪]
মেন্দি তুলবো কয়জনে
আইওরিরা[১৫] পাঁচজনে ॥
মেন্দি বাঁবো কয়জনে?
নশার ভাই বউ একজনে
মেন্দি লাগাবে কয়জনে
আইওয়িরা তিনজনে ॥[৫]

৬.

(তেলাই বা গায়ে হলুদ দেওয়ার সময়ের গান)

কন্যাকে তেলাই দেওয়ার জন্য বরের বাড়ির লোকজন গিয়েছে। রসিকতার স্থলে কন্যার বাড়ির খাওয়া দাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে এই গানে।

মাঐর ম্যায়ার তেলাইর দিন
কান্দে কাটে তালবেতালে
ব্যস্ত মাঐ সারাদিন
আনমনে রান্ধে[১৬] মাঐ
তদারকি করে তাঐ
মাঐর ডালে নুন হয় নাই
আমি শরমের কথা কারে কই
মাঐ আমার বাবুর্চি সরস
চিড়া ভাজতে ভাজে খই ॥
ত্যালাইর মেহমান খাইবে খই
মাঐ আমার বাবুর্চি সরস
চিড়া ভাজতে ভাজে খই ॥
মাঐর ম্যায়ার গায়ে হলুদ
তাঐ জব[১৭] করছে বলদ
চার জুয়ানে টানাটানি
বলদের মাংশ ছিড়ে কই
মাঐ আমার বাবুর্চি সরস
চিড়া ভাজতে ভাজে খই ॥
মাঐ রানছে মাশের ডাল
নুন হয় নাই হইছে ঝাল

www.pathagar.com

সেই ডাইলে ভাই ভইরা রাখছে
বাড়ির সামনের কুম[১৮] আর খাল
সেই ডাল খাওয়ার মানুষ কই?
ত্যালাইর মেহমান খাইছে ডাইল
ছুটাছুটি তাল বেতাল
সবাই করে দই দই
মাঐ আমার বাবুর্চি সরস
চিড়া ভাজতে ভাজে খই ॥
ত্যালাইর মেহমান খাইব দই
মাঐ পাতছে সইরান দই
শোনেন দইয়ের বাখানি[১৯]
যদিও উপরেতে কিছু ঘোলা
নিচেতে টলটলা পানি
সেই দই খাওয়ার মানুষ কই?
মাঐ আমার বাবুর্চি সরস
চিড়া ভাজতে ভাজে খই ॥[৬]

৭.

(বরকে গোসল করানোর গান)

ওসল মিয়া গোসল করে
লুঙ্গি নাই তার শেষে,
নশার[২০] মায়রে বন্ধক থুইয়া[২১]
লুঙ্গি আন দেশে (২)
থাইক মা থাইক মা
লুঙ্গি আমার আছে,
বিয়া টিয়া শেষ অইলে।
দুটি পাইবা শেষে (২)

নশা মিয়া গোসল করে
জামা নাই তার শেষে,
নশার ফুপুরে বন্ধক থুইয়া
জামা আন দেশে (২)
থাক ফুপু থাক ফুপু
জামা আমার আছে,
বিয়া টিয়া শেষ অইলে
দুটি পাবা শেষে (২)
নশা মিয়া গোসল করে
ওমাল নাই তার দেশে,

www.pathagar.com

নশার ভাবীরে বন্ধক থুইয়া
ওমাল আন শেষে (২)

থাক ভাবী থাক ভাবী
ওমাল আমার আছে,
বিয়া-টিয়া শেষ অইলে
দুটি পাবা শেষে ॥[৭]

৮.

(বরের গোসলের গীত)

বিয়ে করতে যাবার আগে বরকে গোসল করানোর নানা আয়োজন ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাকে তৈরি করার এক ব্যস্ত মহড়া এ গানের ভাষাচিত্রে উজ্জ্বলতা পেয়েছে। বরপক্ষ আতশ বাজি পোঁড়াতে পোঁড়াতে কনের বাড়ি যাবে এবং তা দেখে পথের লোকজন বরের আভিজাত্যের প্রশংসা করবে। এমন মানসিকতার চিত্রই এ গানে ভাষা-রূপ লাভ করেছে।

চন্দন গাছটা কাইটা সূতার
বানায় রঙ্গের ফিরা[২২] গো
সেই ফিরাতে গোসল ধোয়াবো
বাপের ভাজন ব্যাটা গো ॥
গোসল টোসল ধুইয়া পুত্র
কীসের ভাবন ভাবো গো
তোমার সাথে দিমু আমি
সাতশ ট্যাকার হাউই গো ॥
কতক পথে যাইয়া পুত্র
ছুটাবা খইয়া বাজি[২৩] গো
পর দেশের লোকে বলবো
জমিদারের ছাইলা গো ॥[৮]

৯.

(বরের গোসলের গীত)

বরপক্ষের লোকেরা বরকে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করছে কনের বাড়িতে পাঠানোর জন্যে। আর এসব ব্যাপারে বাড়ির মেয়েদের আনন্দঘন ব্যস্ততার চিত্র গ্রাম বাংলার চিরন্তন ছবিই তুলে ধরে। এ গানে সেই উৎসব আনন্দের চিত্রই ফুটে উঠে।

পুষ[২৪] মাইসা শীতে গো
মাঘ মাইসা শীতে গো
কত পানি ঢালো
নিমাইর গতরে গো।
নিমাই যাবো বহুত দূরে শ্বশুর বাড়ি
কোথায় রইলা নিমাইর ফুফু

www.pathagar.com

কোথায় রইলা নিমাইর বুবু[২৫]
তাড়াতাড়ি বাহির কর
নিমাইর চাদর, ধুতি, জুতা গো ॥[৯]

১০.

(রান্নার গীত)

শাশুড়ি তার জামাই(কন্যার স্বামী) এর জন্যে খাবার তৈরি করে রেখেছে কিন্তু জামাই বাড়ি আসে না। তাই জামাই এর প্রতি শাশুড়ির অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে এ অভিমান মেয়ের জামাই-এর প্রতি শাশুড়ির গভীর ভালোবাসারই ইঙ্গিতবহ।

বাইর বাড়ি করাতি
দুধের আওটা[২৬] চড়াইছি
দুধ থুইছি জুড়াইয়া
কলা থুইছি এড়াইয়া[২৭]।
সব জামাই খাইল নইলো
মাঝিলা জামাই কই গেল?
ওই যে জামাই আইতাছে[২৮]
ডেসকা[২৯] মাথায় দিয়া
ডেসকার মধ্যে আনছে
জামাই বনের ঘুঘু টিয়া।
ঐ ডেসকা ভাঙ্গমু আমি
পায়ের গোছা দিয়া
আরেক ডেসকা কিনমু
আমি লক্ষ ট্যাকা দিয়া।[১০]

১১.

(বিবাহ আসর)

বিয়ের আসরে বসে কনে আপনজনকে ছেড়ে অচেনা পরিবেশে চলে যাবার বেদনায় অশ্রু বিসর্জন করছে। নতুন ও পুরাতন বন্ধনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নারী হৃদয়ের নির্মম অনুভূতি এ গানে সুন্দর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

হাতে ঝিলমিল রাখী রে
দাঁতে ঝিলমিল মেশি রে।
কাজলা নশা হাসে রে
রুমাল মুখে দিয়া রে।
কন্যা কান্দে রে মায়ের কোলে বইয়া
এমন সুন্দর মাও থুইয়া
কেমনে যাবো চলিয়া।
নওসা হাসে রে রুমাল মুখে দিয়া
কন্যা কান্দে রে বাপের কোলে বইয়া।

www.pathagar.com

এমন সুন্দর বাপ থুইয়া
কেমনে যাবো চলিয়া।
তোমার বাপেরে ডাক দিলে
কামের কথা কব
আমার বাপেরে ডাক দিলে
কোলে তুইলা নিব।[১১]

১২.

(বরকে নিয়ে কনের সখিদের গান)

কন্যাকে স্বামীর হাতে সমর্পণের সময় কনের বাবা মায়ের মনের যে বেদনা তা এ গানে ভাষা-রূপ পেয়েছে। নিজের হাতে বড় করা আদরের কন্যাকে পরের ঘরে পাঠাতে বাবা মায়ের মন কিছুতেই সায় দেয় না। চিরন্তন সত্য জেনেও বাবা মায়ের মন সন্তান স্নেহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিছুতেই যেন মন প্রবোধ মানতে চায় না।

এলান গাছ হেলান গো দিয়া
কান্দে ময়নার মায়ে
কী সোন্দর ময়না গো ॥
ময়নার মায়ে জিজ্ঞাস করে
কোনডা[৩০] ময়নার জামাই
কী সোন্দর ময়না গো ॥
যেডার[৩১] মাথায় সোনালি মুকুট
হেইডা[৩২] ময়নার জামাই,
কী সোন্দর ময়না গো ॥
ময়নার বাপে জিজ্ঞাস করে
কোনডা ময়নার জামাই
কী সোন্দর ময়না গো ॥
যেডার হাতে সোনালি রাখী
হেইডা ময়নার জামাই
কী সোন্দর ময়না গো ॥[১২]

১৩.

(বরকে নিয়ে কনের সখিদের গান)

নওসার আগমনের পর কনের বাড়ির ঠাট্টা সম্পর্কের আত্মীয়বর্গ বরকে নানাভাবে ঠাট্টা করে। বরের আনা নানা সামগ্রীর নিন্দা করে বরকে মধুর ভর্ৎসনা করে। ঠাট্টার ছলে যৌতুকের কথাটাও উঠে আসে। বিয়ের আসরের বর ও কনেপক্ষের আবহমান বাংলাদেশের চির-চেনা দৃশ্য এ গানে প্রতিফলিত হয়েছে।

আইছে দামান সাহেব হইয়া
বইছে রুমাল মুখে দিয়া।
ঘোমটা খোলার আগে তোমায়

www.pathagar.com

করি গো সাবধান
চান্দের আলো দেইখা তুমি
হইও না অজ্ঞান।
দামান মিয়া ধনীর ব্যাটা
চুনু[৩৩] আনছে আঠা আঠা।
আলতার মইধ্যে গাঙের পানি
গায়ে লাগে না
এত সস্তায় আসমানীরে
পাওয়া যাইব না।
দামান মিয়া ধনীর ব্যাটা
শাড়ী আনছে বহর খাটা।
আরো আনছে সদরঘাটের
নকল সোনা
ঐনা সোনা পিন্দা[৩৪] ম্যায়ায়
বউ সাজব না।
দামান মিয়া দশ গেরামের
ধনী হইয়া
র‍্যালী সাইকল চাইছে মিয়া।
তার বদলে দিতে আইছে
পিতলের বালী[৩৫]
এমন দামান্দের মুখে
দিলাম চুনকালী।[১৩]

১৪.

(বরকে ব্যঙ্গ করে গান)

কনের সখিরা বরের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে নানা রকম আদি রসাত্মক কথাবার্তা বলছে। মূলত হাস্যরস সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য।

উত্তর থেকে আইলো লো ভোমরা
সোনার মেঠুর পায়
ওকি কি রসের ভোমরা
বসবার দিব কোনে[৩৬] আইলো গোয়াল ঘর ছাপিয়া
আইলো ছাপিয়া ছাপিয়া
নসার নানিরে নইয়ারে ভোমরা
পাট খেতে যায়
ওকি কি রসের ভোমরা
পাটের যত পঁচলা লো ভোমরা
নসার নানির গায়
ওকি কি রসের ভোমরা

www.pathagar.com

পাটের যত পঁচলা লো ভোমরা
নসার ভাই বউর গায়
ওকি কি রসের ভোমরা
দক্ষিণ থেকে আইলো ভোমরা
সোনার মেঠুর পায়
ওকি কি রসের ভোমরা
নসার নানিরে নইয়ারে ভোমরা
আড়াবোনে[৩৭] যায়
কি কি রসের ভোমরা
আড়ার যত ময়লা লো ভোমরা
নসার নানির গায়
ওকি কি রসের ভোমরা।[১৪]

১৫.

(কনের গহনাপত্র পাঠাতে বিলম্ব হওয়ায় সখিরা উদ্বিগ্ন)

বৃষ্টি মেঘে ভিজল লো বিবির বিছানা
বিছনা ভিজলে যেমুন গো তেমুন
তোষক ভিজলে বালিশ শুকায়না
বৃষ্টি মেঘে ভিজলো লো বিবির বিছানা
সবার গড়ন[৩৮] পাঠাইল
কন্যার গড়ন কেন পাঠায় না
বৃষ্টি মেঘে ভিজলো লো বিবির বিছানা
বিছনা ভিজলে যেমুন গো তেমুন
তোষক ভিজলে বালিশ শুকায়না।।
সবার শাড়ি পাঠাইল
কন্যার শাড়ি কেন পাঠায় না
বৃষ্টি মেঘে ভিজলোলো বিবির বিছানা
বিছনা ভিজলে যেমুন গো তেমুন
তোষক ভিজলে বালিশ শুকায়না।[১৫]

১৬.

(বরের দেওয়া জিনিসপত্রের বর্ণনা)

বর লজ্জাবনত হয়ে মুখে রুমাল দিয়া আছে। ওদিকে কন্যার সখিরা বরের প্রত্যেক জিনিসের সমালোচনা করছে। তাদের কাছে কন্যার জন্য পাঠানো জিনিসপত্র নিম্নমানের মনে হয়েছে।

আইছে দামান সাহেব হইয়া
রইছে দামান[৩৯] মুখে রুমাল দিয়া
কন্যার নিগা[৪০] চুনু আনছে

www.pathagar.com

পাইনা[৪১] পাইনা গালে লাগে না
এত হস্তায়[৪২] কন্যারে পাওয়া যায় না।
আইছে দামান সাহেব হইয়া
রইছে দামান মুখে রুমাল দিয়া
কন্যার নিগা জুতা আনছে বহর[৪৩] খাটা
পায়ে লাগে না
এত হস্তায় কন্যারে পাওয়া যায় না।
আইছে দামান সাহেব হইয়া
রইছে দামান মুখে রুমাল দিয়া
কন্যার নিগা শাড়ি আনছে বহর খাটা
মাজ্জায়[৪৪] লাগে না
এত হস্তায় কন্যারে পাওয়া যায় না।
আইছে দামান সাহেব হইয়া
রইছে দামান মুখে রুমাল দিয়া
কন্যার নিগা বেলাউজ আনছে বহর খাটা
বুকে লাগেনা
এত হস্তায় কন্যারে পাওয়া যায় না।
আইছে দামান সাহেব হইয়া
রইছে দামান মুখে রুমাল দিয়া
কন্যার নিগা আলতা আনছে
পাইনা পাইনা পায়ে লাগে না
এত হস্তায় কন্যারে পাওয়া যায় না।[১৬]

১৭.

(বিয়ে পড়ানোর সময়ের গান)

মেন্দি মেন্দি[৪৫] গাছটি
চিরল[৪৬] চিরল পাতাটি
সোনার মেন্দি যাব রে
নশা মিয়ার হাতে। (২)

নশার মাথায় লাল পাগুড়ি
কন্যার মাথায় তেল
শিঘ্রি শিঘ্রি বিয়া পড়াও
রাইত[৪৭] অইল শেষ (২)

নশা হাসে রে
ওমাল মুখে দিয়া
কন্যা কান্দে রে
মায়েরে ধরিয়া (২)

www.pathagar.com

কত ভাতই খাইছিলাম মা
দূরে দিলা বিয়া
কেমন কইরা যামু মাগো
তোমারে ছাড়িয়া (২)[১৭]

১৮.

(বর কনেকে নিজ বাড়িতে যেতে বলছে)

বর তার নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাচ্ছে। নববধূ আপত্তি জানিয়ে বলছে, নতুন পরিবেশে আমি কাকে মা বলব? আর বাপই বলব কাকে?

ওঠ ওঠ বালি গো ওঠ ঝাইড়া বান্ধ[৪৮] কেশ
কইষা[৪৯] পিন্দ শাড়ি
এতটুকু ঘর হান ব্যাতেরই বান্ধন
তারই মধ্যে বইসা বিবি ঝুড়িছে কান্দন।
এত কান্দন ক্যান্দনা বিবি আল্লা তাল্লার কিরা[৫০]
বাপ ও মায়ের সালাম দিয়া চল আপন দেশ।
ওঠ ওঠ বালি গো ওঠ ঝাইড়া বান্ধ কেশ
কইষা পিন্দ শাড়ি।
উঠুম উঠুম বালি গো উঠুম মা বলিব কারে
আমার একটি মা আছে মা বলিও তারে
তোমার মা'রে মা বলিলে ছাই ফালাবার কব[৫১]
আমার মারে মা বলিলে তুইলা কোলে নিব।
ওঠ ওঠ বালি গো ওঠ ঝাইড়া বান্ধ কেশ
কইষা পিন্দ শাড়ি।
উঠুম উঠুম বালিগো উঠুম বাপ বলিবো কারে।
আমার একটি বাপ আছে বাপ বলিও তারে।[১৮]

১৯.

(কন্যা বিদায়ের গান)

কনেকে তুলে নিয়ে যেতে বরপক্ষের তাড়া এবং কনেপক্ষের লোকদের বিদায় বেদনাগানটিকে বিশেষত্ব দান করেছে। স্নেহাস্পদকে অন্যের হাতে তুলে দিতে আপনজনদের হৃদয় বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে উঠে।

কালা কালা বাগুন গুনি[৫২]
গিঞ্চি গিঞ্চি[৫৩] তাহার ফুল
তার নিচে বইসা বিবি
তেলের পিঠা ভাঁজে।
আপনেগর[৫৪] তেলের পিঠা
আপনেরাই খান
আমাগর[৫৫] টেকার ডালি

www.pathagar.com

ডুলিত[৫৬] তুইলা দেন।
চাচা বলে হায় রে হায়
এত দরদের ভাইজী আমগর
পরে লইয়া যায়।
আইজ বুঝি রসের পাত্রী
নসার[৫৭] সাথে যায়।[১৯]

১৯.

(কন্যার বিদায়কালে স্বজনদের উপদেশ)

এই গানে দেখা যায় কন্যা স্বামীর দেশকে আপন দেশ বলছে। মা তার কন্যাকে ভালভাবে স্বামীর সংসার করতে বলছে। এটাই বাঙালি নারীর কামনা।

ফুলিরো না বিয়া
সোনার গয়না দিয়া
ঝলমল করে ফুলি রে
ও যেন আসমানেরও চান না সে চমকায়।
বাপের গলা ধরি
কান্দে ফুলি ফুকারি[৫৮]
বাপের বাড়ি খেলাপাতি গো
বাপজান বিদায় দেন দ্যাশে চইলা যাই ॥
মায়ের ধইরা দুইখান পাও
ফুলি কয় জন্মের মাও
মায়েরও বাড়ি খেলাপাতি গো
জন্মের মাও বিদায় দ্যাও
দ্যাশে চইলা যাই ॥
মায়ে না কান্দে মুখে আঁচল গুইজা[৫৯]
বিদায়ও কইওনা ফুলি গো
বার না মাসে তের না পার্বণে
নাইওরও তুমি আইবা
বিদায়ও না কইও ফুলি গো।
চাচার গলা ধরি কান্দে ফুলি ফুকারি
চাচা জানের ঘরেতে সব চিনির কুটরা[৬০]
কত না চিনি খাইছে এই ফুলি গো ॥
চাচা জান বিদায় দ্যান দ্যাশে চইলা যাই।
ভাইয়ের গলা ধরে বইনের উপরে পরে
ভাই ও বোন বিদায় দ্যাও
দ্যাশে চইলা যাই ॥
মায়ে কয় শুন ফুলি শোন দিয়া মন

www.pathagar.com

কিছু কথা কহি আমি রাখিও স্মরণ
জন্ম না দিক আর না ধরুক প্যাটে
তারাই এখন তোমার আপনজন রে
শ্বাশুড়িরে মাও মাইনো শ্বশুরেরে বাপ
আদবও রক্ষা কইরো নইলে হইব পাপ
পুতুরারে ভাইও মাইনো ঝিয়ারিরে বইন
তারাই এখন তোমার সর্ব আপনজন
আরও দশজন আছে যারা আপনও ভাবিও
মান ইজ্জত রক্ষা কইরা সংসারও করিও ॥[২০]

২০.

(বর নববধূকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে গমন করলে কনের সখিরা গায়)

সড়ক দিয়া যায় রে নশা সড়ক রোশনাই[৬১] করে
পথের মাইনসে[৬২] জিজ্ঞাস করে কি কি নিছে চোরে (২)

পাতিল আছে বাসন আছে সবই আছে ঘরে
নশার যে নানী হওরী[৬৩] আছাল তারে নিছে চোরে (২)

সড়ক দিয়া যায় রে নশা সড়ক রোশনাই করে
পথের মাইনসে জিজ্ঞাস করে কি কি নিছে চোরে (২)

পাতিল আছে বাসন আছে সবই আছে ঘরে
নশার যে নানী হওরী আছাল তারে নিছে চোরে (২)

সড়ক দিয়া যায় রে নশা সড়ক রোশনাই করে
পথের মাইনসে জিজ্ঞাস করে কি কি নিছে চোরে (২)
পাতিল আছে বাসন আছে সবই আছে ঘরে
নশার যে দাদী আছাল তারে নিছে চোরে (২)[২১]

২১.

(মেয়েকে বিদায় দেওয়ার পর কষ্টে কাতর মায়ের গান)

মায়ে ডাকে ময়না রে ময়না,
ময়না নাই মোর ঘরে রে,
সুন্দর ময়না, ময়না রে (২)

কোনো না গোলামের বেটায়
আমার ময়নারে পাগল করল রে (২)

যাইবার কালে যাবি রে ময়না
অন্তর হুদা[৬৪] কইরা রে

www.pathagar.com

সুন্দর ময়না, ময়না রে (২)
যাইবার কালে যাবি রে ময়না
এই বুকে শেল[৬৫] দিয়া রে,
সুন্দর ময়না, ময়না রে (২)

যাইবার কালে যাবি রে ময়না
ময়না পাগল, বানাইয়া রে (২)
মায়ে ডাকে ময়না ময়না
ময়না নাই মোর, ঘরে ঘরে রে
সুন্দর ময়না, ময়না রে।[২২]

২২.

(নববধূর জন্য বরের স্বজনদের অপেক্ষা)

বরের বাড়ির লোকজন কনেকে দেখার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে। সে চিত্র আমরা এই গানে পাই।

আশি টাকার খাসি লো
রাইন্দা করলাম বাসি লো
বিয়ার কেন এত রাইত অইল।
এত রাইতের কালে লো
ঘটুকির কপালে হলা[৬৬] আর হাছুন[৬৭] লো
বিয়ার কেন এত রাইত অইল।
এত রাইতের কালো লো
আন্ডা ঢোক ঢোক করে লো
জ্যোৎস্না ফটফট[৬৮] করে লো
আমরা শরমে মরি লো
আমরা মরি লজ্জায় লো
বিয়ার কেন এত রাইত অইল।
এত রাইতের কালো লো
পানিয়ার পায় ধরে লো
লাল মোরগখান বাকে লো,
আন্ডা ঢোক ঢোক করে লো
জ্যোৎস্না ফট ফট করে লো
বিয়ার কেন এত রাইত অইল।
এত রাইতের কালে লো
পানিয়ার পায় ধরে লো, দরিয়ার পায়ধরে লো,
আমরা মরি শরমে লো,
আমরা মরি লজ্জায় লো
বিয়ার কেন এত রাইত অইল।

www.pathagar.com

পাইনা ব্যাটা হারমজাদা
তুইলা নেয় কোলে লো, তুইলা নেয় কোলে লো
বিয়ার কেন এত রাইত অইল।[২৩]

২৩.

(কন্যাকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর সখিদের গান)

কন্যা স্বামীর বাড়ির উদ্দেশ্যে গমন করলে কন্যার সখিরা বরের নিকট আত্মীয়দের নানা রকম ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে গান গায়। সেই ব্যঙ্গ চিত্র এই গানে দেখা যায়।

সড়ক দিয়া যায় গো দামান
সড়ক ঝিকমিক করে
পথের ম্যানষে জিজ্ঞাস করে
কি কি নিছে চোরে।
থালও আছে বাসনও আছে
সবই আছে ঘরে
নওসার একখান ভাই বউ আছাল
তাইরে নিছে চোরে।
সড়ক দিয়া যায় গো দামান
সড়ক ঝিকমিক করে
পথের ম্যানষে জিজ্ঞাস করে
কি কি নিছে চোরে।
থালও আছে বাসনও আছে
সবই আছে ঘরে
নওসার একখান দাদি আছাল
তাইরে নিছে চোরে।
সড়ক দিয়া যায় গো দামান
সড়ক ঝিকমিক করে
পথের ম্যানষে জিজ্ঞাস করে
কি কি নিছে চোরে।
থালও আছে বাসনও আছে
সবই আছে ঘরে
নওসার একখান দাদি আছাল
তাইরে নিছে চোরে।
থাক নানি থাক নানি
ছাতি আলার কাছে
বিয়া কইরা শেষে আইসা
ঘুরাইয়া নিব শেষে।
সড়ক দিয়া যায় গো দামান
সড়ক ঝিকমিক করে

www.pathagar.com

পথের ম্যানষে জিজ্ঞাস করে
ছাতি নাইক্যা সাথে
নওসার নানিরে বন্ধক থুইয়া
ছাতি আন দেশে।[২৪]

২৩

(বিয়ের পর বরের গান)

আটে[৬৯] বাজারে দৌড়াই ঘোড়া গো
হায় রে বাজান[৭০] পয়সাই মিলে না।
পয়সাই যুদি মিলে বাজান, টেকাই মিলে না (২)

টেকাই যদি মিলে বাজান গো
হায়রে বাজান, জেওর[৭১] মিলে না। (২)
আগে যে কইছিলাম বাজান গো
আমি বিয়াই, করমু না (২)
বিয়ারই সুময় ও বাজান গো
আমি তর্কই করমু না।
অকুটাই বালির আকর আমি গো
আমি সইতেই পারমু না (২)[২৫]

২৪

(পণপ্রথার নির্যাতনে পিষ্ট মা ও মেয়ের গান)

নূরেরী ঝিলমিল দেখিয়া বৈঠারী ডগ-গম শুনিয়া
কানছে রে অভাগিনী ধুলায় লুটাইয়া (২)

মেয়ে : বাবা অইছাল[৭২] নিদারুণ
টেকা নইছাল[৭৩] কি কারণ?

বিয়া দিছাল বাইল্যা চাটার[৭৪] সনে (২)
আমারে যে রাখিও মাগো
সুন্দুকে ভরিয়া (২)

মা : স্বামী আমার নিদারুণ
টেকা নইছাল কি কারণ?
তোমারে যে রাখব মাগো
সুন্দুকে ভরিয়া।
অন্য দেশের সাধু আইয়া[৭৫]
নিব সুন্দুক খুলিয়া।[২৬]

২৫.

(বিবাহিত নারীর গান)

কাঁচা কলা খাইলে গো মা
কৈষ্টা[৭৬] কৈষ্টা লাগে,

www.pathagar.com

পাকা কলা খাইলে গো মা
মিষ্টি মিষ্টি লাগে।
পরের বাড়ি গেলে গো মা
তুষের আগুন জ্বলে,
শ্বশুর করে রাগারাগি
ভাশুর গোসসা করে।
আড়ায় দিনকার স্বামী অইয়া[৭৭]
চুলের মোঠায় ধরলা,
ধরলি ধরলি ভালাই করলি
ভাঙ্গলি গলার হার,
কাইল[৭৮] যামুগা বাপের বাড়ি
লোকসান হব কার?[২৭]

বিবাহের প্রথম প্রথম নববধু স্বামীর বাড়ির অচেনা পরিবেশে অস্বস্থি বোধ করে। এই জন্য সে বাপের বাড়ির চির-চেনা পরিবেশে আবার ফিরে যেতে চায়। সে কয়েক দিনের জন্য বাপের বাড়ি যায়। এই যাওয়াকে বলে 'নাইওর'।

দাঁড় কাইয়্যায় কাঁঠল খায়
পরাণ আমার ছিট্টা যায়
এত দরদের বাজান গো নাইওর নিলা না।
থাক মা থাক মা ডুলি পাইলাম না
পরের বাইত্তে থাকতে থাকতে
শইল অইল কালা গো
সাধের বড় জ্বালা।
দাঁড় কাইয়্যায় কাঁঠল খায়
পরাণ আমার ছিট্টা যায়
এত দরদের ভাই গো নাইওর নিলা না।
থাক বোন থাক বোন ডুলি পাইলাম না
পরের বাইত্তে থাকতে থাকতে
শইল অইল কালা গো
সাধের বড় জ্বালা।
দাঁড় কাইয়্যায় কাঁঠল খায়
পরাণ আমার ছিট্টা যায়
এত দরদের বাজান গো নাইওর নিলা না
থাক মা থাক মা পালকি পাইলাম না
পরের বাইত্তে থাকতে থাকতে
শইল অইল কালা রে
সাধের বড় জ্বালা।[২৮]

www.pathagar.com

২. ভাটিয়ালি গান

ভাটির দেশের একটি গানের নাম ভাটিয়ালি। ভাটিয়ালি গান বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। বাংলাদেশের ভাটিয়াল অঞ্চলে যে গান প্রচলিত সেই গানই ভাটিয়ালি গান নামে পরিচিত। অর্থাৎ 'ভাটি' শব্দ থেকেই ভাটিয়ালি শব্দের উদ্ভব। ভাটিয়ালি ঠিক গানের নাম নয়, ভাটিয়ালি হলো এক রকমের সুরের নাম। ঐ বিশিষ্ট সুরে গেয় গানকেই এখন ভাটিয়ালি গান বলা হয়।

ভাটিয়ালির নামকরণের অর্থ নানাজনে নানাভাবে করেছেন। কেউ বলেন, নদীর ভাটির স্রোতের টানে নৌকা ভাসিয়ে মাঝি যে গান করে, তাই ভাটিয়ালি গান। কেউ বলেন, বাংলার ভাটি অঞ্চলের নৌকার মাঝির গান হল ভাটিয়ালি গান। আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, 'নদীর ভাটি দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে সাধারণত নৌকার মাঝিগণ যে গান গাইত তাকেই ভাটিয়ালি বলা হত। দিগন্তব্যাপি নদীর শূন্যতার উপর নায়ের বাদাম উড়িয়ে একক ভাবেই এ গান গাওয়া হতো-বাদ্য যন্ত্রের কোনোই ব্যবহার ছিল না। দিগন্তব্যাপী ঢেউ-এর উপর 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না...প্রভৃতি গানের কলিগুলো যখন ছড়িয়ে পড়ত তখন তা চিত্তনদীতেও ভাবের তুফান তুলত।'[২৯]

ভাটিয়ালি গান সম্পর্কে নির্মলেন্দু ভৌমিকের বক্তব্য- 'ভাটির টানে নৌকা ছেড়ে দিলে বিনা আয়াসে নৌকা চলতে থাকে। এই 'অনায়াস' এবং 'তজ্জাত' অবসরই ভাটিয়ালির রচনাগত উৎস। ভাটিয়ালি গান যত না নদী প্রান্তরের গান, তার চেয়ে কোনো বিশেষ একটি অঞ্চলের (যেমন পূর্ববঙ্গীয় অঞ্চল) গান। এই অর্থে ভাটিয়ালি বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের গান, যে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় নিম্নভূমি এবং সেই কারণেই নদী-হাওরে পরিপূর্ণ।'[৩০]

আশুতোশ ভট্টাচার্য, 'নদীর ভাটি ও 'ভাটি অঞ্চল' উভয়ের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ভাটি অঞ্চলের সংগীত বলিয়া ইহার নাম ভাটিয়ালি, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। বাংলাদেশের নিম্নভূমি অর্থাৎ সাধারণত যে সকল অঞ্চল বর্ষায় জলমগ্ন হইয়া যায় তাহাই ভাটি বলিয়া পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে ভাটিয়াল এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংগীত।

একদিকে নদী কিংবা জলাভূমির বিস্তার আর একদিক দিয়া ইহার অলসমন্থর গতি, উভয়ের সহযোগেই ভাটিয়ালির উদ্ভব হইয়া থাকে; এই অবস্থার মধ্য দিয়াই মাঝি কর্মে যথার্থ অবসর লাভ করিতে পারে, এই অবসরের মুহূর্তেই ভাটিয়ালির পক্ষে অনুকূল মুর্হূর্ত। সেইজন্য নদীর ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া অলস বৈঠাটি একহাতে স্থির ধরিয়া রাখিয়া মাঝি এই গান গাহে বলিয়াই ইহা ভাটিয়ালি বলিয়া পরিচিত।'[৩১]

বাংলা ভাষায় 'ভাটিয়ালি' শব্দের দুটি অর্থ পাওয়া যায়, যার একটি হলো- দিবসের পড়ন্ত বেলা অর্থাৎ বিকেল বেলা; অন্যটি হলো জীবনের শেষপ্রান্ত অর্থাৎ বার্ধক্য। দুটি অর্থের মধ্যেই জীবনের কর্মময় ও চঞ্চলতার অবসানের আভাস আছে। জীবন সায়াহ্নে মানুষ পরপারের আকর্ষণে ভাটির টানে গড়াতে চায়। ভাটিয়ালি গানে মূলত এদেশের মানুষের জীবন ও মনের ইহজাগতিক বোধ থেকে পারলৌকিক অভিযাত্রার সুগভীর আকর্ষণে এক অদ্ভুত রহস্যময়তা ধরা পড়ে।[৩২]

www.pathagar.com

আবার 'ভাটি' শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'আল' প্রত্যয় যোগ করে 'ভাটিয়াল' অতঃপর 'ভাটিয়ালি' শব্দ গঠিত হয়েছে। "উজান বাঁকে যায়রে বন্ধু, ভাইটাল বাঁকে ঘর।" ভাটিয়ালি গানের একটি চরণ; 'নদীর নিম্নদিক' অর্থে ভাইটাল<ভাটিয়াল পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'ভাটি' দেশজ 'ভাটা' শব্দজাত, অর্থ নদীর স্বাভাবিক স্রোতের দিক।'[৩৩]

ভাটির টানে মাঝি নৌকা ছেড়ে মনের খুশিতে যে গান ধরে, মনের আনন্দের প্রকাশই ঘটে সে গানে। উদার মাঠ, নদী, গাঙ, খাল-বিল, বাওর প্রভৃতি এলাকার ছন্দবিহীন টানা সুরে ভাটিয়ালি গান গাওয়া হয়। এ গানের গায়ক ও শ্রোতা মূলত গায়েন স্বয়ং। এ গানের উদাস করা আকুল সুর উঁচু গ্রামে শুরু হয়ে কোনো অজানার উদ্দেশ্য মূর্ছিত হয়ে মিলিয়ে যায়।

গবেষকের মতে, ভাটিয়ালি গান মানুষের কর্মশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে না- জীবনের দুঃখ, ব্যথা, হতাশা ও অপ্রাপ্তিতে প্রশমিত করে মনের ওপরে শান্তির স্নিগ্ধ আস্তরণ বুলিয়ে দেয়।

সুরের দিক দিয়ে ভাটিয়ালি গান এদেশের নিজস্ব সম্পদ। নদীমাতৃক বাংলার জলে কাদায় যাঁদের জীবন-মরণ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সূত্রে গ্রথিত, সেই অগণিত চাষি-মাঝির প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের আত্মপ্রকাশ ভাটিয়ালি গানে। এক কথায় ভাটিয়ালি গান গ্রামীণ মানুষের আনন্দ-বেদনার স্ফটিক মুকুর। এই মুকুরে বিম্বিত সাধারণ মানুষের মনোভাবের অসংখ্যা অভিব্যক্তি।

ভাটিয়ালি গানের লৌকিক প্রেম ও অধ্যাত্ম প্রেম উভয়স্থলে নদী-নৌকা-মাঝির কথা আছে। সাধারণ মানুষ অভিজ্ঞতার অধিক বশবর্তী এবং আত্মপ্রকাশে অধিক জীবনবাদী। কেবল সমাজ নিষিদ্ধ বিষয়ে লোক মানস প্রতীকধর্মীয় হয়। যেমন— প্রেম-যৌন ব্যাপারে প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে থাকে। লৌকিক প্রেমের ভাটিয়ালি গানে নদী-নৌকা মাঝির চিত্র এসেছে পরিবেশ হিসেবে, রূপক বা প্রতীক হিসেবে নয়। আধ্যাত্মিক প্রেমের ভাটিয়ালি গানে এর বিপরীত চিত্র আছে। আমাদের বিশ্বাস, বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত লৌকিক প্রেমের গানগুলো আগে রচিত হয়েছে, ধর্মীয় ভাবনাপ্রসূত আধ্যাত্মিক প্রেমের গানগুলো পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। তান্ত্রিক দেহতত্ত্বের সাথে সুফীর মরমীয়া অধ্যাত্মতত্ত্ব যুক্ত হয়েছে এসব গানে। বাংলাদেশে এ দুটি ভাবধারা উচ্চশ্রেণির মানুষ আগে গ্রহণ করেছে। সাধারণ শ্রেণির মানুষ পরে তাদের অনুসরণ করেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব ও ভক্তিবাদ উভয় ধারার মিশ্রণে ও প্রচারে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমরা এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে ভাটিয়ালি গানগুলোকে লৌকিক প্রেম, রাধাকৃষ্ণ প্রেম, অধ্যাত্মপ্রেম ধারাক্রমে সন্নিবেশিত করেছি। বাংলা ভাটিয়ালি গানের উদ্ভব-বিকাশে এ তত্ত্বেরই প্রতিফলন আছে।[৩৪]

ভাটিয়ালি গানের রাগ-রাগিনী নিয়েও গবেষকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের রাগতালনামা (১৯৬৭) গ্রন্থে আহমদ শরীফ নানা রাগ-রাগিনীর নাম করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তালিকায় ভাটিয়ালি বিষয়ক নিম্নরূপ ছয়টি রাগের উল্লেখ আছে : (১) করুণা ভাটিয়ালি (২) নাগোধা ভাটিয়ালী (৩) আকুমারী ভাটিয়ালি (৪) কামোদ ভাটিয়ালি (৫) বেউরপুরী ভাটিয়ালি (৬) ভাটিয়াল বৈরাগী।[৩৫]

www.pathagar.com

নির্মলেন্দু ভৌমিক শ্রীহট্টের ভাটিয়ালি গানের সুরের তিনটি পর্যায় লক্ষ করেছেন। তিনি এগুলোর নাম দিয়েছেন (১) নাগোধা ভাটিয়ালি (২) দুঃখী ভাটিয়ালি (৩) করুণ ভাটিয়ালি। তাঁর মতে 'নাগোধা' 'ন্যগ্রেবি' শব্দজাত, অর্থ নিম্নবোধক; নিম্ন বা ভাটি ভূমির গান 'নাগোধা ভাটিয়ালি' হয়েছে।[৩৬] এরূপ অঞ্চলভেদ থেকে সুরভেদ এবং সুরভেদ থেকে নামভেদ। বৈষ্ণব, বাউল ও সুফী ভাবনা ভাটিয়ালি গানে বিষয় বৈচিত্র্য ও রূপান্তর এনেছে। এতে ভাটিয়ালির গায়ন রীতিতে সূক্ষ্ম পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এসব নামকরণে তারই প্রতিফলন আছে। কতক নাম স্থানবাচক কতক ভাববাচক। ভাটিয়ালি গানে ঘুরে ফিরে পরম শক্তির কাছে নিজেকে নিবেদনের কথাই প্রতীকীভাবে প্রকাশিত হয়েছে, আর সে প্রতীকের অনুষঙ্গ হিসেবে নদী তীরবর্তী মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম উপাদান নৌকা, বৈঠা, নদী ও তার স্রোত ধারার কথা ব্যক্ত হয়েছ। তাই ভাটিয়ালি গানকে বিশ্লেষণের জন্য শুধু মাঝি, নৌকা, নদী ও কর্মক্লান্ত জীবনের কথা বিবেচনা না করে বাংলার ভাববাদী মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার কথাও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।[৩৭]

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। আর বাংলাদেশের ভাটির অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্রতম জেলার নাম টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল জেলার নদ-নদীগুলোতে একসময় ভাটিয়ালি গানের কথা ও সুর ভাসত। এ জেলার যমুনা, ঝিনাই, ধলেশ্বরী, বৈরান, বংশী, ফটিকজানি, লৌহজং প্রভৃতি নদীতে ভাটিয়ালি গানের সুর শোনা যেত। ভাটির এ অঞ্চলে ভাটিয়ালি গান এখন বিলুপ্ত প্রায়। এই জেলায় প্রচলিত কয়েকটি জনপ্রিয় গান হলো–

১.

বন্ধুর নায়ে উঠে লাল বাদাম
তুমি বন্ধু আসিবে বইলে
বাঁর পান মোর হলো বাসীরে
বন্ধু তুমি খেলে না বাঁর পান ॥
আষাঢ় মাসে নতুন পানি
কত নৌকা যায় উজানি
কত নৌকা এলো গেল (২)
বন্ধুর নৌকা এলো না বান ॥

বন্ধু যায় মোর পানসি বাইয়ে
আমি ডাকি হাত উঠায়ে রে
ফির ফির ওহে বন্ধু (২)
শুনি তোমার মুখের গান ॥[৩৮]

২.

আরে ও পদ্মা নদীর পারে
কে গো তুমি আসলা জলে
জিজ্ঞাসি তোমারে রে
পদ্মা নদীর পারে ॥

www.pathagar.com

সকাল বেলায় পানসি লয়ে
চলছি ধীরে ধীরে।
ঢেউ দিয়ো না করি মানা (২)
আমার পানসি যদি ডুবে
পদ্মা নদীর পারে ॥
রাঙা টুকটুক কোমল খানি
চিনি না তোমারে (২)
কে গো তুমি গান গেয়ে যাও
কতই মধুর সুরে
ও গো পদ্মা নদীর পারে ॥[৩৯]

৩.

ও সোনা বন্ধুয়া গো
আমার দিকে একবার ফিরা চাও ॥
ও বন্ধু গো ভাইটাল দেশের মাঝি তুমি
উজান পানি বাও।
রঙের তরী রঙ্গের বৈঠা
রঙ্গে রঙ্গে বাও ॥
ও বন্ধু গো রঙ্গের তরী রঙ্গের বৈঠা
রঙ্গে রঙ্গে বাও।
তোমার কাছে রং না থাকলে
আমার কাছে চাও ॥
ও বন্ধু গো নায়ের মাস্তুলেতে তোতা পাখি
ময়নায় করে রাও (২)
রঙ্গের সাথে রং মিশাইয়া (২)
রঙ্গের তরী বাও ॥[৪০]

৪.

আমার বন্ধুর নায়ে
বন্ধুর নায়ে উড়ে নীল বাদাম ॥
বন্ধু যায় রে পানসি বাইয়া
ডাকি আমি হাত উড়াইয়া গো (২)
ফির ফির ওহে বন্ধু
শুনবো তোমার বাঁশির গান ॥
চলছে বন্ধু উজান বাইয়া
ঘাটে ঘাটে নাও ভিড়াইয়া গো (২)
আমার মনে বলে সাঁতার দিয়া
ধরি বন্ধুর বৈঠা খান ॥

www.pathagar.com

যদি বন্ধু নিত নায়ে
আমি থাকতাম বন্ধুর মুখে চাইয়ে গো (২)
মুখ লাল কইরা চুমা খাইয়া (২)
জুড়াইতাম পোড়া পরাণ ॥[৪১]

৫.

তোমার লাইগা কান্দে আমার মন
কানতে কানতে জীবন গেল (২)
পাইলাম না তোমার মন ॥
তুমি যে বলিয়া ছিলে
না ছাড়িব কোনো কালে গো
ওরে এখন দেখি সবই ফাঁকি (২)
ফিরিয়া না চাও এখন ॥
তোমার দুঃখে দুঃখি আমি
তোমার সুখে সুখি আমি গো
ওরে এখন দেখি সবই ফাঁকি (২)
ফিরিয়া না চাও এখন ॥[৪২]

৬.

দোতারা বাজাইয়া গান গাইও
সোনার বন্ধুরে (২)
রবিবারে গাছ কাটিয়া
সোমবারে বানাইও
মঙ্গলবারে তার লাগাইয়া (২)
বুধবারে বাজাইও
সোনার বন্ধুরে ॥
আমার বাড়ির উপর দিয়া
পরশি বাড়ি যাইও
খোলা মাঠে বইসা বন্ধু (২)
দোতারা বাজাইও সোনার বন্ধুরে ॥
চাম দিয়া ছাইয়ারে বন্ধু
সোমের তার লাগাইও
টাম টুমা টুম বাদ্য দিয়া (২)
আমার মন ভুলাইও সোনার বন্ধুরে ॥
চাম দিয়া ছাইও বন্ধু
সোমের তার লাগাইও
রঙ্গ রসের গান গাইয়া (২)
আমার মন ভুলাইও সোনার বন্ধু রে ॥[৪৩]

www.pathagar.com

৩. ঘাটুগান

প্রেমিক তার প্রেমিকার নিকট আকাঙ্ক্ষার ষোলো আনা নিবৃত্তি করতে চায়। কিন্তু প্রেমিকা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। প্রেমের পবিত্র সম্পর্ক কেবল মনের দেউড়ীতেই সীমাবদ্ধ। বাঙালি নারীর দেহগত সংস্কারের অনুপম প্রকাশ গানটিকে স্বকীয় মর্যাদা দান করেছে।

তুমি যার জন্য হইছ পাগল
তাও তোমারে দিব না
তাও তোমারে দিব না গো ॥ (২)
ঐ বুকের কাপড় তুলতে দিব
জোড় কমলা দেখতে দিব
হাতাহাতি করতে দিব
বন্ধু কোমল ধরতে দিব না ॥ (২)[৭৮]

ঘাটুগান : মশাজান, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

২

প্রেমিকা তার বন্ধুকে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। প্রেয়সী তার বন্ধুর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। নারী তার দেহের গোপন সৌন্দর্য প্রিয়জনের সামনে উন্মোচন করে প্রেমকে সার্থক করার বাসনা প্রকাশ করেছে। সংস্কারমুক্ত নারীর ভোগবাদী চেতনা কোনোভাবেই গোপন থাকেনি এ গানে।

সখা আমার বাড়ি গেলে
প্রেমের বাস্ক[৭৯] দিব খুলে ॥
প্রেমের বাস্ক দিব খুলে
পালঙেগর উপরে ॥ (২)
খাট পালং ফুল বিছনা দিব
মুশারেরই[৮০] তলে

গোলাপ জলে চান করাব
আতর দিব ঢাইলে[৮১]
প্রেমের বাস্‌ক দিব খুলে ॥ (২)[৪৫]

৩.

পরকীয়ায় আসক্ত নারীর হৃদয় পবিত্র নয়। চতুর নারী স্বামীর বুকে মাথা রেখে পর পুরুষের কথা ভাবে। গভীর রাতে স্বামীর চোখ ফাঁকি দিয়ে সে প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। এমন নারীর সাথে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হয় না। স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পরকীয়ায় আসক্ত নারীর এতটুকু বাধে না।

নারী তো আপনও নয় গো
অন্তরায় গরল রাখে
অন্তরায় গরল রাখে গো ॥(২)
হায়রে সন্ধ্যা নাগলে[৮২] (২)
বিছানা রে পাড়ে
কেবল স্বামীর মনও রাখে
ঐ বুগলে[৮৩] শুইয়ে
রাইত্র[৮৪] না দুপুরের কালে গো
বন্ধুর সনে প্রেম করে ॥(২)[৪৬]

৪.

পুরুষের অন্য নারীতে আসক্তির নির্লজ্জতার প্রকাশ ঘটেছে এ গানে। দুশ্চরিত্র পুরুষ নিজের ঘরে সুন্দরী স্ত্রী রেখে অন্য নারীর সঙ্গ লাভ করতে যায়। পুরুষের বহুগামী চরিত্রের প্রকাশ গানটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। লম্পট পুরুষের নিকট সম্পর্কের ভেদাভেদ নেই। নারীর দেহ সম্ভোগের প্রবল আকাঙক্ষাই তার কাছে একমাত্র সত্য।

পুরুষও বেঈমানের জাত গো
লজ্জা নাই তোর গাল মুখে
লজ্জা নাই তোর গাল মুখে গো ॥(২)
হায় রে সোন্দর নারী রাইখা ঘরে
বেড়া কাটো মামীর ঘরে লজ্জা করে না ॥
কিবা[৮৫] বাপের পয়দা তুমি গো
নারী দেইখা রে মন মানে না ॥(২)[৪৭]

৫.

দেশে কলেরা রোগ দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন অগণিত মানুষ মরছে। চারদিক ক্রমাগত জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে। প্রেমিকার হৃদয়ে প্রচণ্ড ভয় এবং শঙ্কা বিরাজ করছে বন্ধুর জন্যে। দেশের সব লোক মরে যাক তাতে ক্ষতি নেই। এমনকি নিজের কোলের সন্তানও যদি মরে তবুও সে সহ্য করতে পারবে, কিন্তু প্রাণ বন্ধু যেন মরে না।

দেশেতে কলেরা আইল[৮৬]
লোকের ভালাই[৮৭] দেহিনা[৮৮] ॥ (২)
পেটও নামায়[৮৯] ও বমি রে করে

www.pathagar.com

নিত্যি নতুন মানুষ গো মরে
ও বাঁচি না ডরে ॥ (২)
মরে মরুক কোলের ছাইলা গো
প্রাণ বন্ধু য্যান মরে না ॥ (২)[৪৮]

৬.

প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ধিক্কার দিচ্ছে এই বলে যে, তোমার যৌবনের সুধা রস একেবারে ফুরিয়ে গেছে। প্রত্যুত্তরে প্রেমিকা বলছে, তুমি আমার সুধা ভরা যৌবনের নিন্দাই করলে সারাজীবন। আসল কোমল চিনলে না। আসল কোমলের সন্ধান পেলে তোমার মতো পুরুষ আমার প্রশংসায় বিভোর হয়ে থাকত সারাজীবন।

ছি ছি ধনী কমলিনী
ও তোর কোমলে নাই মধু
তোর কোমলে নাই মধু গো (২)
তোর কোমলে নাই মধু ॥
ও কমলিনী রাই ॥(২)
আমার কোমল রসে ভরা
নিন্দা করলি জনম গো ভরা
ও রসের কোমলা গো
ও বন্ধু চিনলি না ॥[৪৯]

৭.

বাঙালির প্রণয় জগতের আদ্যোপান্ত জুড়ে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণ। তাই বাঙালি মন প্রেমানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বার বার রাধা-কৃষ্ণকেই প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছে। প্রেমিক তার প্রেমিকার জন্য ভালবাসার সাবান কিনে এনে তাকে খুশি করতে চেয়েছে।

সাবান সাবান কর রাই গো
ও সাবান একখান আইনাছি গো
রুমাল একখান আইনাছি ॥ (২)
আনছি সাবান জলে ভাসা
মিটাইব তোর মনের আশা ॥
ওগো কারবেলি সাবানে শ্যাম গো
শইলের[১০] ময়লা কাটে না (২)[৫০]

৮.

বাঙালি একান্নবর্তী পরিবারের ভাবী আর দেওরের মধুর সম্পর্ক এ গানে প্রতিফলিত হয়েছে। ভাবি তার ছোটো দেবরের নিকট নিজের মনের অবস্থা ব্যক্ত করেছে সাবলীল ভঙ্গিমায়। স্বামী জলের উপর টঙ্গ ঘর বানিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে রাত কাটাতে চাইলে স্ত্রী আপত্তি জানায়।

(নায়িকার প্রশ্ন)
ছোট ছোডমিয়া[১১]

www.pathagar.com

তোর ভাইয়ের ভাত
আমি খাইতাম না ॥ (২)
তোরও ভাইয়ের ভঙ্গি-ছঙ্গি
জলের উপর তুলছে টুঙ্গী[১২]
সেও টুঙ্গীতে গো আমি শুইতাম না ॥ (২)[৫১]

৯.

ভাবী রাগ করে ভাইকে ফেলে বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছে। দেবর বার বার ভাবীকে অনুরোধ করছে যে, সে যেন তার ভাইকে ছেড়ে চলে না যায়। কিন্তু ভাবী দেবরের কোনো কথাই শুনছে না। দুশ্চরিত্র নারীর স্বামীর সংসারের প্রতি চরম অনীহা ও পর পুরুষের প্রতি আসক্তির অনুপম চিত্র এ গানে ফুটে উঠেছে।

(নায়কের উত্তর)
যাইও না যাইও না বউদি
আমার ভাইকে থুইয়া[১৩]
ও আমার ভাইকে থুইয়া গো
বউদি আমার ভাইকে থুইয়া। (২)
লেপ তোষক ফুল বিছানায়
শুইলে তোমার ঘুম আসে না
ওগো কলা তলের ছালার বিছানা
তাও তো তুমি ছাড় না ॥ (২)[৫২]

১০.

গহীন বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় সহসা এক অল্প বয়সী নারীর সঙ্গে দেখা হয় এক পুরুষের। মেয়েটির কোলে একটি শিশু রয়েছে। সম্ভবত এটি তার ছেলে এবং সে তার স্বামীকে খুঁজতে এসে তার কোনো সন্ধান পাচ্ছে না। লোকটি যখন ঐ মহিলার নিকট জানতে চায় যে কোলের শিশুটি তার সন্তান কি না? তখন মহিলা নিজেকে অবিবাহিতা ব্রাহ্মণী বলে পরিচয় দেয়। নারীর হৃদয়ের আজন্ম রহস্যময়তা ও ছলনার প্রকাশ এ গানে খুঁজে পাওয়া যায়। পুরুষ পথিক নারীর সত্য গোপন ও ছলনা করার ভিতরে নারী হৃদয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত পায়।

আচম্বিতি[১৪] অরুন[১৫] গো বনে
পাইলাম একটি রমণী (২)
হায় রে ছায়লা[১৬] কোলে
নইয়া[১৭] গো তিনি।।(২)
করতে আছে স্বামীর গো উদ্দিশ
ও চিনতে না পারে।(২)
ও জিজ্ঞাসিলে দেয় পরিচয় গো
অনকুমারী[১৮] ব্রাহ্মণী ॥(২)[৫৩]

১১.

কবুতরের রূপকে নায়ক তার মনের ইচ্ছা নায়িকার নিকট ব্যক্ত করেছে। মনের অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যে নায়ক নানা রকম অভিব্যক্তি করবে বলে নায়িকাকে জানায়।

ছেরি[৯৯] জোংলা কইতরের মতন
করস বাগ বাক্কুম
লো ছেরি করস বাগ বাক্কুম॥
ছেরি যদি হইতি পায়রি
আমি যদি হইতাম পায়রা
ও তোর গালডার[১০০] উপর
ঠোঁটটা থুইয়া[১০১]
করতাম সাধের বাগ বাক্কুম ॥[৫৪]

১২.

প্রেমিকার বাড়িতে যাবার কালে প্রেমিকের পায়ে কাঁটা বিঁধেছে। মাথায় ডাল ভেঙ্গে পড়ে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে। এসব প্রতিবন্ধকতার জন্যে প্রেমিকাকেই পরোক্ষভাবে দায়ী করছে প্রেমিক।

তুই বড় বেঈমানও রাই গো
ও তোর বাড়ি আর যাইতাম না ॥ (২)
তোরও বাড়ি যাবার গো কালে
কাঁটা ফুইটা বইলাম[১০২] পন্থে
ও যাই কেমন কইরে[১০৩]
ও ডাল ভাঙ্গিয়া মাথায় পইড়া গো
রক্তের ঢালা যায় ভাইসে ॥ (২)[৫৫]

১৩.

ঘাটু গানের আসরে দুই দলের মধ্যে গান চালাচালি হয়। গানে গানে একপক্ষ আরেকপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। যদি কোনো পক্ষ অন্যপক্ষের গানের জবাব গানে গানে দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে পক্ষকে নাস্তানাবুদ হতে হয়। এ গানটিও সে ধরনেরই একটি গান।

ঘাটু গাও রে ঘাটুর ছেরা
ঘাটু জানো কয় ছালা ॥
ওরে গানের পিঠে[১০৪]
গান না দিলে
ধইরা দিমু কান ডলা ॥(২)[৫৬]

১৪.

এটি ঘাটু আসরে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা সংক্রান্ত একটি গান। গানের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ দলকে হেয় প্রতিপন্ন করাই এ জাতীয় গানের উদ্দেশ্য। গ্রাম বাংলায়

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতামূলক ঘাটুগানের আসর বসে যার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাদের সামনে গায়কদের মধ্যে চলে তুমুল লড়াই। বিজয়ী দলের জন্যে থাকে সম্মানজনক পুরস্কারের ব্যবস্থা।

ওগো কইতনে[১০৫] আসিল ছেরা[১০৬]
ছেরা বড় হা করা ॥
খাইবার চাইছে পাকা কাঁঠল[১০৭]
খাইয়া বইছে[১০৮] জাম্বুরা ॥[৫৭]

১৫.

যৌবনকালে নারীর কদর সবার কাছে থাকে। তখন সবাই তাকে কাছে পেতে চায়। যৌবন শেষ হলে নারীর কদর ফুরিয়ে যায়। নারীর যৌবন ঘাসের ডগায় শিশিরের মতোই ক্ষণস্থায়ী। সময়ের দীর্ঘত্ব তাকে মলিন করে দেয়। যৌবন শেষ হলে নারীর কোনো মূল্য থাকে না।

কমলিনী রাই
আর কইরোনা[১০৯] যৈবনের বড়াই
আর কইরোনা যৈবনের বড়াই গো ॥ (২)
যখন ছিলো বয়েসের যৈবন
চেংরা[১১০] বুড়ায় করছে রে যতন
এখন যৈবন জলে ভাইসা যায় ॥(২)[৫৮]

১৬.

বন্ধু তার প্রেয়সীর জন্যে শহরে যাবে কানের দুল কিনতে। কিন্তু তার মন কিছুতেই প্রেয়সীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে যেতে চায় না। তাই ফিরে এসে প্রেয়সীকে জড়িয়ে ধরে। আষাঢ়ের দুরন্ত বাতাসে বন্ধুর ঢেউ খেলানো সিঁথি যাতে ভেঙে না যায় সে বিষয়ে প্রেমিকা তাকে সর্তক করছে।

বন্ধু যায় রে ঢাকার শহর
কিনিয়া আনব দুল
উড়িয়া আসিয়া জড়িয়া ধরে গো
বানতে না দেয় চুল ॥ (২)
যাহারি মাথায় টেরিয়া সিঁথি[১১১] গো
তার সনে যাব ॥
বন্ধু চকে[১১২] যাইও না
আষাইঢ়া ঢেউয়ে ভাঙ্গবে সিঁথি গো
পরাণে সবো না ॥[৫৯]

১৭.

নারী বাপের বাড়ি নাইওর যেতে চায়। স্ত্রী সোহাগী স্বামী এতে সম্মত হয় না। তাছাড়াও স্ত্রীর প্রতি রয়েছে স্বামীর সন্দেহ। সন্দেহের কারণেই স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাসের বাঁধন হয়ে উঠেছে নড়বড়ে।

আমার আল্লাইদা স্বামী
নাইওর যাব বাপের বাড়ি

www.pathagar.com

ছাইড়া দিবানি[১১৩]
ছাইড়া দিবানি গো স্বামী
ছাইড়া দিবানি ॥
আইজই[১১৪] যাব কাইলই[১১৫] আসব
ও ছাইড়া দিবানি।
বিশ্বাস যদি না হয়
স্বামী সঙ্গে নও[১১৬] তুমি ॥[৬০]

১৮.

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় প্রেমিকার নিকট তার বন্ধু যৌবন কামনা করেছে। প্রেমিকা বেপরোয়া প্রেমিকের প্রস্তাবে দিশেহারা। অবোধ প্রেমিকের সঙ্গে প্রেম করে নারীর হয়েছে জ্বালা। যৌবন যদি গাছের গোটা হতো তাহলে হয়তো দুটো ছিঁড়ে বন্ধুর হাতে দিয়ে দিত। যৌবন নারীর অমূল্য সম্পদ। চাইলেই তা কাউকে দিয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু অবুঝ প্রেমিক তা কিছুতেই বুঝতে চায় না।

প্রেম কইরা[১১৭] কি হইলো রে জ্বালা
অবলা বন্ধুর সনে
অবলা বন্ধুর সনে গো ॥ (২)
হায় রে রাস্তা দিয়া হাইটা[১১৮] যাইতে
চেংরা[১১৯] বন্ধু যৌবন রে চাইছে
ঐ কদম তলে
যৌবন কি মোর গাছের গোটা[১১৯] গো
ও ছিঁড়া দেই বন্ধুর হাতে ॥ (২)[৬১]

১৯.

উপহারের কথা বলে পুরুষ নারীর ভালবাসা লাভ করেছে। কিন্তু বাসনা পূর্ণ হওয়ার পর পুরুষ পূর্ব অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। যা নারীর মনে পুরুষ সম্পর্কে বিরুপ ধারণার জন্ম দিয়েছে। পুরুষের মুখের আর মনের কথার মিল নেই।

ও পুরুষও বেইমানের জাত গো
দিবার চাইয়া দিলো না ॥ (২)
হায় রে টাকার কথা কইয়া গো নইয়া
পিরিত করল কোলে বসাইয়া
ও টাকা দিল না ॥ (২)
ও ডবল পয়সা হাতে দিয়া গো
ও টাকার কথা যায় কইয়া ॥ (২)[৬২]

২০.

প্রেমিকা বন্ধুর নিকট থেকে উপহার না পেলে বন্ধুর সঙ্গে অভিমান করে। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে না। বন্ধু গরিবের ছেলে। প্রতিদিন প্রেমিকার জন্যে উপহার নিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু লোভী নারী বন্ধুর মন বোঝে না।

www.pathagar.com

ও লো পশ্চিমা ছেরি
তোর পিরিতে এতই মান
তোর পিরিতে এত মান গো ॥ (২)
মাটি কাইটা করস ব্যবসা
পয়সা ছাড়া কসনা কথা
আমি যে গরিবের ছেলে
নিত্যি পয়সা পাই কোথা ॥ (২)[৬৩]

২১.

নারী তার বন্ধুর সঙ্গে অভিসারে এসেছে। ঘাসের উপর শিশির জল টলমল করছে। শিশিরের জলে শাড়ি ভিজে যাচ্ছে। নারী তার বন্ধুকে কাঁধের গামছা বিছিয়ে দিতে বলছে। গামছার উপরে শুয়ে সে তার বন্ধুর সাথে মনের কথা বলে অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করবে।

এস্তোনিয়ার লোকবিজ্ঞানীর প্রফেসর ইউলোভাল্কের সাথে ড. মো. আবদুল করিম মিঞা

নিহরে ভিজিল শাড়ি
গামছা কেনে বিছাও না
গামছা কেনে বিছাও না গো॥
হায় রে সোনা বরণ শরীল আমার
নীল বরণ গামছা গো তোমার
কেনে বিছাও না
ও গামছা খান বিছাইয়া শ্যাম গো
ও ফুরাও মনের বাসনা।[৬৪]

www.pathagar.com

৪. জারিগান

'জারি' ফারসি শব্দ। এর অর্থ ক্রন্দন বা বিলাপ। মরহম উপলক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জারিগান গাওয়ার প্রচলন আছে। জারিগান মরহম পর্ব উপলক্ষে সাধারণত গাওয়া হয়। মধ্যযুগে মুসলমান শাসনামলে এ গানের সৃষ্টি। বর্তমানে মহরম পর্ব ছাড়াও বছরের সব সময়ই জারিগান গাওয়া হয়। কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্তের বর্ণনা থাকে এই গানে, তবে বীর রসাত্মক নয়, গানের মধ্যে কারুণ্যের একটি স্নিগ্ধ প্রবাহ প্রচ্ছন্নভাবে বহমান থাকে। এই গান বেশ দীর্ঘাকৃতি হয়। আধুনিককালে অবশ্য যে কোনো বিষয়ই জারিগানের বিষয় হয়ে উঠেছে। যেমন– বন্যার জারি, জনসংখ্যার জারি, যৌতুকের জারি ইত্যাদি।

রূপসী বাংলার পল্লি মানুষের গান এই জারি। তবে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাকে জারিগানের উৎসভূমি হিসেবে ধরা হয়। আর ময়মনসিংহ জেলা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া একটি নতুন জেলার নাম টাঙ্গাইল। এখানকার নিরক্ষর সহজ সরল গ্রামের মানুষ এ গানের ভেতর দিয়ে প্রাণপ্রিয় বিশ্বনবীর দৌহিত্রের করুণ শাহাদতের কাহিনি শুনে দু-চোখ জলে ভাসিয়ে দেয়। জারিগানের আবেদন চিরন্তন। গানের উপজীব্যতা জারিগানের এই চিরন্তনী রূপ দিয়েছে। গ্রামের মানুষেরাই এ গানের শিল্পী। নিরক্ষর গ্রাম্য কবির মুখে মুখে এ গান রচনা করে আসরে আসরে গায়।

জারিগানের মূল গায়ক থাকে ও ধুয়া ধরার মতো আরো কয়েকজন গায়ক মিলে মূল গায়কের সাথে একটি দল থাকে। বন্দনা গান গেয়ে জারিগান আরম্ভ করে। জারিগানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে দোতারা, ঢোল, খুঞ্জুরি প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। মূল গায়ক গানের সুরে কাহিনির বিবরণ দেন আর অন্যান্য গায়কেরা জারিগানের ধুয়া ধরেন। বাড়ির উঠান বা বাহির বাড়িতে খড়, নাড়া, পাটি, চট বা ছালা প্রভৃতি বিছিয়ে কিংবা চেয়ারে বসতে দিয়ে মঞ্চ করেও বর্তমানে জারিগান পরিবেশন হয়। জারিগানের ভাষা সহজ। কাহিনি বয়ানের ধারা সরল। মূল গায়কের পরিবেশনের মধ্যে গানের সৌন্দর্য নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয় নিয়ে রচিত জারিগান উল্লেখ করা হলো।

জারিগান টাঙ্গাইল অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী গান। এ ধরনের গানে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমসাময়িক চমকপ্রদ ঘটনা বা ধর্মীয় কাহিনি উপজীব্য হয়ে থাকে। এ গানের বিশেষত্ব হচ্ছে এতে সুরে সুরে ঘটনা বর্ণনার সাথে সাথে বিশেষ ধরনের নৃত্য পরিবেশন করা হয়। মূল গায়কের সাথে দোহার থাকে। এ গানটি ঐতিহ্য বিষয়ক একটি গান।

১.

(টাঙ্গাইল জেলার জারি)

এই আসরে আছেন যত হিন্দু মুসলমান
সবাইকে জানাই আমার সালাম ও প্রণাম।
এই আসরে আছেন যত জ্ঞানী আর গুরু
টাঙ্গাইলের স্মৃতি দিয়া জারি করলাম শুরু।

www.pathagar.com

টাঙ্গাইলের স্মৃতি ভোলা দায় রে ॥
বাংলাদেশে এমন জিলা আর বা
কোথায় পাওয়া যায় ॥
মধুপুরে সস্তা মধু শাল গজারি বন
এইখানে তীর্থ করতো মদনমোহন
লক্ষ্মীঝরার স্বচ্ছ পানি
কলকলাইয়া বইয়া যায় ॥
আতিয়াতে বড় একটা মসজিদ আছে ভাই
দশ টাকারো নোটে যাহার ছবি দেখতে পাই
শাহান শাহের মাজারে গেলে
পাপ মুক্ত হওয়া যায় ॥
আলম নগর পাওয়া যায় নীল কমলের দই
বসুবাড়ি পাওয়া যায় বিন্নি ধানের খই
পোড়াবাড়ীর চমচম দেখলে
জিভের পানি রাখা দায় ॥
মির্জাপুরে বড় একটা হাসপাতাল আছে ভাই
দেশ-বিদেশের রোগীদের সুচিকিৎসা হয়
রণদা প্রসাদের নাম শুনলে
গর্বে বুকটা ভইরা যায় ॥

মহররমের জারি : আলী বয়াতি ও তার দল, মশাজান, মির্জাপুর।

কাগমারীতে কাসার বাসন তৈরি হয় রে ভাই
এইখানেতে বড় একটা দীঘি দেখতে পাই
মাওলানা ভাসানীর রওজায় গেলে
চোখের পানি রাখা দায় ॥

www.pathagar.com

বাজিতপুরের তাঁতের শাড়ি তুলনা যার নাই
দেশ-বিদেশে ইহার খুবই কদর আছে ভাই
টাঙ্গাইলের শাড়ি পরলে
নতুন বউকে খুব মানায় ॥[৬৫]

২.

(জনসংখ্যার জারি)

হারে ও ভাইরে ভাই...
হারে আল্লাহ বল ভাইরে
যত মমিনগণ
যার ইশারায় এই দুনিয়া হইল সৃজন।
মোহাম্মদ মোস্তফা নবি পিয়ারা আল্লার
অসময় নিদানের কালে পাই যেন দিদার।
হারে অসময় নিদানের কালে
পাই যেন দিদার।
আর... আর... ॥
হারে ও... ও
আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর
আগের কথা ভাই
সোনার বাংলায় ছিলো খাদ্য
খাবার মানুষ নাই (২)
দুই আনা সের চাইল বাজারে
এক টাকা মণ ধান,
এক পয়সাতে পাওয়া যাইত
বিরা[১২১] চারি পান।
হায় রে
এক পয়সাতে পাওয়া যাইত
বিরা চারি পান।
আন... আন...।
হারে ও.... ও
আটানার করিলে সদাই
যাইয়া হাট বাজারে
হাতে কেউ নিতে পারতেন না
নিতেন মাথায় করে (২)
আগের দিনে চা খাওয়াইত
আদরও করিয়া
এখন সেই চা পাওয়া যায় না
নগদ পয়সা দিয়া ॥(২)

www.pathagar.com

আ... আ... ॥
হারে ও.... ও
চাইর আনা সের
নারকেল ত্যাল ভাই
সরিষার ত্যাল পাচ আনা (২)
পাঁচ গজী শাড়ি কিনিতে
লাগত ভাই দশ আনা
এক টেকার নিকলে
ধুতি চিকন পাইর[১২২] দেখিয়া
লোকে তারে বাবু কইত
আদাব দিতো যাইয়া (২)
আ... আ... ॥
হারে ও.... ও
যেই ভাবেতে বাড়ছে মানুষ
এই সোনার বাংলায়
সেই কারণেই জিনিসের দাম
বাড়িয়া যায় (২)
মিনিটে হয় তিনটা সন্তান
ঘন্টায় চারশো কুড়ি
ছেলের বউয়ের গর্ভ হয় না
গর্ভ হয় শ্বাশুড়ি ॥ (২)
কোলে একটা কান্ধে একটা
একটা ঘোরে পিছে
ছয় মাস পরে শোনা যায়
তার গর্ভেও একটা আছে
যেই ভাবেতে মানুষ বাড়ছে মানুষ
বাঁচার উপায় নাই
হাট বাজারে গাড়ি ঘোড়ায়
জায়গা পাবে না ভাই।
যেই ভাবেতে বাড়ছে মানুষ
তাইতো চিন্তা করি
আবাদ করবার জাগা থাকবে না
হইয়া যাবে বাড়ি ॥ (২)
ই... ই...
হারে ও... ও
আছেন যত বাংলা বাসী
সভাতে জানাই

www.pathagar.com

দুই সন্তানের অধিক কেউ
জন্ম দিবেন না ভাই
ছেলের মতো একটি ছেলে
হয় যদি সংসারে
এক ছেলে মানুষ করিলে
বংশ উজ্জল করে ॥ (২)
এ... এ...
হারে ও....
কু-পুত্রে হয় সংসার নষ্ট
ঘরে আছে যার
গলায় রশি দিয়া বাপ মার
মরারই দরকার (২)
ছেলের মতো একটি ছেলে
হয় যদি সংসারে
মেয়ের মতো একটি মেয়ে
হয় যদি সংসারে
এক সন্তান মানুষ করিলেই
বংশ উজ্জল করে।
হারে সেই ছেলেকে মানুষ করিলেই
বংশ উজ্জল করে
হারে সেই মেয়েকে মানুষ করিলেই
বংশ উজ্জল করে ॥
এই পর্যন্ত করি খ্যান্ত জনসংখ্যার জারি
মছলিম উদ্দিন নামটি আমার গোপালপুরে বাড়ি ॥ (২)
ই... ই... ই... ॥[৬৬]

৩.

(সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জারি)

হিন্দু আর মুসলমান
নষ্ট করল পাকিস্তান
আক্রোশে জ্বালাইয়া দিলো
এই ভবসংসার,
হায় রে,
আক্রোশে জ্বালাইয়া দিলো
এই ভবসংসার ॥
পরথম[১২৩] কলিকাতা আগুন ধরলো
ঢাকার শহর পুইড়া[১২৪] গেল
ময়মনসিংহ পাড়ি দিয়া

www.pathagar.com

জামালপুর থানায়,
হায় রে,
ময়মনসিংহ পাড়ি দিয়া
জামালপুর থানায়।
লাগল আগুন রেলের গাড়ি
চইলা গেল সইষ্যাবাড়ি[১২৫]
মাঝখানে কালিবাড়ি
কিছুই রইল না,
হায় রে,
মাঝখানে কালিবাড়ি
কিছুই রইল না ॥
দ্যাশের[১২৬] আগুন নিভা[১২৭] গেল
বিদ্যাশে[১২৮] আগুন ধরলো
ওই আগুন লাগল যাইয়্যা[১২৯]
আসামবাসীর গায়
হায় রে,
ওই আগুন লাগল যাইয়্যা
আসামবাসীর গায় ॥
কাইন্দা[১৩০] হইলো পেরেশান[১৩১]
কান্দিতে কান্দিতে তারা
গাড়ির লাইনে যায়
হায় রে,
কান্দিতে কান্দিতে তারা
গাড়ির লাইনে যায় ॥
কারো সন্তান হইলো বালুর চরে
তখোন গাড়ি হুইসেল মারে
জিন্দা ছাইলা[১৩২] ফালাইয়া থুইয়্যা[১৩৩]
গাড়িত চইড়া[১৩৪] যায়
হায় রে,
জিন্দা ছাইলা ফালাইয়া থুইয়্যা
গাড়িত চইড়া যায় ॥

গাড়ির ঝাকির চোটে
কারো সন্তান হইয়া থাকে
দুধ নাই তার মায়ের বুকে
ছেলে মারা যায়,
হায় রে,
দুধ নাই তার মায়ের বুকে

www.pathagar.com

ছেলে মারা যায় ॥
কেউ বলছে আল্লাহ আল্লাহ
কারো কান্দে[১৩৫] ভিক্ষার ঝোলনা
দুধের ভার[১৩৬] লইয়া কেউ
বাজারে বিকায়,
হায় রে,
দুধের ভার লইয়া কেউ
বাজারে বিকায় ॥
আসামেরই মুসলমান
কাইন্দা হইলো পেরেশান
কান্দিতে কান্দিতে আইলো
পাকিস্তান জাগায়,
হায় রে,
কান্দিতে কান্দিতে আইলো
পাকিস্তান জাগায় ॥
এই দ্যাশের মেম্বরেরা
ব্যবস্থা কইরাছে খাঁড়া
হিন্দুর ঘরে দেয় উঠাইয়া
কোনো চিন্তা নাই,
হায় রে,
হিন্দুর ঘরে দেয় উঠাইয়া
কোনো চিন্তা নাই ॥
খাজা নাজিমুদ্দিন জওহর লালে
সভা করে দ্যাশ বিদ্যাশে
গোপনেতে হইলো মিলন
ভাবে বুঝা যায়,
হায় রে,
গোপনেতে হইলো মিলন
ভাবে বুঝা যায় ॥[৬৭]

৪.

(আকালের জারি)

ঘোর কলিরও শেষ যুগে
মানুষ মইলো[১৩৭] পরাভোগে
হায় মওলার কী আজব খেলা
বুঝা ভিষম[১৩৮] দায় ॥
খবর শুনলাম বর্তমান
আসাম আরো হিন্দুস্থান

www.pathagar.com

চল্লিশ ট্যাকা[১৩৯] মন ধান
ঘটিলো কী দায়,
ওরে পাঞ্জাবেতে হুলুস্থুলি[১৪০]
মঙ্গলবারে পাইলাম টেলি[১৪১]
লিয়াকত আলী মারা গেল
রাইফেলের গোলায়[১৪২] ॥
খবর শুইনা হইলাম বোকা
চট্টগ্রাম আরো ঢাকা
লবণের স্যার[১৪৩] বারো ট্যাকা
ঘটিলো কী দায় ॥
পাকিস্তান দ্যাশের ভিতরে
শান্তি দিছাল[১৪৪] পরোয়ারে
একমাত্র লবণের দরে
কিছু কমও পাই ॥
রণদা শাহ[১৪৫] গোপনে
লবণ দিছে হেন্দুস্থানে
সেই কারণে মাসাধিকাল
লবণ নাহি পাই ॥
ওরে কলেজেরও ছাত্ররা
লবণের লাগিয়া তারা
জোড় হতে যাইয়্যা তারা
বাবুর কাছে কয়,
মাড়োয়ারী বন্দুক ধরে
ছাত্ররা ধইরা তারে
টুকরা টুকরা কইরা তারে
নদীতে ভাসায় ॥
লাইগা গেল পারাপারি
লবণের দর বাড়াবাড়ি
চাইট্‌কা চুইট্‌কা[১৪৬] ব্যাপারিরা[১৪৭]
মানুষ হইয়া যায়,
জহির উদ্দিন আর সেকান্দরে
দুই পয়সা নাই যার ঘরে
লবণের ব্যাপারি হইয়া
জুতা লাগায় পায় ॥

তারপরে ছাত্ররা করল
মাড়োয়ারীর বাসা ঘেরাও
পাইলো লবণ বস্তায় বস্তায়
খুঁজিয়া সবাই,

www.pathagar.com

সাড়ে পাঁচ আনা রেট[১৪৮] করে
টাইনা[১৪৯] নিলো বস্তা ধরে
ব্যাচা দিলো কনটোল[১৫০] দরে
লোকে নিয়া খায় ॥
যত ট্যাকা হিসাবেতে
জমা দিলো টেজারিতে
কোনোমতেই পয়সা তারা
নাহি কেহ খায়,
থাকতে লবণ দিছিলোনা
কইরাছিলো দারুণ গুনাহ
সেই কারণে জীবনখানি
একবারেই হারায় ॥[৬৮]

৫.

(ঘ্যাগের জারি)

তোমরা বুইঝা কেনে বুঝ না
তিলিং তিলিং তালা বাজে না ॥
ধুবলিয়া গ্রামে আছে রে এক
সারং জাইতা ঘ্যাগ
ঘ্যাগের উপর বুইনা থুইছে
ধান মোচ আলুর ক্ষেত
ঘ্যাগের তো জমিন মন্দ না ॥
এক ঘ্যাগ দেইখা আইলাম
তাল তলার ঐ চরে
ঘ্যাগের মধ্যে টোকা দিলে
টাম টুমা টুম করে
ঘ্যাগের তো বোল মন্দ না ॥
আরেক ঘ্যাগ দেইখা আইলাম
সোনা আটা বর্ণি
বিষ্টি নামার আগেই রে ভাই
উঠটা থাকে পানি।
ঘ্যাগের তো জাগা মন্দ না ॥
হেমনগর আছে রে ঘ্যাগ
নাম তার দুটা
আগা গোড়া চিকন রে ভাই
মধ্যে খানে মোটা।
ঘ্যাগের তো ডিল মন্দ না ॥
গোলাবাড়ি আছে রে ঘ্যাগ

www.pathagar.com

ডাইলা ঘ্যাগের জাত
সাংকি খোড়া ভাইঙ্গা গেলে
ভাত খাওয়া যায় তাত।
ঘ্যাগের তো বাসন মন্দ না ॥
আরেক ঘ্যাগ দেইখা আইলাম
করটিয়া চান মিয়া সাবের বাড়ি
এক মুরা সদর রে ভাই
আরেক মুরা কাচারী
ঘ্যাগের তো উসার[১৫১] মন্দ না ॥
ময়মনসিংহ আছে রে ঘ্যাগ
ঘ্যাগ সারি সারি
ঘ্যাগের চিপিত পইরা মইল
ভোলা বাবুর গাড়ি।
ঘ্যাগের তো জাতা মন্দ না ॥
সিংজানি আছে রে ঘ্যাগ
ঘ্যাগ পাচ সাত
ইল বিল শুকাইয়া গ্যালে
জল খাওয়া যায় তাত।
ঘ্যাগের তো জাগা মন্দ না ॥
বেগুন বাড়ি আছে রে ঘ্যাগ
ঘ্যাগে দিছে তালি
ফুছকি[১৫২] দিয়া দেখি রে ভাই
ঘ্যাগের মধ্যে খালি।
ঘ্যাগের তো জাগা মন্দ না ॥
দব দবাইয়া হাটে রে ঘ্যাগী
ধুলা উড়াইয়া যায়
গোমটার নিচে থাইকা ঘ্যাগী
কুত কুতাইয়া চায়[১৫৩]।
ঘ্যাগের তো চাউনি মন্দ না ॥
বিষ্টি যখন নামেরে ভাই
ঘ্যাগের ডাক ভারে
আষাইঢ়া ব্যাঙের মতো
ঘ্যাও ঘ্যাও করে।
ঘ্যাগের তো বোল মন্দ না ॥
ঘ্যাগা ঘ্যাগি যুক্তি করে
নদীতে দিল ভাটা
আষাইঢ়া টেংরা মাছে

www.pathagar.com

ঘ্যাগে দিল কাটা।
ঘ্যাগের তো কেরাই মন্দ না ॥
ঘ্যাগা ঘ্যাগী ভাসতে ভাসতে
উঠল বালুর চর
ঘ্যাগের উপর চইড়া দেখলাম
কলিকাতা শহর।
ঘ্যাগ তো উচা মন্দ না ॥
মির্জাপুরে আছে রে ঘ্যাগ
ঘ্যাগে দিছে বাতি
ঘ্যাগের চিপিত পইরা মইল
মন্টু বাবুর হাতী।
ঘ্যাগের তো জাতা মন্দ না ॥
এক ঘ্যাগ দুই ঘ্যাগ
ঘ্যাগ গুনিলাম আশি
সকল ঘ্যাগে যুক্তি কইরা
আমায় দিল ঠাসি।
ঘ্যাগের তো জাতা মন্দ না ॥[৬৯]

৫. ধুয়াগান

ধুয়াগান গ্রাম বাংলার নিজস্ব গান। যার ভাবে বিষয়ে আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারণে ও সুরের আকর্ষণে উদাস হয়ে যায় যে কোনো মানুষের মন। ধুয়াগান অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের সৃষ্টি। এই গানের ইতিহাসও বেশ প্রাচীন। যুগ যুগ ধরে গ্রাম বাংলার খেঁটে খাওয়া মানুষ এই গান রচনা করে আসছে। মূর্খ গায়েনের কণ্ঠে ফুটে উঠে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মের কঠিন ও নিগূঢ় ব্যাখ্যা। সৃষ্টিকে এবং স্রষ্টাকে জানার এক ব্যাকুল আগ্রহ। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে কোনো প্রকার ব্যবধান নেই। মানব দেহের গূঢ় রহস্য পুঙ্ক্ষানুপক্ষরূপে গ্রাম বাংলায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে খেত নিড়ানির সময় কাজে উৎসাহ আনার জন্য এসব তত্ত্ববহুল গান পরিবেশিত হয়।[৭০]

মুসলমান চাষীরা এই গানের গায়ক ও শ্রোতা। বয়াতি মূল চরণ গাওয়ার পর দোহাররা বার বার মূল চরণ গাওয়াকে ধুয়া বলে। 'ধুয়া' শব্দটি সংস্কৃত 'ধ্রুব' শব্দ থেকে এসেছে। 'ধ্রুব' এর আভিধানিক অর্থ স্থির বা অচঞ্চল। গানের যে অংশ স্থির থাকে অর্থাৎ বার বার গাওয়া হয় তাই ধুয়া। ধুয়াগান দীর্ঘ প্রকৃতির গান। এই গানের তাল, ছন্দ ও লয় লম্বা। কৃষকেরা দরাজ কণ্ঠে এলাকা মুখরিত করে ধুয়াগান গায়। ধুয়াগানের বয়াতি প্রথম স্তবক গাওয়ার সাথে সাথে দোহাররা বয়াতির সাথে সুর মিলিয়ে গান ধরে। গানের প্রথম স্তবক শেষ হলে অন্তরা হিসাবে আবার প্রথম স্তবক গাওয়া হয়। তারপর গানের দ্বিতীয় স্তবক শেষ হলে অন্তরা হিসেবে আবার প্রথম স্তবক গাওয়া হয়। এভাবে গানের শেষ স্তবক পর্যন্ত একটার পর একটা অন্তরা চলতে থাকে।[৭১]

www.pathagar.com

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধান কাটা, পাট কাটা বা পাট ধোঁয়ার সময়ও ধুয়াগান গাওয়া হয়। সাধারণত কৃষক রোদবৃষ্টির মধ্যে খেতে খামারে কাজ করে ক্লান্তি দূর করার জন্য এই গান গেয়ে থাকে। তখন অন্য খেতের কাজের লোকেরা সে গান শুনে তারা গাইতে শুরু করে। এক পর্যায়ে শুরু হয় গানের মাধ্যমে প্রশ্ন-উত্তরের পালা।

ধুয়াগানের পালা গাওয়ার সময় গায়কগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করে আরেকদল গানের মাধ্যমেই সে প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং গানের মধ্যে তারা প্রশ্ন করে অন্যরা জবাব দেয়। এমনি করে ধুয়া গান গেয়ে কৃষকের খেত খামারে সময় কাটে। কোনো কোনো সময় গায়ক প্রশ্নবাণে জর্জরিত হন। প্রশ্নের জবাব দিতে সমর্থ না হলে হাস্যস্পদ হয়ে ওঠেন। অনেক সময় প্রশ্নকর্তাও বিপাকে পড়ে যান।

ধুয়াগান আসরে গাওয়ার সময় গায়কগণ ভিন্ন ধরনের পোশাক পরে। সাধারণত খেত খামারে তারা যে পোশাকে কাজ করে সেই পোশাকেই গান গেয়ে থাকে। আর আসরে গাওয়ার সময় তারা সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে নেন। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খোল, খুঞ্জুরি, জুরি, করতাল, ঢোল, দোতারা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। গানের তালে তালে হালকা ধরনের নৃত্যও করে বয়াতি।

ধুয়াগানের বিষয় বহুবিধ। যেমন– ১. বন্দনা, ২. বিচার ৩. দেহতত্ত্বমূলক, ৪. নবীতত্ত্বমূলক, ৫. আদমতত্ত্ব/ ফুলের ধুয়া, ৬. প্রেমমূলক/পিরিতিমূলক, ৭. সাইর : ক. ইসলাম ধর্মের কাহিনি বিষয়ক, খ. হিন্দুধর্মের কাহিনি বিষয়ক, গ. ঐতিহাসিক ঘটনা, ঘ. সামাজিক, ঙ. বিবিধ বিষয়ক।

উপরোক্ত বিষয় ও শ্রেণি অনুসারে এক বা একাধিক গানের উদাহরণ দেওয়া হলো।

বন্দনামূলক ধুয়া

বাংলা সাহিত্যে বন্দনার ধারা অতি প্রাচীন। টাঙ্গাইল জেলা এক সময় আসামের সাথে যুক্ত ছিল। তন্ত্রমন্ত্র ঝাঁড়-ফুকের দেশ আসাম ও তার সন্নিহিত অঞ্চল। লোকবিশ্বাস আছে, প্রতিযোগিতামূলক গানে অপরপক্ষ অর্থাৎ প্রতিযোগী পক্ষ জাদু, বান, ইত্যাদি দিয়ে ক্ষতি করতে পারে। এই জন্য বয়াতি আসরে দাঁড়িয়েই বন্দনা গান গায়। এই গানের মধ্য দিয়ে সে আশীবাদ কামনা করেন। যাতে কেউ তাকে ক্ষতি করতে না পারে।

১.

(প্রথম দলের বন্দনা)

প্রথমে বন্দনা করি আমি পাক নিরাঞ্জন
দ্বিতীয় বন্দনা করি রাসুলের চরণ
বেশ ভাই ওস্তাদের চরণ
দোমে (২) নওরে মওলা দোম গেলে হবে তর মরণ ॥
এক বন্দি দুইও বন্দি হায়রে বন্দি যে আলী
ফয়তে মা[১৫৪] নায়ের[১৫৫] গো বাদাম নবী কাণ্ডারি

বেস ভাই নবী কাণ্ডারি
হাসেন হোসেন টানুক দাড় গো সাগরে ধইরাছি পাড়ি ॥
ময়তে জগতের মা তোর চরণে জানাই
এই দুনিয়া ডিম্ব রূপে ভাসিলা যখন
বেশ ভাই ভাসিল যখন
কিনারে চাপায়া ডিম্ব
মা গো মা হইল তর জন্ম ॥
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ
হায় রে বন্দি চাইর দিক
মাঝখানে বন্দনা করি হজ্জ মক্কার মাটি
বেশ ভাই হজ মক্কার মাটি
সেই ঘরেতে পইড়ে নামাজ
হাজিদের দেহ হয় খাঁটি ॥

আইস মাগো সরস্বতি কণ্ঠে কর ভর বসতি
আসন গো দিব মস্তকেতে ঠাঁই
হায় রে মস্তকেতে ঠাঁই।
বিনা যন্ত্রে তাল মিলাইয়ে মা গো মা
ধুয়া জারি গাই ॥

২.

(দ্বিতীয় দলের বন্দনা)

আর আমি প্রথমে বন্দনা করি
আমি আল্লারজির চরণ বন্দি
ওরে ইমাম হোসেন সাহা আলীর চরণ বন্দি
ফাতেমার চরণ বন্দি
জিবরাইল মেকাইল বন্দি
ইসরাফিলের চরণ বন্দি
আজরাইল বন্দি শেষে।
রুহু নিতে কষ্ট যেন পায় না দেহেতে।
আর আমি ঘুম হইতে চমকিয়া দেখি
সবের মা ফাতেমা দরদি
তারে যেন জান্নাতে দেখি
ওরে ঐ নদীর কূলে বইসা কান্দে
তোমার সন্তানাদি
কয়জন লইয়া আইচ গো তুমি
তুমি পরের কারণে বইয়া আছ
পার কর দীন তরণী
কোথায় রইলা ইমাম হোসেন জগত জননী

আর ভাইরে নবীজিরও উম্মত হইয়া
তোমরা পুলছিরাত হবা পার
নবীজিরও উম্মত হইয়ে
তোমার নামের কারণ ঘুইরা বেড়াই
ঠিক রাখিও ইমাম তুমি
দোজখ হারাম কইরা দাও খোদা
আদম ফাতেমা আলী কান্দিয়া বলে
কোরানে তাই বলিয়াছ তুমি গফুর
তুমি গফুর ব্যাখ্যা কর আগে।[৭২]

ধুয়াগান পরিবেশন : বাহাদুর আলী বয়াতি, নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

৩.

আমি পরথোম[১৫৬] করি আল্লাহর নাম স্মরণ
বন্দি আমি নবীজীর চরণ
নবীর চাইর তরিকা[১৫৭] বন্দি আমি
বন্দি সভার পঞ্চজন
মাতাপিতার চরণ বন্দি গো
বন্দি ফয়তেমার চরণ ॥
নবীর বেটি করিবেন দোয়া
আমি আসর করলাম বন্দনা
কেহ মানে কেহ মানে না
দোহাই লাগে আল্লাহ নবীর
ডাকি ওগো মা ফতেমা
আমার আসর ছাইড়া যাইয়ো না,

www.pathagar.com

আমার আসর ছাইড়া গেলে গো
শ্যাষে[১৫৮] ঘটবে যন্ত্রণা ॥
অধম দারোগ আলী ডাকে মা তরে
ওমা আইসো[১৫৯]আমর আসরে
ভক্তি রাখি মুক্তি দাও মোরে
তোমার নামের জোরে আসর নড়ে[১৬০]
শুইনাছি মা কোরানে
কিঞ্চিত দয়া করো গো মোরে
আহেদুল্লাহ বানছে ধুয়া
সেকতা[১৬১] শুনেন দশজনে ॥[৭৩]

বিচার ধুয়াগান

১.

(পাগলের ধুয়া)

পাগলকে মানুষ অবজ্ঞা করে। কিন্তু নিগূঢ়তত্ত্বে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো বিষয়ের পাগল। কিন্তু সে দোষ দেয় অন্য মানুষকে। এটা মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

পাগল পাগল সবাই পাগল
তয় ক্যানে[১৬২] পাগলরে খোটা
পাগল বিনে এই জগতে
ভালা হয় ক্যারা[১৬৩]
এ্যাক পাগল হয় শিব[১৬৪] সন্ন্যাসী
ত্যারজো[১৬৫] কইরে[১৬৬] কৈলাশ কাশী[১৬৭]
ভাং ধুতুরা সিদ্ধির গোটা
আরেক পাগল নারদ মুনি[১৬৮]
বিনা কতায় বাজায় ন্যাটা[১৬৯]
হরিলুটে পোলাইপান[১৭০] পাগল
সন্ধেতে তুলসিতলা রয় আটা ॥

দ্রুপদী[১৭১] পোন্নামের[১৭২] পাগোল
গর্ভে পাগল গর্ভকার[১৭৩]
প্রসব বেদনায় মাতা পাগল
প্রসব করিবার,
ধাত্রী পাগল নাড় কাটিতে
জ্যোতিষ রনাম রাখিতে
শিশু পাগল দুধ খাবার,
পড়ার জন্য মাস্টার হয় পাগল
ছাত্র পাগল পরীক্ষায় পাস করিবার ॥

পাস করিয়া পাগল হইয়া
খুঁজে নানান চাকুরি
উকিল মুক্তার জজ বেরিস্টার
কেউ হয় মহুরি,
হাকিম পাগল হুকুম দিতে
উকিল পাগল ছল[১৭৪] জেরাতে
চোর পাগল করতে চুরি
ডাকতার পাগল দান করতে
জ্বরের বড়ি,
রাধার জন্য কৃষ্ণ পাগোল
রাই পাগল শুনতে কৃষ্ণের বাঁশরি ॥

সাধু পাগল সত্য বলতে
মাতাল পাগল মদেতে
চাত্তক[১৭৫] পাগল মঘ পানে
ভিমর[১৭৬] পাগল ফুলেতে
নোচ্ছা[১৭৭] গুণ্ডা বদমাইশ যারা
পরনারীতে পাগল তারা
রূপে মইজা[১৭৮] ভবে হয় পাগল
কেউ পাগল মরার আগে মরিতে ॥

লতিফ আলী টাকার পাগল
গান গাইয়াই সে টাকা চায়
হলো না মোর ভজন-সাধন
কি করি উপায়,
আমি মইলাম[১৭৯] ভুতের ব্যাগার খাইটে[১৮০]
বয়েস গেল মোর ছয় বোম্বেটে[১৮১]
রাগ থামাইতে চইটে যায়
আমার জীবন তরী ডুবুডুবু
দিবানিশি জল চুয়ায়
আমি কোনসুম[১৮২] জানি[১৮৩] পইড়া যাই পাকে
দয়ালগুরু তুমি থাইকো[১৮৪] আমার নায় ॥[৭৪]

২.

মন সুপথে না চলে যায় কুপথে। যেখানে গেলে দুর্গতি ঘটবে মন সেখানে যেতে উতালা হয়। মানুষ মদনের দাস হয়ে কাজ করে। গুরুর শিক্ষা দ্বারা মদনকে আয়ত্ব করা যায়। যার কাম বাধ্য পৃথিবীতেই সে যথার্থ মানুষ।

মনকে বলি মোর ডাইনে যাইতে
মন চলে মোর বামে

www.pathagar.com

পথ ছাইড়া কুপথে গিয়ে ঘুরায় জঙ্গলে ॥
ওরে মন হইল না মোর কথার বাধ্য
শোন বলি মন তোরে
ওরে ছানা মাখন ত্যাজ্য করে
তালতলা বেড়ায় ঘুরে।
তালতলা মোদের থানা
বোকা তুই ভাব জানস না।
তালগাছে হয় মিস্ত্রি দানা
শোনরে দিন কানা ॥
ওরে মাক্কাল ফলটি দেখতে ভাল
রঙ্গে কি পরিষ্কার
ডালিম ফলের রং ভাল না ভবের মাজার।
নইলিরে তুই কাস্তের বেপার
ওরে ভেড়ার সনে নাই তুল না
তৈল ছাড়া কী হয় কারবার
খাকিতে খাক বসাইয়ে
গসিকে মাচায় রাখে
দেখ বয়াতি বিচার করে
কী মান্য তাহার ॥
অধম আজাহার কয় ঘুমের মানুষ
করলিরে তুই চৈতন[১৮৫]
মাল খোপেতে[১৮৬] নাইরে[১৮৭] তালা
চোরে নেয় সে ধন।
ঐ পাহারায় আছে ষোলজন[১৮৮]
ওরে নিত্তি[১৮৯] চোরায় দেয় পহরা[১৯০]
মাল লুইটা নেয় এক রাইতে
সে চোরা মদনা চোরা
সহজেই দেয় না ধরা
যার আছে গুরু ধরা
সেই ধরতে পারে ॥[৭৫]

আদমতত্ত্ব

১.

(সওয়াল)

প্রশ্ন করা হয়েছে, মকরম ফেরেস্তা ছিল জিন। সে কত বছর আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করেছিল?

আল্লা আল্লা বল ভাইরে
নবি কর সার,

www.pathagar.com

নবির কালেমা পইড়া ভালো
হইয়া যাব পার।
সে জ্বিনেতে কত বছর
বলো মরকম ছিলো?
সেও কথাটি ও বয়াতি
ভালো জিজ্ঞাসা রইল।

সেইখানে থাকিয়া মরকম
কি কাজ করিল?

জানা থাকলে ও বয়াতি
তুমি চাঁন সভাতে বল।

সেইখান হতে মরকম আবার
কোনোখানে গেল,
সেও কথাটি বয়াতি
জিজ্ঞাসা রইল।

কাশেম আলী বানছে ধুয়া
আমি বলি চাঁন সভাতে
গর্জনাতে বাড়ি আমার
সালাম জানালাম।[৭৬]

২.

(১ নং গানের জওয়াব)

উত্তরে বলা হয়েছে, এক হাজার বছর মকরম ফেরেশতা ইবাদত করে। সিজ্জিন নামক স্থান হতে সে দুনিয়ায় আসে।

যেই কথাটি জিজ্ঞাস করলে
ও ভাই বয়াতি,
ঠিকভাবে ও বয়াতি
ভালো জবাব দিব আমি
সে জ্বিনে এক হাজার বছর
ভালো মরকম ছিলো,
তোমার সোয়ালের উত্তর
খোলাসা হইল।

আর একটি সোয়াল তুমি
জিজ্ঞাইস মোরে,
সেইখানে থাকিয়া মরকম
সেজদা দরুদ পড়ে।

www.pathagar.com

আর একটি সোয়ালের উত্তর আমার
পড়িলো মনে,
সিজ্জিন হইতে মরকম দেখ
জমিনেতে আসে।

যা উত্তর তাই খোলাসা হইল
বাকি ঝুকি নাই
সালামালেক সালাম আমি
সভাতে জানাই।[৭৭]

দেহতত্ত্ব

১.

(রথের ধুয়াগান)

মানুষের দেহকে রথের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানরদেহ বাতাসের উপর নির্ভরশীল। এই বাতাস দেহে না থাকলে দেহ অচল হয়ে পড়বে। যে এই দেহরথ তৈরি করেছে সে আত্মগোপন করে আছে।

মিছা ক্যানে করো গোল[১৯১]
গোলমেলি আর কইরো না মমিন ভাই
দুই চাকার এক রথ গড়াইছে
এমন রথ আর দেখি নাই
আমি তারিফ করি কামিল করে
কি হেকমতে[১৯২] সে রথ গড়ে
সে রথ চলছে পবনের ভরে ॥
রথের আঠারো মোকাম[১৯৩]
আগে চালায় বলরাম[১৯৪]
কানাই বলাই[১৯৫] সব ছাইড়া গেলে
রথের হায়াত মউত সময়ের উল্লাস
থাকবে না রথ চিত হইলে,
যেদিন চান সুরুজ-উইড়া যাবে
দুই কানে লাগবে তালি
সেদিন রথ খোলায় লাগবে গোলমেলি[১৯৬] ॥

সুতারের বাড়ি কোনো দ্যাশে
আমি ঘুরতাছি তার তালাশে
জননম[১৯৭] ভরা খাইটা মরলাম
রথটানা রসে
মন বুইজা[১৯৮] ক্যানে বুজলি নারে
আপন কর্ম দোষে ॥[৭৮]

www.pathagar.com

২.

মানব দেহের সৃষ্টি কৌশল বড়ই চমৎকার। মানব দেহের উপরাংশে চক্ষু নামক দুইটি বাতি জ্বলছে। ঝড় বাতাসেও সে বাতি নিভে না। কিন্তু দেহের বাতাস চলে গেলে সে বাতি আপনা আপনি নিবে যায়।

আপন আল্লাহ ঘর বাইন্ধাছে
আপন কুদরতে
সেই ঘরের রুয়া[১৯৯] স্বারক[২০০] কুর্শিরে সলা[২০১]
এক পাইলে মিলাইছে
বাহাত্তর হাজার হাছলা[২০২] টানে
সে ঘর রাখছে দুই খামে[২০৩] ॥
আজাহারে কয় মুনসেররে
সে ঘরে মাল উঠায়ে
ঘরে থওগা[২০৪] তালা মাইরে।
এক বেটা ডাকাত আইসা
ঘরের তালা নিব মাইরা।
সেই ঘরের উপর তালায়
জ্বলছেরে বাতি
বাতাস পাইলে নিবে না।
বাতাস যেদিন বন্ধ হবে
সে ঘর পড়বে রে জমিনে ॥[৭৯]

৩.

আত্মতত্ত্ব না জেনে নারী গমন করলে দেহ অকালে জীর্ণ হয়ে বার্ধক্য দেখা দেয়। মানুষের আত্মজ্ঞান না থাকলে সে কামের পিছনে ঘুরে মরে। মন আয়ত্ব থাকলে কামকে জয় করা যায়।

দেহ জমিন চিনতে হবে
জ্ঞান বাতি জ্বালাইয়ে
অন্ধকারে আছে জমিন
কাজিমুদ্দি তাই বলে।
তুই ভবে আইসা বোকা হইয়া
জমিন কেনে চিনলি নারে।
মদনের কথা শুইনে
কেনে চাষ দিলি রে।
মনের ঘরে ঠিক রাখিলে
মদন যাবে অতি দূরে
পারব না বাতর[২০৫] ভাঙ্গতে
বোকা তুই জানস নারে।
মন দিয়া চাষ করগা দেহ জমিনে।

www.pathagar.com

জ্ঞানের লাঙ্গল ছয়টা বলদ রাইখ রে যতনে
তুমি বাও অঙ্গের চার খোটা[২০৬] আইনা
গাড় চার কাণিতে[২০৭]।
বাও অঙ্গের চার খোটা দেইখা
মদন[২০৮] যাবে দূরে
বোকা তুই জানস নারে
মন দিয়া চাষ করগা দেহ জমিনে।[৮০]

৪.

সাধনার ক্ষেত্রে দেহের গুরুত্ব অত্যধিক। সাধক মতে, দেহে সেজদার জায়গা চিনে সেজদা পারলে সিদ্ধি লাভ হয়। গুরু সে সাধনার কলাকৌশল জানে। গুরুর পরামর্শ মতো দেহকেন্দ্রিক সাধনায় অগ্রসর হতে হয়।

জমিন জমিন সবে রে বলে
দেহ জমিন কে চিনতে পারে
তিল পরিমান জমিন আছে
আঠার সিজদা পরে।
সেই জমিন আছে কোনো খানে
খোদার দোস্ত মোহাম্মদ নবি
সেইখানে নামাজ পড়ে।
জমিন চিনা মুখের কথা নয়
দেহ জমিন চিনা নিতে হয়।
গাছে না পাঁকিলে কাঁঠাল
কিলাইলে কি পাঁকা হয়
আহাম্মদ আলী ধুয়া বাইন্ধে কয়।
গুরুর তত্ত্ব জাইনে মত্ত হইতে হয়
না জানলে বেথাই এ জীবন।[৮১]

৫.

মানবদেহ আট কুঠরী নয় দরজার দ্বারা গঠিত। এই দেহতরী মন এর নির্দেশ মতো চলে। দেহের মধ্যে আত্মারূপী পরমাত্মা সমস্ত কাজকর্মের নিয়ামক। পরমাত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেলে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

অলি বলে ভাইরে ভাই
আমি দশের কাছে বইলা যাই
আমার এই দেশের পরিচয়
দেহের আট কোঠরী নয় দরজা
ছয়জন তার নিকামার[২০৯]
দেহের মাঝেই আঠার মোকাম।
দিন বন্ধুর নাও[২১০] খানি

www.pathagar.com

এক কলে তুলে পানি
তার মধ্যে সুজনী।
ষোল ধারে চালায় তরী
হালধরে তার মন মাঝি।
মাঝখানে এক সাধু বইসে
করতাছে বেঁচা কিনি।
বাজারের বাও জাইনে
তুমি আসল নইয়া যাও বাড়ি।
সাধু ভাই দোকান করে
বিলাত বাকী যা পরে
সব খাতায় থয়[২১১] লেইখে[২১২]
মহাজন আইসে হিসাব নিবে
ঐ খাতা তলব করবে
যে দিন আসবে শমন, বানবে কইশে
অলি মামুদ তাই ভাবে
আন্ধার[২১৩] ঘরে পইড়া রবি[২১৪] জান গেলে।

৬.

নবির কলেমা সব সময় জপলে 'ভরপার' এর কোনো ভয় থাকে না। এই দেহতরী ছয় রিপুর ছয় দিকে টানে। মন হলো তার নাবিক। যে দিন দেহের তেল ফুরাবে অর্থাৎ আয়ু শেষ হবে সেইদিন দেহতরী নষ্ট হয়ে যাবে।

কিতাব আলী কয় মন
আমি পাই না দরশন
সেই নদী পার হবা কেমনে।
তুমি ছাড় কিস্তি বান্দ দিস্তি
সেই পরকালের আয়োজন
টুপি আর তফন[২১৫]।
নবির কলেমা জাইনে
তজপি টাইনে[২১৬] যাইবা সেই হাওয়া ভরে।
ভাব কি কারণ
আগে নায়ের[২১৭] পত্তন ধারা
তার সনে গলইর[২১৮] জোড়া
জাতি বারি লাগে নাই কখন।
গুড়ায় সনে[২১৯] তক্তার জোড়া
আবার কিসের নায়ের পাটাতন
গুণ টানে ছয়জন[২২০]।
মন মাঝি তার হাইল ধইরাছে

www.pathagar.com

আছে সে তক্তে বইসে
ভাব কি কারণ।
আগা নায়ের ঝরকা কাটা
মাঝখানে মণিকোটা
উপরে জ্বলছে দুই বাতি।
তৈল ফুরাইলে রোশনাই[২২১] জ্বলে
সেদিন তোর থাকবে না তোর বেপারী
দরিয়ার মাঝি
বালু চরায় রবি[২২২] পইড়ে
যবে নায়ের তক্তা খইসে
কয় কিতাব আলী।[৮২]

৭.

নশ্বর দেহের সেবা শুশ্রুষা করতেই আয়ুষ্কাল শেষ হয়। তখন আর সাধন ভজন হয় না। আজরাইলের কাছে ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা সব সমান।

ভাঙ্গা ঘরে তালি রে দিতে গেল আমার দিন (২)
গেল আমার দিন রে বন্ধু গেল বুঝি আমার দিন
ভাঙ্গা ঘরে তালি রে দিতে গেল আমার দিন
এইও বিধির ভাঙ্গা গো ঘরে
টপটপাইয়া পানি গো পড়ে
চোরের ডরে ঘুম আসে না
জাগিয়া পোহাই রাত্রি দিন
ভাঙ্গা ঘরে তালি রে দিতে গেল আমার দিন
মন মনরা পহরা দিছে
আজরাইল আইসা ঘিরা গো নইছে
আজরাইল আইসা বান্দে কইষে
মানবে না আর আলেম পির
ভাঙ্গা ঘরে তালি রে দিতে গেল আমার দিন[৮৩]

পিরিতিমূলক ধুয়া

১.

প্রেম বাজারে প্রেম জাইলানী[২২৩] জাল বুনায়,
অনুরাগে সুতা কাটে চরকায় জড়াইয়া যায় ॥

এরা সব নতুন জাইলানী শুকনাতে ফালাইছে টেনি
চাটা-পুঁটির দাঁত নিটকানী[২২৪] টেংরামাছে মোছ তাওয়ায়,
প্রেম বাজারে প্রেম জাইলানী জাল বুনায়
অনুরাগে সুতা কাটে চরকায় জড়াইয়া যায় ॥

www.pathagar.com

তরা জাল ফালাইছোস অফর বেলা[২২৫]
মাছ মারোস পাঁচ চোইখা আর ছ্যাপচেলা
ওরে অগাধ জলে রুই মাছ থাকে
রসিক জনায় দেখতে পায়,
প্রেম বাজারে প্রেম জাইলানী জাল বুনায়,
অনুরাগে সুতা কাটে চরকায় জড়াইয়া যায় ॥
অরসিকায় বিলে গেল বিল ছাড়িয়া মাছ পালাইলো
অরসিকায় বিলে গেল
ওরা খালি পলোখান[২২৬] হাতে লইয়া
আওড়া ছাপ[২২৭] চাপাইয়া যায়,
প্রেম বাজারে প্রেম জাইলানী জাল বুনায়,
অনুরাগে সুতা কাটে চরকায় জড়াইয়া যায় ॥

ওরে ইচা মাছ আর বালু খাইকা[২২৮]
এই দুই মাছের রক্ত নাইকা
ওরে ইচা মাছ আর বালু খাইকা
ওরে পানির ওপর ভাইসা বেড়ায় পাঁচচোইখা[২২৯]
ধরবার গেলে ফাইট খেলায়।
প্রেম বাজারে প্রেম জাইলানী জাল বুনায়,
অনুরাগে সুতা কাটে চরকায় জড়াইয়া যায় ॥

তাই খান বাহাদুর ভেবে বলে
খইলশা পুঁটি থাকে অল্প জলে
ওরা পেইচা পড়লে কারেন জালে
ছাড়াইতে কলশা ছিঁড়া যায়।
প্রেম বাজারে প্রেম জাইলানী জাল বুনায়,
অনুরাগে সুতা কাটে চরকায় জড়াইয়া যায় ॥

ও তর অষ্ট কাঠের গোপ ছিঁড়িলো
অনুরাগে মাছ পলাইলো
ও তর অষ্ট কাঠের গোপ ছিঁড়িলো
ও তর দিনের মতো দিন ফুরাইলো
ভক্তির খালোই[২৩০] বান গোরায়।
প্রেম বাজারে প্রেম জাইলানী জাল বুনায়,
অনুরাগে সুতা কাটে চরকায় জড়াইয়া যায় ॥
প্রেম বাজারে প্রেম জাইলানী জাল বুনায়।

২.

বৈরাট নগরের সেকান্দর বাদশার ছেলে কালুগাজী। কালুগাজী পালংকে শুয়ে ছিল। পরিরা সব যুক্তি করে তাকে চাম্পার মন্দিরে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

ওরে কালু গাজী ছিলো সোনাপুর দেশে
দুই ভাই শুয়া রইল পালঙ্কে
পরিরা আইসা বাতাস পারতাছে[২৩১]।
ওরে সব পরীয়ে যুক্তি কইরে
নইয়া গেল শ্যাম নগরে
নিয়া রাখল চাম্পার মন্দিরে।
চাম্পা বলে ওহে মন চোরা
তুমি আসলা[২৩২] কেমনে ॥

ওরে চোরারে তুই বড়ই ভয়ংকর
না মানলি পাহারাদার
ধরলে চোরা জানে বাঁচা দায়।
ওরে দক্ষিণা দের হাতে পড়লে
কাটা যাবে তোমার গরদান
কাটা যাবে তোমার দুইটা কান।
সত্য কইরা দেও না পরিচয়
তোমার বাড়ি কোনো মোকাম[২৩৩] ॥
ওরে বাড়ি গো আমার বৈরাট্টনগর
পিতা শাহা সেকান্দর
মায়ের নামটি অজুফা সুন্দর
ওরে আমরা দুই ভাই মুসলমান জাতি
ভাই গেছে পাতাল নগর
সত্য কইরা দিলাম পরিচয়
চম্পা চিনা ন্যাও এখন ॥[৮৪]

৩.

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে প্রবল ধারা বর্ষণে প্রেমিকার হাতের কলম জলে পড়ে গেলে প্রেমিকের নিকট প্রেমিকা আবেদন করে তার কলম তুলে দিতে। প্রেমিক কলম তুলে দিবে যদি প্রেমিকা তার নিকট বিয়ে বসে এই শর্তে। প্রেমিকা প্রত্যুত্তরে বলে আমি জমিদারের মেয়ে। তোমার এই কথা যদি আমার বাবা শুনে তাহলে তোমার মৃত্যু অবধারিত। প্রেমিক বলে- তোমার পিতার জমিদারিতে আমরা থাকি বটে! কিন্তু বছর বছর খাজনা দেই। অতএব তোমার পিতাকে ভয় করার কারণ নেই। প্রেমিকা তখন বলে, আমরা এক গুরুর পাঠশালায় পড়ি। অতএব গুরুর সম্পর্কে আমরা ভাই-বোন। তুমি এমন কথা বলো না। প্রেমিক বলে আমরা এক দোয়াতের কালিতে লেখি, অতএব কালীর সম্পর্কে তুমি আমার শালী। উপায়ান্তর না দেখে প্রেমিকা বলে- তুমি যদি মনোকাষ্ঠের পাটাতন যুক্ত, পবনের বৈঠাওয়ালা একটি হীরার নৌকা আমাকে উপহার দিতে পার তবে আমি তোমার ঘরে যাব।

ওকি মাধব হে......
জ্যৈষ্ঠী গো আষাঢ় মাসে রে

www.pathagar.com

ইন্দ্র বর্ষে রে ধারে
পড়িল হাতের কলম
ও মাধব তুইল্যা দ্যাও মোর হাতে
তোমার কলম তুইল্যা দিলে
আমার হবে কি?

এই সত্য করাল[২৩৪] কর মালঞ্চ
তোমার বিয়ার বর কৈল[২৩৫] আমি ॥
কী কথা কহিলা মাধব
আবার বলো তো শুনি!
শুনিলে আমার বাপে
ও মাধব! তোমায় বলি দিবো আনি।
তোমার বাপের মাটিত কন্যা
আমার বাপের ঘর
মাল খাজনা বুঝাইয়া দিলে
কার বা রাখি ডর?
তুমি আমি পড়ি মাধব
একই গুরুর ঠাঁই
গুরুর সমন্ধে মাধব
তুমি আমার ভাই।
তুমি আমি লেখি পড়ি
এক দোয়াতের কালী
কালীর সমন্ধে মালঞ্চ
তুমি আমার শালী।
হিরার নাও পবনের বৈঠা

www.pathagar.com

মনোকাষ্ঠের চাড়ি
এহি নৌকা দিলে মধাব
যাব তোমার বাড়ি
ও কি মাধব হে ॥[৮৫]

৪.

রানি শান বাঁধানো ঘাটে বসে স্নান করে। নদীর ওপার থেকে মইষাল বন্ধু স্নানের দৃশ্য অবলোকন করে। রানি রাখালের মনোভাব দেখে বলে- রাখাল তুমি দূর থেকে দেখার চেয়ে আমার কাছে চলে আস। রাখাল কুমিরের ভয়ে নদী পার হওয়ার অপারগতা প্রকাশ করে। বন্ধু তুমি পুরুষ হয়ে এত ভয় পাও আর আমি নারী হয়েও এই ভয়াল নদী পার হতে পারি। যাবার বেলায় রানি তার রাখাল বন্ধুকে নিজ গৃহের দিক নির্দেশনা দিয়ে যায়। রাখাল যেন নির্দেশিত পথ ধরে তার বাড়ি যায়। বাড়ির সামনে ডালিম গাছ, পূর্বদিকে মুখ করা ঘর যেখানে দেখবে সে বাড়িতেই সে বাস করে। বন্ধু যদি তার বাড়ি যায় তাকে বাঙালি জীবনের ঐতিহ্যবাহী খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করবে।

বাড়ে রানি চান[২৩৬] করে শানে বান্ধা ঘাটে
ওপার থেকে মইষাল বন্ধু বইসা রঙ্গ দেখে।
কিসের তামসা দেখ মইষাল ওপারে বসিয়া
মনে যদি চায় আইসো সাঁতারও দিয়া।
কেমন করে দিব সাঁতার কুম্ভীরেরও ভয়
পুরুষ হইয়া কেন মইষাল এত ডরান[২৩৭] ডরায়।
নারী হইয়া পারি আমি সাঁতার দিবার
পুরুষ হইয়া এমন কথা কইও না আর।
নদীর কুম্ভীরের সাথে সইশোলা[২৩৮] পাইতাছি আমি
আমার বরাত দিয়া বন্ধু সাঁতার দিও তুমি।
আমার বাড়ি যাইও মইষাল ঐ না বরাবর
ডালিম গাইছা বাড়ি আমার পুব দরজা ঘর।
আমার বাড়ি যাইও মইষাল বসতে দিব ফিরা[২৩৯]
জলপান করিতে দিব শাইলো ধানের চিড়া।
শাইলো ধানের চিড়া দিব বিন্নি ধানের খই
গাছে পাকা সবরী কলা গামছা বান্ধা দই।[৮৬]

৫.

এক সুন্দরী জেলেনি কালিন্দীর বাজারে মাছ বিক্রি করতে এসেছে। তার রূপলাবণ্য দেখে কথিত হিরামন মানিক রাজা মুগ্ধ হয়ে গেছে। জেলেনির রূপের ঝলক যেন সূর্যের কিরণকেও হার মানাচ্ছে। রাজা জেলেনির রূপে পাগল হয়ে তাকে মাছ বিক্রি ছেড়ে দিয়ে তার ঘরণি হতে বলে। জেলেনি তার নিজ যৌবন কালের রূপলাবণ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে- কত রাজা, জমিদার তাকে পাবার জন্যে কামনায় ব্যাকুল হয়ে থাকত।

www.pathagar.com

আসদিন [২৪০] উদয়ভানু পূবে আর পশ্চিমে
আইজ [২৪১] কেন উদয়ভানু কালিন্দির বাজারে।
মাছ বেচ মাইছান-রানি [২৪২] মাছের কিবা দাম
বাইটকার হালি নও নও কুড়ি রৌয়ের ষোল পোন [২৪৩]।
মাছ বেচ মাইছান-রানি ছাড়ো মাছের ডালা
সোনা দিয়া গইড়া দিব তোমার গলার মালা।
মাছ বেচ মাইছান-রানি তোমার ভাই ক্যান কালা
তোমার মতো কত রাজা আমার ভাইয়ের হালা।
যখন আমি ছিলাম ও রাজা কুমারী নারী
তোমার মতো কত রাজা ঘুরছে আমার বাড়ি।
যখন ছিলাম আমি এক ছাওয়ালের মাও
তোমার মতো কত রাজা ধরছে আমার পাও।
ও কি হিরামন মানিকও রাজা রে ॥
মাছ বেচ মাইছান-রানি দুই চরণ বাইয়া পড়ে
মাছের কেতলানী [২৪৪]
কেমনে বেচিবে মাছ রাইয়তগণের বাড়ি ॥[৮৭]

৬.

বন্ধুর প্রেমে পড়ে নারীর দিনে দুপুরে ডাকাতির মতো সর্বনাশ হয়েছে। প্রেমের কারণে বন্ধু তাকে বাপ-মা ত্যাগ করতে বলছে। প্রতিদিন সাক্ষাতের জন্যে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে বলছে। নারী তার বন্ধুর পিরিতের নেশায় দিশেহারা। রাতে ঘুমের ঘোরে বন্ধুর সঙ্গে অভিসার করে। ঘুম ভাঙ্গলে বন্ধুকে আর পায় না। মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠে। শেষ রাতে মোরগের ডাক শোনে তার বিরক্তি লাগে।

শ্যাম কালারও পিরিতি রে
ও রাই করল দুপুইরা ডাকাতি রে।
পিরিত যদি রাখতে চাও
ছাড় তোমার বাপ ও মাও।
পিরিত যদি রাখতে চাও
বাড়ির আগে নাইল্য[২৪৫] ছিটাও।
শাক তুলিতে যাবা নিত্যি
খাবা পানের খিলি।
ঘুমেরও না অলসে রে
ও রাই হাত ফালাইল[২৪৬] বালিশে রে
চেতন পাইয়া দেখে
উহার বন্ধু নাই ঘরে।
রাত্রি না পোষাইল[২৪৭] রে
লাল মোরগে বাগিল রে
উহার মনে বলে

www.pathagar.com

লাল মোরগের গলে দেয় ছুরি রে।
বিহানা উঠিয়া ও রাই
মোল্লা আনিল ডাকিয়া রে
উহার মনে বলে
লাল মুরুগের গলে দেয় ছুরি রে ॥[৮৮]

৭.

বিল যাওর অঞ্চলে বর্ষাকালে সময় কোড়া পাখি দেখা যেত। আমন ধানের উপর কোড়া পাখি ডিম দিত, বাচ্চা উৎপাদন করত। সৌখিন লোকেরা কোড়া শিকার করত। বিনোদ কোড়া শিকার করতে গিয়ে স্থানীয় নারীর প্রেমে পড়ে। এ ধুয়াগানে সেই চিত্র আমরা পাই।

আজি কোড়া শিকারি বিনোদরে
একও ধানও কাটি বিনোদ হায় রে
আরেক ধানও মলি
দক্ষিণা বাতাসে হায় রে বিনোদ
কোড়ার ডাকও শুনি রে
কোড়া শিকারি বিনোদ রে ॥
ছোবের বাশ কাটিয়া বিনোদ
নদীতে দিছ বানা[২৪৮]
আমার বাড়ি যাইতে আসতে
কে কইরাছে মানা রে ॥
ছোবের বাশ কাটিয়া বিনোদ রে
খাঁচার বানাও পিনজিরা[২৪৯]
আমার বাড়ি আসতে যাইতে
কে কইরাছে মানা রে ॥
আমার বাড়ি যাইও বিনোদ রে
খালে বিলে পানি
কেমনে যাইবা বিনোদ আমারও না বাড়ি রে ॥
আমার বাড়ি যাইও বিনোদ বসতে দিব মোড়া
জলপান করিতে দিব শালী ধানের চিড়া
শালী ধানের চিড়া দিব বিন্নি ধানের খই
গাছে পাকা শরবী কলা গামছা বান্ধা দই রে ॥[৮৯]

৮.

ভিন দেশ হতে আগত মৌসুমী ধানকাটা কৃষকের সাথে গৃহস্থ বধূর প্রণয়। প্রণয়ের ধর্ম হচ্ছে, প্রণয়ীর চেহারা, চলন-বলন সবই প্রেমিকের কাছে সুন্দর। প্রণয়ী পরস্পরকে খাইয়ে ও দেখে তৃপ্ত হতে চায়। দাওয়ালা কৃষককে বধূ হৃদয় উজার করে ভালবাসে।

ছোট দাওয়ালা[২৫০] উইঠা বলে বড় দাওয়ালা ভাই
খানি সোনা বাইর[২৫১] কইরা[২৫২] দ্যাও

www.pathagar.com

কামার বাড়ি যাইও রে
বৈদেশি নাগর দাওয়ালা রে ॥
সোনা খানি নইয়া দাউয়ালা পন্থ্যা বাড়ায় পাও
লোকের কাছে জিজ্ঞাস করে
কামারের কোনো গাও রে ॥
কামার ভাইয়া, কামার ভাইয়া
খাও রে বাঁর পান
ভালো কইরা গড়াইয়া দেও
আমার কাঁচি খানও রে ॥
সোনার দিও কাঁচিখানা রূপার দিও হামি[২৫৩]
হিরার ধারে ধার কাটাইও পরাণের আছারি রে ॥
দাওয়ালা যায় ধান ধোয়াইতে[২৫৪]
চিসটে বান্ধে আটি
দাওয়ালা পিন্দনে দেখি কুচি কাটা ধুতি রে ॥
দাওয়ালা যায় ধান ধোয়াইতে
খাইবার দিব কি?
ধর গো দিদি কোলের ছাইলা[২৫৫]
চিড়া কুইটা আনি রে ॥
আইস দাওয়ালা বইস কাছে
খাওরে বাঁর পান
হাসি মুখে কওনা কথা জুড়াই পরাণ রে ॥[৯০]

৯.

বাল্যবধূ ঘরে রেখে সাধু বাণিজ্যে গিয়েছে। দীর্ঘদিন সাধু গৃহে ফিরছে না। এদিকে নববধূ যৌবনে পা দিয়েছে। আশেপাশের লোকজন মধুর লোভে আগাগোনা করে।

কান্দিয়া কমলা বলে চরণও ধরিয়া
শিশুকালে প্রাণের সাধু গেলারে ছাড়িয়া
শিশুকাল মোর বইয়া রে গেল বাড়িল যৌবন
ভ্রমরায় না ছাড়ে পুষ্প মধুরও কারণ ॥
শিশু কালে প্রাণের সাধু গেলারে ছাড়িয়া
যৌবন কালে প্রাণের সাধু আসলা না ফিরিয়া।
শিশু কাল মোর বইয়া রে বাড়িল যৌবন
ভ্রমরায় না ছাড়ে পুষ্প মধুরও কারণ ॥[৯১]

১০.

কৃষক বন্ধু মাথায় মাথাল দিয়ে শস্য খেত নিড়াতে যায়। ঈশাণ কোণে কালো মেঘ জমেছে। প্রেমিকা বাড়ি যেতে পারছে না। তাকে নদী সাঁতরে যেতে হবে।

মাথাইল মাথে পাছুন হাতে
ক্ষেত নিড়াইতে যায় রে বন্ধু ॥ (২)

www.pathagar.com

চারা গাছে কমলা গায়ে
আস্তে হাত বুলায়রে বন্ধু ॥ (২)
মাঠ ভরা গরম হাওয়া ঝইড়া কোণে[২৫৬] সাজল দেওয়া[২৫৭]
সামনে দেখি দীঘল পালা
কেমনে ঘরে যাই রে বন্ধু ॥ (২)
এপারে খামার ওপারে বাড়ি
কেমনে হবো যমুনা পাড়ি
নাও আছে কাণ্ডারি[২৫৮] নাই রে বন্ধু
নাম তো মনে নাই রে বন্ধু ॥ (২)[৯২]

ক. ইসলাম ধর্ম বিষয়ক :

১.

নমরুদের ধুয়া

(সওয়াল)

মিশরের শাসক ছিল নমরুদ। সে ছিল খুব অহংকারী এবং পরাক্রমশালী। নমরুদ নিজেকে খোদা দাবি করে। প্রশ্নোত্তরমূলক এই গানে এক বয়াতি অন্য বয়াতির নিকট নমরুদের পিতার ও তার বংশের নাম জিজ্ঞাসা করছে।

আমি নমরুদ পাপির জন্মের কথা করি জিজ্ঞাসন[২৫৯]
কোনো বংশে বান জন্মে পাপি পিতার নাম বল এখন
অহংকারে আল্লাহ দাবি কইরাছিল সে যখন
ক্যান বাদশাই[২৬০] দিল আল্লাহ করিয়া তারে রহম[২৬১]
আল্লাহ পাকের কি বাসনা পাপির দ্বারা করিল পূরণ ॥

আল্লাহর রহমে যেজন বাদশাই পাইছিল
আল্লাহকে অমান্য কইরা কেন খোদা সাজিল?
এই কথাটার তরজমা কি খুলাসা[২৬২] তুমি বল
নইলে তোমার সনে তোমার বাজির বিষম কাল
জবাব দিলে বুঝি আমি ওস্তাদটা বানাইছ ভাল ॥

গণেশ বলে বটগাছতলা গানের আয়োজন
ধন্য ধন্য গান কমিটি বুদ্ধিবলে বিচক্ষণ।
ঠিকভাবেতে জবাব দিলে সুনাম করিবে অর্জন,
তা না হইলে দোহার গাইয়্যা যাওগা পলায়ন।
জব[২৬৩] দিয়া ভাই মান[২৬৪] রাইখা যাও
যদি হও বয়াতি সুজন ॥[৯৩]

২.

(১ নং গানের জওয়াব)

হযরত নূহ (আঃ) এর বংশে নমরুদের জন্ম হয়েছিল। নমরুদের পিতার নাম ছিল কেনান। কেনান হলো হযরত নূহ (আঃ) এর পুত্র। সেদিক দিয়ে নমরুদ হলো হযরত নূহ (আঃ) এর নাতি। নমরূদের আয়ুষ্কাল ছিল সাতশো বছর।

www.pathagar.com

অহংকারে ছোয়াল[২৬৫] কর নমরুদের কথা
নূহ নবীর বংশে জন্মে কেনান হইল তার পিতা।
সাতশো বছর হায়েদ[২৬৬] পাপির দিয়াছিল কইল খোদা,
ভাগ্যগুণে এই দুনিয়ায় বাদশাই পাইল সেই গাধা।
অহংকারে প্রকাশ করে আমার মালিক খোদা ॥

মান পাইয়া যে দিন পাপি পাপে দিল মন
দুনিয়াতে পাপের বিচার দেখাইত সেই নিরাঞ্জন
পাপের দশা কেমন ঘটে নমরুদ তাহার নিদর্শন
আল্লাহপাকের আশা ছিলো শোন বয়াতি বাচাধন
সেই কারণে নমরুদ পাপি হেদায়দ[২৬৭] মানে নাই কখন ॥

হাদিস খুইলা দেখবার পার কথার নমুনা
ছোয়াল কইরা ভাবছো মনে জবাব তাহার পাবা না
চোখ থাকিতে ও বয়াতি হইলা ক্যান দিন কানা
লোভেতে পাপ পাপেই বিনাশ দেখাইতে সেই রাব্বানা
নমরুদকে বানাইল গোয়ার[২৬৮]
গণেশ কয় বুইঝা দেখ না ॥[৯৪]

৩.

(সওয়াল)

আর বাইরে প্রকাশ হইলে আল্লাহর নবী
দেখিয়া লোকের খারাপি[২৬৯] দেলেতে[২৭০] ভাবি।
পাপির ধর্ম নষ্ট করতে করিলেন যুক্তি
যতো ভাঙ্গল মূর্তি,
আল্লাহ ছাড়া মাবুদ বলতে গো আর কেহ নাই
তারই ভজিলে মুক্তি ॥

নমরুদ শুইনা নবীর কথা,
অন্তরেতে পাইয়া ব্যথা
বলে এই কথা
ইব্‌রাহীমকে জানে মার শোন এই কথা
সবেই স্বীকার করে তা
একটা অগ্নিকুণ্ড তৈয়ার করে গো
দিগ-পাশে[২৭১] তার কতো ছিলো
বলো কত হাত গাতা[২৭২] ॥

কাষ্ঠ[২৭৩] দিয়া আগুন দিয়া
নবীকে তাতে ফালাইল
তুমি তাই বল।

www.pathagar.com

কতখানি ফাঁকে চরক গাছটা গাড়ছিল[২৭৪]
তাতে নবীক বানছিল[২৭৫]
কতজনে দড়ি ধইরা গো
গণেশ কয় বল তুমি
নবীক ফালাইয়াছিল ॥[৯৫]

৪.

(৩নং গানের জওয়াব)

আর শোন বয়াতি জবের কথা
নবীকে মারিতে গাধা, খাটাইল মাথা
আড়ে পাশে[২৭৬] চব্বিশ মাইল একশ গজ গাতা
আছে কিতাবেই লেখা
কাষ্ঠের মইধ্যে তেল ঢালিয়া গো
আগুন দিছিল পাপি
তুমি শোন সেই কথা ॥
চতুর্দিকে এক মাইল কইরে
সেই আগুন ছড়াইয়া পরে ভাবে অন্তরে
শয়তানের বুদ্ধিতে একটা চড়কগাছ গাড়ে
ভাই রে এক মাইলের দূরে।
চাইরশো[২৭৭] লোক দড়ি ধইরা গো
নবীকে আগুনে দিতে তারা টানাটানি করে ॥
আর ভাই রে সত্তুর হাজার ফেরেশতা আইসে
নিযুক্ত নবীর সাহায্যে সাধ্য কি আছে
সাধুর বেশে যুক্তি দিল শয়তানও আইসে
ইহার ভাল বুদ্ধি আছে
নারী পুরুষ চল্লিশজন গো
যদি জিনা[২৭৮] করে তারা ভাই রে চড়কের নীচে ॥
তখনই পড়িবে নবী, সফল হবে চেষ্টা সবই
আমি কইতাছি
সেই কর্ম করাইলো ভাই রে সেই নমরুদও পাপি
তখন পড়ছিল নবী
গণেশ বলে ভেবে দিলে গো
আল্লাহ সখা যাহার আছে
তার সাথে শয়তানে করব কি? ॥[৯৬]

ইব্রাহিম নবীর ধুয়া

৫.

(সওয়াল)

বিরাট গর্ত করে তার মধ্যে কাঠ দেওয়া হয়। তারপর কাঠেল তৈল ঢেলে দিয়ে প্রজ্জ্বলন করা হয়। ইবরাহীম (আঃ) কে দূর থেকে নিক্ষেপ করার জন্য চড়কগাছ তৈরি করা

www.pathagar.com

হয়। ফেরেশতারা যাতে ইবরাহীম (আঃ) কে সাহায্য করতে না পারে সেইজন্য চড়ক গাছের নিচে চল্লিশজন মহিলাকে দিয়ে জেনা করানো হয়।

নবীকে আগুনে ফালায়
শুইনা আমার অন্তর কাঁপে কলিজা শুকায়
আগুনে পড়িয়া নবী ক্যামনে জীবন বাঁচায়
আল্লাহ সখা হইয়া তখন
কি আদেশ করে সেথায়
আর তুমি বল কথা শুনিতাই সভায় ॥

আমার এই মনের বেদনা
শয়তানকে মারিতে ক্যানে হুকুম দিল না
শয়তান মইলে এই দুনিয়ায় শয়তানি আর হইত না
এই দুঃখ মনেতে জাগে নিভাইতে আর পারি না
ওরে বইলে[২৭৯] কথা কর শান্তনা ॥

বলি বয়াতি সুজন
আমার কথার জবাব তুমি দিয়া যাও এখন
না জানিতে ক্যানে আইলা[২৮০]
সঙ্গে লইয়া দোহারগণ।
তাল ছাড়া নাচনাতে বুঝি বুঝাইতে চাও আমার মন
অন-ওরে ভুলে না তায় গণেশ বাবুর মন ॥[৯৭]

৬.

(৫নং গানের জওয়াব)

শয়তানের কুপরামর্শে ইবরাহীম (আঃ) কে আগুনে ফেলা হলো। শয়তান যদি পৃথিবীতে না থাকত তা হলে পৃথিবীতে অনিষ্ট কাজ হতো না।

শোন বয়াতি শোন
আগুনে পরিয়া নবী ডাকে নিরঞ্জন
আমি যদি পুইড়া মরি ভাবি না কইল সে কারণ
তোমার নামের হয় কলংক দুঃখ আমার সেই কারণ
অন-তোমার নামের আল্লাহ রাখ হে মরম[২৮১] ॥

নবীর মুখের শুইনে মিনতি
রাব্বুল আমিন হুকুম দিল আগুনের প্রতি,
আগুন তুমি হও গোলজার[২৮২]
নইলে নাই তোমার গতি
স্বর্ণ সিংহাসনে বইসে নবী গায় নামের গীতি
ই-ওরে যতো ছিলো আল্লাহর সুখ্যাতি ॥

আল্লাহর নামের দেওয়ানা
এস্কেপোড়া[২৮৩] দেহুখানা[২৮৪] আগুনে পুড়ে না

www.pathagar.com

মমিন[২৮৫] হইয়া আল্লাহ বিল্লাহ ভবে করে যে জনা
আল্লাহ তারে রক্ষা করে খলিল[২৮৬] তাহার নিশানা
ওরে গণেশ বলে নাম কেউ ভুইল না ॥[৯৮]

৭.

কারবালাবিষয়ক ধুয়া

হোসেন বলে ওগো বরকত মা
মাগো কই তোমার কাছে
এ... এ... এ...
আংগোর[২৮৭] মরণ কারবালাতে
বেদ্বীনও কাফেরের হাতে গো
শুনছি কতা নূরনবীর মুখে এ... এ... এ...
ওরে আংগোর নানা হযরত নবী
তিনি যাহা মুখে বইলাছে
তাই মঞ্জুর হইয়্যাছে
আছে জহরে[২৮৮] আর কহরে[২৮৯] মরণ
কেতাবে আছে স্মরণ
মাগো বলি তোমার কাছে এ... এ... এ... ॥

এজিদার[২৯০] আমগোরে[২৯১] মারবো
দামেশকে বাদশাই নিবো গো... ও
তবে কী পাবো সিংহাসন... ও অন
ও যার বাপদাদার নাই ঠিকানা আ-আ
সেইতি নিবো রাজ্যের ধন
সবুর কর মন,
আসবে হানিফ[২৯২] করবে শব্দ
তর পুরী[২৯৩] হবে জব্দ বুজবি রে সেই দিন ॥
হানিফ যেদিন দ্যাশে আসবে ভাই
রেজিদ[২৯৪] তখোন কোথায় পলাবো[২৯৫]
তর গুষ্ঠির ছোটা মারিবো
তরে করব রাজ্য ছাড়া তর গুষ্ঠির জুলুম ঘটাবো,
ও তর অলিদ[২৯৬] বাপকে ধইরা[২৯৭] আইনা
গুতাইয়া[২৯৮] ভাংবো মানজার[২৯৯] হাড়
তিন তারাজের তার
ও তর সেরা বাপরে ধইরা আইনা
মারগো দিয়া শুল হাটাবো
তিরিশ তাড়াশ লাগাবো
ও- ও হো ও ... ॥[৯৯]

www.pathagar.com

৮.

(হোসেনের কুফার দিকে যাত্রা)

আব্দুল্লাহ জেয়াদ। সে কুফার অধিপতি। জেয়াদ ছিল এজিদের বন্ধু। সে এজিদের পরামর্শে ইমাম হোসেনকে সাহায্য করার নামে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। ইমাম হোসেন সরল বিশ্বাসে কুফা রওয়ানা হয়। কিন্তু পথ ভুলে কারবালায় উপনীত হয়। কারবালায় যাওয়ার পর ঘোড়ার পা মাটিতে ঢেবে গেলে ইমাম হোসেনের ভবিষ্যৎ বাণীর কথা মনে হয়।

বিসমিল্লাহ বইলা হোসেন রওনা দিলো পথে
কুফাতে যাবে বইলে আশা তার মনে
হোসেন স্বপরিবার সঙ্গে লইয়া গো
ও হোসেন পথেতে দিলো মেলা[৩০০]
পথ ভুলিয়া গেল হোসেন শহীদ কারবালায় ॥
ও হোসেন কারবালায় গেল
ও একটা শব্দ উঠিলো
গাছ বিরিক্ষি[৩০১] তরুলতা কাইন্দা[৩০২] উঠিলো
হোসেন তখোন চুইমকা[৩০৩] উঠে গো
হোসেনের আগের কতা স্মরণ হইলো
শুকান[৩০৪] জমিনে ঘোড়ার পাও[৩০৫] গাইড়া[৩০৬] গেল ॥

ও হোসেন কাইন্দা কাইন্দা কয়
আল্লাহ ঠেকলাম ভীষম দায়
কুফারও পথ ভুইলা[৩০৭] আইলাম[৩০৮] কারবালায়,
ওরে পানির নহর বন্ধ রাইখা রে
হোসেনের পানির ব্যাগেরে[৩০৯] জীবন যায়
কুফাতে যাবো বইলা আইলাম কারবালায় ॥[১০০]

৯.

(মরিয়মের ধুয়া)

ধুয়াগানে বিষয় বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য যেমন ধুয়া গানের বিষয় হতে পারে, তেমনি ধর্মীয় কোনো কাহিনিও গানের বিষয় হতে পারে। এ গানে হযরত মরিয়ম (আঃ) এর গর্ভে হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম-কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভিতর দিয়ে আল্লাহর অপার মহিমার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে।

খোদার লীলা অপার খেলা কে বুঝিতে পারে
বনি ইসরাইলের বংশে ভাইরে ইমরানের ঘরে
আল্লা তালা পাঠাইয়া দিলেন মইরম[৩১০] বিবিরে
বলি তার শেষে, মায়ের নামটি হানা বিবি
শোনবেন সভার দশজনে ॥
মাতা-পিতার ঘরে বিবি সিয়ানা[৩১১] হইল

www.pathagar.com

বায়তুল্লার মসজিদে পাঠায়
আল্লার হুকুমে খেদমত করিতে ॥
মসজিদে থাকিয়া গো বিবি
আল্লার এবাদত করে
স্বামী ছাড়া সন্তান দিল মইরম বিবিরে
পাক পরওয়ারে
ইছা নবীর জন্ম হইল মইরম বিবির গর্ভেতে ॥
মইরম বিবির পালা এখন গাইলাম আসরে
দোয়া করবেন সভার দশজন এই অধমেরে
রোজ হাশরে কঠিন দিনে
রাসুল যেন পার করে ॥[১০১]

হিন্দু ধর্মবিষয়ক ধুয়া

১০.

(বিধবাবিষয়ক)

'পতিই সতীর গতি' হিন্দু শাস্ত্রে সধবার জয়জয়কার ঘোষিত হয়েছে। হিন্দু নারীরা পতির সেবা করে স্বর্গে যেতে চায়। কিন্তু বিধবারা পতির সেবা হতে বঞ্চিত। তাই হিন্দু বিধবা নারীরা অভিশাপ দিচ্ছে, যে হিন্দু বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে তার বেটি ভাতিজী বিধবা হউক।

হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়ে
বিফলে দিন যায় বয়ে
অল্প বয়সে হইলাম যে রাড়ি[৩১২] ॥
ওগো মনে বড় আশা ছিলো পতির সেবা করি
সেও আশা নৈরাশা হইল বিধি হইল বরি।
পতির সেবা না করলে পরে গো
ভবপারে যাইয়া পাইবা না ভবতরী ॥

এই তো জারের দিনে বিছানে শুইলে পরে
ঐ অনলে জ্বলে পুড়ে মরি
ওগো নেপ তোষকের জার[৩১৩] না মানে
কানছি নয়ন ভরে
সারা নিশি পোষাই আমি
বালিশ বুকে নিয়ে।
পতির কথা মনে হইলে গো
আমার ইচ্ছা হয় জান ফাঁসি লইয়ে যাই মইরে ॥

মোকদম সরকার বইলা গেছে বেদবেদান্ত
লেখা আছে সত্য সাধি গণেশ লেইখাছে।
ওগো হিন্দুর নিকা মানা করছে কোনবান সর্বনাশী

www.pathagar.com

ও তার বেটি ভাস্তী[৩১৪] হইগ্‌গা বিধবা
দারুণ কলেরা আইসে।
বিধবা হইয়া নগর দ্বীপ যাইয়ে
ওরা রাধার নামটি নইঙ্গা ঠাইসে ঠাইসে[৩১৫] ॥[১০২]

ঐতিহাসিক ঘটনাবিষয়ক ধুয়া

১১.

(স্বাধীনতার ধুয়া)

১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হয়। ঐ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর সাথে চক্রান্ত করে বঙ্গবন্ধুকে গদিতে বসতে দিল না। শুরু হলো স্বাধীনতা যুদ্ধ। জামায়াতে ইসলামীর লোকজন রাজাকার বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করল। ইন্দিরা গান্ধীর সাহায্য সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

ওরে সোন[৩১৬] ত্যারোশো সাতাত্তর সোনে[৩১৭]
একটি কতা হইলো মনে
ভোটাভুটির তারিখ হইলো ভাই,
ওরে ইয়াহিয়ার কতা বলি
গণতন্ত্র দিলেন তিনি
সেই কারণে ভোট হয়
ওরে পাবলিকেরা[৩১৮] ভোট দিয়া
শেখ সাবকে উইনার[৩১৯] করল ভাই ॥

ওরে শেখ সাব ভোটে উইনার হইলো
সেই কতা শোনাই ভালো
ইয়াহিয়ার মাতায়[৩২০] আগুন ধইরা যায়
ওরে ভুটটুর সনে যুক্তি করে
পেলেন[৩২১] দিয়া সৈন্য আনে
ঢাকাতে নামাইয়া দেয়
ওরে থানায় থানায় সৈন্য যাইয়া
রাইফেল বন্দুক হাত করিলো ভাই ॥

ওরে রাইফেল বন্ধুক হাত করিলো
জামাতিরা[৩২২] সংবাদ পাইলো
জামাতিরা সাইজা গেল ভাই।
ওরে সুবেদারে হুকুম করে
ভর্তি হও ভাই রাজাকারে
তোমাগোর কোনো ভয় নাই,
আমরা তোমাগোর পাছে আছি

www.pathagar.com

রাইফেল ট্রেনিং শিক্ষা করো ভাই ॥
ওরে বাড়ি ঘর সব পুইড়া দিলো
খাসি বকরি ধইরা নিলো
থানায় নিয়া জবাই করল ভাই।
ওরে মাংস রুটি খাইয়্যা তারা
রাইফেল লইয়্যা হইলো খাঁড়া
রাস্তার মইধ্যে পাবলিক পাইলে
চাইর[৩২৩] কালেমা জিজ্ঞাস করে
ন্যাংটা[৩২৪] কইরা দেখতে চায়
ওরে তাই দেখিয়া হিন্দু লোকে
দাড়ি চুল রাইখা দিলো ভাই ॥

ওরে ইন্দিরা গান্ধীর কথা বলি
বহু সায্য[৩২৫] করলেন তিনি
রাইফেল বন্ধুক কামান দিলেন ভাই
ওরে এই দ্যাশটা স্বাধীন হইলো
শেখ সাব পেসিডেন[৩২৬] হইলো
ওরে খাজনার ট্যাহা মাফ করিলো
পাবলিক সব খুশি হইলো
যাগোর[৩২৭] কোনো জমি নাই
ওরে কাপড়ের দাম দুইশো ট্যাহা
ধনীর সুখের সীমা নাই ॥[১০৩]

১২.

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধুয়া

দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে আসামে হিন্দু-মুসলমানে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। শিখ সম্প্রদায় দাঙ্গার উস্কানি দিয়েছিল। এই দাঙ্গার মুসলমান সম্প্রদায় নির্যাতিত হয়। দাঙ্গার ফলে অনেক ধনী লোক অসহায় অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়।

১৩৫৭ সনেতে দুঃখের কথা হইল মনে
আসামেতে লাগল যুদ্ধ হিন্দু মুসলমানে
কত লোক মরে সেইখানে
তারা আল্লার কাছে দোয়া করে গো
বিচার চাই পরওয়ারে ॥

আসামের শিখ জাতি যারা
তারা হইয়াছে উতালা
আছে মার মারোয়াল।

www.pathagar.com

তারা প্রতাপশালী বলে
বাড়িঘর পুইড়া দিল রাজার অনবিচারে,
শুইনা[৩২৮] পরাণও বিদরে[৩২৯]
কত ধনী মানি চইলা আইল রিফুজি[৩৩০] সাজিয়ে
উঠল শহরে বাজারে
ভিক্ষা মাইঙ্গা[৩৩১] খাইলো তারা গো
গোলা ভরা ধান থুয়ে।
কতই গুনা করছি আল্লাহ গো
ও আল্লাহ তোমারও দরবারে ॥
আরেকটি কথা হইল মনে
একটি পর্বত ভাইঙ্গা পড়ে
আড়েপাশে দেড়'শ মাইল
কেমনে হিসাব করে দিয়া দূরবীন ধরে।
নূরুল আমীন খান বাহাদুর
হারু তারা সদাই মিটিং করে
তারা খেনেই[৩৩২] থাকে লাহুর দিল্লী খেনেই করাচীতে
তারা রিফুজিকে বলে
তোমগোর যাহার বাড়ি যেইখানে ছিলো
যাওগা সেইখানে চলে ॥[১০৪]

১৩.

(টাঙ্গাইল জেলা বিষয়ক ধুয়া)

পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা আয়তনের দিক দিয়ে বড়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এই জেলা বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৬৯ সালে টাঙ্গাইল আলাদা জেলার মর্যাদা পায়। কিন্তু মহকুমা সৃষ্টি করার জন্য ভূঞাপুর, গোপালপুর, মধুপুর ও ধনবাড়ির প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো প্রস্তাবই কার্যকর হয় না।

একটি কতা শুনলাম পেপারে
তাই বলছে গভর্নরে
একটি কতা শুনলাম পেপারে
ময়মনসিংহ জেলা ভারি[৩৩৩]
দুইভাগে বিভক্ত করি
মহকুমা বসায় তার সাথে
ঢাকা হইতে কমিশন সাহেব
ডিএম আসে তার সাথে
জেলা হয় টাঙ্গাইলেতে
মহকুমার জন্যে তারা জাগা[৩৩৪] খুঁজতাছে।

পিনসিপাল[৩৩৫] সাব কয় ভূঞাপুর
হাতেম খাঁ[৩৩৬] কয় হেমনগর

www.pathagar.com

হাসান চৌধুরী[৩৩৭] হইলো রে পাগল,
এবার ধনবাড়িতে টাউন করিবো
দম থাকতে না ছাইড়া দিবো
করচিতে কইরাছি দরবার।

মধুপুরের বাসিন্দারা ধরে যাইয়্যা ডিএম-এরে
টাউন চাই মধুপুরে
উচা জাগা আছে সেথায় খরচ কম হবে
এই তিনজন করে টানাটানি
শ্যাষে গোপালপুর হয় ফৈরাদি[৩৩৮]।
ইয়াজ[৩৩৯] পণ্ডিত রেজ্জাক মাস্টার
ওরাই দুইজন বুদ্ধির সাগর
কায়েদ-এ-আজম জিন্নাহর মতোন
সার্কেল বাবু কর্মচারী চান মিঞা তার সঙ্গে মিলে
সব মহাজন ডাইকে[৩৪০] মিটিং করছে গোপনে।
আমির সরকার ভাবিয়া বলে
শোন গো কমিটিগণে
সব মহাজন ডাইকে মিটিং করছে গোপনে।
তোমরা ক্যানে করো লেখালেখি
টাকা নিয়া করো পাইকারি
মইলো কইল[৩৪১] গরীব চাষী
মধুপুর ফারামের মতো হয় না যান শেষে।
গোপালপুরের আশেপাশে
বাসিন্দাসব না উঠাইয়্যে[৩৪২]
করো টাউন নদীর দুই ধারে ॥[১০৫]

১৪.

(দাঙ্গার ধুয়া)

১৯৪২ সালে আসাম প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। দাঙ্গার ফলে বহু মুসলমান আসাম হতে বাংলায় চলে আসে। সে দাঙ্গায় শিখ সম্প্রদায় হিন্দুদের সহযোগিতা করে। আবার বাংলার অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ও বাংলা ত্যাগ করে।

তেরোশো উনপঞ্চাশ সনে
একটি কথা হইলো মনে,
আসামেতে লাগল যুদ্ধ
হিন্দু মুসলমানে
কত লোক মইলো[৩৪৩] সেখানে
বাড়িঘর পুইড়া[৩৪৪] দিলো রাজার অনবিচারে[৩৪৫]
দুঃখ সহে না পরাণে

www.pathagar.com

তারা হাত উঠায়ে দোয়া মাঙ্গে[৩৪৬] হে
বিচার চাই পরকালে ॥

আসামের শিখ জাতি যারা
মুসলমান তাড়াইলো তারা
কতো মানুষ চইলা আইলো
রিফুজি সাজিয়া
উঠল শহরে বাজারে
ভিক্ষা মাইঙ্গে খায় গো তারা
গোলা ভরা ধান থুইয়্যে
দুঃখ সহে না পরাণে,
তারা হাত উঠাইয়ে দোয়া মাঙ্গে হে আল্লাহ
বিচার চাই পরকালে ॥

বাংলার হিন্দু বাসিন্দা যারা
তারা হইলো উতালা[৩৪৭]
কতো হিন্দু চইলে[৩৪৮] গেল ছলনা কইরে[৩৪৯]
আমরা যাবো হিন্দুস্থানে
হিন্দুস্থানে যাইয়্যে আমরা
খাবো বালাম খানা
তাগোর[৩৫০] ক্যাম্প হইলো থানা।
কতো নারী লোকের স্তন কাইটে[৩৫১] নেয়
দুষ্ট মুসলমানে
কথা উঠল পেপারে
তাই শুনিয়া মন্ত্রী আইলো তদন্ত করিতে
মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করে
এসব কথা মিথ্যা লেইখা হে
দিলো রিপোর্টও লেইখে।
তারা হাত উঠাইয়ে দোয়া মাঙ্গে হে আল্লাহ
বিচার চাই পরকালে ॥[১০৬]

১৫.

১৯৫০ সালে আসামে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মানব জীবনে যে মর্মান্তিক করুণদশা নেমে এসেছিল, তারই বাস্তব চিত্র গানটিতে ফুঁটে ওঠেছে।

১৩৫৭ সালের দুঃখের কথা হইল মনে,
আসামেতে লাগল যুদ্ধ হিন্দু মুসলমানে।
কত লোক মরলো সেইখানে
ওরে বাড়ি ঘর সব পুইড়া দিল।

www.pathagar.com

রাজার অবিচারের দুঃখ
সহে না পরাণে,
কত লোক জমাজমি ফেলিয়া
চলে আসলো পাকিস্তানে।

আসামে শিখ জাতি আছে
তারা মুসলমান তাড়াইছে,
ধনি গরিব চইল্যা আইলো
রিফিউজি সাজিয়া।
উঠল শহরে আর বাজারে
ওরে ভিক্ষা মাইগা খাইল তারা
গোলাভরা ধান থুইয়ে,
দুঃখ সহে না পরাণে।
তারা হাত তুলিয়া দোয়া করে
বিচার পাইতে পরকালে।

পাকিস্তানের হিন্দু বাসিন্দা যারা
তারা হইয়াছে উতালা,
কত হিন্দু চইল্যা গেল করিয়া ছলনা।
আমাদের জাতিকুল রইল না,
ওরে হিন্দুস্তানে যাইয়া মোরা
খাব ভালা ভালা খানা।
তাদের ক্যাম্প হইল থানাতে
মানি লোকের মান মাইরাছে
ওরে এইসব বিধির লীলা।

কত হিন্দু বর্ডার পার হইয়াছে
দেশের সঙ্গে ছলনা কইয়াছে,
নারী লোকের স্তন কাটিয়া নেয়,
দুষ্ট মুসলমানে খবর কুকর্ম
ওঠল পেপারেতে।
ওরে তাহা শুনিয়া মন্ত্রি আসে
তদন্ত করিতে।
কত স্বাক্ষী প্রমাণ লয়ে
এসব কথা মিথ্যা বলে
হে দিল রিপোর্ট লিখে।
পাকিস্তান হিন্দুস্তান মিলে
দেশের শান্তি রক্ষা করে,

www.pathagar.com

নূরুল আমিন খান
বাহাদুর জহরলাল নেহেরু
তারা সর্বদা মিটিং করে,
খেনেই যায় দিল্লি লাহোর
খেনেই করাচিতে,
দিল বিজ্ঞাপন ছাপায়ে
ঘর বাড়ি যেখানে ছিলো,
হে তোমরা যাও গা
সেই খানেতে চইলে।[১০৭]

১৬.

মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতনবিষয়ক ধুয়া

বৈচিত্র্যের কারণে ধুয়াগানে সমকালীন নানা ঘটনা স্থান পায়। বহুল আলোচিত ঘটনা বা বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি ধুয়াগানে উঠে আসে। আমাদের কষ্টার্জিত মহান মুক্তিযুদ্ধের চিত্র এ গানটিকে বিশেষত্ব দান করেছে। পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা কত সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হয়েছে, নারী সম্ভ্রম হারিয়েছে তা এ গানে জীবন্ত রূপ পেয়েছে।

আর ভাইরে একাত্তরে জ্যৈষ্ঠি মাসে
শনিবার দিন গিয়াছিলাম গোপালপুর হাটে
ঐ যে বিহারীদের গাড়ি খাড়া রাস্তার উপরে
বেতের ছড়ি নেয় হাতে
চাইর কালেমা জিজ্ঞাস কইরা গো
চড় মারে পাবলিকের গালে ॥
আর ভাইরে লাথি ঘুষি কত দিল
তিনজন মানুষ ধইরা নিল হস্ত বন্ধন করে
চক্ষু বন্ধন কইরা তাগোরে[৩৫২] গাড়িত উঠাইছে
নিছে সি ও'র অফিসে
কত চিক্কার পারে তারা গো
ঐ বিহারীর দয়া না হইছে ॥
আর ভাইরে রবিবার দিন আটটার পরে
তিনজন মানুষ নিয়া যাচ্ছে নদীর কাছাড়ে[৩৫৩]
ওরে কাতার করবার কইয়া তাগরে
বন্দুক নেয় হাতে, মেজরে ঘড়ি দেখতাছে
এক গুলিতে তিনজন মাইরা গো
নদী দিয়া ভাসাইয়া দিছে ॥
আর কত ছেলের বাবা আইনা মারে
ছেলেগরে ইতিম[৩৫৪] করে এই বাংলাদেশে

কত মেয়েলোকের স্বামী মাইরা বিধবা করে
ও সে বিহারীর জাতে ॥
আঃ খালেক ডাইকা[৩৫৫] বলে গো
আল্লায় তাগোর বিচার কইরাছে ॥
আর ভাইরে তিরিশ লক্ষ মানুষ মারে
বাংলাদেশে হিসাব করে মাথা গুণতি কইরে।
শেখ মজিবর বাংলায় আইসা কাইন্দা কইতাছে
আমি মিনারা করব
শহীদ মিনারা বানাইছে
মধুপুর সি ও'র অফিসে ॥[১০৮]

১৭.

জরিপের ধুয়াগান

কলিম উদ্দিন কয় সভাতে
আচম্বিতে কি ঘটনা দেখায় ইংরাজে
ওরে দূরপিনে আমিনে নজর করে
সামনে দূরবীন ধইরে
এক চোক্ষে নজর করে সামনে নিশান গাড়ে[৩৫৬]
আমিনেরা করে মাপ ডিপটিসাব কানন গো সাব
তারা মাঠেতে ঘুরে
ত্রি-সীমানা ঠিক করিয়া সেই খানে পাথরও গাড়ে ॥
আইলোরে[৩৫৭] থানার পুলিশ লেইখা নিলো ঘরবাড়ি
যতো আনাইজ[৩৫৮] তরকারী
আম গাছ আর জামের গাছে নারকেল গাছ
আর সুপারি গাছ যার বাড়ি,
নাও কুয়া সিন্দুক চৌকি
ষাঁড় বাছুর আর গাই[৩৫৯] বকরী
ভাঙ্গা একখান ঘর আছিল
আবার আইলো গুজারতি।
ছোট দিদি কয় বড়ো দিদি
বকরীর জ্বালায় প্রাণ-বাঁচে না
প্রাণেতে না পারি
ন্যাংড়া বকরীর দুইডা ছাও[৩৬০]
ব্যাটারা লেইখা নেয় তাও
আণ্ডাপারা[৩৬১] মুরগির কথা
কইয়ো[২৬২] নাগো আম্মাজান ॥[১০৯]

www.pathagar.com

সামাজিক সাইর

১.

(দুর্গা সুন্দরীর ধুয়াগান)

স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যার মর্মান্তিক দৃশ্য এ ধুয়ায় বর্ণিত হয়েছে। পাষণ্ড স্বামী তার সুন্দরী স্ত্রীকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে পালিয়ে যায়। হত্যা না করার জন্য স্ত্রীর অনুনয় বিনয়েও কোনো কাজ হয় নাই।

হায় রে সোন[৩৬৩] ত্যারোশো পঁচিশা[৩৬৪] সনে
শুনছি লোকের মুখেতে
ওরে খুন হইয়াছে সরাতৈলের চরে
ওরে কি প্রকারে খুন হইয়াছে
কি বলবো দশের কাছে
তা শুইনা আমার প্রাণ কাঁইপে[৩৬৫] উঠে ॥

হায় রে শুনি নাই কোনো শাস্ত্রেতে
স্বামী হইয়া চিরি[৩৬৬] জবাই করে
ওরে মঙ্গলবারের গত রাইতে[৩৬৭]
দুর্গা সুন্দরীর হস্ত বন্ধন করে
সেই সময়ে সে ডাইকে[৩৬৮] বলে
শরীমা[৩৬৯] পানি দেও মোরে ॥

তাই শুনিয়া দুষ্ট নারী কয়
ওরে পানি দিবার কে বান যায়
আজরাইল আইসে হাজির হইয়া রয়
অমনি ছুরি গলে চালায়
দুর্গা সুন্দরী কাইন্দা কাইন্দা[৩৭০] কয়
আহারে আমার প্রাণের পতি
জীবনে মাইরো না আমায় ॥

এ্যাও তো খবর আন্দর[৩৭১] বাড়ি গেল
রাইত ফজরের সময় হইলো
গ্রামের লোক তামশা দেখতে আইলো
ওরে কি পোরকারে[৩৭২] খুন হইয়াছে
কি বলবো দশের কাছে
খবর শুনলো দুর্গা সুন্দরীর মায়ে
আহারে আমার চান্দের বেটি
দুনিয়া তুই আন্ধার করিলি
নশের উদ্দিন কয় উপায় কি করি
নশের উদ্দিকে ডাইকে কয়
খবর পাঠাও আজিজুল্লাহর বাড়ি

www.pathagar.com

খবর শুইনা আজিজুল্লাহ অস্থির হইয়া পইড়া যায়
দরখাস্ত করো কালিহাতী থানায় ॥
ওরে দরখাস্ত পাইয়া পুলিশ সাহেব
কাটা মুণ্ডু দেখতে পায়
আসামী আমার পলাইলো কোথায়,
ধুয়া বানছে সবুর বয়াতি
সে কতা জানাই চান সভায় ॥[১১০]

২.

দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার অনন্য কীর্তি মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতাল। এই হাসপাতালটিতে সকল ধর্মের লোক সমান চিকিৎসার সুযোগ পায়।

নতুন ধুয়া সভায় বলি শোনেন দশজনায়
নৌকাতে ভাই গিয়া ছিলাম মির্জাপুর থানায়।
রায় বাহাদুর মহাপুরুষ, করছে আজব কারখানা
এক জীবনে কোনো জনে করতে পারে না
গইড়াছে এক পরীর স্থান
জীবনে কেউ করে নাই।
রায় বাহাদুর মহাপুরুষ জন্ম কুলিনের
হাসপাতালের নাম রাইখাছে মহকুমা টাঙ্গাইলের
কুমুদিনী হাসপাতাল ভাই, মাতা সকলের
শোভা সুন্দরী ডিসপেনছারী
কন্যা তিনি সাহেবের।
দক্ষিণের দালানে ভাইরে নেংরা রোগী রয়
কত নেংরা নুলা কানা খোড়া
কতই রোগী দেখতে পাই
সকলেরই সমানভাবে চিকিৎসা হয় ভাই
ধুয়া বানছে নোয়া সরকার
সাকিন[৩৭৩] বেথুর গ্রাম
অভাবে পরিয়া ভাইরে
চইড়াছি ভাড়াইটা নায়।[৩৭৪]
দেশের লোক ঠাটটা করে বিদেশে বেড়ায়
রায় সাহেব করিলেন দয়া
সকল অভাব দূরে যায়।[১১১]

৩.

করটিয়ার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী স্বনামধন্য প্রজাহিতৈষী জমিদার ছিলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে পাখি পোষতেন। সে পাখিটি কথা বলতে পারত। তা দেখে এলাকার লোকে অবাক হতো।

www.pathagar.com

আওজু বিল্লাহ বিস্‌মিল্লাহ
শোন মোমিন ভাই
ওরে চান মিয়া সাব সোনার জমিদার
ওনার[৩৭৫] তুল্য কেহ নাই ॥
চান মিয়া সাব চান খবি
দেল খোলাসা ইমাম ঠিক
ওরে হিংসা নিন্দা নাই।
হক বিচারের মালিক তিনি
সোনার বাদশাই[৩৭৬] দিছে মালেক সাই ॥

তার উত্তরে দুখু বয়াতি
তিন পোলা তার ইমাম ঠিক
দুইজন মুসুল্লী।
একজন থাকে রাজ দরবারে
বিন্দে নাম পালে বন পাখি,
সাহেবের পাখির এছাই বিদ্যা
সাহেব আইলে দেয় আদাব।
অন্ধরের পাখি, বিহানে[৩৭৭] ফজরের পাখি
পড়ে লায়লাহা জিকির ॥

সাহেবের বাড়ির মধ্যে আনছে কল
টিপি দিলে ওঠে জল।
উপরে জ্বলে বাতি, খেত পাহারা দেই আমরা
সেই আলো দেখি ॥
সাহেব যখন পূণ্যায়[৩৭৮] বসে
সোনার বাঁা সাজাইয়া আনে
সোনার বাঁার পান
সোনার হুক্কা সারি সারি
কত সোনার অলঙ্কার ॥[১১২]

৪.

(জায়গীর বিষয়ক ধুয়া)

এ গানের বিষয়বস্তুতে গ্রাম বাংলার চিরন্তন রূপের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাম বাংলায় জায়গীরের নিকট মেয়ে বিয়ে দেয়ার এক ধরনের রীতি প্রচলিত ছিল এক সময়। গ্রাম্য কবি, গায়কদের গভীর দৃষ্টি তাকেও এড়িয়ে যেতে দেয়নি। এ জাতীয় বিয়ের সুফল ও কুফল দুই-ই এ গানে সহজে ভাষা রূপ পেয়েছে।

জন্নম[৩৭৯] ভরা রঙ তামাসা কতই কইরাছি
রঙ্গের ঘোড়ায় লাগাম দিয়া তামুক খাইয়াছি
দিন মোর ফুরাইছে চুল পাইকা দাঁত পইড়া গেছে
বুড়ার ডিল[৩৮০] ধইরাছি ॥

www.pathagar.com

বুইড়া বলে ঐ বয়াতি নিন্দা কইরাছে
ভাবে বুঝি ঐ বয়াতির নাতিন যোগাইছে[৩৮১]
কেউ তো ঠোকে না
নাক বোঁচা নাতিন দেইখা কেউ পছন্দ করে না ॥
ও তার বিবি সাব কয় শোন স্বামী তুমি বুঝনা
সাইজ ভালা দেইখা একটা জাগির আনো না।
চেংরা চিকন সুন্দর দেইখা একটা জাগির আনছে
ম্যায়াডারে[৩৮২] পড়বার দিল জাগীরের কাছে
পড়া শিখতাছে
বাংলা আরবি বাদ রাইখা বাতন শিক্ষা দিতাছে ॥
গেরামের লোক শুইনা সমাজ বন্ধ রাখিল
দশ কড়া[৩৮৩] জমি ব্যাটার চকে[৩৮৪] আছিল
বেইচ্যা ফালাইল
গেরামের লোক খাওয়াইয়া সমাজ ঠিক রাখিল ॥
জাগীরের কাছে ম্যায়ার বিয়া পড়াইছে
পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন জামাই চাইতাছে
নইলে নিবে না
কোন দেশে বা গেল জামাই ফিরা তো আর আইলো না
ওরা ঘরে বাইরে ঝগড়া করে উপায় কী বল্
তোর জন্যে বজ্জাত মাগী এই দশা হইল, দুঃখে বাঁচিনা ॥
ওই যে শুকুর বুইড়ারে জাগির রাখলে
টাকা পয়সা লাগতো না ॥[১১৩]

৫.

(কালো জামাই বিষয়ক ধুয়া)

সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনা সমসাময়িক জীবন থেকে লোকগায়করা গ্রহণ করেন তাদের ধুয়া গানে। এ গানে নারীর ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। জীবন সঙ্গী নির্বাচনে নারীর মনের স্বাধীন ইচ্ছার প্রবল প্রকাশ বিশেষ ব্যঞ্জনায় রূপ লাভ করেছে এ গানটিতে।

দুলা ভাইয়ে দিছে বিয়া কালা জামাইর কাছে
গোফ ফুলাইয়া গাল ফুলাইয়া শালী বইসা থাকে
দুলা ভাইয়ে জিজ্ঞাস করে ও আমার শালী
তোমার শইলে[৩৮৫] কি অসুখ কইরাছে ॥
শালী বলে ও দুলা ভাই
ঘরে আমার কালা জামাই
কালা জামাই ভালা লাগে না ॥
তোমায় বলি, ও দুলা ভাই! বলি তোমারে
সোন্দর[৩৮৬] দেইখা একটা জামাই আইনা দেও আমারে

www.pathagar.com

থাকবো না আর উহার ঘরে ও দুলা ভাই
যা থাকে মোর কপালে ॥
দুলা ভাইয়ে ডাইকা বলে
খাওগে স্বামীর ঘর করিয়ে
সোন্দর জামাই কয়জনের মিলে ॥
থাকলো না থাকলো না শালী
কালা জামাইর ঘরে
পিরিতি করিয়া গেল
সোন্দর জামাইর সাথে
আঃ খালেক ডাইকা বলে
অমন পিরিত বেশিদিন টিকে না রে ॥

৬.

(একান্নবর্তী সংসার বিষয়ক ধুয়া)

বর্তমান যুগের বউঝিদের অপছন্দ একান্নবর্তী পরিবার। স্বামীকে নানা রকম শলা-পরামর্শ দিয়া সংসার পৃথক করে। সংসারের কাজকর্মের চেয়ে স্ত্রীর প্রসাধন সামগ্রীর দিকে নজর বেশি।

আফাজ উদ্দি কয় অল্প বয়সে
বিয়া কইরা শুনে বউয়ের বুদ্ধি
কলির এত রীতি কয় আফাজ উদ্দি
চ্যাংড়া ছেলে বিয়া করাইছে
শুনে বউয়ের বুদ্ধি।
তুমি হাটে যাও আগে
আমার মেশি নাই দাঁতে
নারকলের তেল পান সুপারি
ফুরাইয়া গেছে।

উকিল ভাইয়ের বিয়াই যাব হে...
ছড়ূড়া কিনা দিবানি
দাম্মুর দুম্মুর হাইটা যামু
তামশা দেইখনি।
তোমার কামের দরকার নাই
আছে দুই কোলে দুই ছাই
এই সংসারে এত খাইটা
কারেবান খাওয়াই।
তুমি হাটে যাও আগে
আমার মেশি নাই দাঁতে
নারকলের তেল পান সুপারি

www.pathagar.com

ফুরাইয়া গেছে।
তোমার কামের দরকার নাই
আছে দুই কোলে দুই ছাই
এই সংসারে এত কাম কইরা
কারেবান খাওয়াই।[১১৪]

৭.

(পাখির ধুয়া)

এই ধুয়া গানে বিভিন্ন প্রকার পাখির বর্ণনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার পাখির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গায়ের রং বর্ণনা করা হয়েছে।

শোন ওরে মমিন ভাই
নতুন ধুয়া বাইন্ধা গাই
যাত্রা করলাম বিদেশে যাইতে।
কার্তিক মাসের বিশা তারিখ
গিয়াছিলাম ফুলছড়ি
টিকেট করলাম রেলের গাড়ি
বলদি[৩৮৭] হইলাম কাতিহার।
ফরিদপুরের উপর দিয়া
ওকি ভাইরে হইয়া গেলাম পার ॥
ও ভাই গায়ের নামটি শংকরপুর
নামাইয়া দিল পাতালপুর
হাইটা[৩৮৮] গেলাম মাটির তলও[৩৮৯] দিয়া।
ও ভাই জিলার নামটি ছত্রহাটি
আইতে[৩৯০] দিনে তিনদিন হাটি
জারে শীতে আমরা মরি
বাসা নইলাম[৩৯১] সিংগের ঘর
মেলার পরে যাইয়া দেখি
ওকি ভাইরে কতই হইল জ্বর ॥
ও ভাই মেলার পরে যাইয়া দেখি
কোনবান গলিত ঘুরি ফিরি
লোকের কাছে জিজ্ঞাসা না করি।
মেলার উত্তরে ইংরেজের বাসা
পশ্চিমেতে হাতি ঘোড়া
দক্ষিণেতে হইল সারকাস খেলা;
পূর্বের পাশে যাইয়া দেখি
ওকি ভাইরে পাখিরও মেলা ॥
ও ভাইরে পাখির মেলায় যাইয়া দেখি
কী বলব ভাই পাখির খবি[৩৯২]

www.pathagar.com

কী বলব ভাই পাখিরও কাহিনি।
এঙ্গল পাখি ওড়াজোড়া
ময়ুর পক্ষির পাও ভরা
কবিতরের রাঙা পাও
তোতা পাখি বুলবুল করে
ওকি ভাইরে ময়নায় করে রাও[৩৯৩]।
কাইয়া[৩৯৪] কালির মিস কালা
ঘুঘু পাখির গলায় মালা
ওকি ভাইরে ডালে বইসা পেঁচা পাখি
ঘাড় ঘুরাইয়া চায় ॥
ও ভাই জাইঠা বগের ধুড়[৩৯৫] দিঘলা[৩৯৬]
দেইখা গাঙ হইল পাগলা
সুখের পায়রা দেখতে উপহার।
মাছ টেংরা[৩৯৭] শূন্যে উড়ে
ডুব দিয়া মাছ ধরে
ওকি ভাইরে পাখি হইয়া পাখি ধরে
নামে উইরা বাজ ॥[১১৫]

৮.

(মাছ বিষয়ক)

মাছের ধুয়াটি চমৎকার। এই ধুয়ার মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতি মাছের শারীরিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এ মাছগুলি সবই মিঠা পানির মাছ। যা আমাদের আশেপাশের বিল হাওরে পাওয়া যায়।

সিরাজ মিয়া বলে ভাই
মাছের ধুয়া সভায় বইলে যাই।
কাতল মাছের মধ্যে মোটা
পাংগাস মাছের তিন কাটা
শোল টাকিয়ে বাজাইল নেঠা।
পোনা ওঠে বইলকা বইলকা ভাই
যেমন ফেন ফেনির বাজনা।
বোয়াল মাছের মুখে চাপ দাঁড়ি
বাইটকা মাছে বাজায় খুঞ্জরি।
তিতপুঁটি কয় নাচিতে পারি
হায় রে কড়াপুঁটি আর কাউনা
মলা মাছে গায় জারি।
খসল্লায় বলে হুদাই ফাল পারি
বালু খাইকায় উইঠা বলে ভাই,
আমি চলতে না পারি।

www.pathagar.com

ওরা ধরছে বড় সুরা টাইনা
রাগ কইরা কয় আরও ডারকিনা।
এছাই[৩৯৮] জোরে ধরব সুর
আমি কি ধরতে পারি না।
গজারে বলে আর তো হাসিস না
কানি ফইলা উইঠা বলে ভাই
আমি গোসসায়[৩৯৯] বাঁচি না।
হায় রে বেদা মাছে আরো কেদা খায়
টেংরা মাছে পান চাবায়
টেপা মাছে পেট ফুলাইয়া যায়।
চিতল মাছে উইঠা আবার
মধ্যে মধ্যে উলাক দেয়[৪০০]
খলিসা আসে শাড়ি পিন্দা[৪০১]
দেখ আমার কেমন দেখা যায়।[১১৬]

৯.

(বউ শাশুড়ির ঝগড়া)

বউ শাশুড়ির আমিল সর্বত্র। বউ শাশুড়ির কর্তৃত্ব মেনে নিতে চায় না। ফলে কলহ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া আধুনিক যুগের স্ত্রীদের একান্নবর্তী পরিবার পছন্দনীয়।

ওরে পড়িয়া গেল ঘোরকলি
সেও কথা সভাতে বলি শোনেন দশজনা।
ওরে হাল কলিকালের কথা
বইসা শোনেন দশজনা।
কেমুন হইছে দেশের রীতি গো
সেই ভাবেতে দুই চাইর কথা
করি গো বর্ণনা।
হায় রে একদল যুবকেরা
বুক ফুলাইয়া চলে তারা কথা শোনে না,
আমি ভেবে বাঁচি না।
ওরে সন্ধ্যার পরে তারা
আর গৃহে থাকে না,
ও আমি ভেবে বাঁচি না।
ওই যে সদাই থাকে বেশ্যাবাড়ি
ওরে পিতামাতার কথা তাদের
ভালো লাগে না।

ওরে তাই দেখিয়া পিতা-মাতা
বহু চিন্তা করে তারা ছেলে বিয়া করায়

ওরে কালা গিন্নি ঘরে আইনা
ছেলেকে ভুলায়।
গিন্নি বলে ওগো স্বামী ধরি তোমার পায়
ওই যে বুড়া বুড়ির কথা শুনে
আমার অঙ্গ জ্বইলা যায়।

ওরে আমরা দুইজন খাইটা মরি
বুইড়া বুড়ি ঘুইরা করে মাতাব্বরী
স্বামী তুমি পৃথক হও তাড়াতাড়ি।

ওরে তাই শুনিয়া বোকার দল
জমি জমা পৃথক করলি
সোনার জীবন নষ্ট করলি,
ওই যে এতো সাধের গৃহস্থালী
ওরে বৌয়ের কথায় নষ্ট করিলি।

হায়রে আপনার সংসার ছাইড়া দিয়া
করতে আইলি পরের গোলামী,
কি করি এখন কামাই ছাইড়া বুড়াবুড়ি
সংসার ছাইড়া পেটের ভোগে পথে পথে ঘুরি।[১১৭]

১০.

(স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী)

বিগত দিনে মহিলারা ডুলি বা পালকিতে যাতায়াত করত। মহিলারা মাথায় ঘোমটা দিত। আধুনিক যুগের মেয়েরা অর্ধ-নগ্ন হয়ে রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করে। তারা স্বামীর কথা শোনে না।

আল্লার নামটি স্মরণ করি
দাঁড়াইলাম আসরে
ওরে এই আসরে গাইব ধুয়া
মনের হাউসে[৪০২]
ওই যে না আইল দোহারগণ সঙ্গে
নাই প্রাণ বন্ধু সঙ্গে ধুয়া গাই কেমনে।

মাথায় রুমাল বান্দিয়া
সেন্টাল গুঞ্জি গায় দিয়া
ওরে এই আসরে দাঁড়াইলাম
ঘুঘুরা পায়ে দিয়া।
ওই যে ঝুনুর ঝুনুর বাজনা শুনে
লোক ওঠল বাগদিয়া[৪০৩]।

www.pathagar.com

ওরে ওঠে গেল ঘোমটাখানা
কান্দে রাখে সাদা ওড়না,
ওরে দেয়না চুরি হাতে ঘড়ি ভাই
ওই যে চোখেতে চশমা রাখে।
ওই যে কেরালিনের শাড়ি পিন্দে
নারীর গায়ে টেডি জামা।

ওই যে নাওরির সাধ অইলে
বাম হাতে নেয় ব্যাগ তুলে
ওই যে একলাই যায় চইলে
ওর চড়নদারের দরকার হয় না,
ওই যে স্বামীর কথায় ভয় রাখে না গো
তারে সামলাবে কেমন করে।[১১৮]

১১.

(আধুনিক মহিলাদের সাজগোজ)

অভাবের সংসারেও মহিলারা ফ্যাশন করে চলতে চায়। গৃহস্থালী কাজকর্মে তাদের মন বসে না। সে ঝামেলার বিষয় মনে করে।

কলিতে অইল[৪০৪] মেয়ে ছাইলার বাহার,
জারমনির আর অলংকার,
পরিধান করে নানান প্রকার
ওদের হাতে দেখি রূপার চুড়ি
গলে দেখি চন্দ্রহার,
দুই হাতে চুড়ি লাগায়
দুইগাছি তার
এই নাগাদি উঠা গেল গো ভাইরে
সোনা রূপার কারবার।

ওরে এক সান্দানি ছেরি
দোকান নিয়া আইছে,
তারে ডাক দিয়া কাছে বসায়
তারা চাইয়া দেইখ্যা মনের শখ মিটায়,
ওরে রান্ধন বারণ ত্যাগ করে
পেটের ভোগে চাইল চাবায়,
পয়সা নাই দিদি করব কি উপায়,
মুরগী বেইচ্যা পয়সা জোগাব
দিদি আসব নি কাইল।
একটা বাচ্চা ছিলো তাও নিল চিলে
আমি যদি থাকতাম কাছে

www.pathagar.com

আগুন দিতাম চিলের কপালে,
চিলের বাসা ভাঙতে বললে
শোনে না পোলাইপানে
গোলার ধান বেচিলে স্বামী
খুব গাইল পারে[৪০৫]
কাইল যাব গা বাপের বাড়ি গো
স্বামী গয়না না দিলে।[১১৯]

১২.
(পাখির ধুয়া)

পৃথিবীতে নানা প্রজাতির পাখি আছে। এসব পাখিদের বাস ও জন্ম পদ্ধতি বিচিত্র ধরনের। বয়াতি প্রশ্ন করেছে কোনো পাখি শূন্যের উপর ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে মায়ের সাথে উড়ে যায়। আরও একটা প্রশ্ন কোনো পাখি পিঠ দিয়ে ডিমে তা দেয়।

প্রশ্ন.

আমি আল্লাহ নবীর নামটি লই
কেউ করবেন না হই চই
এবার একটা রঙের ধুয়া কই[৪০৬]।
কতো রকম পাখি আল্লায় পাঠায় দুনিয়ায়
কতো পাখি চেনা যায় কতো পাখি অচেনায়
কতো পাখি থাকেরে গাছের ডালে
কতো পাখি থাকে বন জঙ্গলে
কতো পাখি বাস করে জলে স্থলে ॥

কতো পাখি ডিম পারে গাছের আগায়
কতো পাখি ডিম পারে ঘরের মাচায়
এসব পাখি চেনা যায়।
বলো কোনো পাখি উইড়া যাইতে ডিম পারে
ওই ডিম থাকেরে শূন্যের উপরে
ডিম মাটিতে না পড়ে।
ওরে শূন্যের পরে ডিম হইতে বাচ্চা ফুটায়
বাচ্চা হইয়া মায়ের সাথে উইড়া যায়
সেই পাখিটার নাম শুনবার জন্যে মানুষ
বইসা আছে এই সভায় ॥

আরো একটি কথা আমার মনেতে পড়ে
বলো কোনো পাখি ডিম পারে বালুর চরে
কথা জিগাই তোমারে
কেনে ওই পাখি পিষ্ঠ[৪০৭] দিয়া ডিমে দেয় তাও[৪০৮]

www.pathagar.com

ওই পাখি উপর দিকে কেনে রাখে পাও
এই গানের জওয়ার দিয়া যাও ॥
তাই বলছেরে খান বাহাদুর
দুইটা পাখির নাম বলো গানের সুরে
দুইটা পাখির নাম শুনিলে
মানুষ খুশি হবে অন্তরে ॥

মনের দুঃখ কারে কই বয়েস হইলো সাতানব্বই
আমি ক্যামনে গাহান[৪০৯] কই
তাই বলছে অধীর বাহাদুর খান
পাইল দোহার গেছে সব গোরস্থান
আমি এখোনো বিদ্যমান
আমার দুইডা ছেলে আছে নতুন পুরান
ঝড়ের মুখে প্যালা[৪১০] দিয়া ফিরাই তুফান
পিতামাতার দোয়া আছে গো
আরো আছে আল্লাহ মেহেরবান ॥[১২০]

১৩.

ধুয়া গানে মানুষের মনের নানা রঙ্গরস বাঙময় হয়ে উঠে। মনের নানা ইচ্ছা এ গানের সুরে সুরে ফুটে উঠে যা অনেক ক্ষেত্রে শ্রোতার মনে হাস্যরসের যোগান দেয়। এ গানটিও রং তামাসার একটি গান। মানুষ বৃদ্ধ হয় সময়ের ব্যবধানে কিন্তু মন কখনো বৃদ্ধ হয় না। মন চির সবুজ এক বৃক্ষ যার সতেজতা নষ্ট হয় না কোনোদিন।

গিয়াছিলাম দক্ষিণ দেশে রঙের মজা পাইলাম না
রঙের মজা বুঝলাম না ভাই
ওকি ভাইরে রঙ্গের হুক্কায় তামুক খায় তারা ॥
বুড়ি বলে ধুর বুইড়া তর লজ্জা শরম নাই
ওই বুইড়া বুড়ি ঝগড়া করে
বুইড়া যায় না বুড়ির ঘরে
তবু বুইড়ার ভাত পানি জোগায় ॥
ও বুইড়া রঙ্গের মজা বুঝলানা
সাদা পাইড়া কাপড় আনো
আটুর[৪১১] উপুর উইঠা থাকে
টানলেও আর দোপায় নামে না ॥
সংসার হইল আমার হাতে
বউয়েরা দেয় মাঞ্জন দাঁতে
আমি চাইলে পয়সা মিলে না ॥
ও বুড়ি তোর অমন রঙ্গের মুখে দিব ছাই
ওই যে চুল পাইকা দাঁত পইড়া গেছে

www.pathagar.com

চাপায় দাঁতের গোষ্ঠী নাই
ও বুড়ি তোর অমন রঙ্গের মুখে দিব ছাই ॥
চুল পাইকাছে ভালাই হইছে
মুতুলাতে[৪১২] মাঞ্জন ঘঁষবো
শাড়ি পরবো তার শেষে
রাত্র যোগে করব সাজন
বউ পোলায় টের পাবে কিসে ॥[১২১]

১৪.

(কোড়া শিকারের ধুয়া)

হাওর, বাওর, বিল অঞ্চলে এক সময় প্রচুর কোড়া পাখি দেখা যেত। অনেক সৌখিন লোক পোষা কোড়া পাখি দিয়ে জঙ্গলা কোড়া পাখিকে আটকাত। এইভাবে কোড়া ধরা হতো। এদের বলা হয় কোড়া শিকারি। মায়ের বাড়া ভাত না খেয়ে বিনোদ কোড়া শিকার করতে গিয়ে সাপের কামরে নিহত হয়। মায়ের এ দুঃখ রাখার জায়গা কোথায়?

মায়ে নাড়কায় ভাত গো খানি বোনে টুকায় খড়ি রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
কতক দূরে যায় রে বিনোদ ফিরা ফিরা চায়ও রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
একটুখানি বয় রে বিনোদ খাইয়া যা মোর ভাত রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
মায়ে নাড়কায় ভাত গো খানি বোনে টুকায় খড়ি রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
চাইয়া দ্যাখে বোইনের মুখের কান্দন শুনা যায়ও রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
চাইয়া দ্যাখে মায়ের মুখের কান্দন শুনা যায়ও রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
কতক দূরে যাইয়া রে বিনোদ কোড়া শিকার দিল রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
মান্‌জা জলে নাইমা রে বিনোদ মান্‌জা মইলান করে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
পাছা জলে নাইমা রে বিনোদ পাছা মইলান করে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
বুকও জলে নাইমা রে বিনোদ বুকও মইলান করে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
পঞ্চ জলে নাইমা রে বিনোদ পঞ্চ ডুবও দিল রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
গোসল আছল কইরা রে বিনোদ টানে বইসা রইল রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।

www.pathagar.com

এক ডাক ও দুইও ডাকও দিল রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
তিন ডাকের কালে রে বিনোদ মেলা দিল রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
চাইরও ডাকের কালে রে বিনোদ কাছাকাছি গেল রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
পাঁচও ডাকের কালে রে বিনোদ সামনে গেল রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
সামনা সামনি যাইয়া দেখে
সাপের সাথে কোড়া শিকার করে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
ঐ না ধরল ঐ না বিনোদ সাপের মাথা রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
সাপের মাথা ধরলে পরে সাপে দংশন করল রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
উইড়া যা রে পশু পংক্ষি কইও মায়ের কাছে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
তোমার বিনোদ রে ধইরা খাইলো
ঐ না কালের সাপে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
উইড়া যা রে পশু পক্ষি কইও বোইনের কাছে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
তোমার বিনোদ ধইরা খাইলো ঐ না কালের সাপে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
উইড়া যারে পশু পক্ষি কইও বাপের কাছে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
তোমার বিনোদ ধইরা খাইলো ঐনা কালের সাপে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
কত গাহান করল বিনোদ পানির মধ্যে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
মাথায় বিষও উঠলে পরে টালও খাইয়া পড়ল রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
পূবের বেলা পশ্চিমে না গেল রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
কত খোজন খোজলো পরে বিনোদেরই মায়ে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।
ঐ না বিনোদকে ধইরা খাইছে ঐ কালের সাপে রে
কুড়া শিকারি মায়ের বিনোদ রে।[১২২]

www.pathagar.com

৬. নবান্নের গান

এই নবান্নের গানে বাংলার কৃষি জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় কৃষক মাঠ হতে ফসল তুলে বাড়িতে আনে। আর কৃষাহি সেই ধান বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চাল বানায়।

ও আমার মাইঝা ভাই সাইজা ভাই
কই গেলা রে (২)
চল যাই ক্ষেতের ধান কাটিতে ৷৷

কাঁচি লই হাতে মাথাইল লই মাথে
মুড়ি কিছু বাইন্ধা লও গামছাতে ৷৷
কাটিব পাকা ধান
আনন্দে নাচবে প্রাণ
বউঝিরা বানবে বারা ঢেঁকিতে ৷৷

কাটিয়া পাকা ধান
আনন্দে চিবাব পান
মাথাই কইরা আইনা দেব বাড়িতে ৷৷
ধান কাটিয়া নেব
বউ ঝিয়ে সাড়িব
পিঠা চিড়া পাকাইবে হাড়িতে ৷৷[১২৩]

৭. মাগনের গান

১.

দলনেতা : আইলাম রে ভাই উড়িয়া,
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : হস্তির কান্দে চড়িয়া।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : হস্তির কান দুলদুল করে,
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : লাফা বাগুন[৪১৩] গাছে ধরে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : লাফা বাগুন চিনার[৪১৪] ভাত
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : রাখালে খায় করকরা ভাত[৪১৫]।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : করকরা ভাত খাইয়া,
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : ইজল তলে যাইয়া।

www.pathagar.com

সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : বাঘা বাঘী জিজ্ঞাস করে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : কার পালে কয় গাই?
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : বার আবাল[৪১৬] তের গাই।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : শীতে বড় কষ্ট পাই।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : শীতের খেতা জলে ভাসে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : সব লোকে দেইখ্যা হাসে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : হাসি খুশি দুইটি ভাই।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : মাগন দেইনগো চইল্যা যাই।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলদেতা : যে দিব আইচার আগে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেক : তারে খাব মাইছ্যা বাঘে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : যে দিব খোরার আগে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : তারে খাব বোরা বাঘে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : যে দিব কুলার আগে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : তারে খাব নুলা বাঘে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : যে দিব এক কাঠা।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : তার হব সাত বেটা।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দরনেতা : সাত বেটা সওদাগর।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দরনেতা : সোনার টুপি মাথায় ধর।
সঙ্গীরা : হো রে হো,[১২৪]

www.pathagar.com

২.

দলনেতা : ছত্তর রে ছত্তর,
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : সোনার আইবর চেল্লা[৪১৭] গেল, বাড়ির ভিত্তর।
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : আইবরের চেল্লা দেইখ্যা, যে করিব হেলা,
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : তার চোখ দিয়া বাইর অইব, বুইড়া ডেলা[৪১৮]।
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : হেলানী লো বুলানী গায়ে আইল জ্বর,
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : এবাতুরী[৪১৯] দেহি নাই সোনার আইবর।
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : সোনার আইবর ভরত ঠাকুর, মুখে চাপদাড়ি,
সঙ্গীরা : হো রে হো।
দলনেতা : হেলিতে দুলিতে গেল, গোয়ালঝির বাড়ি।
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : গোয়ালঝি গোয়ালঝি, দুগ্ধ দিবে কে?
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : গোয়াল ঘরে মাঝবউ, সে তো বড় বুঝে।
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : গোলার ধান শুকাইয়া পিরের ধান হোজে[৪২০],
সঙ্গীরা : হো রে হো।[১২৫]

৩.

দলনেতা : হন্য রে ভাই হনি।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : ধান খাইল বন্যি[৪২১]।
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেত : খরা রে কয় অন্য খরায়।
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : দুই বউ তার ফরফরায়[৪২২]।
সঙ্গীরা : হো রে হো,
দলনেতা : এক বউ নাউয়ের ফুল[৪২৩]।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : চালে থিকা দেহায় ওল[৪২৪]।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : এক বউ ওগারের খুঁটি।

www.pathagar.com

সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : চাইল চাবায় মুঠি মুঠি।[১২৬]

৪.

দলনেতা : ছিকা নড়েরে ভাই ছিকা নড়ে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : জপ জপাইয়া টেকা পড়ে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : একখান টেকা পাইলাম রে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : বাইন্যা বাড়ি গেলাম রে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : বাইন্যা বাড়ি কৃপন বৌ রে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : ধান দিল কুলা দুই রে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : ধান না তো কড়ি রে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : তাই দিতে যেন মরি রে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : সতীন সতীন বহুত দূর রে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : মধ্যে একটা সমুদ্দুর রে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : শীতে বড় কষ্ট পাই রে।
সঙ্গীরা : হো রে হো
দলনেতা : মাগন দেইন গো চইল্যা যাই।[১২৭]

৮. বারোমাসি গান

আমাদের দেশ ছয় ঋতুর দেশ। এদেশে পালা পার্বণের শেষ নেই। এখানে বারোমাসে তেরো পার্বণ হয়। সব মাসেই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এই উৎসবে গান বাজনার আয়োজন করা হয়। নর-নারীর প্রেম, বিরহ, মিলনজনিত অনুভূতিই বারোমাসি গানের মর্মবাণী। নারী জীবনকে কেন্দ্র করেই বারোমাসি গানের উৎপত্তি।[১২৮]

এ বিষয়ে গবেষক সামীয়ুল ইসলাম বলেন, বারোমাসি গান লোক কৃতিতে এক নতুন দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে। স্বামী বিদেশে। যুবতী নারীর মন ঘরে টিকে না। সে স্বামীর কাছে উড়ে যেতে চায়। কিন্তু পারে না। শুধু অহরহ অন্তরে প্রেমের অগ্নিবাণ প্রজ্জ্বলিত হয়। আগুনে বনপুড়ে, ঘর-বাড়ি পুড়ে। আর প্রেমের আগুনে দগ্ধ হয় যুবতী নারীর মন। সে কিছুতেই যেন আর স্বামীর বিরহ জ্বালা সহ্য করতে পারে না। তাই

www.pathagar.com

অধীর আগ্রহে সে বিদেশি স্বামীর প্রতিক্ষায় দিন গুনে, মাস গুনে, বৎসর গুনে। দিনে আহার হয় না। রাতে ঘুমও হয় না। এই যে স্বামী বিরহের ব্যথা, এই ব্যথার উৎস থেকেই বারোমাসি গানের উৎপত্তি।[১২৯]

বারোমাস্যার চলতি কথায় বারোমাসি। অর্থ্যাৎ বারো মাসের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্খার কথা যে গানে বর্ণিত হয়েছে, সে গানের নামই বারোমাসি গান। গ্রাম্য লোকের ভাষায় বারোমাস্যা গান[১৩০]। আবার বারো মাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা দিয়ে নায়িকা তার জীবনের কথা যে কবিতায় বর্ণনা করে সেই কবিতাকে বারোমাসিয়া কবিতা বলা হয়। প্রাচীন বাংলায় বারোমাসিয়াকে বারোমাস্যাও বলা হতো। মঙ্গলকাব্যের নায়িকারা বারোমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা করেছে বারোমাস্যায়। বছরের ছয়টা ঋতুতে প্রেমিকা স্বামীর বিরহে ব্যথিত বা মিলনে আনন্দিত এমন প্রেমিকার কথা কবিতাকারে থাকলে তাও বারোমাসিয়া বলে গণ্য হয়। নায়িকার বর্ষব্যাপী আনন্দ বেদনার স্মরণমালাকেই 'বারোমাস্যা' বলা হয়।[১৩১] বারোমাসি গানে নায়িকার জীবনের বিরহ তার মনের হাহাকার এসব গানের মূল সুর। এই গানের রচয়িতা খেতখামারের খেটে খাওয়া মানুষ। তবে কে কখন এ গান রচনা করেছিলেন, তা বলার উপায় নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে লোক মুখে মুখে চলে আসছে এই গান। তাদের দুঃখ-বেদনা, আশা-নিরাশা, জ্বালা-যন্ত্রণার কথাগুলো সহজ সরল ভাষায় গানের সুরে উপস্থাপন করে গেছেন। সবচেয়ে বড় কথা বারোমাসের চাষ-আবাদের প্রতিটি পর্যায় ও ঘটনাকে গানের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষকের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা আছে। পূজা-পার্বণের কথা, ঈদ উৎসবের কথা আছে বারোমাসি গানে।[১৩২]

বারোমাসি গানে আমাদের সমাজ ও সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনেক উপাদান বহন করে আছে। এই গান হালকা প্রকৃতির গান। চটুল আর লঘু ছন্দ আছে এ গানে। গান ছন্দোবদ্ধভাবে পাওয়া যায়। গানে বিচ্ছেদী ভাব প্রতিফলিত হয়, মাস ছাড়া ঋতুর বর্ণনা দিয়েও এ গান রচিত হয়েছে। সব মাস ও ঋতুর বর্ণনা পাওয়া যায় বারোমাসি গানে।[১৩৩]

বারোমাসি গান মূলত নারী হৃদয়ের বিরহ বেদনার কথা। নারী পুরুষ উভয়েই এই গান গেয়ে থাকেন। কিন্তু গ্রামের কৃষকের কণ্ঠে এ গান শোনা যায়। তারা ক্ষেত খামারে কাজ করার সময় বারোমাসি গান গায়। এ গান গাওয়ার সময় কৃষক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে না। টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন জনপদে গাওয়া কয়েকটি বারোমাসি গান নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১.

সাধু বা সওদাগর বাণিজ্যে গিয়েছে বহুদিন আগে। ঘরে গৃহস্থ বধূ। স্বামীর বিরহে সে কাতর। পৌষ মাসে বাবার বাড়ি যেতে পারেনি। মাঘ মাসের দারুণ শীত নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেটেছে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড দাবদাহে শরীর কালো রং ধারণ করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের বিভিন্ন রসালো ফলও সে স্বামীকে খাওয়াতে পারল না। আষাঢ় মাসে ছলছল নদীর পানি নায়িকাকে উতলা করে। শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাতে ঘর হতে বের হওয়া যায় না। ভাদ্র মাসে গ্রাম বাংলার তালের পিঠা বড়ই উপাদেয়। আর আশ্বিন মাসের শশা খেতে সুস্বাদু। এসব কোনো কিছুই পতিকে নিয়ে ভোগ করা গেল না।

www.pathagar.com

আগুন[৪২৫] মাসে নতুন খানা
পৌষ মাসে নাইয়র মানা
মাঘও মাস গেল রে নারীর শীত বুকে
হায় রে শীত বুকে।
ফাল্গুন মাসে রোদের জ্বালা
চৈত্র মাসে শরীল কালা
বৈশাখ মাসও গেল রে নারীর
বসন্তে হায় রে বসন্তে।
জৈষ্ঠী মাসে মিষ্টি ফল
আষাঢ় মাসে নতুন জলও রে
শাওন[৪২৬] মাসও গেল রে নারীর
শয়নে হায় রে শয়নে।
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা
আশ্বিন মাসে শশা মিঠা
কার্তিক মাসেও গেল রে নারীর
কাতরে[৪২৭] হায় রে কাতরে।
কতই পাশা খেলছ রে সাধু
বিদেশে হায় রে বিদেশে।[১৩৪]

২.

গানে মানব ভ্রুণের বেড়ে ওঠা চক্র বর্ণনা করা হয়েছে। এক মাস ও দুই মাসে গর্ভের কোনো অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না। তিন মাসের সময় ভ্রূণ রক্তপিণ্ড আকার ধারণ করে। চার মাসের সময় রক্তপিণ্ডে হাড় গজায়। পাঁচ মাসের কালে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। গর্ভের ছয় মাসের সময় মাথার চুল গজায়। সাত মাস কালে গর্ভবতী নারী বিভিন্ন জিনিস খেতে চায়। আট মাসের সময় মানব শিশু পেটে নড়াচড়া করে। দশ মাসের কালে মানব শিশু ভূমিষ্ট হয়।

এক না মাসের কালে জানি বা না জানি
দুইও না মাসের কালে নিহরের পানি।
ওরে তিনও না মাসের কালে
ওরে নিমাইর রক্তে বান্ধে গোলা।
ওরে চারও মাসের কালে
নিমাইর হাড়ে মাংসে জোড়া
পাঁচও না মাসের কালে
নিমাইর পঞ্চ ফুলও ফুঁটে
ওরে ছয়ও না মাসেরও কালে
নিমাইর মাথায় চুলও ওঠে।
সাতও না মাসেরও কালে
নিমাই সাতও শরীর খায়
অষ্ট না মাসেরও কালে

www.pathagar.com

নিমাই মায়ের মন ছোয়ায়।
নয়ও না মাসেরও কালে
নও গোন্ডা তিথি
দশও মাস দশ দিনের কালে
ভূমিস্থ হয় স্থিতি।
নিম্ব তলে জন্মিলারে নিমাই
নিমাই খাওরে নিম্বুর পাতা
কোনো বোধ হরিয়া নিল
নিমাইর সোনা মুখের কথা।
আগে যদি জানতাম রে নিমাই
যাইবা রে ছাড়িয়া
ও তোমার না শিক্ষাইতাম লেখারে পড়া নিমাই
তোমায় না করাইতাম বিয়া।
বৈরাগী না হইও গো নিমাই
নিমাই সন্ন্যাসী না হইও
ঘরে বইসে কৃষ্ণ নামটি নিমাই
মায়েরে শোনাইও।[১৩৫]

৯. ভাটারা গান

১.

নারী নদীর ঘাটে এসেছে খেয়া পার হতে। তার প্রেমিক বন্ধু খেয়া ঘাটের পাড়ানি। বন্ধু যদি নদী পার করে দেয় তাহলে নারী তার বন্ধুকে নব যৌবন দান করবে বলে প্রলোভিত করেছে।

উত্তরে সাজিল দেওয়া[৪২৮]
প্রাণের বন্ধু দিছে রে খেওয়া[৪২৯]
আমি নারী না জানি সাঁতারো রে
খেওয়ানীরে[৪৩০] খাইছে বনের বাঘে রে ॥

যে আমারে করবে পার
তারে দিব গলারই হার।
পার হইয়া যৌবন করব দান রে ॥[১৩৬]

১০. নাচারি

(বেহুলার গীত)

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনির ওপর ভিত্তি করে এক ধরনের নৃত্যগীতের প্রচলন ঘটেছে যার নাম 'নাচারি' বা 'বেইলা-নাচারি'। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে লোককবিরা গান তৈরি করে নৃত্যযোগে দর্শক সম্মুখে পরিবেশন করে। এ গানে চাঁদ সওদাগরের পৌরুষ এবং মনসার প্রতিহিংসার চিত্র ভাষা রূপ পেয়েছে। শৈব উপাসক চাঁদ সওদাগর লৌকিক দেবী মনসাকে পুজা দিয়ে দেবত্বের

www.pathagar.com

আসনে অধিষ্ঠিত করবে না এই তার পণ। অন্যদিকে মনসাও চাঁদ সওদাগরের নিকট থেকে পূজা নেয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আর তার জন্যে মনসা চাঁদের ছয় পুত্রকে সাগরে ডুবিয়ে মেরেছে এবং একমাত্র জীবিত পুত্র লখিন্দরকেও বিয়ের রাতে সর্প দংশনে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।

১.

পুজা নয় হে দিলি রে চান্দু
পুজা নয় হে দিলি
কলঙ্কেরই ডালি রে চান্দু
মাথায় তুইলা নিলি।
ও কি চান্দু রে
দেখবো রে তোর কতই শক্তি আছে ॥
ছয়টি পুত্র খাইছি রে চান্দু
কালিদর[৪৩১] সাগরে
লক্ষিন্দরকে কাটবো আমি
লোহার বাসর ঘরে
ও কি চান্দু রে
দেখবো রে তোর কতই শক্তি আছে ॥[১৩৭]

২.

সুন্দরী বেহুলা কলসি কাঁখে নদীর ঘাটে যায় এমন একটি দৃশ্যকল্প লোককবি তার গানে বর্ণনা করেছে। বেহুলা নদীর ঘাটে গিয়ে কীভাবে স্নান সম্পন্ন করে তারই অনুপুঙ্খ বর্ণনা এ গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনিতে এ রকম কিছু না থাকলেও লোককবিরা তাদের 'নাচারি' গানে তা কল্পনা করে নিয়ে দর্শক শ্রোতার সামনে সুরে সুরে প্রকাশ করেছে। লোক জীবনে মনসামঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তা এবং বেহুলার প্রতি সাধারণ লোকের কৌতূহলের কারণেই হয়ত তাকে নিয়ে গায়কের আগ্রহের মাত্রা বেশি। আর তাই বেহুলার সৌন্দর্য ও ঘর-গেরস্থালির নানা চিত্রকল্প তারা গানে তুলে ধরতে চেয়েছে।

কলসি কাখে নইয়া[৪৩২] রে বেইলা[৪৩৩]
যায় যমুনার ঘাটে রে
মরি হায় হায় রে ॥
খাড়ু জলে নাইমা রে বেইলা
খাড়ু মইলান[৪৩৪] করে রে ॥
হাঁটু জলে নাইমা রে বেইলা
হাঁটু মইলান করে রে ॥
কোমর জলে নাইমা রে বেইলা
কোমর মইলান করে রে ॥
বুক জলে নাইমা রে বেইলা
বুক মইলান করে রে ॥

www.pathagar.com

গলা জলে নাইমা রে বেইলা
গলা মইলান করে রে ॥
সাঁতার জলে নাইমা রে বেইলা
মাথা মইলান করে রে ॥[১৩৮]

১১. মালসি গান

মালসি এক প্রকার প্রেম, ভালবাসা, বিরহ, বেদনামূলক গান। ভিন্ন মতে মালসি হলো দেবী-বিষয়ক এক রকমের গান। গ্রাম্য বয়াতিদের মতে, মায়া শব্দ থেকে মালসি শব্দটি এসেছে। আবার কারো কারো মতে মালব শ্রী ও মায়ুর হইতে আসিয়াছে। আমার মনে হয়, মালশ্রী শব্দের রূপান্তরিত রূপই হলো মালসি। উচ্চারণগত পার্থক্যের কারণে শ্রী সীতে পরিণত হয়েছে।

ভবানীবিষয়ক যে গান তাকেই মালসি বলে উল্লেখিত করা হয়েছে। (আর শিব বিষয়ক গানকে মায়ুর বলা হয়)। বর্তমানে মালসিকে একটি বিশেষ রাগের নাম হিসেবেই সকলে জানেন। মালব শ্রী থেকে মালশী তার পরে মালসি' কথাটা আসা সম্ভব এবং দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগমনী লোক-সংগীতকেও কোনো কোনো অঞ্চলে আজও মালসি বলা হয়। এক সময় শাক্ত-সংগীতকেও মালসি বলার রেওয়াজ ছিল।

গ্রাম্য কৃষকশ্রেণির নরনারীরা এই গান গেয়ে থাকে। গানের কথাগুলি সহজ সরল। গানের তাল লয় প্রেমিক হৃদয়কে আপ্লুত করে। কিছু কিছু মালসি গানে অশ্লীলতামূলক খোলামেলা কথা পাওয়া যায়। গোপন অভিসারের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠে মালসি গানে। এ প্রসঙ্গে জনাব সামীয়ুল ইসলাম বলেন- 'এই গানগুলি কাম জ্বালাকে প্রজ্জ্বলিত করে ও যুবক-যুবতীদের মনে রঙিন স্বপ্ন রচনায় সহায়তা করে'।

এ গান গাইতে তেমন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কেউ কেউ শখ করে ঢোল, খুঞ্জরি ও করতাল ব্যবহার করে। এই গানের কোনো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে না। ক্ষেত খামারে বাড়ির আঙিনায় বসে নরনারীরা এ গান গায়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি মালসি গান এ রকম।

১.

সাধু দূরের বাণিজ্যে যাবে। ঘরের যুবতী বধূ বাণিজ্যে যেতে নিষেধ করছে। সাধু বধূর নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী হিসাবে তার ননদী, শাশুড়িকে থাকতে বলছে। এতে বধূ রাজি হচ্ছে না। সাধু তার ছোট ভাইকে বধূর কাছে থাকতে বললে সে রাজি হয়।

ষোল ধারের পানসীরে
ঐ আমার সাধু ঘাটে বাধা রহিল রে ॥
ওরে পাটু মালা বই সে ধার মালা নেয় রে
তুমি সাধু যাইবা রে দূরে কানন বাণিজ্যেরে
আমি নিলার হবে কি উপায়ও রে ॥
আমারও না মাও রে ঐ নারে নীলা
তোমারও না শাশুড়ি রে
তারে লইয়া থাইকো ছয় মাসও রে ॥

www.pathagar.com

আমারও না বোইনও রে
ঐ না নীলা তোমারও না ননদীরে
তারে লইয়া থাইকো মাসের ছয় মাসও রে ॥
তোমারও না মাও রে আমারও না শাশুড়ীরে
তারে তিন দিন পরে জমে নিয়ে যাবে রে ॥
আমারও না ভাইও রে
ঐ নারে নীলা তোমারও না দেওরও রে
সেইতি খাব নীলার হস্তের[৪৩৫] পানও রে ॥[১৩৯]

২.

নায়ক দূরদেশে চাকরি করছে। ঘরে বধূ একাকী থাকতে চাচ্ছে না। সে বাপের বাড়ি চলে যেতে চায়। ননদী তাকে আশ্বস্ত করতে চায়, তার গহনা বিক্রি করে টাকা দিয়ে ভাইকে বদলি করে আনবে। এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সেকালে ঘুষের প্রচলন ছিল।

আমার ভাইয়ের বদলী[৪৩৬] রে
ঐ নারে ভাবী দিব নাকের সোনা রে
তবু না যাইও ছাইড়া আমার ভাইয়ের ময়া[৪৩৭] রে ॥
আমার ভাইয়ের বদলী রে
ঐ নারে ভাবী দিব কানের সোনা রে
তবু না যাইও ছাইড়া[৪৩৮] আমার ভাইয়ের ময়া রে
আমার ভাইয়ের বদলী রে
ঐ নারে ভাবী দিব গলার হারও রে
তবু না যাইও ছাইড়া আমার ভাইয়ের ময়া রে ॥
আমার ভাইয়ের বদলী রে
ঐ নারে ভাবী দিব হাতের শাখা রে
তবু না যাইও ছাইড়া আমার ভাইয়ের ময়া রে ॥
আমার ভাইয়ের বদলী রে
ঐ নারে ভাবী দিব পটল শাড়ি রে
তবু না যাইও ছাইড়া আমার ভাইয়ের ময়া রে ॥
আমার ভাইয়ের বদলী রে
ঐ নারে ভাবী দিব কোমড়ের বিচ্ছা রে
তবু না যাইও চাইড়া আমার ভাইয়ের ময়া রে ॥
আমার ভাইয়ের বদলী রে
ঐ নারে ভাবী দিব পায়ের নূপুর রে
তবু না যাইও ছাইড়া আমার ভাইয়ের ময়া রে ॥[১৪০]

৩.

যুবতী স্ত্রী ঘরে রেখে বিদেশ করলে তার দুঃখ চিরকাল। মানুষ দৈহিক কামনা বাসনার উর্ধ্বে নয়। কোনো কোনো সময় দেখা যায়, পরের ডাকে যুবতী বধূ গৃহ ছাড়ে।

আমার সুখ নাই রে
দুখ পরাণের ভরি

www.pathagar.com

আমি বিয়া কইরা থুইয়া[৪৩৯] আইলাম গো
অবলা সুন্দরী ॥
হালের বেঁচলাম পালের বলদ
দুধের বেচলাম গাই
ঘরে আমি থুইয়া আইলাম গো
শিশু দুইডা[৪৪০] ভাই ॥
শালা[৪৪১] রে শালীরে[৪৪২] কান্দে
আরো কান্দে বালিশ
ঘরে আমি যাইয়া দেখি গো
আমার বালিশ হইল খালি ॥[১৪১]

৪.

বাল্য বয়সে স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক কম থাকে। স্বামীর বাড়ি যাওয়ার প্রাক্কালে নিকট আত্মীয়-স্বজনরা কনেকে নানা রকম উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যা বাঙালি নারীদের প্রতি স্বজনদের চিরকালের উপদেশ।

শিশুকালে কন্যা শিশুরে মতি
বয়সকালে কন্যা বাপের বাড়ি
কাঞ্চা[৪৪৩] বয়সে কন্যা না চিনিলা স্বামীরে ॥
সন্ধ্যা কালে কন্যা সন্ধ্যা ফুল তুলিও
ঘরের বাতি কন্যা আগে দিও
স্বামীর আগে ভাত পানি
কখনো না খাইও রে ॥
স্বামীর আগে না ভোজন করিও
মনের দুংখের কথা তার কাছে বইল[৪৪৪]
ডাক দিলে প্রাণের স্বামীর কাছে চইলা[৪৪৫] যাইও রে ॥
চালে ধরে চালও কুমড়া
বেড়ায় ধরে কদু[৪৪৬]
বাপও মায়ে পাইলা তোলে[৪৪৭]
অন্যে খায় তার মধু ॥[১৪২]

১২. বিচ্ছেদ গান

১.

বন্ধু প্রেমে দেহ জ্বর জ্বর। প্রেম রোগের কোনো ঔষধ নাই। প্রেমিক জগতে প্রেমের জন্য নিন্দিত। তবু সে বন্ধুকে পাচ্ছে না। এখানেই তার আফসোস।

নিদাগীর দাগ দিলা প্রাণের বন্ধু শ্যাম রায়।।
প্রেমও জ্বালায় প্রাণও যায়।
সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে
প্রেমের বিষ উজান ধায়।

www.pathagar.com

উজা বৈদ্যের নাইরে সাধ্য
প্রেমের বিষ ঝাড়িয়া নামায়।
নগর দিয়া হাইটা যাইতে
লোকে কত মন্দ কয়
বলে বলুক লোকে মন্দ
অলংকার পইড়াছি গায়।
প্রেমও জ্বালায় প্রাণও যায়।।
নিদাগীর দাগ দিলা প্রাণের বন্ধু শ্যাম রায়।
প্রেম জ্বালায় প্রাণ যায়।[১৪৩]

১৩. হুলিগান

(দোলপূজার হুলিগান)

১.

ক্ষান্ত মন আমার আগে করো দেহের নিরূপন
দেহের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোনোখানে হয় বৃন্দাবন
আগে করো দেহের নিরূপন ॥
কোনো নদীতে জোয়ার আসে কোনো খানে
বিরজা[৪৪৮] বসে কোনো নদীর জল
মাসের মাসে পৃথিবীতে হয় পতন
আগে করো দেহের নিরূপন ॥
লাল পাগড়ি বিন্দে মাথে
রাই চলে যায় মথুরাতে
কুবমা[৪৪৯] পেয়ে ভুলে রোলে
রাইয়ের কথা মনে নাই।
আগে করো দেহের নিরূপন ॥[১৪৪]

২.

(হুলির পাল্টাগান)

বিন্দের সখি গো বৃন্দাবনে আর তো যাব না
বৃন্দাবনের গোপীগণের স্বভাব দেখি ভাল না
বৃন্দাবনে আর তো যাবো না।

এক বান্দাছে নন্দরানি আর বান্দাছে সব গোপিনী
বন্দন জ্বালাই জ্বলে মলেম
প্রাণে ধৈর্য্য মানে না
বৃন্দাবনে আর তো যাবো না ॥[১৪৫]

৩.

হটর হটর[৪৫০] করিস না শ্যাম
তর বাবার নাম আর আমার নাম

www.pathagar.com

হটর হটর করিস না শ্যাম।
তর বাবা খাইছে চুল ফালাইয়া
তুই কি পারবি কেঁচির কাম
হটর হটর করিস না শ্যাম।[১৪৬]

৪.

(হুলির পাল্টা গান)

পেঁচা কি ময়ুর হতে চায়
আমি ঘুঘরি[৪৫১] দিলাম ব্যাঙের পায়
পেঁচা কি ময়ুর হতে চায় ॥
লাল টুক টুক পুটকি রাঙা
সবার মধ্যে লেজ ঘুরায় ॥
লেংরিরে বিয়া কইরা ঠেকলাম ভীষণ দায়
নথ[৪৫২] দিলাম খারু[৪৫৩] দিলাম
তবু লেংরি টেংগুস পাইরা[৪৫৪] যায়।
লেংরিরে বিয়া কইরা ঠেকলাম ভীষণ দায় ॥[১৪৭]

৫.

(হুলির পাল্টাগান)

বন্ধুরে নি দেখছো তোমরা
লাল বাজারের গলিতে ॥
পান খিলির দোকানে
ওরে মেচ পাইড়া ধুতি পরা[৪৫৫]
বাবড়ি উড়ায় বাতাসে ॥
বন্ধুরে নি দেখছো তোমরা
লাল বাজারের গলিতে
পান খিলির দোকানে
ওরে মেচ পাইড়া ধুতি পরা
বাবড়ি উড়ায় বাতাসে ॥[১৪৮]

৬.

(চৈত্র পূজার মাইটা হুলি গান)

দুইটা রসের কথা কইলো
বন্ধুরে ডাক দিয়া বসাই ॥
হাঁচি পানে[৪৫৬] দীঘল বোঁা
তারই মধ্যে চুনের ফোঁটা।
তাই দিয়া ঠোঁটটি করলাম
লাল কি লাল লো
বন্ধুরে ডাক দিয়া বসাই ॥

www.pathagar.com

আষাইঢ়া বোয়ালের হুরা[৪৫৭]
তারি মধ্যে খাওয়াইলাম চারডা
ভাত কি ভাত লো,
বন্ধুরে ডাক দিয়া বসাই ॥
দুইটা রসের কথা কইলো
বন্ধুরে ডাক দিয়া বসাই ॥[১৪৯]

১৪. ছাদ পেটানোর গান

নতুন দালানের ছাদ পেটানোতে বর্তমানকাল থেকে প্রাচীনকালের কিছুটা পার্থক্য ছিল। তখন দালান যত বড়োই হোক একদিনের মধ্যে ছাদের কাজ শেষ করতে হতো। দিন শেষে যখন শ্রমিকেরা দুর্বল হয়ে পড়ত তখন বয়াতি রসাত্মক গান গেয়ে তাদেরকে উজ্জীবিত করত।

১.

ছেরি লো কস্না কথা ঝগড়া কি কারণ
তুইতি করিলি আমার নাগর পাগল
ছেরি লো কস্না কথা ঝগড়া কি কারণ।
কাঙ্খা চুলে দাঁতে মেশি চোখেতে কাজল
তুইতি করিলি আমার হামিদা পাগল
ছেড়ি লো কস্না কথা ঝগড়া কি কারণ।[১৫০]

১৫.ধান ভানার গান

১.

গ্রামীণ সমাজে ঢেঁকি দিয়ে ধান ভানা একটি পুরানো রীতি। যৌথ পরিবারে শাশুড়ির সাথে ছেলের বউয়েরা ধান ভানার কাজ করত। অসুখ-বিসুখের কথা বলে অনেক সময় কাজে ফাঁকি দিত তারা।

বারা সব বাড়ির বউ জানে না গো
সব বাড়ির বউ পারে না
বাড়া বানা বড়ই যন্ত্রণা (২)
শাশুড়ি বউকে ডেকে কয়
সাধের বাড়া বানবি যদি আয়
খাবি তোরা করবি তোরা আমার জানের ক্ষয় (২)
ছাতার[৪৫৮] মনুই খোলে বারে বারে (২)
আড়হলুইতের[৪৫৯] মানায় না।
বারা বানা বড়ই যন্ত্রণা ॥

বড় বউ রাগে বাঁচে না,
ঢেঁকিতে বারা চ্যাতে না
ধান দিলে চাল ছিট্টা উঠে

www.pathagar.com

নুটে[৪৬০] থাকে না
মাইজা বউ চকির নিচে (২)
মাঞ্জার বিষে বাঁচে না গো,
ঠ্যাংগের বিষে বাঁচে না
বারা বানা বড়ই যন্ত্রণা। ।
বারা সব বাড়ির বউ জানে না গো
সব বাড়ির বউ পারে না, বারা বানা বড় যন্ত্রণা।
মলইটা রাইখো খবরদার তাতে ধরেনা ঝনকার
ভিন নুটেতে বাইনো বারা বাইনো অনির্বান (২)
ঢেঁকির ডান পাশে আলানি[৪৬১] রাইখো
নুট যেন আর কাটেনা
বারা বানা বড়ই যন্ত্রনা।
ওরা খাইতে পারে ঝাকায় ঝাকায়
কামের বেলায় নাই।
এমন ছ্যাক কপাইলা[৪৬২] দুর্মুইশা[৪৬৩] বউ
কেউ বাড়িতে আইনো না
বাড়া বানা বড়ই যন্ত্রণা।[১৫১]

২.

ঢেঁহির[৪৬৪] গলায় ঘুঘুরা
ঢেঁহির গলায় মুগুরা
উঠাইয়া দিছি আমরা
নানা শাইলের বাড়া (২)
সেও না বাড়া পারাইতে[৪৬৫]
সেও না বাড়া ঝাঁড়িতে
উঠিয়া গেল আমার
দিঘল ঠেঙের বিষরে[৪৬৬] (২)
শ্বশুর আমার কবিরাজ
ভাসুর আমার ইজাদ্দার
ঝাড়িয়া নামাইক আমার
দিঘল ঠেঙের বিষরে।
ঝাড়িয়া নামাল আমার
দিঘল হাতের বিষরে (২)[১৫২]

৩.

হোলার ঢেঁকিতে বারাভানী
চিক্কন চিক্কন চাইল
এই চাইল মুখে দিছি
নুনদে দিল গাইল।

www.pathagar.com

নুনদের[৪৬৭] জ্বালায় ঘরের পাছে গেলাম,
পিঁপড়ায় ছাইক্কা[৪৬৮] ধরলো লো
পিঁপড়ার জ্বালায় ঘরে আইলাম
হশুরে[৪৬৯] নাত্তি মারলো লো
হশুরে নাত্তি[৪৭০] মারল।
হশুরের জ্বালায় বাইর বাড়ি আইলাম
হিয়ালে ছপ্পন ধরল লো
হিয়ালে[৪৭১] ছপ্পন[৪৭২] ধরলো।
হিয়ালের জ্বালায় গাছে উঠলাম
ঢেউয়ায় ছাইক্যা ধরলো লো
ঢেউয়ার জ্বালায় চালায় উঠলাম
হাপে ফেনা ধরলো লো।[১৫৩]

১৬. নাক, কান, ফুঁড়ানোর গান

১.

দাদি নানিরা নাতিনের নাক বা কান ফুরানোর সময় গান গেয়ে থাকে। এ সময় তারা মিষ্টি জাতীয় শিরনির আয়োজন করে। রঙ্গরস করার জন্য নাতিন জামাইকে উদ্দেশ্য করে গান করছেন।

সাধের নাতিন জামাই রে
কুড়াল ভাইঙ্গা নত বানাইয়া নাতিন রে দে
নাতিন নাক ফুঁড়াইছে তারে গয়না গইড়া দে
কোদাল ভাইঙ্গা বোলাক বানাইয়া নাতিন রে দে
সাধের নাতিন জামাই রে।
নাতিনে নাক ফুঁড়াইছে তারে গয়না গইড়া দে
মরিচ ফুলের হীরার চুঙ্গি গইড়া তারে দে
সাধের নাতিন জামাই রে।
বড়ই ফুলে চুনীর চুঙ্গী গইড়া তারে দে
সাধের নাতিন জামাই রে।

হাতুর ভাইঙ্গা ভাসা গইড়া দে
সাধের নাতিন জামাই রে।
বেরী চুঙ্গী উপুর চুঙ্গী, সপ্ত চুঙ্গী গইড়া তারে দে
নত নোলক, ভাসা বোলাক গইড়া তারে দে
সাধের নাতিন জামাই রে।[১৫৪]

২.

পাড়ায় কোনো মেয়ের নাক, কান ফোঁড়ানো হলে সখিরা দল বেধে তার বাড়িতে যেয়ে নৃত্য করে আর গান গায়। তারপর ক্ষীর পায়েস খেয়ে বাড়ি ফিরে।

আয় রে সই তরা সবাই

www.pathagar.com

আমারা সইয়ের বাড়ি যাই
সইয়ের নাক ফোঁড়াইবো
কান ফোঁড়াইবো
দেহুম আমরা সবাই,
আমরা সবাই ॥
আয় রে সই তরা সবাই
আমরা সইয়ের বাড়ী যাই ॥
সইয়ের নাকে চুঙ্গী আর নথ বোলাক
আমরা পরাই আমরা পরাই ॥
সইয়ের কানে ঝুমকা দুল মারকি ফুল
আমরা পরাই আমরা পরাই।
সইয়ের নানি পাতছে পাটি
সইয়ের দাদি পাতছে পাটি
সজনী চাদর তাতে
আমরা বিছাই আমরা বিছাই ॥
আয় রে সই তরা সবাই
আমার সইয়ের বাড়ি যাই।
সইয়ের দাদা আনছে গুড়
সইয়ের নানা আনছে দুধ
ক্ষীর আমরা গিয়া চড়াই আমরা চড়াই ॥
সইয়ের ভাবি বড়ই ডাকাত
নাকে কানে সুঁই ফুটায় সুঁই ফুটায়
আয় রে সই তরা সবাই
আমরা সইয়ের বাড়ি যাই ॥
সইয়ের মায়ে আড়াল হইয়া
ঘুমটার নীচে চোখ মুছায় চোখ মুছায়
আয় রে সই তরা
সবাই সইয়ের বাড়ি যাই।[১৫৫]

৩.

এ যুগের মেয়েরা নাক, কান ফোঁড়ানো অপছন্দ করে। তারা মনে করে এগুলো সেকেলে। কিন্তু আজও আমাদের দাদি-নানিরা নাকে, কানে নানা রকম গহনা পড়ছে।

এ যুগের টেডি মাইয়া
নাক ফোঁড়ানি জানে না
এ যুগের টেডি মাইয়া
কান ফোঁড়ানি জানে না।
নাক বিন্দানী দাদির আমল
কান বিন্দানী নানির আমল
ওসব সেতো মানে না ॥

www.pathagar.com

চমৎকার বোলাক নোলক,
চুঙ্গি, গয়না নাকে
মাজায় আঁচল বাইন্দা বুকটা ঢাকে
বাতাসে উড়ায় দাদি সোনার ধান।।
বাতাসে উডায় নানি সোনার ধান
নাতিন যে তার ঢাকায় থাকে
গোবর যাবর ধান উড়ানো
তার কাছে যে অপমান
তবুও কান বিন্দান হবে
শুইনা জুড়ায় পরাণ
বাজাও সবে বাদ্য বাজনা
বার সবে খুশির গান
মেয়ের বড় কাক্কি রান্দে ক্ষীর
মিঠামুখ করাইবো
কাক্কা আনছে পান সুপারি
সকলেরে খিলাইবো
নানি-হরির জোলার ট্যাহায়
দাদি গড়ায় নাকফুল
নানি আনছে সোনার বালি
পরে দিবো মারকি দুল
ছোট ফুবু নইয়া আইছে
নিমের কাঠি সুতা সুই
চোক্ষু মুইছা মায় গিয়া
আন্দারে পলাইলো কই ॥[১৫৬]

১৭. বৃষ্টি নামানোর গান

১.

দলনেতা : দেওয়া সাইজা[৪৭৩] আইলরে, সোনার খরম[৪৭৪] পায়,
হাতে আছে নাল পাগুড়ী, সেওনা উঠে বায় ॥
সঙ্গীরা : দেওয়া সাইজা...
দলনেতা : ওরে দেওয়া বড়লিনারে কাগমাইরা[৪৭৫] গো ডরে,
খাল বিল হুকাইয়া গেল মাছ পড়ল চরে।
সঙ্গীরা : দেওয়া সাইজা...
দলনেতা : দেওয়া বড়লিনারে কাকমাইরা গো ডরে,
নাঙ্গল জোয়াল তুইল্যা থুইলাম,
গোয়াইল ঘরের কারে[৪৭৬]।
সঙ্গীরা : দেওয়া বড়লিনারে...

দলনেতা : তারুর মায় যে চিমবক্ষিলা[৪৭৭] সর্ব লোকেই জানে,
কুলার আগে দুইডা চাইল চিমটি মাইরা তুলে।
সঙ্গীরা : দেওয়া সাইজা...
দলনেতা : কি করগো তারুর মাও পালঙ্কে বসিয়া,
তোমার তারু গেছে মারা ধেনু রাখবার যাইয়া।
সঙ্গীরা : দেওয়া সাইয়া...
দলনেতা : যাইক তারু যাইক তারু ধেনু ভালা লইয়া,
সেই না ধেনু রাখব আমি চাকর রাখিয়া।
সঙ্গীরা : দেওয়া সাইজা...[১৫৭]

১৮. একদিল গান

একদিল গান মূলত কাহিনিনির্ভর এক ধরনের করুণ পালাগান। এগুলো আগাগোড়া নিরেট সংগীত নয়। কোনো করুণ কাহিনি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছেদ জাতীয় এক ধরনের গান বা নারী হৃদয়ের মাতৃত্বের হাহাকার সংবলিত বিলাপ মাত্র। গায়ক কোনো এক বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভের আশায় কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কাহিনি বর্ণনা করেন। এ কাহিনিতে নারীর সাধনার পথে নানা সংকট উপস্থিত হয়। নারী বিলাপ করে কীভাবে দৈবক্রমে বাঁধা অতিক্রম করে তাই-ই একদিল গানে গায়কের কণ্ঠে সুরে সুরে প্রকাশ পায়। একদিল গানে পুঁথি জাতীয় সাহিত্যের কাহিনিই প্রাধান্য পায়। পুঁথিসাহিত্যের কাহিনি একদিল গানের বিষয়বস্তু হলেও তা কেবল মুসলমান সমাজের লোকের কাছেই সমাদৃত নয়। হিন্দুরাও সন্তান কামনায় এ গান মানত করে। একদিল গানে 'মনাই পির'এর উল্লেখ করা হয়। যার উদ্দেশ্যে গায়ক বন্দনা গানে স্তুতি বা প্রশংসা করে থাকে। হিন্দু বাড়িতে পালা নামানোর সময় এই 'মনাই পির'এর নাম হয়ে যায় 'মনোদুর্গা'। একদিল গানে যিনি মনাই পির তিনিই আবার মনোদুর্গা। একদিল গানকে অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে গায়কদের উদারতার পরিচয় ফুটে উঠে। এ গানের আঙ্গিক নির্মাণে গায়ক একদিকে যেমন মুসলমানের ঐতিহ্য তথা পুথিসাহিত্যের কাহিনি গ্রহণ করেছেন তেমনি হিন্দু ঐতিহ্য তথা মঙ্গলকাব্যের কাহিনির উপাদানও গ্রহণ করেছেন। একদিল গানের মূল কাহিনি বর্ণনা করার সময় এ উভয় ঐতিহ্যের স্পষ্ট পরিচয় ফুঠে উঠে। এ দিক থেকে একদিল গানের গুরুত্ব অনেক। একদিল গানে সাধারণত যে সব পালা বর্ণনা করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো– 'একদিল গাজীর পালা', 'আশেক নুরীর পালা', 'তাজের মল্লিকের পালা' 'কালুগাজি ও চম্পাবতীর পালা' ইত্যাদি।

একদিল গানের উদ্দেশ্য :

একদিল গান আসরকেন্দ্রিক এক ধরনের মানত গান। কেউ মানত করলেই কেবল এ গানের আসরের আয়োজন করা হয়। এ গানের শিল্পীরা অন্যান্য লোকসংগীতের শিল্পীদের মতো সৌখিন গায়ক নয়। এরা পেশাদার গায়ক। অর্থের বিনিময়ে এরা আসরে গান পরিবেশন করে থাকে। সাধারণত নারীরাই এ জাতীয় গানের মানত করে। বিশেষ করে বন্ধ্যা নারী সন্তান কামনায় 'একদিল গাজীর' নামে সৃষ্টিকর্তার কাছে

www.pathagar.com

একদিল গান মানত করে থাকে। তাছাড়া পুত্র সন্তান কামনায়ও এ গান মানত করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। কালক্রমে একদিল গান মানতের ক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গবাদি পশু কিংবা ফুল-ফসলের কল্যাণের জন্যে এবং সংসারের নানা সংকট থেকে উত্তরণের আশায়ও মানুষ একদিল গান মানত করে থাকে। আশু মঙ্গলের আশায় কেউ কেউ অগ্রিম আসরের ব্যবস্থা করে। আবার মানত করার পর মনস্কামনা পূর্ণ হলে পরবর্তীতে একদিলের আসর বসায় অনেকে। জটিল রোগ থেকে মুক্তির আশায়ও অনেকে আরোগ্য লাভের পূর্বে কিংবা পরে একদিল গানের আসর বসিয়ে থাকে। মেয়েদের সময় মতো বিয়ে না হলে বা বার বার বিয়ে ভেঙ্গে গেলেও একদিল গান মানত করে তার জন্যে মঙ্গল কামনা করা হয়।

একদিল গান পরিবেশন রীতি :

একদিল গানের আসর তেমন আড়ম্বরপূর্ণ নয়। সাদামাটা গোছের একটি শামিয়ানা টানিয়ে তার নিচে গায়ক দল গান পরিবেশন করে থাকে। 'বন্দনা' গান দিয়ে একদিলের মূল আসর শুরু হয়। এসব বন্দনার মধ্যে আল্লাহ ও রাসুলের বন্দনা, চার আসহাবের বন্দনা, ফাতেমা ও হাসান- হোসেনের বন্দনা এবং একদিল পিরের বন্দনা স্থান পায়। বন্দনা গানে 'মনাই পির' নামে একজন পিরের প্রশংসাও গায়কের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। এ গানে একজন প্রধান গায়ক থাকে যে একদিলের কাহিনি দর্শকদের সামনে সুন্দর ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করে। কাহিনির বিশেষ পর্যায়ে কাহিনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে বিশেষ সুরে গান পরিবেশন করে। গান পরিবেশনকালে প্রধান গায়ক মাঝে মধ্যে হালকা নাচের মুদ্রাও প্রদর্শন করে থাকে। মূল গায়ককে সহায়তা করতে কয়েকজন দোহার থাকে। এ দোহারগণ মূলত একাধারে একদিল গানের যন্ত্রি ও প্রধান গায়কের পাল দোহারের ভূমিকা পালন করে। একদিল গান শুরুর আগে একদিল পিরের নিদর্শন স্বরূপ, খুঁটির মাথায় টিন দ্বারা তৈরি মানুষের মাথা সদৃশ একটি প্রতীকী মূর্তি বানিয়ে আসরের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। একদিল গায়ক একে 'আশা' নামে অভিহিত করে থাকে। আগের দিন সন্ধ্যায় গানের আসর বসে সারারাত চলে পরের দিন সকালে 'ভরা জাগিয়ে' গান শেষ হয়। 'ভরা' বলতে ধান-দূর্বাসহ নানা ভোগ দ্বারা সাজানো নতুন কুলা। যার মধ্যে রাখা হয় ধূপ, সিন্দুর, কর্পুর, মোয়া-মুড়ি এবং আস্ত নারকেল ইত্যাদি। বন্ধ্যা নারী অথবা কোনো শিশুর জন্মের আগে যদি একদিল মানত করা থাকে, তবে সে নারী বা শিশুকে প্রথমে গোসল করানো হয়। তারপর তিনজন লোক মিলে ভরা জাগিয়ে বন্ধ্যা নারী বা শিশুর মাথায় তুলে দেয়। 'ভরা' মাথায় নিয়ে উক্ত নারী বা শিশু আসরের সামনে পুঁতে রাখা 'আশা' বা একদিল পিরের মূর্তির চারপাশে সাত পাক ঘুরে। সাতবার প্রদক্ষিণ করানোর পর আসরের সবাই মিলে উক্ত শিশু বা নারী- যার উদ্দেশ্যে একদিল গানের আয়োজন করা হয়েছে, তাকে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। দরজা থেকে পুনরায় সবাই আসরের স্থানে ফিরে আসে। কিন্তু বয়াতি বন্ধ্যা নারী বা শিশুকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে অন্যান্য রীতি সম্পন্ন করে। ঝাড়ফুঁক দিয়ে, আশির্বাদ ও কিছু হিতোপদেশ প্রদান করে বয়াতি ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বয়াতি আসরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় কারো সাথে

www.pathagar.com

কোনো কথা বলে না। এমনকি এ সময় কেউ পিছন থেকে ডাকলেও সে ফিরে তাকায় না।

পোশাক ও বাদ্যযন্ত্র

একদিল গানের মূলগায়ক একটি আলখাল্লা জাতীয় লম্বা জামা পরেন। যা গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বুক বরাবর লম্বালম্বি কাটা থাকে এবং কোমরে একটি ফিতা লাগানো থাকে। উক্ত ফিতা দ্বারা বুক কাটা আলখাল্লাটির মাঝামাঝি অংশ কোমরের সাথে প্যাঁচ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। কেন না আলখাল্লাটির কোনো বোতাম লাগানো হয় না। গায়কের কোমর বরাবর পোশাকটিতে কুচি দেয়া থাকে। একদিল গানে তেমন ভারী কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয় না। সাধারণত ঢোল, জুরি, বাঁশের বাঁশি ও হারমোনিয়াম ব্যবহার করা হয়। তবে মূল গায়কের হাতে একটি গামছা বা তদ্রুপ কিছু থাকে। অঙ্গভঙ্গি করার সময় তিনি এটিকে এদিক সেদিক ঘুরান। যার দ্বারা গায়কের চাল চলনে এক মনোহর ভঙ্গিমা প্রকাশ পায়। যা দর্শক-শ্রোতার মনে চমৎকারিত্বও এনে দেয় বটে।

গানের সময়কাল

একদিল গানের আসর সাধারণত শীত মৌসুমেই বেশি হয়। শীতকালই এ গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করা হয়। তবে বছরের অন্য যে কোনো সময়ও একদিল গানের আসর হয়ে থাকে। এ গান আয়োজনের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত নেই। মানতকারী বা এ গানের পৃষ্ঠপোষক যখন ইচ্ছা করবে তখনই পেশাদারশ্রেণির গায়ক ডেকে নিজ বাড়িতে একদিলের আসর বসাতে পারে।

একদিল গান

১.

একদিল গান মূলত আসরকেন্দ্রিক এক ধরনের কাহিনিমূলক গান। কেউ মানত করলেই কেবল এ গানের আসর বসে। বিশেষত এ গানের পিছনে কাজ করে সন্তান লাভের মনস্কামনা। বন্ধ্যা রমণীর সন্তান কামনা কিংবা পুত্র সন্তান লাভের আশায় পল্লি নারী সমাজে এ গানের মানত প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এ কারণে এ গানের কাহিনিতে নারীর ধৈর্যের নানা পরীক্ষার পরিচয় ফুটে উঠে। সন্তানের আকুলতায় ধৈর্য ও ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই একদিল গাজীর উসিলায় সৃষ্টিকর্তা বন্ধ্যা নারীর গর্ভেও সন্তান দান করেন এ লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই একদিল গানের সূত্রপাত হয়েছে। গায়ক আসরের শুরুতে বন্দনা করে মূল কাহিনি আরম্ভ করে। এটি সেই বন্দনা গানেরই একটি নমুনা।

বন্দনা

প্রথমে বন্দনা করি
প্রভু নিরাঞ্জন
যাহার কুদরতে পয়দা
এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয়ে বন্দনা করি

www.pathagar.com

নবীজীর চরণ
আওয়াল ও আখেরে নবি
জাহেরী বাতন।
তৃতীয়ে বন্দনা করি
হযরত আলীর চরণ
চাইরমে বন্দনা করি
ফাতেমার চরণ।
পঞ্চমে বন্দনা করি
হাসেন হোসেনের চরণ
তারপরে বন্দনা করি
একদিল পিরের চরণ।
তারপরে বন্দনা করি
মা দূর্গার চরণ
জন্মদাতা মাতা-পিতার
ওস্তাদের বন্দি গো চরণ।
আসরে বন্দনা করি
যত জ্ঞানী গুণী জন
ছোট বড় সবার কাছে
রাখি গো সালাম
এই আসরে আমি সবার
পায়েরও গোলাম।
একদিল গাজীর কিচ্ছা খানি
করিব কীর্তন॥[১৫৮]

২.

নারী সন্তানের আশায় সতীত্বের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। দীর্ঘ সময় পর স্বামীর কাছে ফিরে এসে স্বামী সঙ্গ লাভ করতে অধীর হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা নারীর মানবিক জৈব আকুতি এ গানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পতিপ্রাণা নারী তার সর্বস্ব উজার করে দিয়ে স্বামীর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।

আমি এই বয়সের নারী গো
যৌবন জ্বালায় জ্বইলা মরি
পতি আইসো তাড়াতাড়ি ॥
আইসো আমার প্রাণের পতি
খাও গো বাঁটার পান
এই রূপ সোনার যৌবন
তোমায় করব দান ॥
পান খাও প্রাণ পতি
ছাবা[৪৭৮] দেও গো খাই

www.pathagar.com

এই রূপ সোনার যৌবন
তোমায় দিতে চাই ॥
তাই গুয়া কাটে সারি সারি
বানায় পানের খিলি
লবঙ্গ এলাচি দিয়া
করে চতুরালি ॥
দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা
ডাক দিয়া বসায় কাছে
কথা দিয়া কথা নিয়া
প্রাণে মারে শেষে ॥
মন্দিরেতে যাইয়া বিবি
কি কাজ করিল
নিজ হাতে বানাইয়া পান
পতিকে খাওয়াইল ॥
বাদশা আর বাদশা বিবির
মিলন হইল
ঐ দিন হইতে বাদশার বিবি
গর্ভবতী হইল ॥[১৫৭]

৩.

পতিপ্রাণা নারী- সন্তান আকাঙক্ষায় ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে নানাভাবে। দৈব নির্দেশে ঘুরে বেরিয়েছে বন-জঙ্গল, নগর-পাহাড় নানা স্থানে। ফলে নিজ গৃহের বাইরে অবস্থানজনিত দীর্ঘ পতি বিরহের যে আকুলতা তা এ গানে ফুটে উঠেছে। নারী সন্তানের আশায় বহুদিন পরবাসে অবস্থান করেছে। তাই বলে সে তার প্রিয় স্বামীকে ভুলে যায়নি। প্রতি মুহূর্তে সে স্বামীর প্রেমের কথা উপলব্ধি করেছে তীলে তীলে।

আমি কেনে বান পিরিতি রে করলাম
বৈদেশি বন্ধুয়ার সাথে
আমার কানতে জনম গেল গো
ঐ বৈদেশি বন্ধুয়ার সাথে ॥
পিরিত রতন পিরিত যতন
পিরিত কারে কয়
চোখের আঠা মুখের মিঠা
যার যা মনে লয় গো ॥
পিরিত করছে আল্লার রাসুল
বিনা সূতায় গাঁথা গো ॥
পিরিত করছে শিরি ফরহাদ
তাদের না হইছে মিলন গো ॥

www.pathagar.com

পিরিত করছে লাইলি মজনু গো
তারা ইস্কুলে আসিয়া
লাইলির জন্য মজনু পাগল
ঘোরে জঙ্গলায় জঙ্গলায় গিয়া ॥[১৬০]

৪.

সন্তানের জন্যে মায়ের যে অগাধ ভালবাসা তা এ গানে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটে উঠেছে। পৃথিবীর সব মানুষ প্রত্যাখ্যান করলেও মা তার আপন সন্তানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কারণ সন্তানের সঙ্গে মায়ের বন্ধন হলো নাড়ীর বন্ধন। যা শত বাধা বিপত্তিতেও ছিন্ন হবার নয়।

মাও বিনে দরদী নাই রে
মায় জানে সন্তানের জ্বালা
আর বান[৪৭৯] জানে কে
আর জানে সেই দরদের মা
যে রাখছাল[৪৮০] উদ্দরে[৪৮১] ॥
ওরে দশমাস দশ দিন
মায়ে রাইখাছে উদ্দরে
এক অঙ্গ খাইছে মায়ের
গুয়ে আর মুতে[৪৮২]
আরেক অঙ্গ খাইছে মায়ের
মাঘ মাইসা শীতে ॥
তবু মায়ে দেয় না ফেলে
টান দিয়া নেয় কোলে
মায়ের মতো এমন দরদি
নাই ভব সংসারে ॥
কাউরো ছেলে গেলে বিদেশে
মায়ে ঘুরে বাড়ি বাড়ি
পাড়ায় পাড়ায় ঘুইরা মায়ে
ছেলের খবর নেয় রে ॥
ছেলে যদি না খায় খানা
মায়ে ডাকিয়া খাওয়ায়
মায়ের মতন এমন দরদি
এ জগতে নাই ॥
মায়ের দোয়া বড় দোয়া
যদি দোয়া মাগে
মায়েরই দোয়াতে তারে
খায় না জংলার বাঘে ॥[১৬১]

৫.

একজন বন্ধ্যা নারীর মাতৃত্বের আকাঙক্ষা কতটা তীব্র হতে পারে তা কেবল নিঃসন্তান নারীই জানে। অন্য কোনো আশা নেই, শুধু কেউ একজন থাকবে যে মা ডেকে বুকের হাহাকার দূর করে দিবে। মা সন্তানের কাছ থেকে কোনো স্বার্থ কামনা করে না। মরার পর ছেলে কবরে এক মুঠো মাটি দিবে তাতেই শান্তি। এ গান তারই নমুনা বহন করে।

আমি পাষাণে মরিয়া রে যাব
ওরে ব্যাটারও লাগিয়া ॥
একটা ব্যাটা দ্যাও গো আল্লা
অঞ্চল পাইতা নিব
কামাই খাইবার আশা নাই গো
মইলে[৪৮৩] মাটি দিব ॥
নামাজে বসিয়া মায়ে
মুছে চোখের পানি
একটা ব্যাটা দ্যাও গো আল্লা
কইরা মেহেরবানী ॥
এক না মাছের পিছে
নব লক্ষ পোনা
আমার ঘওে দিতে ব্যাটা
কে কইরাছে মানা গো ॥
যার ঘরে আছে ব্যাটা
হাসি-খুশি মন
আমারে রাইখাছ আল্লা
পশুরও মতন গো ॥

কোনো বা জাইলার
খাইছিলাম মাছ
না দিছিলাম কড়ি
সেও না জাইলায় দিছে গালি
আমি ব্যাটারও কাঙ্গালি গো ॥
এই নিশি পোষাইলে আল্লা
কার দুয়ারে যাব
কার বা ছেলে সোন্দর দেইখা
তুইলা কোলে নিব গো ॥
ব্যাটার শোক দারুণ শোক
যার কলিজায় লাগে
ব্যাটার শোকে মায়ে পাগল
ফকির হয় তার বাপে গো ॥
আহা আল্লা শাহা গাজী

www.pathagar.com

সাহেব নিরঞ্জন
কী দিয়া বুঝাব আল্লা
আমার এই না মন গো ॥[১৬২]

৬.

সন্তানের জন্যে নারী সতীত্বের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। সে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করে না। মা ডাক শোনার জন্যে নারী জীবনে যে কোনো কঠিন সাধনা করতে পারে। একদিল গানের প্রচলিত কাহিনিতে সন্তানের মুখ দেখতে নারীকে সতীত্বের ও ধৈর্যের নানা পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এ গানে সে চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

দুঃখ সহেনা অন্তরে রে
ওরে মায়ের দুঃখ
আর বলবো কারো॥
শুনিয়াছি আমি ওগো
প্রাণের পতির ঠাঁই
আল্লারও দরবারে যাইতে
কোনো ভয় নাই ॥
আমি করি কী উপায়
আল্লা ঠেকাইলা বিষম দায়।
অন্তরের আগুনে আমি
মরবো গো জ্বলিয়া
তেজিব এ তুচ্ছ জীবন
আগুনে ঝাঁপ দিয়া রে ॥
দেলেতে আল্লার নাম
একেন করিয়া
আতশের মধ্যে মায়ে
পড়িল ঝাঁপাইয়া ॥
আতশের মধ্যে যখন
পড়িল ঝাঁপাইয়া
আতশ নিভিয়া গেল
মায় চলিল হাঁটিয়া ॥[১৬৩]

৭.

একদিল গানের প্রচলিত কাহিনিতে দেখা যায় একদিল গাজী দৈব কারণে আড়াই দিন বয়সে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দূরে চলে যায়। এ সময় মায়ের জন্যে তার মনের যে বেদনা তা এ গানে প্রকটিত হয়েছে। অনেক কষ্টে পাওয়া মায়ের নাড়ী ছেঁড়া ধন মাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার বেদনায় আকুল হয়ে উঠেছে।

একদিল কান্দছে রে
জননীর লাইগা
গুনাইয়া গুনাইয়া।

www.pathagar.com

আহা হা রে মা জননী
রহিল শুইয়া
তোমার একদিল যায় গো
মা তোমাকে ছাড়িয়া।
থাকো থাকো মা জননী
চিত্তে সবুর দিয়া
তোমার দুধের দাবি মা গো
আমায় দাও ছাড়িয়া ॥
কাঁদিতে লাগিল মায়ের
দুই পায়ে ধরিয়া
মায়ের দুখানি পাও
চাটিয়া চাটিয়া ॥
আড়াই দিনের জন্য মা গো
তুমি আনলে চাইয়া
কি করিব আল্লা পাক
দিয়াছে লিখিয়া ॥
ধীরে ধীরে যায় একদিল
দেখে ফিরা চাইয়া
মায়ের দুখানি পাও ধরে
চিক্কির[৪৮৪] মারিয়া ॥
চলে গেল সাহেব গাজী
মায়েরে ছাড়িয়া
আহা রে ! দুখিনী মায়ে
রইল ঘুমাইয়া ॥[১৬৪]

৮.

নারী সন্তান লাভের আশায় পরবাসে বহুদিন নানা দুঃখ কষ্টের জীবন অতিবাহিত করে গৃহে ফিরে এসেছে। সে তার স্বামীর সঙ্গে রতি ক্রিয়ায় মিলিত হওয়ার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে। নারীর বিশ্বাস সে যে পরীক্ষা ও ত্যাগ স্বীকার করে এসেছে তাতে আল্লাহ তাকে মাতৃত্বের হাহাকার থেকে মুক্তি দিবেন। তাই তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে যতটা না স্বামীসঙ্গ লাভের আশায় তার চেয়ে বেশি সন্তান আকাঙ্ক্ষায়।

আমার যৌবন জোয়ারের পানি
হবে ভাঁটি আর উজানী।
যৌবনের জ্বালা আর
সহিতে না পারি
এসো এসো প্রাণের পতি
এসো তাড়াতাড়ি।
নারীরও যৌবন খানি

www.pathagar.com

ধুতুরারও ফুল
সকালে ফোটে ফুল
বিকালে ঝরে ॥
নদীর বসন্ত কালে
ভাইঙ্গা পড়ে মাটি
নারীর বসন্ত কালে
পুরুষ গলার কাঠি ॥
হাসি-খুশি বাদশা বিবি
রজনী পোষাইলো[৪৮৫]
বাদশা বিবি দুইজনে
মিলন হইলো ॥[১৬৫]

৯.

সন্তানের জন্যে নারী দৈব নির্দেশে গৃহত্যাগ করে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সন্তান ধারণের ক্ষমতা অর্জন করার দৈব আশ্বাসে স্বামীর কাছে ফিরে আসে এবং স্বামী তাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে বলে। দীর্ঘসময় গৃহের বাইরে সন্তানের জন্যে সাধনা করেছে স্ত্রী যা স্বামীর মনে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। সুন্দরী নারী তার সতীত্ব ধরে রাখতে পারেনি বলে স্বামীর ধারণা। নারী স্বামীর কাছে নিজের সতীত্বের প্রমাণ দিতে আল্লার নামে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছে।

আমি করি কী উপায়
আল্লা ঠেকাইলা বিষম দায়।
ঘরে যাইতে দেয় না স্বামী
নিদয় হইয়া রে
অসতী হয়ে গেছি
এই কথা বলি রে ॥
ভাবা গোণা[৪৮৬] করে মায়ে
কিনারে দাঁড়ায়ে
লইবো চালুনে[৪৮৭] পানি আল্লা
তোমার নাম লয়ে।
দেলেতে আল্লার নাম
একিন করিয়ে
পানির ভিতরে চালুন
দিলো ডুবাইয়ে ॥
আল্লা আল্লা বলে মায়ে
লইল উঠাইয়া
চালুনের মইধ্যে পানি
রইয়াছে ভরিয়া।
হাঁটিয়া চলিল চালুন

www.pathagar.com

মাথায় লইয়া
পতির সামনে সতী
দাঁড়াইল গিয়া।
শানিল বাদশা স্ব-চক্ষেতে
দেখিল চাহিয়ে
চালুনে ভরিয়া পানি
আসিয়াছে লইয়ে ॥[১৬৬]

১৯. সারিগান

'সারিগান' লোকসংগীতের অন্যতম প্রধান শাখা। টাঙ্গাইল জেলায় সারিগানকে 'হারিগান' 'হাইর গান' 'নৌকা বাইচের গান' বলে। 'সারিগান' বলতে সাধারণত নৌকা বাইচের গানকেই বুঝায়। মাঝি-মাল্লার বিষয়টি এখানে জড়িত। তবে ভাটিয়ালি গানের মতো সারিগান একক সংগীত নয়, সমবেত সংগীত। কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমবেত সংগীতকে সারিশ্রেণির গান বলা যায়। সারিগানকে কেউ কেউ কর্ম সংগীত, কেউ কেউ মাঝি-মাল্লাদের সংগীত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নৌকার মাল্লারা বা বাইচালরা সারিবদ্ধভাবে বসে বৈঠার তালে তালে যে গান গায় তাকে 'সারিগান' বলে।

আধ্যাত্মিক, বীরত্বব্যাঞ্জক, প্রেমমূলক হালকা রসাত্মক, আক্রমণাত্মক ধরনের সারিগান নৌকা বাইচে গাওয়া হয়। সমাজ স্বীকৃত এমনকি সমাজ বহির্ভূত প্রেম সারিগানের বিষয়বস্তু। সারিগানে শিল্পীগণ অনেক সময় আদিরসের মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকেন। নৌকা ঘাট থেকে ছাড়ার সময়, প্রতিযোগিতার আগে, প্রতিযোগিতার পরে, বাড়ি প্রত্যাবর্তনের সময় গানের ধরনও থাকে ভিন্ন প্রকৃতির। সারিগানের কোনো পাণ্ডুলিপি থাকে না। গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরাই এ গানের রচয়িতা। তবে সারিগানে অপূর্ব অন্তঃমিল ও ছন্দজ্ঞান পরিলক্ষিত হয়। সারিগানের মূল গায়ককে বলা হয় 'বয়াতি'। বয়াতি ও বাইচাগণ সাধারণত চড়া রঙের হালকা পোষাক পরিধান করেন। পোষাকের মধ্যে হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি। মাথায় বাঁধে লাল পাগুড়ি। টুপি কিংবা লাল রুমাল। বৈঠাগুলো বিভিন্ন রঙে রাঙানো হয়। নৌকা বাইচে টিকারাবাদকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বৈঠা ওঠা-নামার সাথে সারিগারের সুরের সঙ্গতি অপূর্ব ছন্দ, দোলার সৃষ্টি করে। সারিগানকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন–

প্রথম পর্যায় : বন্দনা
দ্বিতীয় পর্যায় : প্রতিযোগিতায় যাওয়ার সময়ের গান।
তৃতীয় পর্যায় : বাইচে বিজয়ী বা বিজিত হওয়ার পর গান।
চতুর্থ পর্যায় : বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের সময়ের গান।

১.

মুখ পয়ার : ভেড়া পানান[৪৮৮] তো যায় না পশমের জ্বালায় ওরে আড়িল[৪৮৯]
বেইচা কিনলাম ভেড়া দুধ খামু আশায় ॥
বয়াতি : ওরে নাল আড়িলডা[৪৯০] দিছাল ব্যাভার[৪৯১] শাশুড়ি আম্মায়

বাইচালগণ : ভেড়া পানান তো যায় না পশমের জ্বালায় ॥
বয়াতি : ওরে বেচার কথা হুইনা[৪৯২] সে যে মনেই কষ্ট পায়
বাইচালগণ : ভেড়া পানান তো যায় না পশমের জ্বালায় ॥
বয়াতি : ওরে হুমুন্দির[৪৯৩] বউ হুইনা কথা আড়েটারে চায়,
বাইচালগণ : ভেড়া পানান তো যায় না পশমের জ্বালায় ॥
বয়াতি : ওরে নিমুরাইদা[৪৯৪] নোন্দের জামাইর[৪৯৫] শরম তো নাই হায়,
বাইচালগণ : ভেড়া পানান তো যায় না পশমের জ্বালায় ॥
বয়াতি : ওরে দুইবাঁআলা ভেড়া তোমার পালেই শোভা পায়,
বাইচালগণ : ভেড়া পানান তো যায় না পশমের জ্বালায় ॥
বয়াতি : ওরে খাওগা তুমি দুধ পানাইয়া খ্যাতারও[৪৯৬] তলায়,
বাইচালগণ : ভেড়া পানান তো যায় না পশমের জ্বালায় ॥
বয়াতি : ওরে শোন শোন বাইচাল ভাই গো বলি যে তোমায়
বাইচালগণ : ভেড়া পানান তো যায় না পশমের জ্বালায় ॥
বয়াতি : ওরে চাইয়্যা দ্যাহো সামনে পাছে ডাইনে আরো বায়,
বাইচালগণ : ভেড়া পানান তো যায় না পশমের জ্বালায় ॥
বয়াতি : ভেড়া পানান তো যায় না পশমের জ্বালায়
ওরে আড়িল বেইচা কিনলাম ভেড়া দুধ খামু আশায় ॥
ভেড়া পানান তো যায় না পশমের জ্বালায় ॥[১৬৭]

২.

বৈঠায় টান মারো রে
কানা কুরকার[৪৯৭] ছাও[৪৯৮]
বিলচাপড়ারও বাইচাল আমরা
নিকরাইলেরও নাও
বৈঠায় টান মারো রে ॥

বৈঠায় টান মারো রে
আহাম্মদ মণ্ডলের নাও
শমসের ফকির হাইল ধইরাছে
পলকেতে যাও
বৈঠায় টান মারো রে ॥

বৈঠায় টান মারো রে
আল্লাহ মালেক সাঁই
মাবুদ মওলা সাথে আছে
ডর ভয় নাই
বৈঠায় টান মারো রে ॥

বৈঠায় টান মারো রে
খাবো খাসীর ঝোল

www.pathagar.com

আল্লাহ আল্লাহ বলো মোমিন
হিন্দু হরি বোল
বৈঠায় টান মারো রে ॥

বৈঠায় টান মারো রে
মুহাম্মদ আলী ভাই
তোমার বৈঠা দেইখা ভাবি
গায়ে জোর নাই
বৈঠায় টান মারো রে ॥

বৈঠায় টান মারো রে
ডাইনে একটা ছেড়ি
অবিয়তি[৪৯৯] বাইচালদের
পায়ে দিমু দড়ি
বৈঠায় টান মারো রে ॥
বৈঠায় টান মারো রে
কানা কুরকার ছাও
বিলচাপড়ারও বাইচাল আমরা
নিকরাইলেরও নাও
বৈঠায় টান মারো রে ॥[১৬৮]

৩.

এই নৌকা বাইচের গানে বোয়াল মাছের রূপকে প্রেমিকের কথা বলা হয়েছে। আদিরসের চিত্র এই গানটিতে পাওয়া যায়।

উত্তর পাড়ার ফুলজান বিবি দক্ষিণ পাড়া যায়
দক্ষিণ পাড়া যাইতে ফুলজান চিপাচিপি পথ
ব্যাতের আকড়ায় ধরল টাইনা পাঁচশ টাকার নথ
সাধের ফুলজান লো।

হারে হাটু পানি নাইমা ফুলজান এদিক ওদিক চায়
হারে বোয়াল মাছে গিললো রে নথ করি কি উপায়
সাধের ফুলজান লো।
পাঁচশ টাকার নথ গিললো রে করি উপায়
সাধের ফুলজান লো।
মাজা পানি নাইমা ফুলজান এদিক ওদিক চায়
চ্যালা মাছের ঠুকরে না হইল ভীষম দায়
সাধের ফুলজান লো।
বুক পানিতে নাইমা ফুলজান এম্মুহি ওম্মুহি চায়
হারে বুকের জ্বালা বুঝল বোয়াল আর নাই উপায়
সাধের ফুলজান লো।

www.pathagar.com

বোয়ালে আর ফুলজানে গড়াগড়ি খায়
বোকা বোয়াল ফুলজানের এহেনে ওহেনে কামড়ায়
সাধের ফুলজান লে।
নানী দাদী কামড় দেইখ্যা কয়
ফুলজানের আর নাই উপায়
সাধের ফুলজান লো।[১৬৯]

৪.

এই গানটিতে পরকীয়া প্রেমের চিত্র পাওয়া যায়। বাইচালদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্যই বয়াতি আদি রসাত্মক গান গেয়ে থাকে।

পাছা মোটা ডাঙ্গর ছেরি
বাঁকা চোখে চায় লো।
বাঁকা চোখের চাউনি দিয়া
দাদারে ভিজাইলি লো।
ডাঙ্গর ছেমরি দেখতে সরস
দাদীরে কান্দাইলি লো। (২)
বাঁকা চোখের চাউনি দিয়া
নানারে শুকাইলি লো।
ডাঙ্গর ছেমরি দেখতে সরস
নানীরে কান্দাইলি লো।
ভাইয়েরে ভুলাইলি ছেমরি
ভাবীরে কান্দাইলি লো
পাছার ঠমকে বুকের চমকে
বাইছারে ভুলাইলি লো।
ঠমক চমক বাইছা উরে (২)
বাইছারে উড়াইলি লো।
উইড়া চলে নৌকা আমার (২)
পাছে সবাই পড়ল লো।[১৭০]

৫.

এ গানটিতেই আমরা আদি রসরে চিত্র পাই। আদি রসাত্মক চিত্র থাকলেও গানটিতে সমাজের একটি নিঁখুত চিত্র পাওয়া যায়।

বাইছা টান দিও রে সামনে খনকার বাড়ীর ঘাট
পশ্চিম পাশে হাই স্কুল আড়াই গজের হাট
বাইছা টান দিও রে।
অর্কমা কতক খনকার পিরগিরি করে
অকর্মাদের ভাতের চাইল মুরিদদেরই ঘরে
বাইছা টান দিও রে।

www.pathagar.com

বাইছা টান দিও রে মাস্টার সাবের ঘাটে
দুই বউয়েতে টানাটানি ডাক্তার সাবের ফাটে
বাইছা টান দিও রে।
সামনে নদীর বড় পাক বাইছার মনে জ্বালা
বাইছা দেইখা হইল পাগল দেলোয়ারের খালা
বাইছা টান দিও রে।
আবু মিয়ার সুন্দরী বউ গোসল করে ঘাটে
ভিজা কাপড় সারা দেহের ফুট ফুইটা উঠে
বাইছা টান দিও রে।
বাইছা টান দিও রে
জিতা আহন চাই
কোম্পানী দিবো খাসি কোনো চিন্তা নাই
বাইছা টান দিও রে।[১৭১]

২০. বাউল গান

বন্দনা

বাংলা গানে বন্দনা রীতির প্রচলন অতি প্রাচীন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নানা কাব্য-সংগীতে বন্দনা জাতীয় বিষয় চোখে পড়ে। বাউলগানেও এই 'বন্দনা' গানের পরিচয় পাওয়া যায়। গান শুরুর আগে গানের আসরে সৃষ্টিকর্তা, মুহম্মদ (সাঃ), চার আসহাব, হাসান-হোসেন, ফাতেমা এবং বিভিন্ন ধর্মের দেব-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রশংসা কীর্তন করে গানের মূল পর্ব আরম্ভ করা হয়। মূল গান শুরু করার আগের এ জাতীয় প্রশংসা সূচক গানকেই 'বন্দনা' গান বলা হয়। বন্দনা গানের ভিতর দিয়ে বাউলদের উদার চিন্তা ও মানবতাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে থাকে। গুরুর প্রশংসাই মূলত এ গানের অন্যতম বিষয়। গুরুকে শিষ্য নিজের মধ্যে সর্বদা হাজের নাজের জ্ঞান করে। গুরুর কৃপা তার সমস্ত কাজে তাকে কামিয়াব করবে এটি বাউল ঘুণাক্ষরেও ভোলে না। তাই সার্বিক স্তুতি বা প্রশংসার মধ্যে বাউল গুরুর স্তুতি কীর্তন করে গুরুর কৃপা ভিক্ষা করে। গুরুর অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করলে কোনো চিন্তা নেই। গুরুই সকল বিপদ থেকে শিষ্যকে রক্ষা করবেন এ চেতনার প্রকাশ 'বন্দনা' গানে লক্ষ্য করা যায়।

ভজন

বাউল গানে 'ভজন' শ্রেণির এক ধরনের গানের সন্ধান মেলে। এ গানগুলোর ভিতর দিয়ে সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা তুলে ধরা হয়। স্রষ্টা অদৃশ্য কিন্তু গুরু দৃশ্যমান। বাউল সাধনা যেহেতু গুরুবাদী সাধনা সেহেতু বাউল সাধকগণ গুরুর মহিমা কীর্তন বা ভজনের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার সান্নিধ্য পেতে চায়। গুরুকে তারা স্রষ্টার প্রতিনিধি জ্ঞান করে তাঁর ভজন-সাধন ও সেবা দানের মাধ্যমে 'ভবনদী' পার হতে চায়। অন্ন, বস্ত্র, পানীয় এবং শ্রম বা আপন দেহ দ্বারা গুরু সেবা প্রদান করে গুরুর পরিতুষ্টি সাধনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের আকুলতা ভজন গানের ভিতর দিয়ে ভাষারূপ লাভ করে। গুরু ভজনার রূপকে স্রষ্টার ভজন-সাধনই ভজন গানের মূল উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

১.

দয়াল গুরু আমি তোমার ভজন করতে পারি নাই। কিন্তু সর্বদা তোমাকে দেখার আশা করি। আমার সে আশা পূরণ করিও। তোমার কাছে মিনতি 'পার' এর বেলায় তুমি আমায় পার করিও।

ভজন বিহন দেহ আমার
দয়াল তুমি দেখিয়া রাখিও
তোমার কাছে এই মিনতি
তুমি খুশি থাকিও ॥ (২)

ভজন গান : গ্রামাটিয়া, টাঙ্গাইল

আমি তোমার করব সেবা
দয়াল তুমি আমায় দেখ না
তোমার সাথে যেতে চাই
তুমি সাথে নিলা না (২)
তোমার দিকে রইলাম চাইয়া
তুমি পারের বেলায় ডাকিও..ওই (২)

অধম অবুঝ কাঙ্গালের
এই প্রার্থনা
দয়াল তুমি আমারে ছাইড়া
যাইও না (২)
পারের বেলায় নিও তুমি
আমারে না ছাড়িও ...(ওই)[১৭২]

২.

স্ত্রী-পুত্র ধন-সম্পদ সাধক জীবনে কোনোটাই কাজে আসে না। ভজন সাধনই 'পার' হওয়ার একমাত্র ভরসা। গুরু তুমি আমার হবে– এটাই সাধকের মূল সাধনা। তাই সাধক বলছে–

www.pathagar.com

ভজনহারা দেহ আমার
পাপের ভার সহে না
ওরে তুমি আমার আমি তোমার
এক জীবনের বন্দনা (২)

খাট পালঙ্ক সোনার গহনা
মনে তো ভাল লাগে না
আমার জীবনের এই যন্ত্রণা
প্রাণে তো আর সহে না (২)
দয়াল আমি তোমার কিছু হই না
বুঝলাম প্রেমের বেদনা (ওই)

স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন
আমার কেহ আপন হইল না
ওরে অবুঝ মনার এই প্রার্থনা
মনেতে ব্যথা দিও না (২)
ওরে তুমি আমার আমি তোমার
এক জীবনের বন্দনা (ওই)[১৭৩]

৩.

এই গানে দেখা যায় ভক্ত সম্পূর্ণভাবে গুরুর উপর আত্মসমর্পিত। ভক্ত গুরুকে বুঝতে পারছে না যে সে গুরুর উপর কতটা নির্ভরশীল। ভক্তের একমাত্র ভরসা গুরু। তাই ভক্ত গুরুর কাছে মিনতি করে বলছে–

ওগো দয়াল কিভাবে ভজিলে
তুমি হইবে খুশি
সেইভাবে ডাকিবো তোমারে
ডাকলেও যদি হও রাজি (২)

পরপারে পারের বেলায়
একেলা ফেলিও না আমায় (২)
তোমার নামে সাঁতার দিব
মরণ যেন হয় আমার ..(ওই)

দয়াল আমি তো ভজন জানি না
কিভাবে দিব তোমায় সান্ত্বনা (২)
ভজনহারা কাঙাল[৫০০] আমি
অধমের এই প্রার্থনা...(ওই)[১৭৪]

আদমতত্ত্ব

বাউল গানের এ শাখায় আদম বা মানব সৃষ্টির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়। আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বাউলদের নানা তত্ত্বগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এ গানে

www.pathagar.com

প্রকাশ পায়। মানব সৃষ্টি সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্ব দর্শনের মতো বাউল সাধকদেরও নিজস্ব দর্শনকেন্দ্রিক তত্ত্বকথা 'আদমতত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্বের' গানে প্রকাশ পায়। আদম সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য ও ফেরেশতাদের ভূমিকা এ গানে তত্ত্বাকারে প্রকাশ পায়। বিশেষ করে আদম (আঃ) এর সুরত তৈরির নানা তত্ত্ব ও হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টি রহস্য এ গানে তত্ত্বাকারে ফুটিয়ে তোলা হয়।

ইসলাম ধর্ম মতে প্রত্যেক আদম সন্তানকে পুলসিরাতের পুল পাড়ি দিতে হবে। সূক্ষ্ম, চিকন ও ধারালো এ পুল পাড়ি দেওয়া খুব কঠিন। ইসলামের বাণী বাহক হযরত মুহাম্মদ (স) এর অনুসারী যারা তারা তার নিকট হতে টিকেট নিয়ে অর্থাৎ তাঁর প্রদর্শিত পথে সাধনা করে সে পুল পাড়ি দিয়ে জান্নাতে চলে যাবে।

১.

দেখে আইলাম ফুলসিরাতে মহাভবের স্টিমার
আদম হাওয়া কেরানি তার (২)
মুহাম্মদ হয় টিকেট মাস্টার।
দেখে আইলাম ফুলসিরাত মহাভবের স্টিমার
তাই আদম থেকে পড়লে পরে
অমনে আইসা জাহাজ ভিড়ে (২)
কেরানি কয় কেন ভিড়ে
নামে রে জাহাজ চমৎকার।
দেখে আইলাম ফুলসিরাতে মহাভবের স্টিমার।
জাহাজখানি দেখতে ভালো
কোনো কারিগর গড়েছিলো
রাসুল তার বিদ্যুৎ আলো (২)
ব্যারেজ ভর্তি ইঞ্জিল তার
দেখে আইলাম মহাভবের স্টিমার।
আদম হাওয়া কেরানি তার (২)
মুহাম্মদ হয় টিকিট মাস্টার
দেখে আইলাম ফুলসিরাতের মহাভবের স্টিমার (২)
রাসুল বলে সুজন যারা
টিকেট লইয়া আসবে তারা (২)
যে জন হবে টিকেট ছাড়া (২)
তারে না করিবে পার।[১৭৫]

বিচার গান

'বিচার গান' বাউল গানের অন্যতম একটি শ্রেণি বা শাখা। এ শ্রেণির বাউল গানে সাধকের আত্মমূল্যায়নের কথা থাকে। মানব জন্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে বাউল সঠিক সময়ে সাধন ভজনের কথা চিন্তা করতে পারেনি। তাই জীবনে যে সময় অপচয় করেছে তার জন্যে তার অনুশোচনা বিচার গানে মূর্ত হয়ে

www.pathagar.com

উঠে। বাউল দর্শনে 'নিজেকে চেনো বা জানো' এ তত্ত্ব উপলব্ধির জন্যে বিচার গানে সাধকের আত্মবিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আত্ম-উপলব্দির মাধ্যমে আত্ম সংশোধনের উপায় খুঁজে বাউল যেমন নিজেকে লক্ষ্যগামী করে তেমনি অন্যকেও সঠিক পথে চলতে উপদেশ প্রদান করে। বিচার গানে আত্মবোধের জাগৃতি ও আত্মশুদ্ধির ব্যাকুলতাই প্রকাশ পায়। এজন্যে বিচার গানে বাউলদের অনুশোচনার অন্ত নেই।

১.

বিচার গানে থাকে বাউলের আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম-অনুশোচনা। বাউল সংসারের মায়া জালে আবদ্ধ থেকে সাধন ভজনে আত্মনিয়োগ করতে পারেনি। ভক্তি সাধনার নদীতে ডুব দিবে দিবে করে কেটে গেছে জীবনের অমূল্য সময়। সংসার ধর্ম এবং পরম সত্তার দোটানায় পড়ে বাউলের কিছুই করা হলো না। এ গানে তারই প্রকাশ ঘটেছে।

ওরস উপলক্ষ্যে বাউল গান, গোলাম মওলার ওরস, চামারি ফতেপুর, টাঙ্গাইল

একটা ভাবের নদীতে সই গো
ডুব দিলাম না
জলে নামি নামি আশা করি
মরণ ভয়ে নামি না ॥
নিত্য গঙ্গায় চান করি
কুলে বইসা ঐ রূপ হেরি
মরণ ভয়ে নামলাম না ॥
নদীর বাঁকে বাঁকে ঘুইরা বেড়াই
কুল কিনারা পাইলাম না
সই গো ডুব দিলাম না ॥[১৭৬]

২.

এই গানে খানকা ঘরের পাশে তাকে কবর দেওয়ার ইচ্ছা ব্যাক্ত করা হয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মৃত ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া এখানে ব্যাক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে (২)
আমার খবর লইও সোনার বন্ধু রে
মনে চাইলে আমার বাড়ি যাইও রে ॥

আমার বাড়ির উত্তর পাশে
আছে খানকা ঘর
সেই ঘরে সাজাইও তোমরা
আমার শেষ বাসর।
সাড়ে তিন হাত ঘর বানাইয়া
সেই ঘরে শোয়াইও ॥
যে দিন আমার প্রাণের পাখি
যাবে রে ছাড়িয়া
বড়ই পাতার গরম জলে
গোসল দিও করাইয়া।
ওরে সাদা মারকিন কাপড় সেইদিন
আমার গায়ে পরাইও ॥

মনের মানুষ পাই না কোথাও
কার কাছে বলিব।
আমারও গোপন প্রেমের কথা
কেউরে না বলিও ॥[১৭৭]

৩.

জগতে কেউ কারো নয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র এগুলো সংসারের সম্পর্ক। আমরা যাকে দাদা বলি, সে পিতাকে জন্ম দিয়েছে বলেই তাকে দাদা বলি। মা উদরে ঠাঁই দিয়েছে বলে তাকে মা বলি। অর্থাৎ সম্পর্কগুলো সংসারের কর্মের সাথে সম্পর্ক। সাধক বলেছেন একমাত্র ছোবের বাঁশই তার কাছে আপন। কারণ মৃত্যুর পর বাঁশ ভিন্ন অন্য কেউ কবরে যায় না।

মইলে তোর সঙ্গে যাবে কেবা রে
ভাব ধইরা দেখ দেহের মাজারে।
বাপ তো আপনা নয় রে
দাদার জন্ম পিতা
মাও তো আপনা নয় রে
উদরে দিছাল[৫০১] জাগা ॥
ভাই তো আপনা নয় রে
একই ছোবের বাঁশ
বোন তো আপনা নয় রে
সে তো পরের গৃহে বাস।
বউ তো আপনা নয় রে
পরের কামাই[৫০২] খায়

www.pathagar.com

কটু একটা কথা কইলে
রাড়ি হবার চায়।
ঘরের পাশে বাঁশের ঝাড়
তারাই সোদ্দর ভাই
বিপদে পড়লে হাতের লাঠি
মইলে সঙ্গে যায় ॥[১৭৮]

৪.

নামাজের মাধ্যমেই আল্লাহর দীদার লাভ করা সম্ভব। নামাজ হলে মুমিনের মেরাজ। মানুষ যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সাধন করে তা হলে তার দোযখে যাওয়ার ভয় থাকে না।

ওরে নামাজে পাইবা তাঁরে
কোরানে দিছে খবর
আগে তুই পাঞ্জেগানা পড়,
পরে পিরের চরণ ধর (২)
আলেপে দাঁড়াইয়া সে হরফে রুকু দিয়া
দাল আসনে বস তাহার পর (২)
মিম হরফে সেজদা দিয়া
সোবহানা রাব্বুল আলামিন কইয়াগো
সামনে চাইয়া দেখ কাবা ঘর ॥
আগে তুই পাঞ্জেগানা পড়,
পরে গুরুর চরণ ধর।
পড় নামাজ নিশি রাইতে,
দ্যাখা পাইবা তাহার সাথে
কালেবে তার হইবে খবর। (২)
সাফ হইলে দেলের ময়লা
দেখতে পাইবা নুর তাজেল্লা
তোর ভিতরে আছে কুহুতোর
আগে তুই পাঞ্জেগানা পড়,
পরে গুরুর চরণ ধর।
আজ হইতে জন্মাবধি কয়টা নেকি কয়টা বদি
আমলনামা নিজেই হিসাব কর। (২)
নিজের হিসাব নিজে করে
উঠ যদি রোজ হাশরে গো
কাসেম বলে নাই দোজখের ডর হায় রে
কাসেম বলে নাই দোজখের ডর।
আগে তুই পাঞ্জেগানা পড়
পরে পিরের চরণ ধর।

www.pathagar.com

বিল্লাল যখন আযান দিত
মদিনার লোক চৈতন পাইত
চৈতন পাইয়া আল্লাহু আকবার। (২)
তোমরা কেন রইলা ঘুমে
আয়ু তোমার গেল কমে গো
ঠিক নাই তোর ঈমানের পাথর
আগে তুই পাঞ্জেগানা পড়,
পরে পিরের চরণ ধর।[১৭৯]

৫.

নামাজের মধ্যে খোদাকে হাজির নাজির জেনে নামাজ পড়তে হয়। নামাজ হলো বেহেশতের চাবি। ধ্যানের মধ্যে কাবাঘর সামনে রেখে নামাজ পড়তে হয়।

নামাজে আছে মজা
শুন বে-বুঝা বলি তরে, নামাজে...।
ও তুই রসগোল্লার স্বাদ কী পাবি
চিড়া গুড় চিবাইলে পরে
নামাজে আছে মজা
শুন বে-বুঝা বলি তরে, নামাজে...।
নামাজ অইলো বেহেশতের চাবি
যেইখানে চিরকাল রবি...
হুর গেলেমান সবই পাবি দিবে তরে। (২)
ওরে হাজির নাজির জেনে তারে
সেজদা কর কাবাঘরে। (২)
নামাজে আছে মজা
শুন বে-বুঝা বলি তরে, নামাজে...।
নামাজে হয় আদ্যশক্তি,
পড়লে সারে ভবব্যধি...
পড় নামাজ নিরবধি বিশ্বাস করে। (২)
দেওয়ান কাশেম বলে নিদান কালে
নামাজে বাঁচাইবে তরে। (২)
নামাজে আছে মজা
শুন বে-বুঝা বলি তরে, নামাজে...।
ওরে কুরাতুল আইনে কিতাবে সালাত
দেখ একটু হাদিস পড়ে
নামাজে আছে মজা
শুন বে-বুঝা বলি তরে, নামাজে...।[১৮০]

৬.

মৃত্যুর সময় কেহ সঙ্গের সাথি হয় না। মোহের বন্ধনে পড়েই আয়ুষ্কাল শেষ হলো। একাগ্রচিত্তে তাঁকে ডাক, ‘ভবপার’ এ যেতে পারবে।

www.pathagar.com

কবে আসিবে সেই দিন;
যেদিন মন যাবি একেলা।
কেউ হবেনা তোর যাবার বেলা ॥
কি করিতে আইলি ভবে কি যে করিলি তার।
মায়া জালে জড়াইলি আপন করলি পর
পিছনেতে চেয়ে দেখ ডুবল আয়ু বেলা (২)
দিন কাটালি করিয়া হেলা ॥

চারজনা আসিয়া মনরে দুয়ারে দাঁড়াবে
যতনে সাজাইয়া তরে পালকিতে চড়াবে
ভাই বন্ধু লুটাবে সেদিন করিবে রোদন (২)
সে দিন ভাঙ্গিবে রঙের মেলা ॥
মধু পাগল ভেবে বলে হরদম তাঁরে ডাক
নামের বাদাম তুইলা দিয়া, নিরিখে হাল ধর
নীল দরিয়া পার হইয়া
দুজনাতে খেলিবি খেলা ॥[১৮১]

৭.

মানুষের জীবনের কোনো ভরসা নাই। যে কোনো মুহূর্তে সে মৃত্যুবরণ করতে পারে। তবু মানুষ আশা করে সে চিরকাল জগতে থাকবে। সময় থাকতে মন সুপথে এসে আল্লাহর নাম স্মরণ কর।

পরাণ পাখি রে।।
সময় থাকতে তৈয়ার হইয়া যাও
পরাণ পাখি রে (২)
এক ডালেতে বাসা তোমার
আরেক ডালে পাও (২)
ও পাখি রে
নীল আকাশে সাজিয়েছে কাল বৈশাখী মেঘ
আজকে বুঝি ভাব ভালো না
ফিরে চাইয়া দেখরে (২)
ঝড়ে যাবে তোর আশার বাসা
গাছে লাগলে বাও ॥ (২)
ও পাখি রে
ভুল করিয়া ছিটকি ডালে
কেন বান্ধিলি বাসা (২)
এই জীবনে কাঁচা বাসার
নাই কোনো ভরসারে (২)
অন্তরে রাখিয়া আশা

www.pathagar.com

বন্ধুর নাম গাও ॥ (২)
ও পাখি রে
সময় থাকতে কথা শোন ওরে পরাণ পাখি (২)
সময় গেলে থাকবে শুধু
জল ভরা দুই আঁখি (২)
হাসানের কি আছে বাকি
হইতে উধাও ॥ (২)[১৮২]

৮.

বাউল দর্শনে শুক্র মহামূল্যবাণ বস্তু। শুক্রক্ষয় করে সন্তান জন্ম দিলে মানুষ জন্মচক্রে পড়ে। সাধুসঙ্গ করে সাধন ভজন করলে মানুষ এই জন্মচক্র হতে রেহাই পায়।

তুই কেনবা ভবে আইলি হাতে তুলে বিষ খাইলি
আত্মহত্যা মহাপাপে কেনবা ডুবিলি ॥ (২)
মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা যা করেছো ভবে,
এ সকল পুটলী করে সঙ্গে নিতে হবে
ও তার প্রতিফলও পাবে।
ও তুই কোথা হতে কার ধন এনে
কারে বা খাওয়াইলি ॥
বাল্যকাল তোর ছিলো ভালো ষোল আনা ছিলো,
জোর করে যৌবনের স্ত্রী
তার অর্ধেক কেড়ে নিল
এখন উপায় কি তাই বল (২)
বাকি অর্ধেক পুত্র কন্যায় নিয়ে তফিল করল খালি ॥
জ্ঞান দাস কয় এ সংসারে আর তো উপায় নাই,
দেশ বিদেশ ঘুরে ফিরে যদি সাধুর সঙ্গ পাই
আমি আর কারে ডরাই (২)
সাধুর সঙ্গ বিনে এ জীবনে আসা যাওয়া খালি ॥[১৮৩]

৯.

মানবদেহের মধ্যে স্রষ্টার বাস। বাতাসের সাথে তাঁর চলাফেরা। নফ্‌সকে আয়ত্ব করলেই তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। সংসারের প্রয়োজন মেটাতেই মানুষের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায়।

শোন রে মনাই টুক্কু মিয়া
এই নামটি গিয়াছে
তোর মায় রাখিয়া ॥
সুন্দর একটি অজুদ পাইয়া
দমের মধ্যে আছ লুকাইয়া
কে তুমি, জান কি?
পেয়েছ কি তোমায় খুঁজিয়া ॥

www.pathagar.com

তোমায় যদি পেতে চাও
বাতাসের সাথে ডুবে যাও
কলব রুহু ছির খবি আখফাতে যোগ লাগাও
নফ্‌সকে টানিয়া লইয়া
চৌঠা আসমানে থাক ভাসিয়া ॥
টুক্কুরে তোর- দুখের বোঝা বইতে বইতে,
দিন গেল তোর ফুরাইয়া ॥
যাদের তরে ঘর বাঁধলি
পেলি কি তাদের খুঁজিয়া
কত আশা ছিলো মনে
সুখ দিবে তোর সন্তানে
সুখ তো দূরের কথা
দুঃখ দিয়ে রাখে সদা কান্দাইয়া ॥[১৮৪]

১০.

কুম্ভক সাধনার মাধ্যমে দম আয়ত্ব থাকলে দেহের উপর কর্তৃত্ব জন্মায়। দমের উৎপত্তিস্থল, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধক জ্ঞাত থাকলে সাধানায় সফলতা লাভ করতে পারে।

দমের সনে তোমার কেমন পিরিতি
ভবে দম বিনে আর নাই গতি।
দম কি আদম, আদম কি দম
মন রে আমানতের কর কি ॥
দমের আছে কয়টি রে দেশ
তুমি কোনো দেশে কোনো ভাব আছে ভাব কি
দমের আছে কয়টি ধারা
তুমি কোনো ধারায় কয় স্থিতি ॥[১৮৫]

মাদারের গান গেয়ে ভিক্ষাজীবি জনৈক সাধু

www.pathagar.com

১১.

কর্মের লেখা পরিবর্তন হয় না। যে কোনো ভাবেই তা জীবনে ঘটে। জগতে সুখিজন কখনও দুঃখীজনদের যাতনা বুঝে না। দুঃখীর মর্ম দুঃখীজনই একমাত্র উপলব্ধি করে।

বিধি যার কপালে যা লেইখাছে রে
ওরে দুঃখ কান্দিলেও যায় না
আমি দুঃখ লইয়া যাই বন্ধুর বাড়ি,
বন্ধু ডাকলেও কথা কয় না ॥
আমি দুঃখের ডালি মাথায় নিয়ে
ঘুইরা বেড়াই ভবের হাটে-
সুখীজনায় দর করে না রে
দর করে কাঙ্গালি যারা ॥
কেহ থাকে দালান কোঠায়
কেহ থাকে বৃক্ষ তলায়
যার দিন যে হালে যায়।
কেহ রঙ্গ রসে হাসে খেলে রে
কেহ কান্দিয়া কুল পায় না ॥[১৮৬]

১২.

গুরু তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি ছাড়া কেউ আমার দুঃখ বেদনা বুঝে না। দয়াল গুরু তোমার চরণে আমাকে ঠাঁই দাও।

দয়াল গুরু গো
আর আমার নালিশের জাগা নাই
আমার মুখ দেখে যেদুঃখ বুঝিবে
এমন বান্ধব ভবে নাই
আর আমার নালিশের জাগা নাই ॥
আমি বট বৃক্ষের
ছায়ারে দেখে দৌড়াইয়া যাই,
আমি এই মিনতি করি রে গুরু।
চরণে যেন জাগা পাই ॥
বট বৃক্ষের ছায়ায় রে বসে
ছাড়ি কত দুঃখের হাই
দয়াল গুরু গো ॥[১৮৭]

পরমতত্ত্ব

'পরমতত্ত্ব' গানে বাউল স্রষ্টার রহস্য জানতে চায়। স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্কের নিগূঢ় রহস্য জ্ঞান লাভ করতে বাউলের চৈতন্য বিভোর হয়ে থাকে। মানুষ ভজন করেই বাউল ক্ষান্ত হয় না। সে পরম স্রষ্টাকে দেখতে চায় স্বরূপে। পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের আকুল আকুতি বাউলের অন্তরকে করে অধীর। পরম সত্তাকে লাভ করার জন্য কী করতে হবে

www.pathagar.com

তা নিয়ে বাউল সাধনা করে। মানবের ভিতরে লুকিয়ে থাকা জীব সত্তাকে বিলীন করে পরম সত্তাকে জাগ্রত করতে পারলেই পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। আর পরমাত্মার সাথে একাকার হতে পারলে মানবের ধ্বংস নেই।'পরমতত্ত্ব' গানে বাউলের এ তত্ত্ব চিন্তার প্রতিফলন ঘটে।

১.

মানুষের দেহের মধ্যে পরমাত্মার বাস। 'অধর মানুষ'কে ধরতে হলে দেহের নয় দরজা বন্ধ করে সাধনা করতে হয়।

মানুষ থাকে নিগুম ঘরে
লামের জোত লাগাইয়া দেখ
তারে নিরিখ ভরে ॥
লায়লাহাতে নাই কিছুই
ইল্লালকে সত্য জাইনে
মিমের ঘরে খোঁজে দেখ
রূপে মানুষ ঝলক মারে ॥
দেহের নয় দরজা বন্ধ করে
দ্বিদল পথে উঠ যাইয়ে
মিমের ঘরে কপাট মাইরে
রূপে মানুষ খেলা করে ॥
মুর্শিদ চান দয়ালে বলে,
শুনরে বালক বলি তরে,
সাকারে আকারে মানুষ
এই সংসারে বিরাজ করে ॥[১৮৮]

২.

আল্লাহ রাহমানুর নাম ধারণ করেছে পাপীদের দয়া করার জন্য। ভক্তের অভিযোগ, স্বার্থপর জগতে তাঁর দয়া হতে সে বঞ্চিত রয়েছে।

কি দিয়ে বুঝাবো মনকে
ত্রি জগত যে চালাইতেছে ॥
সেঁ বা কেমন রূপটা কেমন
কোথাও না পেলাম তাঁকে।
বেদনা মোর অন্তরালে
দিবা নিশি মরছি জ্বলে
আবরণ দেখে কেহ
নাহি তো বোঝে ॥
রাহমানুর রহিম যিনি
দেখা নাহি দিলেন তিনি
কিভাবে যে আছি আমি
জানাবো কাকে ॥

www.pathagar.com

আদমে দম দিয়া
কেল্লা শরীফ থাকে লুকাইয়া
ভবের সংসারে এসে চাকর সেজেছি
মাইনা ছাড়া চাকর হয়েছি
স্ত্রী পুত্র কন্যা বেরাদর যত
আত্মীয় দেখলাম শত শত
ঘটিলে স্বার্থের ব্যাঘাত
কেউ থাকেনা কাছে ॥[১৮৯]

৩.

আল্লাহ তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। তুমি মুর্শিদ রূপে জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ফলে তোমাকে কেহ চিনতে পারছে না। তোমার মোরাকাবা বা মোশাহেদা সাধন জানি না। আমি তোমার আশ্রয় প্রত্যাশী।

আমি ডাক্‌ছিরে আল্লাহ
আস্তাল মওলা সামাদ আল্লাহু
তুমি ছাড়া এই জগতে
আমার বান্ধব নাই কেহু ॥
তুমি নিরাকারে আকার ধরে
বেড়াও মুর্শিদ এই ভব সংসারে
তোমায় চিনেনা কেহু ॥
কে বুঝিতে পারে তোমার নিলার মহিমারে হু
তোমার মোরাকাবা নহে রে জানি
মোশাহেদায় হও রব্বানি
তোমায় বুঝেনা কেহু ॥
আমি দিবানিশি বইসা ডাকি
সদায় ইল্লাহু
কালবি আকার তোমারই কারবার,
তোমায় দেখে না কেহু ॥
তোমার লাহুদ মোকামের পর্দা
একবার খুলে দেখাও হু
অধীন বাল্লুক কাইন্দা বলে
দয়াল মুর্শিদ চান্দের চরণ তলে
আমি তোমার দিদার হু ॥
কিয়ামতের ময়দানেতে
তোমার দেখা পাই যেন হু ॥[১৯০]

৪.

নিরাকার আল্লাহ মীমের কায়া ধরে জগৎ সংসারে বিরাজ করছে। মোহাম্মদ নাম ধরে সৃষ্টিকে সাধন ভজন শিক্ষা দিতেছে।

www.pathagar.com

আল পুরেতে আল্লাহ আছে
এ ভেদ জান তোমার গুরুর কাছে ॥
আলেপেতে নক্‌সা দিয়া
মীমের ঘরে ছবি দিছে
লামের ঘরে রূপ লাগাইয়া
তাঁর সৃষ্টির সনে মিশে আছে ॥
আল্লাহ নামটা জপ
এ নাম মুখে শুধু ভাসতে আছে
আল্লাহ নিরাকার, মীমের আকার
এই জগতে খেলা করছে ॥
আপনি আপন নাম জপিয়া
তাঁর সৃষ্টিকে নাম শিখাইয়াছে
মোহাম্মদী নাম রাখিয়া
তাঁর স্বরূপ তত্ত্ব প্রচার করছে ॥
মুর্শিদ চান পাগলে বলে
শুনরে বালক বলি তরে
আল্লাহর ভেদ যায় না বুঝা
তুমি এক নাম ধরে থাক বসে ॥[১৯১]

নবিতত্ত্ব

'নবিতত্ত্ব' বাউল গানের একটি অন্যতম শাখা। এ গানে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সৃষ্টি রহস্য, তাঁর পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য, তাঁর কর্ম, জীবন দর্শন ও ধর্মাদর্শ প্রচারের নানা তত্ত্ব বাউলেরা সুরে সুরে প্রকাশ করে। 'নবিতত্ত্বে' বাউলেরা সৃষ্টি ও স্রষ্টার অভিন্নতাও বাউলের তত্ত্ব ব্যাখ্যা তুলে ধরে গানের ভাষায়। নবির নুর দ্বারা জগতের সকল সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে বাউল এ কথা বিশ্বাস করে। 'নবি মোর নুর- এ খোদা / তাঁর তরে সকল পয়দা/ আদমের কলবেতে তাঁরই নুরের রওশনি'॥ 'নবিতত্ত্ব' গানে উল্লিখিত পংক্তি সমূহের তত্ত্বদর্শনের সার বস্তুই ফুটে উঠে। স্রষ্টা আপন নুরের অংশ থেকে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সৃষ্টি করে নিজ রূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন বলে বাউলের বিশ্বাস। তাই নবিতত্ত্ব গানের গুরুত্ব বাউল সাধকের নিকট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়।

১.

দেহঘরের মধ্যে বাস করে মুর্শিদ। সে ঘরে আলো আঁধারির খেলা চলে। শিষ্য গুরুকে এই দেখে, এই নাই। এই দেহ ঘরে রয়েছে আসমান-জমিন এবং কাবা শরীফ। সময় মতো সে ঘরে সহি নামাজ আদায় করতে হয়। শিষ্য দেহ ঘরের ভিতরে মুর্শিদ গুরুর অস্তিত্ব অনুভব করেছে এ গানে–

দরিয়ায় বাইন্ধা ঘর
বসত করে আমার নবী রে পয়গাম্বর
ওরে ঘরে ক্ষেণে ক্ষেণে জ্বলছে বাত্তি
আবার ক্ষেণেই হয় অন্ধকার ॥

www.pathagar.com

সেই না ঘরের চাইরটা কোণা
আসমান জমিন জরিপ করা
বায়তাল মসজিদ ঘর
সে ঘরে পড়গা নামাজ
হওগা হাজি সময় যারও হয় ॥
সেও ঘর খানা ভাই আছে খাড়া
তিনশ ষাইটটি পর্দা আছে ভাই গো
সেই ঘরের বেড়া ॥[১৯২]

২.

মুর্শিদের জন্যে শিষ্যের আকুলতার শেষ নেই। শিষ্য মুর্শিদকে এক পলকের জন্যেও চোখের আড়াল করতে চায় না। বুকের পিঞ্জরে সর্বদা মুর্শিদের উপস্থিতি শিষ্যের কাছে প্রাণ পাখির সমতুল্য। মুর্শিদ বিনে শিষ্যের কোনো গতি নেই।

তুই যে আমার সোহাগের পাখি
আমি যে তোর পিঞ্জিরা॥
আহা রে দরদের পাখি
তোমায় বিনে আন্ধার দেখি
তুমি আমার আমি তোমার
না দেখিলে দয়াল বাঁচিনা ॥
পশু পঙ্খি তারাই সবে
পহরে পহরে ডাকে
মানুষও হইয়া তোরা
একবার ডেকে দেখলি না ॥
আসমানের চন্দ্র সূর্য
তারাই কান্দে আকাশে
বেহেস্তে ফাতেমা কান্দে
রাসুল পাব কেমুনে ॥[১৯৩]

৩.

মুর্শিদি গানে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভক্তি চরমভাবে প্রকাশ পায়। তিনি ভক্তের নিকট পরম প্রেমের আধার। এ গানে মুর্শিদের জন্যে শিষ্যের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

দয়াল আমায় ছেড়ে গেল গো
সোনার মদিনা
জানতাম যদি আগে আমি
ছাইড়া যাইতে দিতাম না
সোনার মদিনা গো ॥
জ্বালাইয়া মোমের বাতি
জেগে রইলাম সারা রাতি গো

www.pathagar.com

আমি কোথায় তুমি কোথায়
কেউতো কারে দেখি না
সোনার মদিনা গো ॥
এই বাও বাতাসে জুড়ায় না প্রাণ
নদীতে উইঠাছে তুফান
হায় গো ছয়ষট্টি মাইল বেগে চলে
চব্বিশ ঘণ্টায় থামেনা
সোনার মদিনা গো ॥
নবী আমার এতিম ছিলো
আবু জেহেল জ্বালা দিলো
জ্বালায় জ্বালায় অন্তর কালা
উম্মতের কথা নবি ভোলে না
সোনার মদিনা গো ॥[১৯৪]

৪.

নবী সৃষ্টির আগেও ছিলেন। আবার সৃষ্টির পরেও থাকবেন। মানুষ সৃষ্টির আগে নবী ময়ূর রূপে ছিলেন। তখন নিজের রূপ দেখে নিজেই পাঁচটি সেজদা করেন।

ওরে আওয়াল ও আখেরে নবি (২)
যাহেরে ও বাতনের মূল, বাতনের মূল ॥
যতনে কইরাছে পয়দা মুহাম্মদী নূর মওলায়
দীনের নবি পয়গাম্বরে ময়ূরও আকারও ধরে
সেই সময় দুনিয়াতে নাহি ছিলো
কোনো কূলরে কোনো কূল
যতনে কইরাছে পয়দা মুহাম্মদী নূর।
তাই সাদা মুক্তার আবরণে
নূর ছিলো সেই এক ধিয়ানে
সাদা মুক্তার আবরণে
নুর ছিলো সেই এক ধিয়ানে
মাবুদের আয়না দেইক্যা
সেজদা দিছে, সেই ময়ূর
যতনে কইরাছে পয়দা মুহাম্মদী নূর।
আপে দেইখা আপনারে
পাঁচটি সেজদা তখন গো করে
সেই হইতে নামাজ পয়দা
পাঞ্জেগানায় হয় কবুলরে হয় কবুল।
যতনে কইরাছে পয়দা মুহাম্মদী নূর
যতনে কইয়াছে পয়দা মুহাম্মদী নূর।

www.pathagar.com

আদম নূর মুহাম্মদের মন বাসনা
শোধ হইলো না ভবের গো দেনা
সই মিছা কাজে দিন ফুরাইলো
মিছা কাজে দিন ফুরাইলো
ভাবনা চিন্তা হয় না দুর, হয় না দূর।[১৯৫]

৫.

'মীম' বলতে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে বুঝানো হয়েছে। 'মীম' জগৎ সংসারে আকার রূপে বিরাজ করলেও তাঁর প্রকৃত সৃষ্টি রহস্যময়। এই মীম হজরত মুহাম্মদ (সঃ) কে জানতে না পারলে আল্লাহর দীদার পাওয়া যাবে না।

তোর জ্ঞানের ঘরে ঘুণ ধরেছে
মীমের খবর পাবি কিসে
মীমের পর্দা খুলে দেখ
এই সংসারে কে বিরাজে।।

মীমকে সুরৎ দিয়া
আল্লাহ গেছে গায়েব হইয়া
বেদ বেদান্ত খোঁজে দেখ
আলেমুল গায়েব লিখে কোরানে।।

মীমের সুরৎ আদমে পাইল
তাই সৃষ্টির সেরা আদম হইল
মীমে মওলার তৌহিদ কালাম
মাহফুজে তা লিখা আছে।।
সাত তবক এই অজুদে আছে
তার উপরে মীম মজুদ রইয়াছে
দেহের বিচার না জানিলে
মীমের বিচার বুঝবে কিসে।।

মুর্শিদ চান দয়ালে বলে
শোনরে বালক বলি তোরে
মীমের জন্য জগত পাগল
তুই পাগল হলি কিসে।।[১৯৬]

৬.

নবীর তরিকায় বায়েত পড়। সর্বদা 'আল্লাহ' নামে জিকির কর। তা হলে আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তা হলে ভবপার হতে তোমার কোনো বাধা থাকবে না।

ওরে বেলা থাকিতে আপন দেশে চল
বেলা ডুবিলো, দিন থাকিতে আপন দেশে চল (২)
ওরে বেলা আছে দণ্ডচারী[৫০৩]

www.pathagar.com

ছাড় তরী তাড়াতাড়ি (২)
নবিগঞ্জ ইস্টিশনে চল
বেলা ডুবিলো...ওই
ওরে চাইর কালেমা সঙ্গে নিয়া
থাক পন্থের পানে[১০৪] চাইয়া (২)
আল্লাহর নাম মুখেতে জপিয়া...ওই
'হু' আল্লাহু আল্লা বলে
ছাড় তরী নবীর নামে (২)
পলকে তোমায় পার করিল...ওই
পাঞ্জেগানা পড় ভাই
তা না হলে উপায় নাই (২)
গুরু তোমার সামনেতে রাখিয়া...ওই
গুরু তোমার পারের কড়ি
পার করিবে তাড়াতাড়ি (২)
এই অধম বলে গুরু না ভুলিও...ওই[১৯৭]

দেহতত্ত্ব

'দেহতত্ত্ব' গান বাউল গানের এক অনন্য শাখা। দেহকেন্দ্রিক সাধনার রীতি প্রাচ্যের বহু ধর্ম-দর্শনে খুঁজে পাওয়া যায়। বাউলেরাও তাদের তত্ত্ব দর্শনের ভিতর দিয়ে দেহকেন্দ্রিক সাধনার কথা প্রচার করে থাকে। দেহই সকল সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের কেন্দ্রস্থল এই দেহ। দেহের ভিতরে থাকে আত্মা। আত্মাই পরমাত্মার অধর রূপ। দেহ না থাকলে আত্মার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। দেহ ও আত্মার যোগ সাধনার মাধ্যমেই নিজের ভিতরে খুঁজে পাওয়া যাবে পরমাত্মার স্বরূপ। বাউলেরা তাই তাদের সাধনায় দেহকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে থাকে। এই দেহ নারী ও পরুষের যুগল দেহ। বাউলদের বিশ্বাস নারী-পুরুষের যুগল দেহ সাধনার ভিতরেই স্রষ্টার স্বরূপ এবং রহস্য নিহিত রয়েছে।

নিজ দেহের পাশাপাশি তাই নারীদেহের মিথুনাত্মক সাধনার প্রতিও বাউলদের রয়েছে সমান গুরুত্ব। নারী-পুরুষের মিলনেই জগতে মানব সৃষ্টি। আর সৃষ্টির সাথে রয়েছে স্রষ্টার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। সৃষ্টির রহস্য ও স্রষ্টার স্বরূপ ভেদ জানতে হলে দেহের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে। দেহের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে 'ভবনদী' পার হতে হবে। দেহকেন্দ্রিক সাধনার দ্বারা 'ভবনদী' পার হয়ে পরম স্রষ্টার দর্শন পেতে চাইলে গুরুর নিকট থেকে তত্ত্ব ও দেহ সাধনার পদ্ধতি জেনে নিতে হবে। নর-নারীর মিথুনাত্মক সাধন প্রক্রিয়ায় শুক্র ক্ষয় ব্যতিরেকে যদি কেউ দেহকেন্দ্রিক সাধনায় উত্তীর্ণ হতে পারে তবে তার দ্বারা সহজে 'ভবনদী' পার হওয়া সম্ভব।

১.

সাধক মতে শুক্রপাতের ফলে দেহ দ্রুত জীর্ণ হয়। রিপু তাড়িত হয়ে মানুষ যাবতীয় অন্যায় করে। কিন্তু এই সমূহ দেহ হতে আস্তে আস্তে বিদায় নেয়। তখন সমস্ত অন্যায় কর্মের দায়ভার পড়ে মানুষের ওপর। মানুষের এই অসহায় অবস্থায় মুর্শিদই ভরসা।

www.pathagar.com

বসে বসে চিন্তা গো করি
আমি কি দিয়া চালাব তরী রে ॥
তরীতে মোর বুঝাই সোনা
সমুদ্রের পানি নোনা রে
নোনায় সোনা খাইয়া দিল
পারি আমার জমলো নারে ॥
এই মধ্যের গাঙ্গে নৌকা থুইয়া[৫০৫]
দেহের মাল্লা ছয়জন[৫০৬] যায় পালাইয়া
আমার কপাল যদি হইত রে ভাল
আমায় ফেলে যাইত নারে ॥
তরী ডুবে যায় তরী ডুবে যায় রে
আমার মুর্শিদ এসে হও কান্ডারি
আমার ভাঙ্গা নায়ের মাঝি হইও রে
তরী ডুবে যায় তরী ডুবে যায় রে।
আমার রসুল এসে হও কান্ডারি
তরী ডুবে যায় তরী ডুবে যায় রে ॥[১৯৮]

২.

বাউল মতে- যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহ ভাণ্ডে। দেহ-ই সকল সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। নিজ দেহের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেই তবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হবে। বাউল তাই নিজ দেহের সাধন দ্বারাই পরমকে পেতে চায়। এ গানে সে তত্ত্বই ফুটে উঠেছে।

ভেদ রয়েছে গোপনে, ভেদ রয়েছে গোপনে
মানব দেহে চইদ্দ ভুবন হিসাব কর মনে মনে ॥
পদতলে তল ভুবন, পায়ের ঊর্ধ্বে কিতল ভুবন
জাণুতে সুতল ভুবন আগে লইও চিনে
জঙ্ঘাতে তলাতল ভুবন বলে জ্ঞানী জনে...
উরুতে রসাতল ভুবন দেখতে পারবে জ্ঞান নয়নে ॥
মহাতল ভুবন মূলাধারে, কটিতে পাতাল ভুবন ধরে
নাভিতে ভূলোক ভুবন দমের চাবি টানে
পেটের মাঝে ভবলোক ভুবন খেলা হয় সেখানে
হৃদয়ে সুলোক ভুবন প্রেমের মানুষ সে নিজনে ॥
সত্যলোক ভুবন তালুর, ক্ষুদ মহাজন খেলা করে
কপালে তপলোক ভুবন অর্ধ্বচন্দ্র ধরে
সাধু মহৎ চিনতে পারে ধ্যান আকর্ষণে
কণ্ঠে মহালোক ভুবনে কথা যোগায় মনমোহনে ॥
জনলোক ভুবন জ্ঞানের থলি তথায় গুরুর আসন বলি
মূলের ঘরে ভাবের কলি দেখিবে সন্ধানে

www.pathagar.com

নিজেকে নিজ লও চিনিয়া প্রাণ থাকতে জীবনে
হালিম বলে রওশন আলী সদয় থেকো স্বরূপ ধ্যানে ॥[১৯৯]

৩.

মিথুনাত্মক সাধনার দ্বারা বাউল ভবপার হতে চায়। সে সাধনায় বাউল সজাগ। রতিক্রিয়া সাধন করেও বাউল অটলত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সচেতন। সে জানে শুক্র ক্ষয় হলে তাকে জন্মচক্রে পড়তে হবে। বাউল জন্মচক্রের কবল থেকে রেহাই পেতে চায়। এ গানে শিষ্য তার গুরুর নিকট সে বিষয়েই জানতে চায়।

অকূল নদী কেমুনে দিব পাড়ি
আমি ভেবে মরি
ভীষম নদীর ঢেউয়ের চোটে
নানা রকম বাইদ্য উঠে
কাণ্ড দেখে প্রাণ কাপে শিহরি ॥

মরা গাঙ্গে মাসে মাসে
হঠাৎ করে জোয়ার আসে
ঘাটে আছে কামিনী এক বুড়ি
উতাল পাতাল ঢেউ তুলিয়া
শুনি দেয় নাও ডুবাইয়া
অসময়ে কে হবে কাণ্ডারি ॥
নদীর জলে চান করিতে
যাব আমি কোনো ঘাটেতে
সেখানে কয়টি হলো সিঁড়ি
নদীর কূলে কুম্ভীর থাকে
সাঁতার খেলে পাঁকে পাঁকে
ঘোর বিপাকে উপায় কি যে করি ॥
নোনা গাঙ্গে বাইচ খেলাইয়া
দাদা দিছে নাও ডুবাইয়া
অন হারাইয়া করছে আহাজারি
হালিম বলে ওস্তাদ কবি
তোমার কাছে রইল দাবী
রক্ষা হবে কেমনে আমার তরী ॥[২০০]

৪.

রতি সাধনায় শিষ্য যাতে অটলত্ব নষ্ট না করে গুরু তাই সতর্ক করে দিচ্ছে। যৌবনের উন্মাদনায় শুক্র ক্ষয় হয়ে অটলত্ব নাশ করতে পারে। এ রকম হলে শিষ্য যেন মৈথুন কাজে বিরতি দেয়। দিন ক্ষণ দেখে রতি সাধন করতে পারলে জন্ম চক্রের অভিশাপ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

মাঝি নাও চালাও সাবধানে
মাঝি নাও চালাও সাবধানে

www.pathagar.com

ভরা নদীর বাঁকে বাঁকে
নৌকা বেয়ে যাও উজানে ॥
দেখলে গাঙে ঢেউয়ের চিন
কামের জ্বালা কইরো বিলীন
নোঙর ফেলে থাইকো ঐদিন
নিরিখ ধরে ধ্যানে
বৎসরে ছত্রিশ দিন
খেয়াল রাইখো মনে
ত্রিবেণীতে তিন মহাজন
মিলন হয়ে রয় একখানে ॥
আসিলে কুম্ভীরের পাল
শক্ত করে ধইরো হাল
জোয়ার ভাঁটার বুঝিয়া তাল
বৈঠা বাও সন্ধানে
অটলে রাখিতে মাল
পাকা হও সাধনে
দেহের রতি আসল মতি
হারাস না কেউ এ জীবনে ॥
রাগিনী, কামিনী, মধুমিতা, রাক্ষসিনী
সোহাগিনী, মায়াবিনী, নাগিনী
সেখানে বুড়ী একটা কাল সাপিনী
সাত সিঁড়ির মাঝখানে
গুরু বলে ওরে বেহুশ
বৈঠা মার সাধন জেনে ॥[২০১]

৫.

যৌবনে নারীর সৌন্দর্য পুরুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। এ সময় বেশি উত্তেজিত হলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অটল অবস্থায় নারীর সঙ্গে রতি সাধনা করতে হয়। তা না হলে জন্মচক্রে পড়তে হবে। যা বাউল সাধনায় আদৌ কাম্য নয়।

নারীর গাছে ফুটেছে ফুল
ভোমরা পোকা হয় আকুল
প্রাণ ভোমরা মধু নিতে হয় ব্যাকুল ॥
বিশ্ব বাগান নারী দিয়া
রাখছে দেখ সাজাইয়া
দেখলে অবাক যাবে হইয়া
কিছু নাই তার সমতুল ॥
বাউল সাধক গুরু যত
চলে গেছে শত শত

www.pathagar.com

নারীর ধনে ধনী কত
হইয়াছে ঐ সাধককুল ॥
আদ্যশক্তি ভক্তির গুণে
মানিক মুক্তা লইছে চিনে
সন্ধানে ফুল বাগানে ঘুরছে
কত সাধককূল ॥
ধন মিলে না সাধন বিনে
শুদ্ধ পুরুষ হও ভূবনে
হালিম বাদশার এই জীবনে
ভাঙ্গিল না মনের ভুল ॥[২০২]

৬.

এখানে তাস খেলার রূপকে সাধনার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাস খেলাতে রঙের 'ম্যারিজ' হলে অর্থাৎ সাহেব (পুরুষ) ও বিবি (নারী)'র মিল হলে বত্রিশ ফোঁটা মিল হয়। তখন খেলায় সাধারণত জয়লাভ হয়। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের সম্মিলিত সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। নারী ব্যতীত বাউল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।

ওরে চমৎকার বায়ান্ন বাজার
বায়ান্ন তাসেরই খেলা,
চার রঙ্গে করেছে তৈয়ার
ভব রঙ্গ মঞ্চ মাজার। (২)
চার আটে বত্রিশ তাসে রং খেলায় কুতুব চারজন
ওরে রহিতন আর হরতন রিস্কা আর চিরাতন
খেলছে খেলা আটাশ ফোটায়
রঙ্গে যদি মেরাজ দেখায়
চার আটে বত্রিশ মিল হইয়া যায়
সাহেব বিবির জোড় আছে যার।
ভব রঙ্গ মঞ্চ মাজার। (২)
এক ফোটাতে এক নিরঞ্জন, দুই ফোটায় সঙ্গে নবী
ওরে তিন ফোটাতে আদম ছবি, চার ফোটায় হাওয়া বিবি,
পাঁচ ফোটায় পাঁচ পাঞ্জাতনে
ছয় ফোটায় ছয় রিপু ছয়জনে (২)
ধ্যানেতে বাস করে এইবার।
ভব রঙ্গ মঞ্চ মাজার। (২)
ওরে সাত ফোটাতে সাত দোজখের দরজা বন্ধ করতে হয়
আট ফোটাতে আট বেহেশতের দরজা খুলিতে হয়
নববিধি ভক্তি বলে নয় ফোটা রাখে দখলে (২)
দশ ইন্দ্রীয় জয় হইলে দেওয়ান কয় তার ভাবনা নাই।

www.pathagar.com

ভব রঙ্গ মঞ্চ মাজার। (২)
ওরে চমৎকার বায়ান্ন বাজার বায়ান্ন তাসেরই খেলা,
চার রঙ্গে করেছে তৈয়ার।
ভব রঙ্গ মঞ্চ মাজার। (২)[২০৩]

৭.

প্রত্যেক মানুষ তার নিজ হাতের সাড়ে তিন হাত লম্বা। এই দেহতরীতে ছয় রিপু চড়নদার হিসাবে অবস্থান করে। বাউল মনে করে রিপুর ভুলে পড়ে জন্মদ্বারে শুক্র ক্ষয় করা যাবে না।

এ ভব সংসারে প্রেমেরই নহরে
বাওরে ভাই মানব তরি মনে আশা যার ॥
সাড়ে তিন হাত লম্বা তরি
ষোলজন তার কাণ্ডারী
আটজন তার দ্বার প্রহরী
ছয়জন চড়নদার
ধীরে ধীরে বাইও তরি বেলা আছে দণ্ড চারি
অনায়াসে দিবি পাড়ি ধরিলে কাণ্ডার ॥
বেপার করিতে গেলে
মাল ভর ভাই মনিপুরে।
থাইক নদীর দক্ষিণ ধারে করিতে বেপার ॥
সাবধানে সাবধানে বলি
হাতে রাইখ টাকার থলি
এই বাজারের মানুষ গুলি
ঠকেরই কারবার ॥[২০৪]

৮.

দেহের কাম, ক্ষুধা ও প্রেমের তাড়নায় মানুষ দিশেহারা। এদের সামাল দেওয়া কঠিন। এদের সাথে রঙ্গরস করতেই মানুষের সময় চলে যায়। ফলে মানুষের ভজন সাধনের সময় হয় না।

দেহের আরাম করছে হারাম
তিন দেশের তিন পাগলে।
বান্ধা কাম, ক্ষুধা, প্রেম নামের শিকলে।।
ক্ষণিক পর পর রাক্ষসের বেশে।
ক্ষুধার জ্বালা-মারে ঠেলা
আমি হারা হই দিশে।।
আমি এই দোজখ নিভাব কিসে
সকলি যায় বিফলে।। ঐ
দুপুর বেলা প্রখর হয় কিরণ।

www.pathagar.com

সবকিছু বিনাশ করতে চায় মানে না বারণ ॥
(তখন) ক্ষুধার চেয়ে কামান্ধমন
কাম খোঁজে বিলে-ঝিলে ॥ ঐ
প্রভু প্রেমে মগ্ন হলে মন।
ক্ষুধার জ্বালা কামের গন্ধ হয়ে যায় বারণ ॥
(তখন) পাইতে প্রভুর দরশন
যেতে চায় দেহ ফেলে ॥ঐ
একটি পাখি একটি বাসা।
তাতে তিন পাগলের রং তামাশা
পাখি ছাড়বে এ বাসা ॥
ভেঙ্গে যাবে সকল আশা
ভাবে নাই তোফাজ্জলে ॥[২০৫]

৯.

বসন্ত বাতাসের ফুল ঝরে নতুন গাছতলে।
আরে সাধু বিনে পায়না মধু
তারাই খাইয়া ফুল তুলে।
বসন্ত বাতাসের ফুল ঝরে নতুন গাছতলে।
ডালে যে দিন ধরবে কলি
মন রঙ্গে আসবে অলি
ছেড়ে কলম কাগজ কালি (২)
বসিতে হয় নিরলে।
পাইছে মাল্যধন সাধনারই পরশ রতন
বাক্যসিদ্ধি গুরুর চরণ (২)
পাইতে পার লাভে মূলে
বসন্ত বাতাসের ফুল ঝরে নতুন গাছতলে।
সে ফুলের মালিক নামে হযরত আলী
ফুলের মালিরা তারে পাহেরা দিতাছে
কি সুন্দর একটা ফুল ফুইটাছেরে (২)
হায় রে হায় যে দিন ফুলডা ফুটে
তিনদিন গন্ধ থাকে
নিজে খোদা ভ্রমর হইয়া মধু খাইতাছে
আছে মায়া সূতার বেড়া, চতুর্দিকে খাড়া
মা ফাতেমা গাছে জল ঢালতাছে
কি সুন্দর একটা ফুল ফুইটাছে
সেই ফুলের মালিক নামে হজরত আলী
ফুলের মালিরা তারে পাহেরা দিতাছে
কি সুন্দর একটা ফুল ফুইটাছেরে ॥ (২)[২০৬]

www.pathagar.com

১০.

মন ঠিক না থাকলে সাধন হয় না। গুরুর কাছে সাধন শিক্ষা নিয়ে মনকে বাধ্য করতে হয়। মন বাধ্য থাকলে মানুষের সাধন ভজন হয়। জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর দীদার লাভ করা যায়।

আগে মনের মানুষ ধর
যারে দিয়া পয়দা হইলা,
তারে কেন ছাড় (২)
মনে তোমার খোশাল্লাদি[৫০৭]
ছেড়ে দেওগা সারা রাতি (২)
গুরু সদয় তোমার প্রতি,
যদি বিপদে পড়...(ওই)

মনের সঙ্গে ইষ্টি করিয়া,
মনকে আপন কর (২)
গুরুর পায়ে রাখলে ভক্তি,
হইয়া যাবি ভবপার...(ওই)

মন অইল পিঞ্জিয়ার পাখি
কেউ তারে দিও না ফাঁকি (২)
প্রেমানন্দে ডাকা ডাকি,
হৃদ মাজারে[৫০৮] ভর...(ওই)

আল্লাহর নামে টান মারিয়া
'হু'তে ফানা কর,
ফানাফিল্লার দেশে গিয়া,
ভবের মরা মর (২)
নিজে ধর মনের মানুষ ধর...(ওই)

এই অধম ভেবে বলে
মুনের মানুষ কাকে বলে,
তোমার সিনার বাম ধারে,
একটু তালাশ কর (২)
নূরে মোহাম্মদী কলব তারে,
আগে বন্ধ কর...(ওই)

ফুঁটবে তোমার জ্ঞানের কলি,
নিজ রূপ ধ্যান কর (২)
আগে মনের মানুষটা ধর...(ওই)[২০৭]

১১.

এই দেহতত্ত্ব গানে সাধনার কথা রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। সাধকের জীবন তো সমাজের কাছে কলঙ্কময়।

www.pathagar.com

নতুন গাছে লাউ ধরেছে
লাউতো বড় সোহাগী
আমার লাউয়ের পিছে
লাগছে বৈরাগী।।(২)
বৈরাগীকে বল্লাম আমি
কুলের মুখে দিয় না কালি
তার মাথায় জটা হাতে নোটা
কপালে তিলকের ফোঁটা
আবার গাঁও গেরামে ঘুরে বেটা
সাজিয়ে ব্রহ্মচারি।। (২)
আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখলাম
চোরে নিবার ডরে
কেমন করে পড়ল সে লাউ
বৈরাগীর নজরে।
আবার হরন করে নিতে চায় সে লাউ
বানাইতে ডুগডুগি।। (২)
এই লাউয়েতে হয় না একতারা
মনরে হয় না দোতারা
গিটারের সুর করিয়ে বানায় একতারা
সাধক নাহেজ বলে এ লাউয়ের জন্য
কতজন হয় ঘর ত্যাগি।। (২)[২০৮]

গুরুতত্ত্ব

ভারতীয় ধর্ম দর্শনে গুরুবাদী ধারণা অতি প্রাচীন একটি রীতি। প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম সাধনায় গুরুবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাউল দর্শন ও সাধনায় গুরুবাদ এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। গুরু শিষ্যকে সাধন ভজনের সঠিক পথ নির্দেশ করে। এখানে গুরু হচ্ছে 'ভবনদী' পার হওয়ার একমাত্র কাণ্ডারি। গুরুর দয়ায় শিষ্য ভবনদী পার হয়ে পরম গুরুর নৈকট্য লাভ করতে পারবে। তাই শিষ্যের নিকট গুরু অমূল্য ধন। গুরু হচ্ছে শিষ্যের পরম আশ্রয়স্থল। বাউল সাধনায় গুরু শিষ্যের মধ্যে হয় পাপ পুণ্যের কেনা-বেচা। গুরু শিষ্যের সমস্ত পাপ বা বদ স্বভাব গ্রহণ করে শিষ্যকে দেন পুণ্যময় জীবনের সন্ধান। যার দ্বারা শিষ্য বিগত জীবনের গ্লানিমুক্ত হয়ে সন্ধান পায় পরম গুরুকে লাভের সঠিক পথ।

১.

গুরুর ভজন সাধন অত্যন্ত কঠিন। গুরুরূপ ধ্যান করা সাধনার অঙ্গ। কামের পিছনে ঘুরলে প্রেম সাধন হয় না। স্রষ্টার সান্নিধ্য পেতে হলে তো প্রেম সাধন দরকার।

গোসাঁই করণ ভীষণ গো ভজন
ভজন যে কইরাছে সেই জানে
করণ যে কইরাছে সেই জানে ॥

www.pathagar.com

গোসাঁইর অনুরাগী যারা
নিরিখ ধইরা আছে তারা
তারা সদাই দেয় রূপের পাহারা
তাদের তিলেক[২০৯] নাই দুই নয়নে ॥
কাম নদীতে যার বাসনা
তার হবে না রূপা গো সোনা
ওরে কাম থাকিতে প্রেম হবে না
তোমরা ভজ গুরু চরণে ॥[২০৯]

২.

যে গুরুর নির্দেশিত পথে সাধন ভজন করে তার সাফল্য অনিবার্য। সরলভাবে গুরু শরণাপন্ন হলে গুরু তাকে উদ্ধার করে। সাধনার ক্ষেত্রে মিথ্যা বা ফাঁকির জায়গা নেই।

গুরুর ভাব লইয়া যেজন
বইসা আছে গো সরল হয়ে।
ও তার চিন্তা নাই কোনোই কালে গো
ও তার ভাবনা নাই কোনো কালে ॥
জলে স্থলে অগ্নি গো জ্বলে
বিপদ নাই তার কোনোই কালে ॥
পাখি করে বৃক্ষের আশা গো
বাদুরে ডাল ধরে ঝুলে।

ও তুই ডাল ছাড়িলে যাবি গো মারা
না ছাড়িলে যাবি গো তরে ॥

মায়ে করে পুত্রের দরদ গো
অধমও বালক কালে
যেমন গুরু করে শিষ্যের দয়া
মনেতে মন মিশাইতে পারলে ॥
আয়না দিয়া মুখ দেখা যায়
পারদ নষ্ট না হইলে
যেমন গুরুর ছবি দেখা যায় রে
নয়ন দুইটা ঠিক রাখিলে ॥
তিলক চন্দন মালা দিলে
সাধু হয় না কোনো কালে
মনের ময়লা দূর না হইলে
কাষ্ঠের মালায় কি কাজ করে ॥

৩.

সিদ্ধ সাধক পুরুষের নিকট দীক্ষা লাভ কর। মাতা-পিতা হলো মানুষের প্রথম গুরু। রিপু আর ইন্দ্রিয় বশীভূত করে কুম্ভক সাধনা কর। কুম্ভক সাধনা করলে শুক্র স্খলিত হয়ে জীব উৎপন্ন হবে না।

www.pathagar.com

মানুষ যে চিনাছে তারে ধর[৫১০]
ধর মানুষ ঠিক করিয়া ধর।
মাতা গুরু পিতা গুরু
এই দুইজনকে বাধ্য কর
মায়ের চরণ হৃদে রাইখে
ঐ চরণ সাধনা কর ॥
দশে ছয়ে ষোলজনা[৫১১]
ঐ কয়জনকে বাধ্য কর
ওরে দুমের ঘরে চাবি দিয়া[৫১২]
ঐ চরণ সাধনা কর ॥
সমুদ্রে তুফান ভারী[৫১৩]
কিনারায় নাও চাইপা ধর
গুরুর নামে বাদাম দিয়া
হাইলের শলা আইটা ধর[৫১৪]।[২১০]

৪.

গুরুর প্রেমে পড়লে জগতের কোনো বন্ধনই আটকাতে পারে না। মায়ার বন্ধন ছিন্ন করতে পারলেই জগত ভক্তের নিকট গুরুময় হয়।

গুরুর রূপ সাগরে
ডুবল রে দুই নয়ন তারা
হাত বান্ধিবি পাও বান্ধিবি
মন বানতে কি পারবি তোরা ॥
গুরু আমার সাধনার ধন
তারে না দেখলে বাঁচে না জীবন
কে আছিস গো আত্মীয় স্বজন
গুরু এনে দেখাও গো তোরা ॥
গুরু আমার নামের হরি
হাতে লয়ে হিরাছরি
কাটবে বলে মায়ার দড়ি
সামনে আছে গুরু গো খাড়া ॥[২১১]

৫.

এই গানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আল্লাহকে পেতে হলে পিরের প্রয়োজন আছে কী? বায়েত পড়লে ভক্তের কী লাভ? আর বায়েত না পড়লে কী অসুবিধা হবে সে কথা ভক্ত পিরের নিকট জানতে চেয়েছে।

কোন কারণে ভজব দয়াল তোমারে।
আল্লাকে সিজদা করিলে পিরের কি দরকার পড়ে ॥
তুমি আমি সবাই ইনছান
হাওয়া আর আদমের সন্তান।

www.pathagar.com

(তবে) কোনো জাগায় তোমার অবস্থান
জানাও তোমার ভক্তেরে ॥
যে জনা বায়েত পড়ে নাই
তাদের কিবা হবে উপায় (২)
বায়েত না পড়িলে কি হয়
কি লাভ হয় বায়েত পড়ে ॥
কোন অবতার রূপটি ধরে
এসেছ ভক্তের বাজারে।
গুরু ভক্তের রূপ সাগরে
কোনোজনা কোনো রূপ ধরে ॥
তোফাজ্জল কয় চরণ ধরে
কি উপায় শেষ বিচারে (২)
কেমনে তরাইবা ভক্তেরে (দয়াল)
পার হইবা কি প্রকারে ॥[২১২]

প্রেমতত্ত্ব বা বিচ্ছেদ

'প্রেমতত্ত্ব' নামে বাউলগানের একটি শাখা রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় তাকে বিচ্ছেদ গান হিসেবেও গণ্য করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছেদের ভিতরে নর-নারীর মানবিক প্রেম ঘটিত দুঃখবোধকে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু বাউল সাধনায় প্রেমতত্ত্ব বা বিচ্ছেদ গানগুলো ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এ গানে যে প্রেম বা বিচ্ছেদ রূপায়িত হতে দেখা যায় তা মূলত নর-নারীর কামজ প্রেম বা বিরহের আর্তি নয়। এ প্রেম বা বিরহ পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার মিলনের আকুতি। জীবাত্মা চিরকাল তার পরম আরাধ্যকে কাছে পেতে চায়। তার সন্ধান না পেয়ে সারাজীবন খুঁজে মরে। এই যুগ যুগান্তের মিলন পিপাসু বিরহী আত্মার ব্যাকুলতাই প্রেমতত্ত্ব বা বিচ্ছেদ গানগুলোর ভাববস্তু। বাউলেরা এই অতীন্দ্রিয় প্রেমে বিভোর হয়ে বিচ্ছেদের অনলে পুঁড়ে পুঁড়ে পরম প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করে। বাউলদের প্রেমতত্ত্ব বা বিচ্ছেদ গানে দেহজ কামনা বা রূপজ মোহ সক্রিয় নয়। তাদের বিচ্ছেদ বেদনায় প্রকাশ পায় ভক্তি রসের নিবেদন। এ প্রেমের উৎস বাউলের আত্মভূমি। দেহাতীত ও অতীন্দ্রিয় প্রেম সাধনার দ্বারা বাউলেরা ধরতে চায় অধর মানুষ বা মনের মানুষকে। মনের মানুষের সন্ধান একবার পেলে মানব জীবন হবে ধন্য। তাই মনের মানুষের জন্যে বাউলের অন্তরের বিচ্ছেদ বেদনা অনন্তকালের।

১.

নারীপুরুষের যুগল দেহের আনন্দের মাঝেই বিরাজ করে অধর মানুষ। নিজের দেহকে চিনতে পারলেই অচিন মানুষের দেখা পাওয়া যাবে। সাধন ভজনের দ্বারা ভাব ভক্তির বন্ধনে তাকে বেঁধে রাখতে হবে। যার মনে ভাব নেই সে কোনোদিন মনের মানুষের সন্ধান পায় না।

আছে মানুষ আনন্দের বাজারে।
নিরিখ রাখ নিগুম ঘরে
মানুষ আছে গো।

www.pathagar.com

আছে মানুষ বর্তমান
নয় দরজায় পাইতা ফান ॥
চীন শহরে যাও
মানুষ যদি চিনবার চাও
আছে মানুষ চীনের শহরে ॥
রঙ্গে রঙ্গে রঙ মিশাইয়া
ভাব ভক্তির তার লাগাইয়া
বাইন্ধা রাইখো তারে ॥
গাছের আগে নারকোলের ফল
পাতিল বিনে থাকে গো জল
টলমল করে তার ভিতরে ॥
যে জন প্রেমের ভাও[৫১৫] বোঝেনা
তার সঙ্গে প্রেম কইরো না
অনরসিকে[৫১৬] ছোলকা[৫১৭] চুইষা মরে ॥[২১৩]

২.

সুখের আশায় প্রেম করে দুঃখ হয়েছে নিত্য সঙ্গী। নারী তার বন্ধুর বিরহে কাতর। প্রেম করতে গিয়ে কুল মান হারিয়ে কলঙ্কের ডালা মাথায় তুলে নিয়েছে। কিন্তু বন্ধু রয়েছে দূরদেশে। বিরহী নারী পাখির কাছে জানতে চেয়েছে বন্ধুর খবর। যৌবন থাকতে যদি বন্ধুকে না পায় তবে আর বেঁচে থেকে কী লাভ।

কে কয় পিরিত ভালা গো
তার সমান আর নাই জ্বালা ॥
হাতে তুলে মাথে নইলাম[৫১৮]
কলঙ্কেরও ডালা গো ॥
উচ্চ ডালে থাকো পাখি নজর বহুদূর
তুমি নি জানো পাখি
আমার প্রাণ বন্ধুর খবর ॥
যৌবন কালের যৌবন মিষ্টি
যেমন সবরী কলা গো
যৌবনও ফুরাইয়া গেলে
মরণ আমার ভালা গো ॥[২১৪]

৩.

নারী পরম পুরুষের আকর্ষণে সংসারে মন বসাতে পারে না। সংসারের কাজে মন দিলে কালা সময় অসময় না বুঝে ডাক দেয়। নারী না পারে সইতে না পারে ঘরে থাকতে। সংসারের সকল কাজ ফেলে তার পরম বন্ধুর পথের পানে চেয়ে থাকে। বন্ধু যদি পরজন্মে নারী হয়ে জন্ম নেয় তবেই বুঝবে নারীর মনের কী বেদনা।

কালার বাঁশির সুরে মন উদাসী
আমি ঘরে রইতে পারি না ॥

www.pathagar.com

বাজাইয়া বাঁশের বাঁশি
মন কইরাছে উদাসী।
কালা যখন বাজায় বাঁশি
আমি তখন রানতে[২১৯] বসি
রান্দা-বাড়া বারণ রেখে
দরজায় দাঁড়াই আসি ॥
এইবার কালা পুরুষ হইবো
তোরে আমি নারী সাজাবো
নারী হইলে বুঝবি রে কালা
নারীর কিবা বেদনা ॥[২১৫]

৪.

বন্ধুর বিরহে নারীর হৃদয় ব্যাকুল। অন্তরে বিচ্ছেদের আগুন জ্বলছে। বন্ধু কাছে নেই; কার কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করবে। আগে যদি জানত প্রেমে এত জ্বালা তাহলে বন্ধুকে মন দিত না। পাড়া-পড়শি নানা অপবাদ দিচ্ছে। কিন্তু কী হবে তাতে। বন্ধুর প্রেমের সাধ যে তার আজও পূর্ণ হয়নি। নারীর তাই আর ঘর বাড়ি ভালো লাগে না।

মনের দুঃখ মনে লইয়া গো
দেশে দেশে ঘুরি
অন্তরে অনন্ত জ্বালা
কেমনে প্রকাশ করি ॥
কার কাছে শুধাবো আমি
মনের দুটি কথা
বন্ধু বিনে কে বুঝিবে
আমার মর্ম ব্যথা
প্রেমানলে জ্বলছে চিতা
জ্বইলা পুইড়া মরি ॥
আগে যদি জানতাম আমি
প্রেমের এত জ্বালা
তাইলে কি আর বদল করতাম
বিনা সুতার মালা
প্রেমের বিষে অঙ্গ কালা
উপায় কি যে করি ॥
পাড়া পড়শি দেখলে আমায়
দেয় গো অপবাদ
তবু তো মিটলো না সই গো
শ্যাম পিরিতের সাধ
প্রেম করিয়া ঘটলো বিপদ
মনে লয় ছাড়ি ঘর-বাড়ি ॥[২১৬]

www.pathagar.com

৫.

প্রেম কোনো কালেই সুখের হয় না। যথার্থ প্রেম না হলে শুধু সমাজের গঞ্জনা সহ্য করতে হয়।

প্রেম করা সুখ হইল না
প্রেমিক না হইলে।
রসগোল্লার স্বাদ কিরে পাইবা
চিড়া গুড় খাইলে ॥
কিনচিত[520] মধু খাইবার আশে
হাত দিও না বল্লার চাইকে
যাইবা শুধু পাইবা না মধু
আসিবে ফিরে।
প্রেমিক না হইলে ॥[217]

৬.

প্রেমের অবস্থান সমস্ত স্বার্থের উর্ধ্বে। একমাত্র প্রেমিকই প্রেমের স্বরূপ বুঝতে পারে।

পিরিতের মর্ম ভারী বলিহারী
যে করছে প্রেম সেই জানে
আর সাঁই জানে ॥
লায় লাহা ইল্লেললাহু
মোহাম্মদ রাসূল হইতে প্রেম হইল শুরু।
নবি ভক্ত ছিলো উম্মে হানি
নবির জন্য কেঁদে কেঁদে পোহায় রজনী।
নবি মুছাইয়া দেয় চোখের পানি
ভক্তি জানায় তখনি ॥
লায়লি মজনু স্কুলেতে যায়
মাস্টার এসে লেখতে দিল মজনুরও খাতায়।
খাতা দেইখা মাস্টার বেত মারিল
লাগে লাইলীর চাঁদ বদনে ॥
রামের ভক্ত ছিলো হনুমান
হৃদয় মাঝে ছাপা রাখছে রামের ছবি খান।
ও তাই বুক ছিড়িয়া দেখায় প্রমাণ
রামের ছবি সেখানে ॥
নবির ভক্ত ছিলো ওয়াজকরণি
নবির দন্ত শহীদ হইলে খবর পান তিনি।
খবর পাইয়া ওয়াজকরণি গো
ও তাঁর সব দন্ত উঠায় তখনি ॥[218]

www.pathagar.com

৭.

রাসুলের এশ্‌কে দেওয়ানা হলে তার ঘরে থাকা দায়। প্রেমিকের রূপ মনে পড়লে সকল বন্ধন আলগা হয়। সে তখন প্রেমিককের সান্নিধ্য পাবার জন্য ছুটে যায়।

আরে কালা আমায় পাগলও বানাইল রে
ঘরে রই কেমনে,
রাসূল আমায় দেওয়ানা বানাইল রে
ঘরে রই কেমনে ॥
ওরে কালা কালা বলে সবাই রে
কালা গলার হার
আমার আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি
আমার কালা কাঞ্চা সোনা রে ॥
কালা কালা বলে সবে রে
আর ভাসি নয়ন জলে
ওগো কালার ঐরূপ দেখি
আমার যখন পরে মনে রে ॥
ওগো সুরধ্বনির ঘাটে যাইয়া রে
আমি দেখলাম রূপের ছবি
তোরা একা একা যাইস না ঘাটে
আমার মতন হবি রে ॥[২১৯]

৮.

কালা (প্রেমিক) দেখা দিয়ে মনের জ্বালা নিবারণ কর। তোমাকে পাবার আশায় সকলই করলাম। তোমার প্রেমানলে অঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আমায় শান্ত করলা নারে কালা
কালা জ্বালাইয়া দিলা প্রেমেরই আগুন
নিভাইয়া দিলা নারে কালা ॥
তোমারে পাইবার আশে
আমি ঝাপ দিলাম যমুনার গো জলে
ওগো যমুনার জলে সাঁতার খেলি
কিনার পাইলাম নারে কালা ॥
তোমার প্রেমে যে মইজাছে
তার কি পোড়ার বাকি গো আছে
ও পাপী জ্বলবে দুযখের[৫২১] আগুনে
তাপি জ্বলবে নারে কালা ॥[২২০]

৯.

প্রেমিকার রূপের মতো জগতে কোনো রূপ নেই। প্রেমিকের রূপ মনে পড়লে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম ফেলে মন তাঁর সান্নিধ্যে যেতে চায়। প্রেমের পথে গেলে সাধক আর সংসারে ফিরে না।

www.pathagar.com

ও কালার কথা মনে গো হইলে
হারে মনে বলে
কোলের ছাইলা[২২২] আমি দেই জলে ফেলে ॥
ওগো কোলের ছাইলা জলে ফেলে
ধরি কালার চরণে
কালার পিরিতের দাগ আমার
লাইগাছে গলে ॥
জনম ভরা খাওয়াইলাম যারে
ওরে সেও হইল না সঙ্গের সাথি
আমার এই নিধান কালে।
আমার মনে বলে ঐ মানুষটার
সঙ্গ ধরে আমি যাই চলে ॥
হাজার মানুষ বাজারে ঘোরে
খুঁজিতে গেলে সোনার মানুষ
দুই একজন মিলে।
আমার মনে বলে ঐ মানুষটার সঙ্গ ধরে
আমি যাই চলে ॥[২২১]

১০.

প্রেমের শোক বড়ই শক্ত। জয়নাবের প্রেমের শোকে এজিদ হযরত হাসান (রাঃ) কে বিষপানে হত্যা করে। হযরত হাসান ও হযরত হোসেন (রাঃ) এর শোকে পাগল হলো ফাতিমা জননী। উম্মতের শোকে হযরত মুহাম্মদ (সা) দেওয়ানা, স্বামীর শোকে পাগল সখিনা।

এই ভবে আমার মতো পোড়া নাই পোড়া নাই রে
ও পুড়ুক বন্ধুর জ্বালায় রে পুড়ুক
আমি কী পোড়া ডরাই[২২৩]
এই সংসারে আমার মতো পোড়া নাই রে ॥
ওগো জয়নবের শোকে এজিদ পাপি
বন্ধ করল পানি রে
ওগো ইমামের শোকে পাগল হইল
ফাতেমা জননী রে ॥
উম্মতের শোকে পাগল হইল
নবি মোস্তফাও রে
আবার কাশেমের শোকে
পাগল হইল বিবি সখিনাও রে ॥
খোদার দোস্ত ছিলো একজন
দাউদ পেগাম্বর রে

www.pathagar.com

ওগো এক সেজদাতে আঠার পুত্র
শহীদ হইয়া যায়ও রে ॥[২২২]

১১.

ও তোর প্রেমের পূজায় কোনোদিন আমায়
দিবে নিয়া বলী রে বনমালী
ও তুই গরল বলে সরলে বিষ দিলি ॥
ও বন্ধু রে-
আমায় কি দোষে করিলি পর
ভাঙ্গিয়া এ সুখের ঘর, জ্বলন্ত আগুনে অন্তর
পুড়ে হইলো কালি।
যেমন অকুলে তরণী পরে
কাণ্ডারী যার নাই সংসারে
ভাঙ্গলে তারে কেবা দিবে তালি ॥
ও বন্ধু রে-
ওই পাখি যখন শূন্যে উড়ে
জোড়ায় জোড়ায় ভ্রমণ করে
তাই দেখিয়া প্রাণ বিদরে
কইব কারে খুলি ॥
আমার একা ঘরে মন বসে না
এই অভাগিনীর কেউ আসে না
কেউ নিতে চায় না চরণ পাশে তুলি ॥
ও বন্ধু রে-
আমি শয়নে স্বপনে দেখি
দিবানিশি ঝরে আঁখি
কয়দিন রাখি ফোটা কমল কলি।
তাই দুলালী কয় কান্দিয়া
নব বাসর সাজাইয়া
প্রেম শিখাইয়া সায়রে ভাসালি।[২২৩]

১২.

প্রেমও জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে রে
বন্ধু রইতে না আর দেয় ঘরে
কি যাদু করিলি আমারে, আমারে
সোনা বন্ধু রে ॥
ও বন্ধুরে-
তোর লাগাইয়া পীরিতের ডুরি
বধিলি অবলা নারী
হলো জারি কলংক সংসারে।

www.pathagar.com

আমার চিন মানুষ করলে অচিন
যায় ভালো আসে কঠিন
কেবা জাবিন হইবে ভবপারে ॥

ও বন্ধু রে-
করি দিবা নিশি ঐ ভাবনা
গৃহ কাজে মন বসে না
ফুল বিছানা ভাসে আঁখি নীরে।
আমি কোনো কুল হতে কোনো কুলে যাই
এ দুঃখ বা কারে জানাই
বান্ধব নাই বুঝিবে অন্তরে ॥

ও বন্ধু রে-
আমি আর কতো সহিব প্রাণে
পোড়া হিয়া প্রেম আগুনে
বাধ মানে না যৌবন সাগরে।
তাই দুলালী কয় মনও চোরা
জীয়ন্তে হইয়েছি মরা
বন্ধু ছাড়া গৌরব কি সংসারে ॥[২২৪]

১৩.

আর কতকাল থাকবি বৈদেশ গিয়া রে বন্ধু বিনোদিয়া।
পাগলিনী করলি রে তোর পীরিতে মজাইয়া রে বন্ধু বিনোদিয়া ॥
ও বন্ধু রে-
জন্ম হতে আজোবধি, কাঁদাইলে নিরবধি,
আশা নদীর, কূল গেল ভাঙ্গিয়া।
আমি নারী অভাগিনী, কান্দি বসে দিন রজনী,
কলংকিনী হইতাম তোর লাগিয়া রে বন্ধু বিনোদিয়া ॥

ও বন্ধু রে-
এই কি প্রেম পিরিতের খেলা, সহে না বিরহ জ্বালা,
অন্তর কালা করলাম যার লাগিয়া।
ও তুই জ্বালাইয়া প্রেম হুতাশনে, ভুলে রইলি কোনো পরাণে,
গোচারণে সখিগণ লইয়া রে বন্ধু বিনোদিয়া ॥
ও বন্ধু রে-
আজ পাবো কাল পাবো বলে, এই জনম গেল বিফলে,
নয়ন জলে ভাসে অবুঝ হিয়া।
দুলালি কয় সুশীলেরে, একবার দেখা দাও আমারে,
দেখবো তোরে মনের স্বাদ মিটাইয়া রে বন্ধু বিনোদিয়া ॥[২২৫]

www.pathagar.com

১৪.

পাগলও করিলো নিঠুর শ্যাম পীরিতে।
আমার মন বসেনা রে একা ঘরে রইতে ॥
শাশুরী ননদীর জ্বালা সুখ নাই পতি কুলে,
পাড়া প্রতিবেশী যত, মন্দ কয় সকলে,
আমি কার কাছে যাবো, মনের কথা কইতে ॥
নাম ধরিয়া যখন কালা বাজায় নিঠুর বাঁশি,
বুকের মাঝে দুখের অনল জ্বলে দিবা নিশি,
আমি কি করি এখন, পারি না আর সইতে ॥
জলে ভরা দুটি আঁখি পরান কাঁপে ডরে,
কার জন্যে সাজাবো বাসর কয় সুশীল সরকারে,
যদি না আসে ভ্রমর, ফুলের মধু খাইতে ॥[২২৬]

১৫.

বন্ধুর প্রেমের স্মৃতি কখনও ভুলা যায় না। তার কথা চিরদিন মনে থাকে। আগে যদি জানা যেত বন্ধুর প্রেম বিষে ভরা তাহলে প্রেম করতাম না। আমি তার কাছে জীবন কুলমান সপে দিতাম না।

আরে সুখের আশায় প্রেম করিয়া
আমার সুখ হইলো না এক রত্তি
ভোলা যায় না, ভোলা যায় না তোর প্রেমের স্মৃতি
সোনা বন্ধুরে ভোলা যায় না
ভোলা যায় না তোর প্রেমের স্মৃতি ॥
নিষ্ঠুর বন্ধু কঠিন তোর হিয়া
ওরে নিষ্ঠুর বন্ধুরে কঠিন তোর হিয়া
আমারে করিলি পাগল পিরিতি শিখাইয়া
জ্বলে আগুন রইয়া গো রইয়া (২)
জাইনা কর পিরিতি
ভোলা যায়না তোর প্রেমের স্মৃতি
সোনা বন্ধু রে
ভোলা রে যায় না ভোলা যায় না
তোর প্রেমের স্মৃতি।
জানতাম যদি তুই বড় পাষাণ
কিরে জানতাম যদি আমি তুই বড় পাষাণ
হাত করিয়া দান করতাম না দেহ রে কুলমান
আমি হাড়ে হাড়ে টের পাইলাম (২)
বেঈমান হয় মানুষ জাতি।
ভোলা যায় না, ভোলা যায় না
তোর প্রেমের স্মৃতি ॥

www.pathagar.com

চন্দ্র হারা রাত্রি হয় যেমন
তোরে ছাড়া আমি থাকি পাগলের মতন (২)
পতিহারা পোলা যেমন
পতি হারা পোলারে যেমন আমার হয় তেমন গতি
ভোলা যায় না তোর প্রেমের স্মৃতি ॥
পিরিত যে সই বিষেতে ভরা
আরে বন্ধুর পিরিত বিষেতে ভরা
আগে কেন প্রাণ সখি বলিস নাই তোরা
রশিদ বলে প্রেমের মরা (২)
মরলে তো পাইবা শান্তি
ভোলা যায় না তোর প্রেমের স্মৃতি
সোনা বন্ধুরে ভোলা যায় না ভোলা যায় না
তোর প্রেমের স্মৃতি।[২২৭]

১৬.

যৌবনকাল সাধনার উপযুক্ত সময়। যৌবনকাল একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। কাজেই যৌবনকালেই সব সাধনা করা উচিত।

ওরে যারে হারাইছি আমার এই জীবনে
আমি আর কি তারে দেখা পাবো গো মুর্শিদ (২)
ছোটকালে ভালোবাসা ছিলো বাপ-মায়ের কোলে
যৌবন কালে ভালোবাসা গেল খেলার ছলে (২)
আমার সেই কালের ভালোবাসা গো
মুর্শিদ মিশব মাটির সনে রে ॥
ওরে যারে...(ওই)
রাস্তা দিয়া হাইট্টা যাইতে মাজা বাঁকা হয়
পোলাপানে ডাইক্যা বলে বুড়া কি বিচরায় (২)
তখন বুড়া ছাড়ে চোখের পানি রে
ওরে বাবাজান যারে...(ওই)
তোমার মতো যৌবন রে বাপজান ছিলো একদিন
তারে আমি হারাইয়া কান্দি বসে রাত্রি দিন (২)
আর নি আসবে গো বাপজান আমার দিন গেছে ফুরাইয়া
ওরে যারে...(ওই)
নদীর পানি শুকাইয়া গেলে পড়ে বালুচর
আপন মানুষ বুড়া হইলে হইয়া যায় পর (২)
পর কোনোদিন আপন হয় না রে বাপজান
ওরে বাপজান যারে...(ওই)
জৈষ্ঠ্য না আষাঢ় গো মাসে মেঘে ছাপা চাঁন
ওই না দিনে হারাইয়া গেছে আমার ঘরের শ্যাম (২)

www.pathagar.com

আমি আর নি শ্যামের দেখা পাব গো মুর্শিদ
ওরে বাপজান যারে...ওই[২২৮]

১৭.

যার জন্য প্রাণ কান্দে গো আমি তারে পাব কোনো খানে
তোমরা তো বল গো সখি আমার মানে না প্রাণ (২)

আমার হাত বান্দিবা পাও বান্দিবা মন বান্দিবা কেমনে
ওরে কারেন্টের তারের মতন সব সময় আমারে টানে (২)
তোমরা তো বল সখি আমার মানে না..(ওই)

শয়নে স্বপনেতে আমি দেখছিলাম যারে
এখন আমি পাই না তারে আমার আত্মা কেমন করে (২)
তোমরা তো বল গো সখি আমার মানে না প্রাণ (ওই)

উড়ে যারে প্রাণের পাখি দুই পাখায় ভর করে
কোথায় আছ প্রাণ বন্ধুয়া শীঘ্র দেখা দেও আমারে (২)
তোমরা তো বল গো সখি আমার মানে না প্রাণ...(ওই))

এই অধম বলে মনের পাখি আছেরে তোমার ঘরে
তুমি আল্লার নামে টান মারিয়া হুতে ধর তারে (২)
তোমরা তো বল গো সখি মানে না আমার প্রাণ...(ওই)[২২৯]

১৮.

সৃষ্টির কাছে তার সৃষ্টিকর্তাই সব। তাই সৃষ্টি তার সব কিছু সর্মপিত করে, সৃষ্টিকর্তার একান্ত সান্নিধ্য পেতে ব্যাকুল।

মরণ যদি দাও হে প্রভু রাখিও তোমার কাছে
ওরে তুমি আমার বেহেস্ত দোযখ তাই থাকি তোমার আশে (২)

পরকালের বন্ধু তুমি এই কালের জগৎ স্বামী
তোমার কাছে আমার আশা যেভাবেই ডাক তুমি (২)
তুমি আমার বেহেস্ত দোযখ তাই থাকি তোমার আশে (ওই)

তোমার নামে দরুদ পড়েও অন্তর পায় না সভার কাজি
তাই তোমায় সদাই ডাকি তুমিই তোমার অন্তরে (২)
তুমি আমার বেহেস্ত দোযখ তাই থাকি তোমার পাশে (ওই)[২৩০]

১৯.

ভক্তের ভালোবাসায় হয়তো ফাঁক ছিল। যার জন্য গুরু সাথে ভক্তের দেখা হয় নাই। এই না পাওয়ার বেদনা ভক্তকে পিড়িত করছে।

কলিজাতে দাগ লেগেছে হাজার হাজার বার
ভালোবাসার ময়না পাখি এখন দেখি তার (২)

www.pathagar.com

ভালোবাসার ঘর বান্ধিলাম থাকবো যতন করে
সেই ঘর আমার ভাইঙা নিল কাল বৈশাখী ঝড়ে (২)
বন্ধুহারা পাগল আমি এই অন্তরে শুধু হাহাকার..(ওই)

যারে আমি সব সপিলাম দিয়া আমার প্রাণ
সে যে আমায় ছেড়ে দিয়া হইলো গোপন (২)
অশ্রুঝরে দুটি চোখে দেখল না সে একবার..(ওই)

মন দিয়াছি প্রাণ দিয়াছি তোমারে সপিয়া
বিনা দোষে প্রাণ বন্ধুয়া যাইও না ছাড়িয়া (২)
মরলাম মরলাম জ্বলে অন্তরে ব্যথা আমার..(ওই)

যারে আমি ভবে খুব বিশ্বাস গো করি
সে দেয় আমার দেয় মাথায় গো বারি (২)
দরদী হইলে বুঝতে আমার মনের ব্যথাভার..(ওই)[২৩১]

২১. মুর্শিদি গান

১.

আমার এই পাপ দেহ নিয়ে ভবপারে যেতে ভয় হচ্ছে। তুমি পাপীদের তরাবে এই আমার ভরসা। কারণ সাধন ভজন যা আছে তা দিয়ে পারে যাওয়া যাবে না। একমাত্র তুমিই ভরসা।

মুর্শিদ তোমার প্রেম নদীতে
কেমনে দেই পারি ॥
ঐ নদীর নোনা জলে
জাহাজ পড়ল কাকড়া তলে রে
আমার তরীতে লাগিয়ারে নোনায়
কখন যেন ডুইবা মরি ॥
দীনহীনের ভাঙ্গা তরী
পাপের ভরে হইছে ভারী
চড়তে ভয় করি
তুমি নিজ গুণে দয়ারে করে
দাওহে তোমার চরণ তরী ॥[২৩২]

২.

রাসূল (সা) তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করেছি। তুমি জগতকে তরানোর ভার নিয়েছ। আমাকে যদি না তরাও তা হলে জগতে তোমার দয়াল নামের কলঙ্ক হবে।

তুমি মুর্শিদ যাহা কর
আমি দিয়াছি চরণে হার
করতে হবে ভবপার ॥

www.pathagar.com

তুমি মুর্শিদ অভয় তরী
প্রেম বিলাইছ জগৎ জুড়ি
জগৎকে তরাইতে পারো
আমি হইছি কতই ভার ॥
তোমার ঐ নাম লইতে লইতে
যাই যদি দোজখী হয়ে
দয়াল নাম আর কেউ লবে না
আমার এই বেহাল দেখে।
রাসুল নাম আর কেউ লবে না
আমার এই বেহাল দেখে ॥[২৩৩]

বাউল গান : টাঙ্গাইল কোর্ট প্রাঙ্গণ

৩.

তুমি আইস দয়াল গুরুজী
তুমি আইস দয়াল মুর্শিদী
তাপির অঙ্গ শীতলও করি ॥

তুমি এই আসরে না আসিলে গো
তোমার কাঙ্গালের হবে কোনো গতি ॥
তুমি হইলা ধনের গো ধনি
আমি হইলাম ধনেরও কাঙ্গাল
তুমি এই আসরে না আসিলে গো
দোহাই লাগে তোঁমারই ॥
তুমি মন্ত্র তুমি গো যন্ত্র
আমি হইলাম অধমও বাল্লক

www.pathagar.com

তুমি এই আসরে না আসিলে গো
তোমার ভক্তের হবে কি গতি ॥[২৩৪]

৪.

আমার দয়াল আইস এই আসরে
আমার বান্ধব আইস এই আসরে
আইজ আমি ডাকি কাতরে ॥
তুমি আসিলে আনন্দ হবে
আমার নিরানন্দ যায় দূরে (২) ॥
তুমি আসিলে আসন গো দেব
আমার মস্তকেরও উপরে (২) ॥
তুমি ঐ পথে কেন দাঁড়াইয়া থাক
আমার ভয় লাইগাছে অন্তরে (২) ॥[২৩৫]

৫.

আইজ দয়াল ডাকি কাতরে
আইজ রাসুল ডাকি কাতরে
উদয় হওরে দীনও বন্ধু হৃদয় মন্দিরে।
আমি আর কোনো ধন চাই না
দয়াল রাইখো চরণে ॥
আমি গাঁথিয়া বন ফুলের মালা
পরাব শ্যাম বন্ধুর গলে সেও আশা মনে ॥
নইয়ে আইলাম ষোল আনা
বেপারও করিব দোনা
সেও আশা মনে
আমি লাভে মূলে সব হারাইলাম আইসা বেপারে ॥[২৩৬]

৬.

মুর্শিদের দয়ার উপরই ভক্তের 'পার' এ যাওয়া নির্ভর করে। এই জন্য ভক্ত মুর্শিদের কৃপার উপর নির্ভরশীল।

তোমার দিদারের লাগি,
কত নিশি আমি জাগি,
দাও দেখা দাও, মুর্শিদ আমার।
দয়াল চান আমার দাও দেখা দাও
মুর্শিদ চান আমার ॥
কাতরে ডাকি তোমারে
কিঞ্চিৎ দয়া কর মোরে
তুমি হলে দয়ারই সাগর,
ডাকি তোমায় বারে বার ॥
আরব সাগর হইতে পার

দয়া করে আমায় কর পার
তুমি যদি না কর দয়া,
হবে না মোর পারে যাওয়া
চির সাথী তুমি যে আমার ॥
দাও দেখা দাও, মুর্শিদ আমার।
দয়াল চান আমার দাও দেখা দাও
মুর্শিদ চান আমার ॥[২৩৭]

৭.

পৃথিবীতে সবাই স্বার্থপর। স্ত্রী পুত্র কন্যা সবায় স্বার্থের অধীন। দেহের মধ্যে পরমাত্মা উপস্থিত থাকতে তাঁর দেখা না পাওয়ায় ভক্তের মনে বড় খেদ।

অজুদে মুজুদ থাকতে রে
ওরে দয়াল, দেখা নাহি দিলে রে
আমার দরদি।।
কত যে মনের দুঃখ রে দয়াল
মনে চাপা রইল রে
ও আমার দরদী।।
পুত্র-কন্যা সুত রে দয়াল
সবই স্বার্থের দাস
ও আমার দরদি।।
দেহ গাড়ি অচল হলে রে
দয়াল কেউনা হয়ও সাথি রে
ও আমার দরদি।।
আত্মায় আত্মায় থাকলে পিরিত রে
সেখানেই সান্ত্বনা রে
ও আমার দরদী।।[২৩৮]

৮.

ভক্তের একমাত্র দয়ালই ভরসা। তাঁকে সব সময় ভক্ত কাছে পেতে চায়। কারণ গুরুর মতো আপনজন জগতে আর কেউ নেই।

আমি মুর্শিদ শোকে হইলাম রোগি প্রাণে বাঁচি না রে
কত ওষুধ বড়ি খাইলাম
আমার অসুখ ছাড়লো না রে (২)

ও দয়াল দেখলাম জগৎ ঘুরে
ওষুধ বড়ি নাই সংসারে করি কি উপায়।।
আমার বুঝি হইল মরণ
প্রাণে তো আর বাঁচিব না রে (২)
দয়াল তুমি আমার জীবন
মরণ তুমি আমার বেদনা রে[২৩৯]

www.pathagar.com

৯.

ভক্ত পরিপূর্ণভাবে মুর্শিদের কাছে আত্মবিক্রীত। মুর্শিদকে ছাড়া দেহে প্রাণ থাকে না। ভক্তের নিবেদন গুরু যেন তাকে ভুলে না যান।

দয়াল আমি তোমার কিছু হই না বুঝেও
কোনো দোষেতে গেলে আমায় ছাড়িয়া (২)

কবিগানের আসর, শৈলকুড়িয়া, টাঙ্গাইল

ওরে দয়াল আমি তোমার প্রেমে পোড়া
আমি জিয়ন্তে হইয়াছি গো মরা (২)
আমার মরার আছে কি তোমার প্রেমে পড়িয়া..(২)

মন প্রাণ সপিয়া দয়াল হয়েছি জিয়ন্ত মরা
আশায় দিন যে গেল তবু না দিলে ধরা (২)
ওরে এই অবুঝ রে যাইও না দয়াল ভুলিয়া.. (২)[২৪০]

১০.

যার গুরু ইহধামে নাই জগতে তার মতো কাঙাল আর কেহ নাই। ভক্তের আশা ছিল গুরুর হাতে হাত রেখে সে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু ভক্তের সে আশা পূরণ হয়নি বলে মনে বড় খেদ।

মুর্শিদহারা ভক্ত যারা
বোঝে কি তার মনের বেদনা
ওরে ব্যথার বেথিক সেই জানে
অন্যে তো তা বুঝে না (২)

ওরে যেদিন আমি মুর্শিদহারা
হইছি রে ভাই জিয়ন্তে মরা[৫২৪] (২)

www.pathagar.com

আরে মনের ব্যথা মনে জানে
মুর্শিদহারা বেদনা (২)
অন্যে তা..ওই
তোমার হাতে হাত রাখিয়া
মনের সাথে মন মিশাইয়া
হইতো যদি মরণ ওরে
সেই মরণে হইতাম খুশি
চলে যাইতো যন্ত্রণা (২)
মুর্শিদ তুমি আমায় ভুইলো না
সে সময় দিও দেখা ভুলে যাব যন্ত্রণা।[২৪১]

তথ্যনির্দেশ

১. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
২. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল। সংগ্রাহক: মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন (বাদল), করটিয়া, টাঙ্গাইল।
৩. জরিনা বেগম, বয়স : ৬০ বছর, স্বামী-বাহাদুর মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রাহক : স্বাধীন আজম। তারিখ : ২৭, নভেম্বর-২০১১
৪. জরিনা বেগম, বয়স : ৬০ বছর, স্বামী-বাহাদুর মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রাহক : স্বাধীন আজম। তারিখ : ২৭, নভেম্বর-২০১১
৫. খোদেজা বেগম, বয়স-৫০, পিতা মৃত সেকান্দর আলী, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রাহক : স্বাধীন আজম। তারিখ : ১৬, আগস্ট-২০১১
৬. সৈয়দ নূরুর রহমান (গিনি), বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : শিক্ষক, বানিয়ারা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
৭. সুফিয়া বেগম, বয়স : ৫২, স্বামী মৃত-হাফিজ উদ্দিন, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল।, সংগ্রাহক : স্বাধীন আজম। তারিখ : ২৮, নভেম্বর-২০১১
৮. জমিলা বেগম, বয়স : ৬০ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৯.১২.২০১১, সংগ্রাহক : মোহাম্মদ আবু তাহের, গ্রামঃ অলিপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল।
৯. জমিলা বেগম, বয়স : ৬০ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৯.১২.২০১১, সংগ্রাহক : মোহাম্মদ আবু তাহের, গ্রামঃ অলিপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল।
১০. সবুরা বেগম, বয়স : ৫৭ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৭.১২.২০১১, সংগ্রাহক : মোহাম্মদ আবু তাহের, গ্রামঃ অলিপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল।
১১. সবুরা বেগম, বয়স : ৫৭ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৭.১২.২০১১
১২. হায়তন বেওয়া, বয়স : ৭৫ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৬.১২.২০১১
১৩. হায়তন বেওয়া, বয়স : ৭৫ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ৬.১২.২০১১

www.pathagar.com

১৪. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
১৫. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল। সংগ্রাহক: মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন (বাদল) করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৬. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
১৭. হাজেরা বেগম, বয়স : ৫০ বছর-গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। সময় : ১৫ অক্টোবর ২০১১
১৮. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
১৯. হায়তন বেওয়া, বয়স : ৭৫ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৬.১২.২০১১
২০. সৈয়দ নূরুর রহমান (গিনি), বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : শিক্ষক, বানিয়ারা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
২১. খোদেজা বেগম, বযস-৫০, পিতা মৃত সেকান্দর আলী, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রাহক : স্বাধীন আজম। তারিখ : ১৬, আগস্ট-২০১১
২২. মো : আফছার আলী, বয়স : ৭০ পিতা : নাছিম উদ্দিন মণ্ডল, মলাজানী, টাঙ্গাইল সংগ্রাকহ্ : স্বাধীন আজম, তারিখ : ১৪, আগস্ট ২০১১
২৩. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল। সংগ্রাহক: মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন (বাদল) করটিয়া, টাঙ্গাইল।
২৪. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল। সংগ্রাহক: মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন (বাদল) করটিয়া, টাঙ্গাইল।
২৫. জরিনা বেগম, বয়স : ৬০ বছর, স্বামী-বাহাদুর মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল।
২৬. জরিনা বেগম, বয়স : ৬০ বছর, স্বামী-বাহাদুর মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল।
২৭. শুকুর জান, বয়স : ৩৪, স্বামী- হযরত আলী, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল
২৮. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
২৯. আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১৯৯৫ (পরিমার্জিত সংস্করণ), পৃ. ১০০।
৩০. নির্মলেন্দু ভৌমিক, ভাটিয়াল-ভাটিয়ালী গান, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৪০১, কলিকাতা, পৃ. ৩৭৮।
৩১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৩৩৪।
৩২. শাহিদা খাতুন সম্পাদিক, বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংগ্রহমালা, ২২, ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালী, ২০১০, পৃ. ১২।
৩৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত), সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৬৩৩।
৩৪. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসংগীতের ধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা-২০০৬, পৃ. ১৩৪।
৩৫. আহমদ শরীফ, (সম্পাদিত) মধ্যযুগের রাগতালনামা, ঢাকা- ১৯৬৭, পৃ.দ (ভূমিকা)।
৩৬. নির্মলেন্দু ভৌমিক, ভাটিয়াল-ভাটিয়ালী গান, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৪০১, পৃ. ৩৮০।
৩৭. শাহিদা খাতুন, সম্পাদক- বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংগ্রহমালা ২২, ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালী, ২০১০, পৃ. ১৩।
৩৮. মোঃ রমজান আলী বয়াতি, বয়স : ৯৫ বছর, গ্রাম : দক্ষিণ মান্দিয়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ০৭-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। পেশা : কৃষি।

www.pathagar.com

৩৯. মোঃ হোসেন আলী, বয়স : ৭৫ বছর, গ্রাম : সুতি দিঘলিপাড়া, ডাকঘর : সুতি, উপজেলাঃ গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২১-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি।
৪০. ঐ।
৪১. ঐ।
৪২. ঐ।
৪৩. ঐ।
৪৪. মোঃ আব্দুল খালেক, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৭০ বছর, গ্রাম : জটাবাড়ী, পো : জটাবাড়ী থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১১.২০১১
৪৫. ঐ।
৪৬. ঐ।
৪৭. ঐ।
৪৮. মোঃ রফিকুল ইসলাম, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, বয়স : ৫৬ বছর, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ২.১২.২০১১
৪৯. মোঃ তুলা মিয়া, পিতা : বছির উদ্দিন, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, বয়স : ৫৮বছর, গ্রাম : গোপদ, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৭.১১.২০১১
৫০. মোঃ তুলা মিয়া, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, বয়স : ৫৮ বছর, গ্রাম : গোপদ, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৭.১১.২০১১
৫১. মোঃ আব্দুল খালেক, শিক্ষা : নিরক্ষর, বয়স : ৭০ বছর, গ্রাম : জটাবাড়ী, পো : জটাবাড়ী, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১১.২০১১
৫২. ঐ।
৫৩. ঐ।
৫৪. ঐ।
৫৫. সুরেশ চন্দ্র দাস, গ্রাম : আমবাগান (খাসপাড়া), পো : ধনবাড়ী, থানা : ধনবাড়ী, জেলা : টাঙ্গাইল। বয়স : ৭৮ বছর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, তারিখ : ১৯.১২.২০১১
৫৬. ছাবেদ আলী, গ্রাম : নরিল্যা, পো : ভাইঘাট, থানা : ধনবাড়ী, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৬৮ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৫.০১.২০১২
৫৭. মোঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রাম : কালামাঝি, পো : গাংগাইর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৫৬ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, তারিখ : ২২.১১.২০১১
৫৮. সুরেশ চন্দ্র দাস, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, বয়স : ৭৮ বছর, গ্রাম : আমবাগান (খাসপাড়া), পোঃ ধনবাড়ী থানা : ধনবাড়ী, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৯.১১.২০১১
৫৯. মোঃ আঃ খালেক, বয়স : ৭০ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : +পো : জটাবাড়ী, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৭.১১.২০১১
৬০. ঐ।
৬১. ঐ।
৬২. ঐ।
৬৩. ঐ।
৬৪. ঐ।
৬৫. জাহাঙ্গীর আলম, বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষা : এম.এ, গ্রাম : গোপীনাথপুর, পো : মধুপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২.১২.২০১১

www.pathagar.com

৬৬. মছলিম উদ্দিন, বয়স ৬২ বছর, গ্রাম : সুন্দর, ডাকঘর : উপজেলা : গোপালপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল। পঞ্চম শ্রেণি পাশ। পেশা : বাউল শিল্পী। সংগ্রহ : ১৮-০৮-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
৬৭. জহির উদ্দিন মণ্ডল, বয়স : ৮০, গ্রাম : সিংগুরিয়া, ডাকঘর : সিংগুরিয়া, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ৬ জুলাই ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
৬৮. আবদুল হামিদ, বয়স : ৫৫, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : সিংগুরিয়া, ডাকঘর : সিংগুরিয়া, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ৬ জুলাই ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ, বুধবার।
৬৯. শ্রী সহদেব চন্দ্র দাস, বয়স : ৫৫ বছর, গ্রাম : ফলদা পালপাড়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, শিক্ষা- এইচ.এস.সি পাশ। পেশা : চাকুরি। সংগ্রহ : ২২-৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
৭০. ঐ।
৭১. ঐ।
৭২. মতিয়ার রহমান, বয়স : ৬৫ বছর, গ্রাম : ভোলারপাড়া, ডাকঘর : হেমনগর, উপজেলাঃ গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, সংগ্রহ : ১০-০৮-২০১২।
৭৩. ফজল শেখ, বয়স : ৫৮, পেশা : গরু ব্যবসায়ী, গ্রাম : নিকরাইল, ডাকঘর : নিকরাইল, উপজেলা : ভূঞাপুর। তারিখ : ২৫ জুলাই, ২০১১
৭৪. সিরাজ খাঁ। পিতা : মৃত মকবুল হোসেন খাঁ। বয়স : ৭০। পেশা : কৃষিকাজ। গ্রাম : আমুলা, ডাকঘর : নিকরাইল। দোহার : মোনছের আলী (৬৫), আজাহার আলী (৬৭), সিরাজ উদ্দিন (৬০), গ্রাম : আমুলা। তারিখ : ২৯ অক্টোবর ২০১১
৭৫. মোঃ আবদুল ওয়াহাব বয়াতি, বয়স : ৪৬ বছর, গ্রাম : বেড়াডাকুরী, ডাকঘর : ভেঙ্গুলা বাজার, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ১৪-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। নবম শ্রেণি পাস। পেশা : কৃষি। তিনি ধুয়া, জারি ও পালাগানের বয়াতি
৭৬. আবুল কাশেম বয়াতি, বয়স : ৮০ বছর, গ্রাম : গর্জনা, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ১ অক্টোবর-২০১২।
৭৭. আবুল কাশেম বয়াতি, বয়স : ৮০ বছর, গ্রাম : গর্জনা, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ১ অক্টোবর-২০১১
৭৮. শামছুল হক বয়াতি, গ্রাম : নিকলা দড়িপাড়া, ডাকঘর : নিকলা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২৪-০৭-২০১১
৭৯. রমজান আলী বয়াতি, বয়স : ৯৫ বছর, গ্রাম : দক্ষিণ মান্দিয়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ০৭-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি
৮০. সিরাজ আলী মিয়া, বয়স : ৮০ বছর, গ্রাম : আগবিক্রমহাটি, ডাকঘর : শিবপুর, উপজেলা : টাঙ্গাইল সদর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২৫-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : ব্যবসা।
৮১. ঐ।
৮২. ঐ।
৮৩. ছোট মিয়া, বয়স : ৭৫ বছর; পেশা : কৃষি, করাতিপাড়া, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
৮৪. মোঃ ফজর আলী বয়াতী, বয়স : ৭৫ বছর, গ্রাম : আলমনগর, ডাকঘর : আলমনগর, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ০৪-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি।

www.pathagar.com

৮৫. মোঃ জোয়াহের আলী, বয়স : ৫৮ বছর, গ্রাম : কালামাঝি, পো : গাংগাইর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৩য় শ্রেণি, তারিখ : ১৫/০৮/২০১১
৮৬. মোঃ সুরুজ আলী মুন্সী, বয়স : ৯১ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : কালামাঝি, পো : গাংগাইর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৩/১১/২০১১
৮৭. ঐ।
৮৮. ঐ।
৮৯. মোঃ আহাম্মদ মণ্ডল, বয়স : ৯০ বছর, গ্রাম : ধুবলিয়া, ডাকঘর : ধুবলিয়া, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ১২-০৮-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি।
৯০. ঐ।
৯১. ঐ।
৯২. মোঃ ইন্নছ আলী মণ্ডল, বয়স : ৭৫ বছর, গ্রাম : রসুলপুর, ডাকঘর : রসুলপুর, জেলা : উপজেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২১-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : দিনমজুর
৯৩. আজগর আলী মণ্ডল, বয়স : ৭৮, গ্রাম : দীঘিকাতুলী, ডাকঘর : নিকরাইল, উপজেলা : ভূঞাপুর। তারিখ : ১ আগস্ট, ২০১১
৯৪. আবদুস সবুর বয়াতি, বয়স : ৬২, গ্রাম : দীঘিকাতুলী, ডাকঘর : নিকরাইল, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ১ আগস্ট, ২০১১
৯৫. আজগর আলী মণ্ডল, বয়স : ৭৮, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : দীঘিকাতুলী, ডাকঘর : নিকরাইল, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ৩১ জুলাই ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ, রবিবার
৯৬. আব্দুস সবুর বয়াতি, বয়স : ৬৮, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : আমুলা, ডাকঘর : নিকরাইল, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ৩১-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ
৯৭. ঐ।
৯৮. ঐ।
৯৯. ঐ।
১০০. ঐ।
১০১. মোঃ জোয়াহের আলী, গ্রাম : কালামাঝি, পো : গাংগাইর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৫৮বছর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, তারিখ : ১০/১১/২০১১
১০২. মোঃ আমির আলী, বয়স : ৭৬ বছর, গ্রাম : সূতি পূর্বপাড়া, ডাকঘর : সূতি, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২৪-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি
১০৩. ফরমান আলী খাঁ, বয়স : ৬৫, পেশা : কৃষক, গ্রাম : ধুবলিয়া, ডাকঘর : ধুবলিয়া, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ৩০-০৬-২০১১
১০৪. মোঃ মুজাফফর আলী, বয়স : ৭০ বছর, গ্রাম : সূতি দিঘুলিয়াপাড়া, ডাকঘর : সূতি, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ০৫-০৯-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : দিনমজুর। ঘাটু ও ধূয়াগানের বয়াতি
১০৫. আব্দুল বাছেদ শেখ, বয়স : ৬৫, বগাজান, ঘাটাইল। তারিখ : ২৭-০৬-২০১১খ্রিষ্টাব্দ।
১০৬. ঐ।
১০৭. ১০৩. আবুল কাশেম বয়াতি, বয়স : ৮০ বছর, গ্রাম : গর্জনা, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল।

www.pathagar.com

১০৮. মোঃ আঃ খালেক, বয়স : ৭০ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : পো : জটাবাড়ি, মধুপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৫/১১/২০১১

১০৯. শামছুল হক বয়াতি, গ্রাম : নিকলা দড়িপাড়া, ডাকঘর : নিকলা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২৪-০৭-২০১১

১১০. আজগর আলী মণ্ডল, বয়স : ৭৮। পেশা : কৃষিকাজ। গ্রাম : দীঘিকাতুলী, ডাকঘর : নিকরাইল, উপজেলা : ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল। তারিখ : ০১-০৮-২০১১।

১১১. সিরাজ আলী মিয়া, বয়স : ৮০ বছর, গ্রাম : আগবিক্রমহাটি, ডাকঘর : শিবপুর, উপজেলা : টাঙ্গাইল সদর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ১৫-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : ব্যবসা।

১১২. ঐ।

১১৩. মোঃ জোয়াহের আলী, বয়স : ৫৮ বছর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, গ্রাম : কালামাঝি, পো : গাংগাইর, থানা : মধুপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১০/১১/২০১১

১১৪. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল। সংগ্রাহক : মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন (বাদল), করটিয়া, টাঙ্গাইল।

১১৫. মোঃ হোসেন আলী, বয়স : ৭৫ বছর, গ্রাম : সূতি দিঘুলিয়াপাড়া, ডাকঘর : সূতি, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২১-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি।

১১৬. সিরাজ আলী মিয়া, বয়স : ৮০ বছর, গ্রাম : আগবিক্রমহাটি, ডাকঘর : শিবপুর, উপজেলা : টাঙ্গাইল সদর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ১৫-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : ব্যবসা।

১১৭. আবুল কাশেম বয়াতি, বয়স : ৮০ বছর, গ্রাম : গর্জনা, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল।

১১৮. ঐ।

১১৯. ঐ।

১২০. রচয়িতা ও বাহাদুর আলী খান, বয়স : ৯০, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : বামনহাটা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২৬ জুন ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।

১২১. মোঃ জোয়াহের আলী, বয়স : ৫৮ বছর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, গ্রাম : কালামাঝি, পো : গাংগাইর, মধুপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১০/১১/২০১১

১২২. বেল্লাল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, বাহাতৈর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

১২৩. সুরাইয়া বেগম, বয়স : ৭০ বছর, স্বামী- মোঃ মহির উদ্দিন তালুকদার, গ্রাম : আলমনগর বয়ড়া, ডাকঘর : আলমনগর, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ১২-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। পঞ্চম শ্রেণি পাস। গৃহিণী।

১২৪. জরিনা বেগম, বয়স : ৬০ বছর, স্বামী-বাহাদুর মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা- ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল

১২৫. ঐ।

১২৬. ঐ।

১২৭. সুফিয়া বেগম, বয়স : ৫২ বছর, স্বামী-হাফিজ উদ্দিন, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ-২৭ নভেম্বর- ২০১১।

১২৮. ঐ।

১২৯. ঐ।

www.pathagar.com

১৩০. ঐ।
১৩১. ঐ।
১৩২. ঐ।
১৩৩. ঐ।
১৩৪. মোঃ ইন্নছ আলী মণ্ডল, বয়স : ৭৫ বছর, গ্রাম : রসুলপুর, জেলা ও উপজেলা : টাঙ্গাইল। অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি। সংগ্রহ : ২১-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
১৩৫. ঐ।
১৩৬. তারাপদ দাস, বয়স : ৬০ বছর, গ্রাম : রসুলপুর, ডাকঘর : রসুলপুর, জেলা ও উপজেলা : টাঙ্গাইল। অষ্টম শ্রেণি পাস। পেশা : ব্যবসা। সংগ্রহ : ২১-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
১৩৭. সুরুজ আলী মুন্সি, গ্রাম : কালামাঝি, পো : গাংগাইর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৯১ বছর শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, তারিখ : ৩/১১/২০১১
১৩৮. ঐ।
১৩৯. মোঃ রফিকুল ইসলাম, বয়স : ৫০ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : অলিপুর, পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ২/১২/২০১১
১৪০. সুফিয়া বেগম, বয়স : ৫২ বছর, স্বামী-হাফিজ উদ্দিন, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ-২৭ নভেম্বর- ২০১১।
১৪১. ঐ।
১৪২. ঐ।
১৪৩. ঐ।
১৪৪. ঐ।
১৪৫. ঐ।
১৪৬. ঐ।
১৪৭. ঐ।
১৪৮. ঐ।
১৪৯. ঐ।
১৫০. দুদু মিয়া, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৫১. জরিনা বেগম, বয়স : ৬০ বছর, স্বামী-বাহাদুর মণ্ডল, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা-ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল
১৫২. ঐ।
১৫৩. ঐ।
১৫৪. ঐ।
১৫৫. ঐ।
১৫৬. ঐ।
১৫৭. ছোট মিয়া, বয়স : ৭৫ বছর; পেশা : কৃষি, করাতিপাড়া, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
১৫৮. ফালু মিয়া, বয়স : ৫০ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৫৯. সুফিয়া বেগম, বয়স : ৫২, স্বামী মৃত হাফিজ উদ্দিন, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইর, জেলা : টাঙ্গাইল।
১৬০. মর্জিনা আক্তার, বয়স : ১২ বছর, পিতা : হযরত আলী, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল।

www.pathagar.com

১৬১. ঐ।
১৬২. ঐ।
১৬৩. ঐ।
১৬৪. ঐ।
১৬৫. ঐ।
১৬৬. ঐ।
১৬৭. মোঃ আব্দুর রশিদ বয়াতি, বয়স : ৫২ বছর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, পিতা : মৃত আব্দুল জলিল, গ্রাম : দিগরবাইদ, পো : লাউফুল, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৭/১২/২০১১
১৬৮. ঐ।
১৬৯. ঐ।
১৭০. শাহাদত হোসেন, গ্রাম : রানিয়াদ, পো : লাউফুলা, উপজেলা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৭৫ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, তারিখ : ৫/১১/২০১১
১৭১. ঐ।
১৭২. ঐ।
১৭৩. ঐ।
১৭৪. আবদুস সাত্তার বয়াতি। বয়স : ৫৬, পেশা : বয়াতি। গ্রাম : কুকাদাইর, ডাকঘর : গোবিন্দাসী, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
১৭৫. আয়েজ উদ্দিন। বয়স : ৮২, ধুয়াগানের শিল্পী। গ্রাম : নিকরাইল, ডাকঘর : নিকরাইল, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২৬ জুন ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
১৭৬. সৈয়দ নূরুর রহমান (গিনি), বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : শিক্ষক, বানিয়ারা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
১৭৭. ঐ।
১৭৮. ঐ।
১৭৯. মুক্তার আলী বয়াতি, বয়স : ৫৫ বছর, গ্রাম : ছোট চওনা, উপজেলা : সখিপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল। ১৬ মে-২০১২
১৮০. ঐ।
১৮১. ঐ।
১৮২. আহম্মদ আলী, বয়স : ৭০ বছর, পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৮৩. মোঃ হযরত আলী, গ্রাম : শটিবাড়ী, পো : লাউফুলা, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৭০বছর। শিক্ষা : নিরক্ষর। তারিখ : ২২/১২/২০১১
১৮৪. মোঃ মছলিম উদ্দিন বাউল, বয়স : ৬২ বছর, গ্রাম : সুন্দর, ডাকঘর ও উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ১৮-০৮-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
১৮৫. মোঃ হোসেন আলী, বয়স : ৭৫ বছর, গ্রাম : সূতি দিঘলিপাড়া, ডাকঘর : সূতি, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২১-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি।
১৮৬. আহম্মদ আলী, বয়স : ৬০ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৮৭. ফালু মিয়া, বয়স : ৫০ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৮৮. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : ব্যবসা, মীর দেওহাটা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

www.pathagar.com

১৮৯. ঐ।
১৯০. ঐ।
১৯১. দুদু মিয়া, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৯২. আমজাদ শিকদার, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৯৩. ঐ।
১৯৪. দুদু মিয়া, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৯৫. মুক্তার আলী বয়াতি, বয়স : ৫৫ বছর, গ্রাম : ছোট চওনা, উপজেলা : সখিপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। বয়াতি : শাহেন শাহ (বাউল কবি) বয়স : ৮০ বছর, গ্রাম : কচুয়া, উপজেলা : সখিপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। ২২ মার্চ-২০১২।
১৯৬. আমজাদ শিকদার, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৯৭. দুদু মিয়া, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৯৮. আমজাদ শিকদার, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৯৯. ঐ।
২০০. মোঃ হযরত আলী, বয়স : ৭০ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : শটিবাড়ী, পো : লাউফুলা, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ২২/১২/২০১১
২০১. ঐ।
২০২. ঐ।
২০৩. আহম্মদ আলী, বয়স : ৬০ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
২০৪. আমজাদ শিকদার, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
২০৫. শাহেন শাহ (বাউল কবি) বয়স : ৮০ বছর, গ্রাম : কচুয়া, উপজেলা : সখিপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। ২২ মার্চ-২০১২।
২০৬. সঞ্জাব আলী ফকির, বয়স : ৬৫ বছর, গ্রাম : ফলদা দিঘুলিয়াপাড়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২৪-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি।
২০৭. মোঃ আঃ রশিদ বয়াতি, বয়স : ৫২ বছর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, গ্রাম : দিগরবাইদ, পো : লাউফুলা, মধুপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২০/১২/২০১১, সংগ্রাহক : মোহাম্মদ আবু তাহের, গ্রাম : অলিপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল।
২০৮. ঐ।
২০৯. ঐ।
২১০. আহম্মদ আলী, বয়স : ৬০ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
২১১. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : ব্যবসা, মীর দেওহাটা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
২১২. ঐ।
২১৩. আহম্মদ আলী, বয়স : ৬০ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
২১৪. সুফিয়া বেগম, বয়স : ৫২, স্বামী মৃত হাফিজ উদ্দিন, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইর, জেলা : টাঙ্গাইল।
২১৫. ঐ।

www.pathagar.com

২১৬. ঐ।
২১৭. ঐ।
২১৮. ঐ।
২১৯. ঐ।
২২০. ঐ।
২২১. মোঃ হযরত আলী, বয়স : ৭০ বছর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : শটিবাড়ী, পো : লাউফুলা, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ২২/১২/২০১১
২২২. ঐ।
২২৩. ঐ।
২২৪. ছাদেক আলী ফকির, বয়স : ৫০ বছর। গ্রাম : ফলদা দিঘুলিয়াপাড়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২৪-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। নিরক্ষর। পেশা : ব্যবসা।
২২৫. আইয়ুব আলী খান, বয়স : ৪৩ বছর। গ্রাম : ঝনঝনিয়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২৫-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি।
২২৬. মোঃ আমীর আলী বয়াতি, বয়স : ৭৬ বছর। গ্রাম : সূতী পূর্বপাড়া, ডাকঘর : সূতী, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। পেশা : কৃষি। নিরক্ষর। সংগ্রহ : ২৪-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
২২৭. সুফিয়া বেগম, বয়স : ৫২, স্বামী মৃত হাফিজ উদ্দিন, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইর, জেলা : টাঙ্গাইল।
২২৮. মোঃ আমীর আলী বয়াতি, বয়স : ৭৬ বছর। গ্রাম : সূতী পূর্বপাড়া, ডাকঘর : সূতী, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। পেশা : কৃষি। নিরক্ষর। সংগ্রহ : ২৪-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
২২৯. মোঃ আমীর আলী বয়াতি, বয়স : ৭৬ বছর। গ্রাম : সূতী পূর্বপাড়া, ডাকঘর : সূতী, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। পেশা : কৃষি। নিরক্ষর। সংগ্রহ : ২৪-০৭-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
২৩০. সুনীল চন্দ্র দাস, বয়স : পেশা : বাউলশিল্পী, গ্রাম : পালিমা, ডাকঘর : পালিমা, উপজেলা : কালিহাতী, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
২৩১. আবুল সরকার, বয়স : ৩৫, পেশা : বাউলশিল্পী, গ্রাম : রূপেরবয়ড়া, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২০ আগস্ট ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
২৩২. হাসান আলী, গ্রাম : ঝনঝনিয়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ১১ আগস্ট ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
২৩৩. সুনীল চন্দ্র দাস, বয়স : পেশা : বাউলশিল্পী, গ্রাম : পালিমা, ডাকঘর : পালিমা, উপজেলা : কালিহাতী, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২৫ আগস্ট ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
২৩৪. আহম্মদ আলী, বয়স : ৬০ বছর; পেশা : কৃষি, কুমুল্লী নামদার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
২৩৫. মুক্তার আলী বয়াতি, বয়স : ৫৫ বছর, গ্রাম : ছোট চওনা, উপজেলা : সখিপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল। ২২ মার্চ-২০১২
২৩৬. শাহেন শাহ (বাউল কবি) বয়স : ৮০ বছর, পিতা : জহির উদ্দিন মুন্সি, গ্রাম : কচুয়া, উপজেলা : সখিপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২২ মার্চ, ২০১২।
২৩৭. মুক্তার আলী বয়াতি, বয়স : ৫৫ বছর, গ্রাম : ছোট চওনা, উপজেলা : সখিপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল। ১৬ মে-২০১২।

www.pathagar.com

২৩৮. ঐ।
২৩৯. সৈয়দ মজিবর রহমান, বয়স : ৬৩ বছর। গ্রাম : ঝনঝনিয়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২৫-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অষ্টম শ্রেণি পাস। পেশা : কৃষি।
২৪০. ঐ।
২৪১. সঞ্জাব আলী ফকির, বয়স : ৬৫ বছর, গ্রাম : ফলদা দিঘুলিয়াপাড়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ : ২৪-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। অশিক্ষিত। পেশা : কৃষি।

শব্দার্থ

ঢেউয়া– বড় পিঁপড়া।

সুতার- কাঠমিস্ত্রি। ২. দামান- জামাতা। ৩.সুতার– কাঠমিস্ত্রি। ৪. বাজন বেটা– বড় ছেলে। ৫. বাইছা– বেছে ৬. ওমাল– রুমাল। ৭. লাইঠাল– লাঠিয়াল। ৮. কদ্দুর– কত দূর। ৯. নরৈল– নখ কাটার যন্ত্র বিশেষ। ১০. বাপজান– এখানে ছেলেকে আদর করে ডাক দেওয়া বুঝানো হয়েছে। ১১. কামাইও– চুল কাটাইও। ১২. সিধা– চাল/ টাকা দান। ১৩. নশার হওরী- বরের শ্বাশুড়ি। ১৪. ঐরাণ জঙ্গলে-অরণ্যের মধ্যে। ১৫. আইওরিরা- কনের সখিরা। ১৬. আনমনে রান্ধে- অন্য মনস্ক ভাবে রাধে। ১৭.জব- জবাই করা ১৮. কুম- পুকরের আকৃতির মতো বড় জলাশয়। ১৯. বাখানি- প্রশংসা। ২০. নশা– বর ২১. বন্ধক থুইয়া– বন্ধক রেখে। ২২. ফিরা- পিঁড়ি, ২৩. খইয়া বাজি– এক ধরনের আতশ বাজি। যা বিস্ফোরিত হলে খইয়ের মতো চারদিকে ছুটে যায়। ২৪. পুষ-পৌষ, ২৫. বুবু- বড় বোন। ২৬. আওটা– দুধ জ্বাল দেয়ার পাত্র, ২৭. এড়াইয়া– খোসা মুক্ত, ২৮. আইতাছে- আসছে, ২৯. ডেসকা– বড় পাতিল। ৩০. কোনডা- কোনটা। ৩১. যেডার- যে ব্যক্তির। ৩২. হেইডা- সেটা। ৩৩.চুনু-স্নো, ৩৪.পিন্দা- পরে, ৩৫. বালী- বালা। ৩৬. কোনে- কোথায়। ৩৭. আড়াবোনে< আড়াবন- বাড়ির পিছনের জঙ্গল। ৩৮. গড়ন- অলংকার। ৩৯. দামান- জামাই, জামাতা। ৪০. নিগা- জন্য। ৪১. পাইনা- পাতলা। ৪২. হস্তা- সস্তা। ৪৩. বহর- প্রস্থ। ৪৪. মাজ্জা- কোমর। ৪৫. মেন্দি– মেহেদী ৪৬. চিরল– চিকন, সরু ৪৭. রাইত– রাত। ৪৮.বান্ধ- বাঁধ ৪৯. কইষা- শক্ত করে। ৫০. কিরা- শপথ ৫১. কব- বলব। ৫২. গুনি- গুলো। ৫৩. গিঙ্গি- ছোট। ৫৪. আপনেগর- আপনাদের। ৫৫. আমাগর- আমাদের। ৫৬. ডুলি- এক ধরনের বাহন।যা সাধারণত বিবাহ, নাইয়রির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ৫৭. নসার-বরের। ৫৮.ফুকারি- ফুঁপিয়ে কাঁদা ৫৯. গুইজা- গোঁজা ৬০. কুটরা- কৌটা বা পাত্র বিশেষ। ৬১. সড়ক রোশনাই– সড়ক আলো। ৬২. মাইনসে– মানুষে ৬৩. নানী হওরী– নানী শাশুড়ি। ৬৪. হুদা-খালি, শুন্য। ৬৫. শেল মারিয়া– আঘাত দিয়ে। ৬৬. হলা- বাঁশের তৈরি ঝাড়ু, ৬৭. হাছুন- শনের তৈরি ঝাড়ু ৬৮. ফটফট- ঝলমলে। ৬৯. আটে– বাজারে ৭০. বাজান– বাবা ৭১. জেওর– গহনা। ৭২. অইছাল-হয়েছিল ৭৩.নইছাল– নিয়েছিল। ৭৪. বাইল্যা চাটা– অতিশয় কৃপণ ৭৫. আইয়া– এসে। ৭৬. কৈষ্টা– কটু স্বাদ ৭৭. অইয়া– হয়ে ৭৮. কাইল– আগামি দিন। ৭৯. বাসক- বাক্স, ৮০.মুশার- মশারি, ৮১. ঢাইলে- ঢেলে। ৮২. নাগলে-লাগলে। ৮৩. বুগলে- নিকটে। ৮৪. রাইত্র- রাত্র। ৮৫. কিবা–কেমন। ৮৬. আইল- এলো, ৮৭. ভালাই- ভাল, ৮৮. দেহিনা- দেখিনা, ৮৯. পেট নামায়- পাতলা পায়খানা করে। ৯০. শইল- শরীর। ৯১. ছোডমিয়া- ছোট দেবর, ৯২. টুঙ্গী- টঙ ঘর। ৯৩. থুইয়া- রেখে। ৯৪. আচম্বিতি- আচমকা। ৯৫. অরুন গহীন। ৯৬. ছায়লা- ছেলে। ৯৭. নইয়া - লয়ে। ৯৮.

www.pathagar.com

অনকুমারী - অবিবাহিতা নারী। ৯৯. ছেরি - অবিবাহিতা মেয়ে। ১০০. গালডার – গালটার, ১০১. থুইয়া – রেখে। ১০২. বইলাম- বসলাম, ১০৩. কইরে-করে। ১০৪. পিষ্ঠে – পৃষ্ঠে। ১০৫. কইতনে-কোথা থেকে, ১০৬. ছেরা- ছোট ছেলে, ১০৭. কাঠল-কাঁঠাল, ১০৮. বাইছে-বসেছে। ১০৯. কইরোনা-করোনা, ১১০. চেংরা-নবীন বয়েসের যুবক। ১১১. টেরিয়া সিঁথি - ঢেউ খেলানো বাবরি চুলের সিঁথি। ১১২. চক - বিস্তীর্ণ মাঠ। ১১৩. দিবানি- দেবে নাকি। ১১৪. আইজ- আজ। ১১৫. কাইল- কাল। ১১৬. নও- চলো। ১১৭. কইরা- করে। ১১৮. হাইটা-হেঁটে। ১১৯. চেংরা- অল্প বয়সী ছেলে। ১২০. গোটা- গাছের ফল। ১২১. বিরা- ১০০টি প্যানে এক বিরা। ১২২. পাইর- শাড়ি কাপড়ের উভয় প্রান্তের মোটা অংশকে পাইর বলা হয়। ১২৩. পরথম- প্রথম। ১২৪. পুইড়া- পুড়ে। ১২৫. সইষ্যাবাড়ি- সরিষাবাড়ি। ১২৬. দ্যাশের-দেশের। ১২৭. নিভা- নিভে। ১২৮. বিদ্যাশে- বিদেশে। ১২৯. যাইয়্যা- যেয়ে। ১৩০. কাইন্দা- কেঁদে। ১৩১.পরেশান- হয়রান। ১৩২.জন্দা ছাইলা- জীবিত ছেলে। ১৩৩. থুইয়্যা- ফেলে রেখে। ১৩৪. চইড়া- চড়ে। ১৩৫. কান্দে- কাঁধে। ১৩৬. ভার- পাত্র। ১৩৭. মইলো-মরলো, মারা গেল। ১৩৮. ভিষম- ভিষণ। ১৩৯. ট্যাকা- টাকা। ১৪০. হুলুস্থুলি- গোলমাল। ১৪১. টেলি- টেলিফোন, তার বার্তা। ১৪২. গোলায়- গুলিতে। ১৪৩. স্যার- সের। ১৪৪. দিছাল- দিয়েছিল। ১৪৫. রনদা শাহ- রনদা প্রসাদ সাহা। ১৪৬. চাইট্‌কা চুইট্‌কা- ছোট, ক্ষুদ্র। ১৪৭. ব্যাপারিরা- ব্যবসায়ীরা। ১৪৮. রেট- দর। ১৪৯. টাইনা- টেনে। ১৫০. কনটোল < কন্ট্রোল- নির্ধারিত মূল্য। ১৫১. উসার- প্রস্থ, ১৫২. ফুসকি- উঁকি। ১৫৩. কুতকুতাইয়া চায়-সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহনি। ১৫৪. ফয়তে মা-হজরত ফাতেমা ১৫৫. নায়ের- নৌকার। ১৫৬.পরথোম-প্রথম। ১৫৭.তরিকা-শরিয়ত, মারেফত, হকিকত, তরিকত। ১৫৮. শ্যাষে-শেষে। ১৫৯. আইসো-এসো অনুরোধ অর্থে। ১৬০. নড়ে-কেঁপে ওঠে। ১৬১. সেকতা-সে কথা। ১৬২. তয় ক্যানে-তবে কেন। ১৬৩. ক্যারা-কে। ১৬৪. শিব-হিন্দুদের দেবতা। ১৬৫. ত্যারজো-ত্যাজ্য, পরিত্যাগ। ১৬৬. কইরে-করে। ১৬৭. কাশী-হিন্দুদের তীর্থ স্থান। ১৬৮. নারদমুনি-জনৈক ঋষি। ১৬৯. ন্যাটা-ঝামেলা। ১৭০. পোলাইপান- শিশু। ১৭১. দ্রুপদী- দ্রৌপদী। ১৭২. পোন্নাম- প্রণাম। ১৭৩. গর্ভকার- গর্ভবতী অর্থে। ১৭৪. ছল-সওয়াল, জিজ্ঞাস করা। ১৭৫. চাত্তক- চাতক পাখি। ১৭৬. ভিমর< ভ্রমর। ১৭৭. নোচ্ছা-লোচ্চা, দুশ্চরিত্রের মানুষ। ১৭৮. মইজা< মজে। ১৭৯. মইলাম < মরলাম। ১৮০. ব্যাগার খাইটে- মিছামিছি খেটে। ১৮১. ছয় বোম্বেটে- ছয় রিপু। ১৮২. কোনসুম- কোনো সময়। ১৮৩. জানি- যেন। ১৮৪. থাইকো < থেকো। ১৮৫. চৈতন- জাগ্রত। ১৮৬. খোপ- ছোট কক্ষ। ১৮৭. নাইরে- নয়। ১৮৮. ষোলজন- দশ ইন্দ্রীয় ও ছয় রিপু। ১৮৯. নিত্তি- সর্বক্ষণ। ১৯০. পহরা- পাহারা। শব্দার্থ : ১৯১. গোল- গোলমাল ১৯২. হেকমত- কৌশল। ১৯৩. আঠারো মোকাম- আঠার উপাদান। ১৯৪. বলরাম- কৃষ্ণের সখা। ১৯৫. কানাই-বলাই-হিন্দুদের দেবতা। ১৯৬. গোলমেলি- বিশৃঙ্খলা। ১৯৭. জননম- জনম। ১৯৮. বুইজা- বুঝো। ১৯৯. রুয়া- কাঠ বা বাঁশের তৈরি ঘরের চাল নির্মাণের দন্ড। ২০০. স্বারক- কাঠ বা বাঁশের তৈরি ঘরের চাল নির্মাণের দন্ড। ২০১. সলা- চিকন। ২০২. হাছলা- রশি। ২০৩. খামে-খুঁটিতে। ২০৪. থওগা- রেখে দাও। ২০৫. বাতর- ক্ষেতের সীমানা বা আইল। ২০৬. খোঁটা-খুঁটি বা খাম। ২০৭. কাণিতে- কোণাতে। ২০৮. মদন- কামের দেবতা, কামভাব। ২০৯. নিকামার- পাহারাদার। ২১০. নাও- নৌকা। ২১১. থয়- রাখে। ২১২. লেইখে- লেখে। ২১৩. আন্ধার- অন্ধকার। ২১৪. রবি- রবে। শব্দার্থ : ২১৫. তফন- লুঙ্গি। ২১৬. টাইনে- টেনে।

www.pathagar.com

২১৭. নায়ের- নৌকার। ২১৮. গলইর- নৌকার অগ্রভাগের। ২১৯. সনে- সঙ্গে। ২২০. ছয়জন- ছয় রিপু। ২২১. রোশনাই- জ্যোতি। ২২২. রবি- থাকবি। ২২৩. জাইলানী- জেলেনী। ২২৪. নিটকানী- দাঁত বের করে ব্যঙ্গ করা। ২২৫. অফর বেলা- পড়ন্ত বেলা। ২২৬. পলোখান- বাঁশের তৈরি মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ ২২৭. আওড়া চাপ - পলো দিয়ে এদিক ওদিক চাপ দেওয়া। ২২৮. বালু খাইকা- নদীতে থাকে এক প্রকার ছোট মাছ। ২২৯. পাঁচ চোইখা- এক প্রকার ভাসমান মোট মাছ, ২৩০. খালোই- মাছ রাখার যন্ত্র। ২৩১. পারতাছে- দিচ্ছে। ২৩২. আসলা- আসিলা। ২৩৩. মোকাম- স্থান বা জায়গা। ২৩৪.কড়াল- প্রতিজ্ঞা। ২৩৫. কৈল- কিন্তু। ২৩৬. চান-স্নান ২৩৭. ডরান- ভয়। ২৩৮. সইশোলা- মিতালি। ২৩৯. ফিরা- পিঁড়ি। ২৪০. আসদিন - অন্য দিন। ২৪১. আইজ- আজ। ২৪২. মাইছান রানি - জেলেনী। ২৪৩. পোন - বিশ হালি। ২৪৪. কেতলানী - আঁশটে যুক্ত পানি। ২৪৫. নাইল্যা- পাট। ২৪৬. ফালাইল-ফেললো। ২৪৭. পোষাইল-পোহালো। ২৪৮. বানা- বাঁশ দিয়ে তৈরি মাছ ধরার বেড়া। ২৪৯. পিনজিরা- খাঁচা।২৫০. দাওয়ালা- অন্য দেশ হতে আগত ধান কাটার মৌসুমী কৃষক। ২৫১. বাইর- বের ২৫২. কইরা- করে। ২৫৩. হামি- কাঁচির হাতলের সাথে রূপার বেষ্টনী। ২৫৪. ধোয়াইতে- কাটতে। ২৫৫. ছাইলা- ছেলে। ২৫৬. ঝইড়া কোণে- ঈশান কোণ। ২৫৭. সাজল দেওয়া- মেঘ বৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হলো। ২৫৮. কাণ্ডারি- কান্ডারি। ২৫৯. জিজ্ঞাসন- জিজ্ঞাসা। ২৬০. বাদশাই- বাদশাহী, রাজত্ব। ২৬১. রহম< রহমত। ২৬২. খুলাসা- খুলে বলা। ২৬৩. জব- জবাব। ২৬৪. মান- ইজ্জত, সম্মান। ২৬৫. ছোয়াল < সওয়াল- প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। ২৬৬. হায়েদ < হায়াত, আয়ু। ২৬৭. হেদায়দ < হেদায়েত, উপদেশ। ২৬৮. গোয়ার- একরোখা। ২৬৯. খারাপি- খারাপ। ২৭০. দেলেতে- অন্তরে। ২৭১. দিগ-পাশে- দৈর্ঘ্য প্রস্থে। ২৭২. গাতা- গর্ত, গভীরতা অর্থে। ২৭৩. কাষ্ঠ- কাঠ। ২৭৪. গাড়ছিল- পুঁতেছিল। ২৭৫. বানছিল- বেঁধেছিল। ২৭৬. আড়ে পাশে- দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে। ২৭৭. চাইরশো- চার'শ। ২৭৮. জিনা- অবৈধ সহবাস। ২৭৯. বইলে- বলে। ২৮০. আইলা- আসলা, আসিলে। ২৮১. মরম- মর্ম। ২৮২. গোলজার- ফুলের বাগান, বাগান। ২৮৩. এস্কেপোড়া- প্রেমে পোড়াল ২৮৪. দেহখানা- দেহটি, দেহখানা। ২৮৫. মমিন- নেক বান্দা। ২৮৬. খলিল- সৃষ্টিকর্তা। ২৮৭. আংগোর- আমাদের। ২৮৮. জহর- বিষ। ২৮৯. কহরে- বিপদে, অত্যাচারে। ২৯০. এজিদার- এজিদের, ইয়াজিদের (মুয়াবিয়ার পুত্র)। ২৯১. আমগোর < আমাদের। ২৯২. হানিফ- মুহম্মদ হানিফা। হজরত আলী (রঃ) এর দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র। ২৯৩. পুরী- রাজ্য অর্থে। ২৯৪. রেজিদ- এজিদ, ইয়াজিদ (মুয়াবিয়ার পুত্র)। ২৯৫. পলাবো- পালাবে। ২৯৬. অলিদ < ওয়ালিদ। ২৯৭. ধইরা আইনা- ধরে এনে। ২৯৮. গুতাইয়া- আঘাত করে। ২৯৯. মানজা- কোমর। ৩০০. মেলা- রওনা, রওয়ানা। ৩০১. বিরিক্ষি- বৃক্ষ। ৩০২. কাইন্দা < কেঁদে। ৩০৩. চুইমকা < চমকিয়া, চমকে ৩০৪. শুকান- শুকনো ৩০৫. পাও- পা ৩০৬. গাইড়া- গেড়ে, দেবে ৩০৭. ভুইলা- ভুলে ৩০৮. আইলাম < এলাম ৩০৯. পানির ব্যাগ- প্রবল তৃষ্ণা। ৩১০. মইরম/মরিয়ম-হযরত ঈসা (আঃ)এর মাতা। ৩১১. সিয়ানা-বিবাহের উপযুক্ত হওয়া। ৩১২. রাড়ি- বিধবা। ৩১৩ .জার- শীত। ৩১৪.ভাস্তি- ভাতিজি, ভ্রাতৃকন্যা। ৩১৫. নইঙ্গা ঠাইসে ঠাইসে- জপ করুক বেশি বেশি। ৩১৬. সোন- সন, সাল। ৩১৭. ত্যারোশো আটষট্টি সোনে- ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। ৩১৮. পাবলিকেরা- জনগণে। ৩১৯. উইনার- জয়ী। ৩২০. মাতায়- মাথায়। ৩২১. পেলেন- উড়োজাহাজ। ৩২২. জামাতিরা- জামায়াতে ইসলামীর লোকজন। ৩২৩. চাইর- চার। ৩২৪. ন্যাংটা- উলঙ্গ। ৩২৫. সায্য <

www.pathagar.com

সাহায্য। ৩২৬. পেসিডেন- প্রেসিডেন্ট ৩২৭. যাগোর- যাদের ৩২৮. শুইনা- শুনে। ৩২৯. বিদরে- মায়া করে। ৩৩০. রিফুজি- শরণার্থী। ৩৩১. মাইঙ্গা- চেয়ে। ৩৩২. খেনেই- কখনো। ৩৩৩. ভারী- বৃহত্তর অর্থে। ৩৩৪. জাগা- জায়গা। ৩৩৫. পিনসিপাল- প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ কে বোঝানে হয়েছে। ৩৩৬. হাতেম খাঁ- কৃষক নেতা হাতেম আলী খানের কথা বলা হয়েছে। ৩৩৭. হাসান চৌধুরী- ধনবাড়ীর জমিদার হাসান আলী চৌধুরীর কথা বলা হয়েছে। ন৩৩৮. ফৈরাদি- বিবাদী। ৩৩৯. ইয়াজ- রিয়াজ। ৩৪০. ডাইকে- ডেকে। ৩৪১. কইল- কিন্তু। ৩৪২. উঠাইয়ো- উচ্ছেদ না করে। ৩৪৩. মইলো- মারা গেল। ৩৪৪. পুইড়া- পুড়ে। ৩৪৫. অনবিচারে- অবিচারে। ৩৪৬. মাঙ্গে- প্রার্থনা করে। ৩৪৭. উতালা- উতলা, উৎকণ্ঠ। ৩৪৮. চইলে- চলে। ৩৪৯. কইরে- করে। ৩৫০. তাগোর- তাদের। ৩৫১. কাইটে- কেটে। ৩৫২. তাগোরে-তাদেরকে। ৩৫৩. কাছাড়ে-পাড়ে। ৩৫৪.ইতিম-এতিম। ৩৫৫.ডাইকা-ডেকে। ৩৫৬. গাড়ে- পুঁতে। ৩৫৭. আইলোরে- এলোরে। ৩৫৮. আনাইজ- বিভিন্ন প্রকার সবজি। ৩৫৯. গাই- গাভী। ৩৬০. ছাও- বাচ্চা। ৩৬১. আণ্ডাপাড়া- ডিমপাড়া। ৩৬২. কইয়ো- বলো। ৩৬৩. সোন- সন, সাল। ৩৬৪. ত্যারোশো পঁচিশ- তের'শ পঁচিশ। ৩৬৫. কাঁইপে- কেঁপে। ৩৬৬. চিরি- স্ত্রী, সহধীনি। ৩৬৭. রাইতে- রাতে, রাত্রিতে। ৩৬৮. ডাইকে- ডেকে, ডাকিয়া। ৩৬৯. শরীমা- শাশুড়ি মা। ৩৭০. কাইন্দা কাইন্দা- কেঁদে কেঁদে। ৩৭১. আন্দর বাড়ি- অন্দরমহল। ৩৭২. পোরকারে- প্রকারে। ৩৭৩. সাকিন- গ্রাম। ৩৭৪. ভাড়াইটা নাও- যে নৌকা বর্ষাকালে ভাড়ায় চলে। ৩৭৫. ওনার- তাঁর। ৩৭৬. বাদশাই- বাদশাহী। ৩৭৭. বিহানে- ভোরে। ৩৭৮. পূণ্যা- হালখাতা জাতীয় উৎসব। ৩৭৯. জন্নম-জনম। ৩৮০. ডিল-চেহারা। ৩৮১. যোগাইছে-যোগ্য হয়েছে। ৩৮২. ম্যায়া-মেয়ে। ৩৮৩. কড়া-শতাংশ। ৩৮৪. চকে- মাঠে। ৩৮৫. শইলে-শরীরে। ৩৮৬. সোন্দর-সুন্দর। ৩৮৭. বলদি- বদল। ৩৮৮. হাইটা- হেঁটে। ৩৮৯. তল- নিচ। ৩৯০. আইতে- রাতে। ৩৯১. নইলাম- নিলাম। ৩৯২. খবি- খবর। ৩৯৩. রাও- কথাবলা। ৩৯৪. কাইয়া- কাক। ৩৯৫. ধুড় - গলা। ৩৯৬. দিঘলা- লম্বা। ৩৯৭. মাছ টেংরা- মাছরাঙা। ৩৯৮. এছাই- এমনি। ৩৯৯. গোসসা- রাগ। ৪০০. উলাক দেয়- টাল্লা দেয়, ৪০১. পিন্দা- পরিধান। ৪০২. হাউস- আনন্দ। ৪০৩. বাগদিয়া- আনন্দধ্বনি দিয়ে। ৪০৫. গাইল পারে- গালি গালাছ করে। ৪০৬. কই- বলি। ৪০৭. পিষ্ঠ- পিঠ। ৪০৮. তাও- তা, উম। ৪০৯. গাহান- গান। ৪১০. প্যালা- ঠিকা দেওয়া। ৪১১. আটু- হাটু। ৪১২. মুতুলা- দাঁতের মাড়ি। ৪১৩. লাফা বাগুন- বড় আকারের গোল বেগুন। ৪১৪. চিনা- এক প্রকার খাদ্য শস্য। ৪১৫. করকরা ভাত- বাসিভাত। ৪১৬. আবাল- অল্প বয়সী বলদ গরু। ৪১৭. চেল্লা খায়- কাদামাটিতে পিছলে পরে। ৪১৮. ডেলা- চোখের মনি। ৪১৯. এবাতুরী- এখন পর্যন্ত। ৪২০. হোজে- পরিশোধ করে। ৪২১. বন্যি- বন্যি। ৪২২. ফরফরায়- চটপটে। ৪২৩. নাউয়ের ফুল- লাউয়ের ফুল। ৪২৪. ওল- গুপ্তাঙ্গ। ৪২৫. আগুন- অগ্রহায়ণ। ৪২৬. শাওন- শ্রাবণ। ৪২৭. কাতরে- কষ্টে। ৪২৮. দেওয়া- বৃষ্টি। ৪২৯. খেওয়া- খেয়া। ৪৩০. খেওয়ানী- ঘাটের মাঝি। ৪৩১. কালিদর- কালীদহ। ৪৩২. নইয়া- লয়ে। ৪৩৩. বেইলা- বেহুলা। ৪৩৪. মইলান- প্রক্ষালন। ৪৩৫. হস্তের- হাতের। ৪৩৬. বদলী- বদল ৪৩৭. ময়া- মায়া ৪৩৮. ছাইড়া- ছেড়ে। ৪৩৯. থুইয়া- রেখে। ৪৪০. দুইডা- দুইটা। ৪৪১. শালা- শ্যালক। ৪৪২. শালী- শ্যালিকা।৪৪৩. কাঞ্চা- কাঁচা। ৪৪৪. বইল- বলিও। ৪৪৫. চইলা- চলে। ৪৪৬. কদু- লাউ। ৪৪৭. পাইলা তোলে- লালন পালন করে বড় বানায়। ৪৪৮. বিরজা- বৈষ্ণব মতে এই নদী পার হয়ে গোলকধামে যেথে হয়, বীর্য। ৪৪৯. কুবমা- ভালবাসা। ৪৫০.

www.pathagar.com

হটর- বেশি কথা বলা। ৪৫১. ঘুঘরি- ঘুঙুর, ৪৫২. নথ- নাকের গহনা, ৪৫৩. খারু- পায়ের গহনা, ৪৫৪. টেংগুস পাইরা- ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে হাটা। ৪৫৫. মেচ পাইড়া ধুতি পরা- ছোট পাড়ের ধুতি। ৪৫৬. হাঁচি পানে- সাজানো পান। ৪৫৭. বোয়ালের হুরা- বোয়াল মাছের মাথা। ৪৫৮. ছাতা- ময়লা, বিরক্তসূচক শব্দ। ৪৫৯. হলুই- ঢেঁকির পেছনে ছিদ্র করে প্রবেশ করানো কাঠের দণ্ড বিশেষ। ৪৬০. নুট- ধান ভানার গর্ত বিশেষ। এই গর্তে ধান থাকে। ঢেঁকি প্রতিনিয়ত আঘাত করে এই ধান হতে চাল বের করে। ৪৬১. আলানী- উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেওয়া। ৪৬২. ছাইক কপাইলা- মন্দ ভাগ্য লোক। ৪৬৩. দুরমুইশা- ক্ষতিগ্রস্তকারী, যে ক্ষতি করে। ৪৬৪. ঢেকি- ধান ভানার যন্ত্র বিশেষ ৪৬৫. পারাইতে- পা দিয়ে ঢেঁকি চালাতে ৪৬৬. ঠেঙের বিষ- পায়ের ব্যথা। ৪৬৭. নুনদে- ননদে। ৪৬৮. ছাইক্ক্যা- ঘিরে ঘরা। ৪৬৯. হশুর- শ্বশুর। ৪৭০. নাত্তি- লাথি। ৪৭১. হিয়াল- শেয়াল। ৪৭২. ছপ্পন- শিকার ধরার জন্য নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকান। ৪৭৩. দেয়া সাইজা- বৃষ্টি সেজে। ৪৭৪. খরম- কাঠের তৈরী পাদুকা। ৪৭৫. কাগমাইরা- কাগমারী পরগণার বাসিন্দা। ৪৭৬. কারে- মাচায়। ৪৭৭. চিমবক্ষিলা- কৃপণ। ৪৭৮. চিমটি মাইরা- দুই আঙুলের অগ্রবাগে চাপ দিয়ে অল্প পরিমান দ্রব্য তোলা। ৪৭৮. ছাবা- চিবানো পানের অংশ বিশেষ। ৪৭৯. বান- বা। ৪৮০. রাখছাল- রেখেছিল। ৪৮১. উদ্দরে- উদরে। ৪৮২. মুত- প্রস্রাব। ৪৮৩. মইলে- মরলে। ৪৮৪. চিক্কির- উচ্চ স্বরে কান্না করে। ৪৮৫. পোষাইলো- পোহালো। ৪৮৬. গোণা- গণনা। ৪৮৭. চালুন- বাঁশের তৈরি ছাকনা। ৪৮৮. পানান- দোহানো। ৪৮৯. আড়িল- ষাঁড়। ৪৯০.

আড়িলডা- ষাঁড়টা। ৪৯১.ব্যাভার- উপহার। ৪৯২. হুইনা- শুনে ৪৯৩. হুমুন্দি < সুমুন্দি, স্ত্রীর বড় ভাই। ৪৯৪. নিমুরাইদা- মুরোদহীন। ৪৯৫. নোন্দের জামাই- ননদের স্বামী। ৪৯৬. খ্যাতার- কাঁথার। ৪৯৭.কুরকার- মুরগীর। ৪৯৮. ছাও- বাচ্চা। ৪৯৯. অবিয়তি- অবিবাহিত। ৪৯৫. ভজনহারা কাঙাল- ভক্তি জ্ঞানহীন ব্যক্তি। ৪৯৬. উদরে দিছাল- গর্ভে স্থান দিয়েছিল, ৪৯৭. কামাই- রোজগার। ৪৯৮. দণ্ডচারী- অল্প সময়। ৪৯৯. পন্থের পানে- পথের দিকে। ৫০০. থুইয়ো- রেখে। ৫০১. ছয়জন- ছয় রিপু। ন৫০২. খোশাল্লাদি- আনন্দ উচ্ছ্বাস। ৫০৩. হৃদ মাজারে- হৃদয় মাঝে। ৫০৪. তিলেক- ক্ষণকাল। ৫০৫. ধর- দীক্ষা নাও। ৫০৬. দশে ছয়ে ষোলজনা- পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ছয় রিপু মিলে ষোলজন। ৫০৭. দুমের ঘরে চাবি দিয়া- কুম্ভক সাধনা করে। ৫০৮. সমুদ্রে তুফান ভারী- দেহে প্রবল কামোত্তেজনা। ৫০৯. হাইলের শল্লা আইটে ধর- গুরুর চেহারার প্রতি নিরিখ রাখ। ৫১০. বাও- ভাব। ৫১১. অনরসিক- বেরসিক লোক। ৫১২. ছোলকা- খোলস। ৫১৩. নইলাম- লইলাম। ৫১৪. রানতে- রান্না করতে। ৫১৫. কিনচিত < কিঞ্চিৎ- অল্প। ৫১৬. দুযখের- দোজখের। ৫১৭. ছাইলা- ছেলে। ৫১৮. ডরাই- ভয় পাই। ৫১৯. জিয়ন্তে মরা- জীবন্ত মরা। ৫২০. দেয়া- মেঘ। ৫২১. ডাকিয়া- গর্জন করে। ৫২২. রাস- রাধাকৃষ্ণ লীলা। ৫২৩. নিহরে শিশির। ৫২৪. ঘোলা ঘোলা - নড়াচড়া করা। ৫২৫. থিতি - স্থির। ৫২৬. কালকুইটা- নাগিনী। ৫২৭. পনছিলো - পৌছিল। শব্দার্থ : ৫২৮. ছেইলা - ছেলে। ৫২৯. কাটারী - কাটার যন্ত্র। ৫৩০. ছেও - ছিন্ন করা। ৫৩১. ষাইট - মঙ্গলসূচক শব্দ। ৫৩২. বাঐ-বাবুই। ৫৩৩. আধার-আহার। ৫৩৪. নিগা-জন্যে। ৫৩৫. থুইয়া-রেখে। ৫৩৬. ই রাত্রি-এই রাত্রি।

www.pathagar.com

লোকাবাদ্যযন্ত্র

লোকবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে টাঙ্গাইল জেলায় দোতারাই সর্বাধিক জনপ্রিয়। টাঙ্গাইল জেলায় প্রায় গ্রামেই দুএকজন লোকগায়কের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব গায়কদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো দোতারা, আমরা জারিগান, ধুয়াগান, বাউলগান, মুর্শিদী গানসহ অন্যান্য গানে দোতারার ব্যবহার দেখি। সাম্প্রতিককালে নতুন বাউল শিল্পীরা দোতারার পরিবর্তে বেহালা বাজিয়ে গান গায়।

ক. বাঁশি

পল্লি সংগীতের প্রধান অনুসঙ্গি হলো বাঁশি। এক সময় টাঙ্গাইল জেলার প্রতি গ্রামেই দুই একজন বংশীবাদকের দেখা পাওয়া যেত। সাধারণত জ্যোৎস্নারাতে ভবঘুরে যুবক ছেলেরা বাঁশি বাজাত। জনশ্রুতি আছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নায়িকা রাধার মতো এ কালের অনেক নায়িকাই বাঁশির সুরে ঘর ছেড়েছে।

খ. একতারা

একতারার ব্যবহার টাঙ্গাইল অঞ্চলে কম। তবে বিরল নয়। বাউল গায়কদের মাঝে একতারার ব্যবহার দেখা যায়।

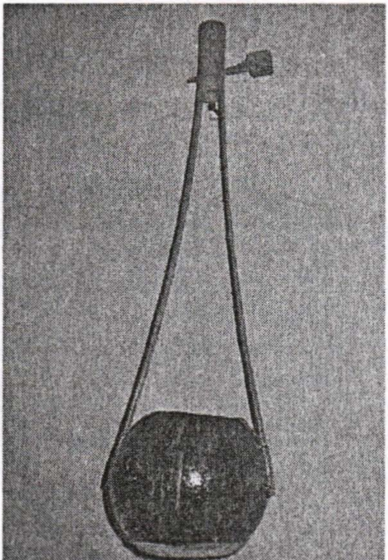

একতারা

www.pathagar.com

গ. হারমোনিয়াম

হারমোনিয়াম এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। ইউরোপের প্যারিসে ১৮৪২ সালে আলেকজান্ডার ডেবিয়ান এটি আবিস্কার করেন। সব ধরনের সংগীতে হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

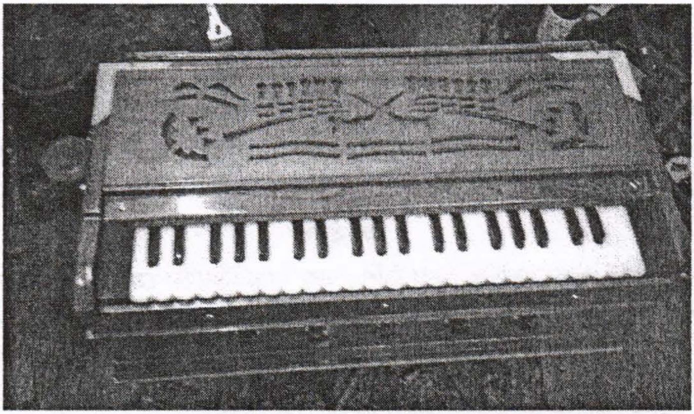

হারমোনিয়াম

ঘ. ঘুঙুর

জারির বয়াতি, সারিগানের বয়াতি এবং লাঠিখেলার খেলোয়ারদের পায়ে ঘুঙুর পরতে দেখা যায়।

ঙ. ঢোল

টাঙ্গাইল অঞ্চলের প্রত্যেক লোকগানেই ঢোলের ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে বাউল গান ও জারিগানে ঢোলের ব্যবহার দেখা যায়।

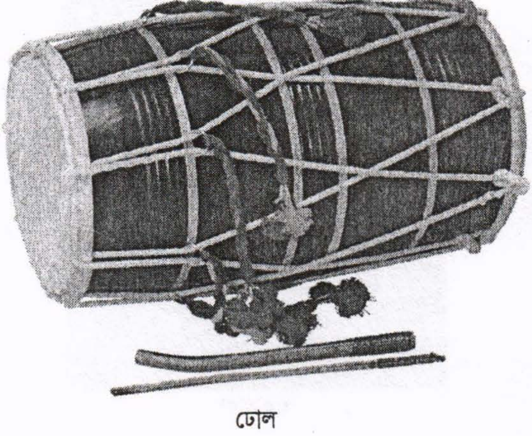

ঢোল

www.pathagar.com

চ. খোল

গ্রাম অঞ্চলে সাধারণত কীর্তণ ও ভজন গানে খোলের ব্যবহার দেখা যায়।

লোকজ বাদ্যযন্ত্র তৈরি করছেন

ছ. জুরি ও মন্দিরা

প্রত্যেক লোকগানেই মন্দিরার ব্যবহার আছে। মন্দিরা গানের তাল, ছন্দ ও লয়কে প্রাণবন্ত করে তোলে।

জ. গাবগুবাগুব

এই লৌকিক বাদ্যযন্ত্রটি বাউল ও মুর্শিদি গানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ঝ. টিকারা

বাইচের নৌকায় টিকারা নামক বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। বাইচের তাল ও ছন্দকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য টিকারা ব্যবহৃত হয়। বাইচের নৌকার পেছনে বসে বৈঠার তালে তালে দুইটি কাঠির সাহায্যে টিকারা বাজানো হয়।

ঞ. কাশর

বাইচের নৌকায় কাশর ব্যবহার হয়। সারিগানের তালের সাথে কাশরের শব্দের একটা সম্পূর্ণ রয়েছে।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

টাঙ্গাইল জেলায় বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো লোকউৎসব হয়। এ অঞ্চলের লোকউৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য অসম্প্রদায়িক চেতনা। ফলে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ লোকউৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব উৎসব সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। উৎসবের সন্নিকটে অস্থায়ী দোকান বসে। হাজার-হাজার মানুষের পদভারে ভরে ওঠে উৎসবস্থল। প্রাচীনকাল থেকেও কিছু উৎসব চলে আসছে। যেমন- গোপালপুর উপজেলার সূতী কাঙ্গালদাসের নটকা গোটার মেলা। এটি খুবই প্রাচীন। প্রতিটি উৎসবে মেলা থাকে দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত। নিম্নে প্রচলিত কয়েকটি লোকউৎসবের বিবরণ দেওয়া হলো।

ক. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব

বাংলা নববর্ষ, বৈশাখি উৎসব ও মেলা বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য। বাংলা বর্ষপঞ্জি প্রচলিত হওয়ার পর থেকে নববর্ষ পালন শুরু হয়েছে, এমনটি ধরে নেয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে ব্যবসায়ীরা বৈশাখি উৎসব পালনের সাথে হালখাতারও ব্যবস্থা করে। হালখাতা অনুষ্ঠানে গ্রাহকেরা বকেয়া অর্থ জমা দেয়, বিনিময়ে, দোকানদার, দাদনদার, মহাজন প্রভৃতি ব্যবসায়ীশ্রেণি গ্রাহকদের 'মিষ্টিমুখ' করে আপ্যায়ন করে। অতীতে প্রধানত জমিদারগণ নবাবদের অনুকরণে পুণ্যাহ ও বৈশাখি উৎসবের আয়োজন করতেন। ১লা বৈশাখকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করায় সকাল হতেই নগরের সকল পেশার মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে মেলা, মিছিল, আলোচনা সভা, গান-নাচের অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমোদ-ফূর্তির মাধ্যমে দিনটি উপভোগ করে। কোথাও ঘুড়ি উড়ানো হয়, কোথাও হাডুডু খেলা, পুতুলনাচ, কোথাও যাত্রাপালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে বৈশাখি মেলা এখন সর্বজনীন লোকোউৎসবে পরিণত হয়েছে। মেলায় দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে জড় হয়। কৃষক কৃষিপণ্য, শিল্পী-কারিগর হস্তশিল্প, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, তাঁতি তাঁতবস্ত্র, ময়রা মিষ্টান্ন ইত্যাদি সামগ্রী নিয়ে দোকানপাট সাজিয়ে বসে। মেলায় সার্কাস, সঙ, নাগরদোলা, ভোজবাজি প্রদর্শিত হয়। মেলায় আগত লোকেরা সারাদিন ঘুরেফিরে আনন্দ উপভোগ করে এবং যে যার মতো সংসারের উপযোগী এবং বাচ্চাদের খেলনা সংগ্রহ করে আনন্দে ঘরে ফিরে।[১]

খ. নবান্ন

নবান্ন উৎসব বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত। অনেক ফোকলোরবিদ এই লোকাচারকে লোকউৎসব বলে সমর্থন করেছেন। হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র

www.pathagar.com

করেই এই লোকউৎসবের সূচনা। আবার বলা যায় অগ্রহায়ণের প্রথম দিকে নতুন ধানের ভাত খাওয়া বা নতুন ধান ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করেই এর উদ্ভব।

নতুন ধান সংগ্রহ

সাধারণত টাংগাইলের মধুপুর অঞ্চলে ১লা অগ্রহায়ণ উপলক্ষে এই লোকাচারটি পালন করা হয়। বিশেষ করে গারো তরুণ-তরুণীরা আদিবাসী পোষাকে সজ্জিত হয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে। এটি গারোদের সর্ববৃহৎ সামাজিক উৎসব। এই উৎসবে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকে। মধুপুর অঞ্চলে ২/৩ দিনব্যাপী এই উৎসবের আয়োজন করা হয়।

নবান্ন উৎসব উপলক্ষে নৃত্য পরিবেশন করছেন মধুপুর অঞ্চলের গারো তরুণীগণ

www.pathagar.com

আবার অন্যান্য উপজেলাতেও মুসলমানগণ নবান্ন পালন করে থাকে। তবে তা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। এই অঞ্চলের মুসলমানেরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম শুক্রবারকে তাদের নবান্ন উৎসবের দিন হিসেবে মনে করে। তাই সেদিন তারা নতুন চালের পায়েস রান্না করে মসজিদে শিরনি দেয় এবং নতুন চাল, গুঁড়, কলা দিয়ে মেখে বাড়ির সব গরুকে খাওয়ায়। এভাবেই এ অঞ্চলে গারো, হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয়ে নবান্ন উৎসব পালিত হয়।[২]

গ. শব-ই বরাত

শব-ই বরাত এর বাংলা প্রতিশব্দ ভাগ্য বা সৌভাগ্য রজনী। মুসলমানদের নিকট এ রাতের মহিমা অপার। তাদের ধর্মীর বিশ্বাস এ রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দার সারা বছরের রিযিক বা ধনদৌলত ও ভাগ্যের ভাল-মন্দ নির্ধারণ করেন। মুসলমান ধর্মের লোকেরা এ রাতে নফল ইবাদত ও জিকিরে মগ্ন থাকে। শব-ই বরাতকে কেন্দ্র করে মধুপুর অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবে গড়ে উঠেছে কিছু রীতিনীতি। মহিমান্বিত এ রজনীকে উপলক্ষ্য করে বাড়ি বাড়ি হালুয়া রুটি এবং ভাল-মন্দ রান্না করা হয়। আলেম ওলামাকে দাওয়াত করে খাওয়ানো হয়। বাড়িতে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ গরীবদের মধ্যে ভালো খাবার বিতরণ করে। মসজিদে ইবাদত এর পাশাপাশি সমাজের সকলে মিলে মিলাদ মাহফিল ও তবারক বিতরণ করে থাকে। কোথাও কোথাও মসজিদকেন্দ্রিক শিরনি রান্না করে শেষ রাতে ইবাদত সমাপনের উপস্থিত সকলের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ রীতি ঐতিহ্যগতভাবে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।[৩]

ঘ. গায়েহলুদ

বিয়ের সম্পর্ক পাকাপাকি হওয়ার পর সাধারণত কনের বাড়িতে গায়েহলুদের অনুষ্ঠান করা হয়। বরপক্ষের লোকজন কনের বাড়িতে গিয়ে কনেকে হলুদ মেখে আসে বলে এর নাম হয়েছে গায়েহলুদ। গায়েগলুদ অনুষ্ঠানে হলুদ বাটা, সরিষা বাটা, মেহেদী পাতা বাটা, ধান, দূর্বা ও চাটিতে প্রদীপ জ্বেলে একটি ডালা বা কুলাতে তুলে কনের সামনে রাখা হয়। কনের গায়ে হলুদ মাখার সময় নানী, দাদী বা অন্য যে কেউ মেয়েলি গীত পরিবেশন করে থাকে। গান, কৌতুক ও হাস্যরসের পরিবেশনার মাধ্যমে গায়েহলুদের অনুষ্ঠান বিবাহের সাজ সাজ রব ফুটিয়ে তোলে। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার রান্না ও পরিবেশন করা হয়ে থাকে। বিয়ে স্থির হওয়ার পর বিয়ের অনুষ্ঠানের তিন চারদিন আগে থেকেই কনের মুখে নিয়মিত হলুদ মাখানো চলতে থাকে। মূলত কনের রূপ লাবণ্যকে আরও দৃষ্টিনন্দন করানোর উদ্দেশ্যেই কনেকে হলুদ মাখানো হয়। কালক্রমে এটি বিয়ের অবিচ্ছেদ্য একটি অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। হিন্দু সংস্কৃতিজাত হওয়া সত্ত্বেও এটি পরবর্তীকালে সর্বজনীন বাঙালি সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে।[৪]

www.pathagar.com

ঙ. ঈদ উৎসব

মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের দুটি ঈদই হয়ে ওঠে সবার জন্য অনেক আনন্দময় সম্মিলনের প্রধানতম উৎসব। বিশেষ করে রোজার ঈদের পর টাঙ্গাইলে বিভিন্ন অঞ্চলে ঈদমেলার আয়োজনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। রোজার ঈদকে ছোটো ঈদ আর কোরবানির ঈদকে বড়ো ঈদ বলে আখ্যায়িত করে থাকে এ অঞ্চলের মানুষ। এর নামকরণের সুনির্দিষ্ট কারণের ব্যাখ্যা কেউ বলতে পারেন না। এলাকা বা গ্রামভেদে এক থেকে সাতদিন, এমনকি ১৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে গ্রামীণ মেলা হয়ে থাকে। এই মেলা এখনো আলাদা মাত্রা নিয়ে ধনী-গরিব-নির্বিশেষ সকল শ্রেণিপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। মেলার কয়েক দিন আগে বিভিন্ন ধরনের রঙিন কাগজের পোস্টার, ব্যানার গ্রামের হাট-বাজারসহ ঘরবাড়িগুলোতে মেলায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে সেঁটে দেওয়া হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে। প্রচার-প্রচারণার জন্য আরও ব্যবহার করা হয় মাইক। মেলার আয়োজকদের পক্ষ থেকে নানা বৈচিত্র্যময় উপকরণের কথা বলে মানুষকে আকৃষ্ট করার নানা কৌশল গ্রহণ করে থাকে। সাধারণভাবে এসব মেলায় প্রধান আকর্ষণ থাকে, বাচ্চাদের খেলনার বিভিন্ন মনোহারি সামগ্রী। চিত্তবিনোদনের জন্য থাকে পুতুল খেলা, স্থানীয় ও জেলা শহর থেকে আনা শিল্পীদের পরিবেশিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনেক সময় মঞ্চস্থ হয় যাত্রাপালা। কোনো বছরে আয়োজন করা হয় সার্কাস খেলারও। এছাড়াও গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খেলারও আয়োজন করা হয়ে থাকে– যেমন সাইকেল বাইচ, মোটরসাইকেলের গতি সবচেয়ে ধীরে চালানো, ঘুড়ি ওড়ানো, শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, হাডুডু, হস্তচালিত নাগরদোলা প্রভৃতি। এই আয়োজনগুলো একদিকে যেমন আবহমান বাংলার শাশ্বত ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকেও চোখের সামনে সজীব করে তোলে। বিনোদনের জন্য পুতুল খেলা, বায়োস্কোপ ছাড়া আরো কিছু আনন্দদায়ক খেলার আয়োজন করা হয়।[৫]

চ. শারদীয় দুর্গোৎসব

শারদীয় উৎসবে টাঙ্গাইল জেলার প্রায় সব অঞ্চলই আনন্দমুখর থাকে। ঢাক-ঢোল-কাঁসার বাদ্যযন্ত্রে চার দিন প্রতিটি জনপদ উৎসবমুখর থাকে। প্রতিটি মণ্ডপ ঘিরে চার-পাঁচ দিনের মেলা বসে। মেলাতে বসা দোকানের মালিক অধিকাংশই মুসলিম। মুসলিম গ্রামবাসীরাও মেলায় ছুটে আসেন। পূজার তিন-চার দিন হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে পূজামণ্ডপে ও মেলায়। কোনো হিন্দু পরিবার ঘরে বসে থাকে না। নতুন পোশাক পরে আনন্দ-উল্লাসে তারা পূজা দেখতে যান। সবচেয়ে বড় দুর্গোৎসব হয় টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায়। সেখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে বলে জানা যায়। প্রচুর দোকানপাট বসে। বিভিন্ন বাড়িতে ব্যক্তিগত ও গ্রামে সর্বজনীন পূজা হয়ে থাকে। সে সব স্থানেও আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। প্রগতিশীল প্রান্তিক সমাজের মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে আনন্দে শরিক হন। দুর্গাপূজায় মহিলারা দুর্গার দুঃখময় জীবনের গান গেয়ে থাকেন। দশমীর দিন দুর্গার বিসর্জন দেওয়া হয়।[৬]

www.pathagar.com

ছ. রথযাত্রা

রথযাত্রা হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এতে রথের উপর দেবতাদের মূর্তি স্থাপন করে রথ চালানো হয়। হিন্দ সম্প্রদায় প্রতি বছর রথযাত্রা উৎসব পালন করে থাকে। রথযাত্রা অনুষ্ঠান গোপালপুর উপজেলার সূতী কাঙ্গালদাস বড় পরিসরে হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে বিরাট বাজার বসে। এই রথযাত্রার মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্রে আসেন সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যকুণ্ডে স্নান করতে। এ সময় বৃন্দাবন থেকে এগারশ গোপিনীসহ যশোদা বাড়ি আসেন। ষোলোশো গোপিনী যার প্রধান রুক্ষিণী। কৃষ্ণ বলরামসহ নগরকীর্তনের ছলে যশোদাকে রুক্ষিণী জিজ্ঞাসা করে জানতে চান রাধা প্রেমলীলার স্বরূপ কি– তিনি বলতে না চাইলে তার পাপাচারীতে যশোদা দ্বাররক্ষী হিসেবে সুভদ্রাকে রেখে তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা দিতে থাকেন। এই সময় নগর প্রদক্ষিণ শেষে কৃষ্ণ এসে হাজির হলে যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপস্থিতি টের পাননি। এ সময় প্রেমের বিস্ময়াভিভূত রূপ ধরে রাখার জন্য পুরীধামে এই প্রেমের রূপ নিহিত রাখা হয়। এটা হয় জগন্নাথের রথযাত্রা। দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনে রথে চড়ে যে যাত্রা হয় তাই রথযাত্রা হিসেবে ভক্তরা মেনে চলেন। এভাবেই এই জগন্নাথের রথযাত্রা হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বিরাট চাকাধারী রথ টেনে ভক্তরা টেনে নিয়ে যান। রথের উপরে ভক্তরা থাকেন, তার নীচে দল বেঁধে লোকজন টেনে নিয়ে চলেন নির্দিষ্ট পথে। গীত অনুষ্ঠান চলতে থাকে। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আর একাদশী তিথিতে হয় প্রত্যাবর্তন বা উল্টোরথ। অর্থাৎ রথটি প্রথম দিন যেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, আট দিন পরে আবার সেখানেই এনে রাখা হয়। একেই বলে উল্টোরথ।[৭]

তথ্যনির্দেশ

১. রাশেদ রহমান, বয়স : ৪৩ বছর, গ্রাম : রসুলপুর, উপজেলা : টাঙ্গাইল সদর। জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ ১৫-০৭-২০১১।
২. সাধন চক্রবর্তী, বয়স : ৬৯ বছর, গ্রাম : আকুরটাকুরপাড়া, ডাকঘর ও উপজেলা : টাঙ্গাইল সদর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ ৩০-০৭-২০১১।
৩. আব্দুস ছাত্তার পলাশী, বয়স : ৬০ বছর, গ্রাম : সূতীপলাশ, ডাকঘর : সূতী, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ ২৯-০৮-২০১১।
৪. ক্বারী মোঃ ইব্রাহিম, বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষা : ক্বারী পাশ, গ্রাম : দুর্গাপুর, পো : দুর্গাপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৮.১১.২০১১।
৫. মোঃ নজরুল ইসলাম, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪০, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৯.১১.২০১১।
৬. সৌরভ দেবনাথ, পেশা : ছাত্র, বয়স ২০, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা- গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৯.১১.২০১১।
৭. অজিত দেবনাথ, পেশা : ছাত্র, বয়স ২৫, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা- গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৯.১১.২০১১।

www.pathagar.com

লোকমেলা

ক . জামাই মেলা

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার রসুলপুর গ্রামে বৈশাখ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে বসে ঐতিহাসিক জামাই মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে এলাকার প্রায় ৩০-৩৫টি গ্রামের মেয়ের জামাইরা দাওয়াত পেয়ে মেলাতে মিলিত হন।

শ্বশুর-শাশুড়িরা জামাইকে মেলায় যাওয়ার জন্য দুইশ, পাঁচশ ও হাজার টাকা পর্যন্ত পরবি দিয়ে থাকে। মেয়ের জামাইরা সেই টাকা নিয়ে মেলায় গিয়ে মাটির জালা কোলা বোঝাই করে জুড়ি, বাতাসা, চিনির সাজ, মোয়া, গজা, জিলাপিসহ বিভিন্ন মিষ্টি দ্রব্য এবং খেলনা নিয়ে শ্বশুরালয়ে আসে। তাছাড়া এই মেলায় বাঁশের তৈরি খেলনা, শামুক, ঝিনুকের তৈরি তৈজসপত্র, মাটির তৈরি খেলনা ও মৃৎপাত্র, কাঠের তৈরি খাটপালং, চেয়ার-টেবিল, আলনা, সোকেচ, ড্রেসিং টেবিল, শোফা সেট ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে মেলায় আমদানি ও বিক্রি হয়। জামাইরা ঐসব জিনিসপত্র কিনে নেন, শ্বশুর-শাশুড়িরা মেয়ের জামাইকে ঐসব জিনিসপত্র কিনে দেন। মেলার প্রথম দিন সাধারণত জামাইরাই কেনাকাটা করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন মহিলারা কেনাকাটা করে। এই মেলায় নাগরদোলা, পুতুল নাচ, যাদুর খেলা, বানর নাচ, সাপের খেলা, সাইকেল ও বাই সাইকেল খেলার ব্যবস্থা থাকে। প্রায় শত বছর আগে থেকে এই মেলার আয়োজন হয়ে আসছে। জামাইদের মিলন মেলায় পরিণত হওয়ার জন্য এই মেলাকে 'জামাই মেলা' বলা হয়। মেলা উপলক্ষ্যে ৩০-৪০টি গ্রামের মানুষ সপ্তাহব্যাপী আনন্দ উৎসব করে।[১]

খ. মদনা মায়ের মেলা

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ছোট কালীবাড়ি টাঙ্গাইলের একটি প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী মন্দির। মন্দিরটি প্রায় ৪০০ বছরের পুরানো। এখানে মদনা মায়ের মেলা দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই মদনা মায়ের মেলার ইতিহাসে এতই প্রাচীন যে, তার সঠিক তথ্য কেউ দিতে পারে না। এই মেলা বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহের রবিবার দিন বসে। এই মেলার পূর্বে দীর্ঘ সময়কাল চড়ক গাছ ঘুরানো হতো। এখন চড়কগাছ ঘুরানো হয় না। মেলায় বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন রকম দ্রব্যদি আমদানি হয়। যেমন– আখড়ি, ঢেপের খই, বিন্নির খই, মৃৎশিল্পের অনেক কারুকার্যময় খেলনা ও পোড়াবাড়ির চমচমসহ অনেক মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।[২]

গ. নটকা গোটার মেলা

টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার একটি প্রাচীন গ্রামের নাম সূতী কাঙ্গালদাস। এখানকার সামন্ত প্রভূ ছিলেন দিকপাইতের বিখ্যাত জমিদার। তারই জমিদারিতে বসবাস করত পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক ও হেমলতা ভৌমিক। তাদের প্রায় দুই বিঘা জমিতে

www.pathagar.com

কাঙ্গাল দাস ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি বট-পাকুর গাছের বিয়ে দিয়েছিলেন। তার বিয়ে দেওয়া গাছ দুটি এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করে। কালক্রমে গাছের নিচে সাধু সন্ন্যাসীরা এসে আশ্রয় নেন। এখানে প্রতিবছর ২৫ জুন ১১ আষাঢ় নটকা গোটার মেলা বসে। মেলায় বিভিন্ন প্রকার জিনিসপাতি আমদানি হলেও নটকা গোটার আমদানিটাই সর্বাপেক্ষা বেশি হয় বলে এই মেলার নামকরণ করা হয়েছে 'নটকা গোটার মেলা'। এখানে কাঠের জিনিস, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, নানা রকমের মিষ্টি পাওয়া যায়। নটকা গোটার মেলার স্থানে রথযাত্রার মেলাও বসে। তবে রথযাত্রার মেলার চেয়ে নটকা গোটার মেলার নামই অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছে।[৩]

ঘ. বার তীর্থের মেলা

মধুপুর উপজেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শোলাকুড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত শোলাকুড়ি বাজারের সন্নিকটে বারতীর্থের দিঘি অবস্থিত। এ দিঘিটি হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট অতি পবিত্র। এ দিঘিকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর বৈশাখ মাসের অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত হয় পুণ্য স্নানের উৎসব। সারাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীপুরুষ এসে সমবেত হয় এখানে। এ উপলক্ষ্যে এখানে জমে উঠে এক অনবদ্য গ্রাম্য মেলা। বৈশাখ মাসের অমাবস্যার দিন সন্ধ্যা বেলায় বিভিন্ন স্থান থেকে আগত হিন্দুরা বারতীর্থের দিঘির উত্তর কোণায় একটি অস্থায়ী বেদি স্থাপন করে পূজার আয়োজন করে। সারারাতব্যাপী চলে পূজার কার্যক্রম। রাতভর দিঘির চার পাড়ে চলে মেলার কেনাবেচা। নানা ধর্মের এবং বয়সের মানুষের অংশগ্রহণে মেলা জমজমাট হয়ে উঠে। পরের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দিঘিতে শুরু হয় স্নান উৎসব। দুপুর বারোটা পর্যন্ত চলে স্নানের পালা। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে দীঘির পাড় থেকে মেলা উঠে অর্ধেক চলে যায় জামালপুর জেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের দড়িপাড়া গ্রামে। এবং বাকি অর্ধেক চলে যায় শোলাকুড়ি বাজার সংলগ্ন হাইস্কুল মাঠে। স্কুল মাঠে মেলা চলে দুই দিন। এখানে মেলা প্রাঙ্গণে রাতভর চলে নানা অনুষ্ঠান। নাগরদোলা, ব্যারাইটি শো, নাচ-গান, চুড়ি নিক্ষেপ ও জুয়ার আসরে নানা বয়সী মানুষের অংশগ্রহণ মেলাকে উৎসব মুখর করে তোলে। মেলার শেষ দিন চলে বউ মেলা। এদিন শুধু নারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে মেলা প্রাঙ্গন। পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। তবে নারী তার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় প্রবেশ করতে পারে। যুগ যুগ ধরে এ মেলা এই এলাকার মানুষের মধ্যে গড়ে তুলেছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক বন্ধন।[৪]

পাঁচ পিরের দরগা

মধুপুর উপজেলা সদরের উত্তরে দুর্গাপুর নামক স্থানে পাঁচ পিরের দর্গা অবস্থিত। এটিও মধুপুরের কিংবদন্তির আরেক নিদর্শন। দর্গাটির সঠিক ইতিহাস কেউ বলতে পারে না। এ দর্গাকে ঘিরে রয়েছে নানা জনশ্রুতি। কথিত আছে যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাঁচজন দরবেশ এখানে ইসলাম প্রচারে আসে। পথিমধ্যে একদল ডাকাতের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে পাঁচজন মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাঁদেরকে একত্রে পাশাপাশি কবর দেওয়া হয়। অন্যত্র শোনা যায় এই পাঁচ দরবেশ পাশের ডোবায় মাগরিবের নামাজের আগে ওযু করতে গিয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হন। এই পাঁচ দরবেশের সমাধি

www.pathagar.com

ক্ষেত্র পাঁচ পিরের দর্গা বা পঞ্চ পিরের মাজার হিসেবে খ্যাত হয়ে উঠে। প্রতি বছর এখানে শিরনি দেওয়া হয়। লোকে নানা কারণে মানত করে মনোবসনা পূর্ণ হবার আশায়।[৫]

তথ্যনির্দেশ

১. রাশেদ রহমান, বয়স : ৪৩ বছর, গ্রাম : রসুলপুর, উপজেলা : টাঙ্গাইল সদর। জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ ১৫-০৭-২০১১।
২. সাধন চক্রবর্তী, বয়স : ৬৯ বছর, গ্রাম : আকুরটাকুরপাড়া, ডাকঘর ও উপজেলা : টাঙ্গাইল সদর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ ৩০-০৭-২০১১।
৩. অধ্যাপক বাণীতোষ চক্রবর্তী, বয়স ৬৫, গ্রাম ও ডাকঘর : ডুবাইল, থানা- গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৮.৭.২০১১।
৪. মো. নুরুজ্জামান, বয়স ৬০, গ্রাম : ডুবাইল (আটাপাড়া), ডাকঘর : ডুবাইল, থানা- গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৮.৭.২০১১।
৫. সাধন চক্রবর্তী, বয়স : ৬৯ বছর, গ্রাম : আকুরটাকুরপাড়া, ডাকঘর ও উপজেলা : টাঙ্গাইল সদর, জেলা : টাঙ্গাইল। সংগ্রহ ৩০-০৭-২০১১।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. সাধভক্ষণ

গর্ভের সাত মাসকালে মেয়েলি সমাজে 'সাধভক্ষণ' অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সন্তান প্রসবকালে আমাদের সমাজে অনেক মহিলা মারা যেত। এজন্য কন্যা গর্ভবতী হলেই তার বাবা ও শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়-স্বজন কন্যা যা খেতে চায় তাই খাওয়ানোর চেষ্টা করে। কন্যাকে খাওয়ানোর এই অনুষ্ঠানের নাম সাধভক্ষণ। সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান সাধারণত স্বামীর বাড়িতে হয়। সেখানে পোয়াতির বাপের বাড়ির আত্মীয়-স্বজনদেরও দাওয়াত করা হয়। পোয়াতিকে মাঝখানে বসিয়ে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা ক্ষীর পায়েস খায়। আর বয়স্ক মহিলারা গান গায় এবং কামনা করে তার যেন ছেলে সন্তান হয়।

মেয়েলি সমাজের বিশ্বাস, পোয়াতিকে তার বাঞ্ছিত খাবার খাওয়ালে গর্ভের সন্তানও খাওয়ার ব্যাপারে অল্পে তুষ্ট থাকে। এজন্য টাঙ্গাইল অঞ্চলে সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়।

১.

বিলাতনের বাতাসা লো বিলাতনের বাতাসা
একখান একখান বাতাসা লো
একখান একখান বাতাসা।
মায়ে না আনছে লো নকশি পাইড়া শাড়ি লো
ফুপু না যে আনছে লো ফুলতোলা শাড়ি লো
বড় জেঠি রানছে লো,
কাঞ্চা সেওইর ক্ষীর লো
হাতে কাটা কাঞ্চা সেওইর ক্ষীর॥
কন্যা মধ্যে বইছে লো, ইষ্টি কুটুম ঘিরা লো
ক্ষীর খাইবো লো পুলাপান।
ডাকল দামান কনে লো।
যদি চুককা সেওইর খাড়া লো
পোলা অইবো বটে লো
যদি ক্ষীর ফাটে লো
ম্যায়া অইবো বটে লো।
বিলাতনের বাতাসা লো বিলাতনের বাতাসা
একখান একখান বাতাসা লো
একখান একখান বাতাসা।[১]

www.pathagar.com

২.

ছোট বউ আল্লাদি
সাত মাসের পোয়াতি
হাসুরিতে[১] সোয়াত[২] খাওয়াইবার চায় লো।
সোয়াত খাওয়াইবার চায়।
ঢোল ডগ্গর বাজাইয়া
পুলাপান নাচাইয়া
সাত পদে খঞ্চা না সাজায় লো
খঞ্চা না সাজায়।
ক্যাদা কেদি কইরা
গোসলও না সাইরা
পুলাপানে বইলো গোল দিয়া লো
বইলো গোল দিয়া॥
আল্লাদিরে কোলে নিয়া
আইলো দুলা মিয়া
বইলো গোলের মধ্যে গিয়া লো
গোলের মধ্যে গিয়া।
দুয়া দরুদ অইল কত
মানাছিনা আরও যত
মালিক নিরাপাদে দিও সোনার চান রে॥
হাসুরিতে সোনা দিল
রূপা দিল কাকি জেঠি
ঝলমলা বস্ত্র দিল ছোট পিসি রে।
ননদে আচার দিল
নোনাস[৩] দিল থালা
দাদীমা গলে দিল তারা ফুলের মালা রে
তারা ফুলের মালা॥
দান দক্ষিণা শেষ অইলো
দামান বউ কোলে নিল
সাধ খাওয়া শেষ অইলো রে॥[২]

২. খতনা

ইহুদি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে খাৎনার প্রচলন রয়েছে। বাঙালি মুসলমানদের খতনা উৎসব উপলক্ষ্যে গান বাজনার প্রচলন রয়েছে। এ সময় নানা রকম খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

১.

মাঘ মাইসা শীতের কালে
পোলাপানের বন্ধু আইছে

পোলাপান ক্যান পালায় গো
চ্যান কাটানির উক্ত যায়
ধইরা চ্যান কাটাও গো ॥
হাজাম ব্যাটা রহিম উদ্দি
বাড়ি যে তার বাথুরা
পোলাপানের বন্ধু সে যে
বড়ই চতুর কাটুয়া ॥
ময়তা থনে আইছে বন্ধু
নাম সোনাই খলিফা
গোসল করাও বন্ধুরে তার
বন্ধু বড়ই চতুরা ॥
কালমা পড়ায় সোনাই ব্যাটা
কন দিয়া কি কল্লো লো
চিকুর দিলো বন্ধু যে তার
সুন্নত অইয়া গেল গো ॥
সোনাই কয় রহিম উদ্দি
রহিম কয় সোনাই ভাই
বাড়িয়ালা বড়ই ধনি
বকশিস যেন সেরম পাই ॥
ধুতি দিব লুঙ্গি দিব
চাদরের সাথে পাঞ্জাবি
দশ ট্যাহা বকশিস দিবো
সিধা দিব মন ভরি ॥[৩]

২.

তোমরা সবে যাইও গো
আইজকা বিনুর ধোয়ানী
সাতদিন আগে কাটাইছে
আইজকা তার মাথায় পানি ॥
গোছলত করাইয়া তারে
ক্যাদা কেদি খেলিবা
ক্ষীর পোলাও খাইয়া সাথে
গায়ের পথে চলিল
ঘোড়াতে চড়িয়া বিনু
সাথে সর্দার ভাঙ্গে ডাক
রাজকুমারী দ্যাখে তারে

www.pathagar.com

পালকির দরজা কইরা ফাঁক
বর সাজে পাগড়ী পরা
বিনুরে না দেখিয়া
কন্যার বড় ভাল লাগে
মন যায় গলিয়া
মনে মনে কয়ও কন্যা
যাইব তোমার সাথে
পালকি না ঘুরাইয়া দিল
ঘোড়ার পিছু পথে ॥
রাজকন্যা দেইখা খুশি
হইল বিনুর মায়
বরণও করিতে তারে
চুঙ্গি হিরাতে গড়ায়
মনে মনে ভাবে কন্যা
হইল বিষম দায়
নাকও না বিন্দাইছে আমার
অভাগিনি মায়।
নাক বিন্দানি মাথায় পানি
এক সাথ হইয়া গেল
সর্দার দল এক হইয়া
ডাকও না ভাঙ্গিল
আল্লা আল্লা হরি হরি
ডাক ভাঙ্গিতে লাগিল ॥[৪]

৩. পৌষ-পার্বণ

পৌষ মাসের শেষ দিন এই পার্বণ উদ্‌যাপিত হয়। কৃষানিরা পার্বণের প্রায় ১৫ দিন আগে থেকে ঘর পরিষ্কার করেন। কৃষানিরা নানা ধরনের পিঠা তৈরি করেন। প্রতিটি পরিবারে আনন্দের ধুম পড়ে যায়। সারা মাস কৃষক-সন্তানরা ধানিজমি থেকে ধানের নাড়া সংগ্রহ করে বুড়ির ঘর তৈরি করে, সেটার মধ্যে মুলিবাঁশ দেওয়া হয়। একে কেউ বলে ভেড়াঘর, কেউ বলে ভেড়া-ভেড়ি। সেখানে সারারাত সবাই মিলে আনন্দ করে। অন্যের বাড়ির পিঠা এবং গাছের ফল চুরি করে সেই ঘরে বসে খায়। এতে গ্রামের মানুষ কিছু মনে করেন না। পার্বণের দিন ভোরবেলা হিন্দু পরিবারের ছেলে শিশুরা স্নান করে ভেড়াঘরে আগুন লাগায়। আগুন জ্বলে উঠলে মুলিবাঁশ বিকট শব্দ করে ফুটে উঠে, তখন সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে। পৌষ-পার্বণের সারাদিন লোকজন আনন্দে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ায় এবং পিঠা ও তিলুয়া দ্বারা আপ্যায়িত হয়। পৌষ-পার্বণের ঐতিহ্যকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এখনও ধরে রেখেছেন।[৫]

www.pathagar.com

৪. অন্নপ্রাশন

শিশুর মুখে প্রথম ভাত খাওয়ানোই অন্নপ্রাশন। হিন্দু সমাজে জন্মের ষষ্ঠ, সপ্তম কিংবা নবম মাসে পুত্রের এবং অষ্টম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান পালন করে। পুত্রের ক্ষেত্রে বেজোড় মাস ও কন্যার ক্ষেত্রে জোড়া মাসে অন্নপ্রাশনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাধারণত মামা কিংবা জেঠা শিশুর মুখে প্রথম ভাত তুলে দেয়। পুত্র বা কন্যাকে একটি স্বর্ণের আংটি ও নতুন কাপড় পরিয়ে নিকট আত্মীয়ের কোলে রাখা হয়। সোয়া সের দুধের পায়েস একটি থালায় রাখা হয়। মামা বা জেঠা একটি আংটি তিনবার পায়েশের ভিতর ডুবিয়ে তিনবার শিশুর নাকে গন্ধ শুকিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠবার যতটুকু পায়েশ আংটিতে ধরে তা শিশুর মুখে তুলে দেয়। অন্নপ্রাশনের সময় শিশুর নাম রাখা হয়। পুত্রের জন্য চৌদ্দ পুরুষের পিণ্ডি বা যজ্ঞ করে। কন্যার ক্ষেত্রে যজ্ঞের প্রয়োজন নেই। এরপর মামা বা জেঠা শিশুকে কোলে নিয়ে বাদ্য বাজনাসহকারে মন্দিরে নিয়ে প্রণাম করোনো হয়। অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে বাড়িতে ধুমধামের সঙ্গে ভুড়িভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে।[৬]

৫. আকিকা

আকিকা মুসলমান সমাজে শিশু নামকরণের একটি অনুষ্ঠান। ইসলামি শরীয়তে আকীকা একটি মুস্তাহাব আমল। তাই নবজাতক সন্তানের বাবার পক্ষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আকীকা করা মাস্তাহাব। শরিয়ত মতে আকিকা দিয়ে শিশুর নামকরণ করতে হয়। জন্মের ৭ম দিন না হলে ১৪তম দিনে আকীকা করার বিধান রয়েছে। তা সম্ভব না হলে ২১ দিনে তাও সম্ভব না হলে যেকোনো দিন আকীকা করা যাবে। পুত্রের জন্য একজোড়া এবং কন্যার জন্য একটি (ছাগল অথবা ভেড়া আবার গরু হলে একটি) জবাই করে আকিকা দিয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের দাওয়াত করে আকিকা অনুষ্ঠানে খাওয়ানো হয়। আগের দিনে আকিকার জবাইকৃত পশুর মাংস আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করা হতো।[৭]

৬. ষষ্ঠি

হিন্দু সমাজে ষষ্ঠিতে শাশুড়ি জামাইকে নিমন্ত্রণ করে। ষষ্ঠিতে জামাই-মেয়েকে নতুন কাপড়চোপড় দেওয়া হয়। ষষ্ঠির দিন শাশুড়ি একটি সাইটের ডালা নিয়ে পুকুর বা নদীতে গোছল শেষে বাড়ি ফিরে ষষ্ঠি ঠাকুরের পূজা করে। একটি পিঁড়া বা পাটিতে জামাইকে বসিয়ে সাইটের জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। শাশুড়ি সাইট সাইট বলে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে জামাইয়ের হাতে রঙিন সুতা বেঁধে দেয়। ষষ্ঠির অনুষ্ঠানে জামাইকে ফল মিষ্টান্নসহ পাঁচ প্রকার (মাছ, মাংস, ডাল, মুড়িঘণ্ট, ফল) খাদ্যদ্রব্য খাওয়ানো হয়। আড়াই দিন পর জামাই স্ব-গৃহে চলে যায়।[৮]

৭. মঙ্গলাচরণ

মঙ্গলাচরণ হিন্দু বিয়ের পূর্ববর্তী কনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। বরপক্ষ প্রথমে কনেকে তার বাড়িতে দেখে আসে। বরপক্ষের কনে পছন্দ হলে পরবর্তী সময়ে বিয়ের কথা পাকাপাকি করতে গিয়ে কনেকে মঙ্গলাচরণ করে। এ সময় বরপক্ষ একটি সোনার

www.pathagar.com

আংটি, মিষ্টান্ন ও বড় মাছ নিয়ে কনের বাড়িতে হাজির হয়। বরপক্ষ শুভবিবাহের মঙ্গল কামনায় কনেকে ধান-দূর্বা মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করে থাকে। কনে বরপক্ষে গুরুজনদের চরণে প্রণাম করে। এটিই মঙ্গলাচরণ।[৯]

৮. বউবরণ

বিয়ে করে পুত্র বউ নিয়ে স্ব-গৃহে ফিরলে বর-কনেকে বরণ করা হয়। বরের মাতা কিংবা প্রবীণা আত্মীয় প্রথমে বর ও পরে বউকে মাথায় ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করার রীতি হিন্দু সমাজে প্রচলিত। মুসলমান বিয়েতে মা প্রথমে পুত্র ও পরে বউকে দুধ পান করিয়ে বরণ করে। এ অঞ্চলে এভাবে নতুন বউকে বরণ করে ঘরে তোলা হয়। বউবরণ অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী নববধূকে একনজর দেখার জন্য গ্রামের মানুষ ভিড় করে।[১০]

৯. বৌভাত

টাঙ্গাইলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়েতে বৌভাতের প্রচলন আছে। সাধারণত বিয়েতে দু-দিন বা তিনদিন পর বরের বাড়িতে বৌভাত অনুষ্ঠিত হয়। বরপক্ষের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে। বৌভাত খাওয়া-দাওয়ার একটি উৎসব বলা যায়। কন্যা পক্ষ ও আত্মীয়-স্বজনকে পূর্বেই দাওয়াত করা হয়। বরপক্ষ, দাওয়াতি কন্যাপক্ষ ও আত্মীয়-স্বজন একত্রে বরের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে। এটি মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের বৌভাত অনুষ্ঠান নামে পরিচিত।[১১]

১০. ভাত-কাপড়

এখানে হিন্দু বিয়েতে ভাত-কাপড় আচারটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি বৌভাত অনুষ্ঠানে পালন করা হয়। বৌভাত অনুষ্ঠানে বর একটি থালায় পাঁচ প্রকারের খাবার কনের হাতে দিয়ে ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ দায়িত্ব গ্রহণকালে বর কনের পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে শাসন করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এটিই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভাত-কাপড় অনুষ্ঠান বলে পরিচিত।[১২]

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ নূরুর রহমান (গিনি), বয়স : ৫৫ বছর; পেশা : শিক্ষক, বানিয়ারা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, ২৯.১১.২০১১।

২. ঐ।

৩. ঐ।

৪. ঐ।

৫. মো. নজরুল ইসলাম, শিক্ষা : এম.এ, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪০, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, ২৯.১১.২০১১।

৬. অজিত দেবনাথ, পেশা : ছাত্র, বয়স ২৫, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা- গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৯.১১.২০১১।

www.pathagar.com

৭. মো. আ. করিম, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪৭ বছর, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৮. সুভাষ দেবনাথ : পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৪৮ বছর, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৯. বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, পেশা : চাকরি, বয়স : ৩৭, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা: গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
১০. মো. দেলোয়ার হোসেন, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪৮, গ্রাম : নিচনপুর, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
১১. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা: গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
১২. গৌরী দেবনাথ, পেশা : চাকরি (নার্স), বয়স : ২৫, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

শব্দার্থ : ১. হাসুড়ি- শাশুড়ি। ২. সোয়াত- সাধ। ৩. নোনাস- ননদ।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

কথায় বলে, মাছে ভাতে বাঙালি। কথাটা পুরোপুরি সত্য। টাঙ্গাইল জেলার কিছু অংশ বাদে অধিকাংশ ভূমি সমতল। সমতল অংশে ধান পাট প্রধান শস্য। এই জেলায় বিল বাওর ও নদী প্রধান অঞ্চল হওয়ায় এখানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ফলে এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য হলো ভাত ও মাছ। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে চিনা, কাউন ও ঢেঁপের ভাত খেতে দেখা যায়। তারা দেশি লাউ কুচি কুচি করে কেটে আতব চাউল দিয়ে ঝাউ রান্না করে। আবার অনেকে শুধু আটা দিয়ে পাতলা করে ঝাউ রান্না করে খায়। কাউন ও ঢেপের ভাত খেতে দেখা যায়। অভাবের সংসারে শুধু মশুরি কালাই সিদ্ধ করে খেয়ে দিন কাটাতে দেখা যায়। তবে এই অবস্থা এখন আর নাই।

টাঙ্গাইল জেলার জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু মুসলমান প্রধান। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। একেক অনুষ্ঠানে একেক রকম খাদ্যের প্রাধান্য থাকে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

১. পিঠা

পিঠা তৈরিতে টাঙ্গাইলের মেয়েরা অত্যন্ত পারদর্শী। বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে পিঠা থাকবে না, এটা কল্পনাই করা যায় না। এ অঞ্চলের কয়েকটি পিঠার বিবরণ তুলে ধরা হলো।

চিতই পিঠা

সিদ্ধ বা আতপ চাল উভয়ের গুঁড়ি দিয়েই চিতই পিঠা তৈরি করা যায়। পানিতে চালের গুঁড়া মেশানোর পর মাটির তৈরি সাজে আগুনের তাপে এ পিঠা তৈরি করা হয়।

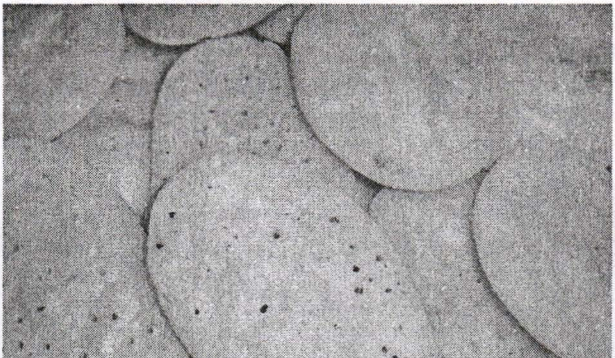

চিতই পিঠা

www.pathagar.com

শীতকালে এ পিঠার কদর অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। খেজুরের গুঁড় ও নারিকেল দিয়ে অথবা চিনি ও নারিকেল দিয়ে টাঙ্গাইলের মানুষ এ পিঠা খেতে বেশি পছন্দ করে। আবার চিতই পিঠা খেজুরের গুড় ও দুধ দিয়ে ভিজিয়ে খাওয়া হয়। টাঙ্গাইলের লোকজন এ পিঠাকে দুধের পিঠা বলে।[১]

তালের পিঠা

শরৎকালে তালপাকা মৌসুমে এ পিঠা খাওয়া হয়। পাকা তালের শাঁস পানিতে মিশিয়ে এর রসের সাথে চালের গুঁড়ি, লবণ ও নারকেল মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করা হয়। পরে কলাপাতায় পেঁচিয়ে খোলার উপর দিয়ে চুলায় সিদ্ধ করা হয়।

তেলের পিঠা

আতপ চালের গুঁড়া, খেজুরের গুড় বা চিনি, লবণ, নারকেল পানিতে মেশানো হয়। এরপর তেলে ভাজা হয়। সবসময় এ পিঠা তৈরি করা হলেও শীতকালে এর কদর বেশি। অতিথি আপ্যায়নে এ পিঠার গুরুত্ব অনেক বেশি।

পাটিসাপটা পিঠা

পাটিসাপটা পিঠা মূলত শীতকালেই বেশি খাওয়া হয়। এ পিঠা তৈরি করতে দরকার হয় চালের গুঁড়া, দুধের ক্ষিরসা, গুড় ও সয়াবিন তেল। গুড়, লবণ মিশিয়ে এর সাথে পানি মিশ্রণ করতে হয়। মিশ্রণটি খুব পাতলা করা যাবে না। এরপর চুলায় কড়াই বসিয়ে তাতে অল্প করে তেল ছড়িয়ে নেকড়া বা কলাপাতার ডাঁটা দিয়ে ঘষে ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হয়। পরে চালের গুঁড়ার মিশ্রণ গোল চামচে করে কড়াইয়ে ছেড়ে দিতে হয় এবং কড়াই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিশ্রণটি ছড়িয়ে দিতে হয়। পিঠার উপরিভাগ শুকিয়ে গেলে ক্ষিরসা দিয়ে অন্য পিঠ ঘুরিয়ে দিতে হয় এবং নামিয়ে চামচ দিয়ে চ্যাপটা করে পেচিয়ে দেয়া হয়।[২]

পুলি পিঠা

প্রথমে চালের গুঁড়া সিদ্ধ করে রুটির মতো পুরু করে বেলে এরমধ্যে চিনি অথবা গুড়, নারকেল দিয়ে বাঁশের চটা দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি করে কেটে তেলে ভেজে এ পিঠা তৈরি করা হয়। কখনো কখনো চিনি অথবা গুড়ের সিরায় ভিজিয়ে পরিবেশন করা হয়। এ পিঠায় নকশাও করা হয়। টাঙ্গাইল জেলায় এ পিঠাকে কুলি পিঠা বলা হয়।[৩]

পুলি পিঠা বা কুলি পিঠা

www.pathagar.com

ভাপা পিঠা

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো টাঙ্গাইলেও ভাপা পিঠা খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। চালের গুঁড়া, নারকেল ও গুড় দিয়ে তৈরি করা হয়। চালের গুঁড়া খুব বেশি মিহি করা হয় না। চুলার তাপে ভাপের সাহায্যে এ পিঠা তৈরি করা হয় বিধায় এর নাম ভাপা পিঠা। পিঠা তৈরির কাজে সুতির কাপড় ব্যবহার করা হয়। এ পিঠা শীতকালেই বেশি খাওয়া হয়।

শেই পিঠা

চালের গুঁড়া লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে হাতের সাহায্যে লতা দিয়ে ছোটোছোটো শেই তৈরি করা হয়। তারপর নারিকেল ও খেজুরের রস অথবা দুধ, চিনির সাহায্যে চুলায় রান্না করা হয়। শীতকালে এ পিঠার কদর খুব বেশি। নতুন অতিথি আপ্যায়নে এ পিঠার গুরুত্ব অত্যাধিক।[৪]

তথ্যনির্দেশ

১. মো. আ. করিম, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪৮, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, ২৯.১১.২০১১।

২. মো. আ. জলিল, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪৩, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, ২৯.১১.২০১১।

৩. মো. আ. মনসুর, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪৫, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, ২৯.১১.২০১১।

৪. বিপ্লব দেবনাথ, পেশা : ব্যবসা, বয়স ৩৩, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৯.১১.২০১১।

www.pathagar.com

লোকনাট্য

বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের বিশাল মানচিত্রে টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ জেলা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা লোকনাট্যেও টাঙ্গাইল জেলা বিশেষ সমৃদ্ধ। গ্রামীণ জনজীবনের অক্ষরজ্ঞানহীন, অশিক্ষিত কিংবা অল্পশিক্ষিত মানুষের অন্তরের নির্যাস থেকে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো লোকনাট্যের উদ্ভব। লোকজীবনভিত্তিক কাহিনি অবলম্বন করে সহজ সংলাপ, বন্দনা, চরিত্র, সংগীত, নৃত্য ও হাস্য-কৌতুকের সমন্বয়ে যা উন্মুক্ত আসর কিংবা মঞ্চে পরিবেশিত হয়, তাই-ই লোকনাট্য। লোকালয় জীবন থেকে লোকনাট্য উদ্ভূত এবং বিষয়বস্তুগুলোও লোকজীবন নির্ভর। প্রাথমিক পর্যায়ে লোকনাট্যে ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় দেবদেবি বিষয়ক রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তি আশ্রয়ী কাহিনি অন্তর্ভূক্ত হলেও পরবর্তীতে ইতিহাস আশ্রয়ী, সামাজিক ও হাস্য-কৌতুকমূলক কাহিনি অন্তর্ভূক্ত হয়।

১. চন্দ্রতাপের পালা

ভূমিকা

ওরে আল্লাহ আল্লাহ কর বান্দা নবী কর সার
নবীরও কালেমা পইড়া[১] হইয়া যাবা পার।
খালি[২] আল্লাহ বইলো[৩] না গো রাসুল হয় ব্যাজার[৪]
আখেরই আইয়াল[৫] পন্থে কে তরাবে আর ॥
তাই আল্লাহ বলে ভাঙ্গি বাজার রাসুল বলে রাখি
লাগাইয়াছি চান্দের বাজার দিনডা চারি[৬] দেখি।
শোন রে সুজন বান্দা যার ভাবে সেই থাক
আর হবে না মানব জরমো[৭] আল্লাহ বলে ডাক ॥
আইজি[৮] মরণ কাইলি[৯] মরণ মরণ একদিন আছে
বান্দাকে চিরিজন[১০] কইরা জোম[১১] লাগাইয়াছে পাছে।
এইসব কতা কইতে আমার অনেক হবে পেরেশানি
কি হেকমতে[১২] রাখছে আল্লায় ডাবের মধ্যে পানি ॥
ডাবের মধ্যে পানিরে আল্লাহ নাইকোইলের[১৩] মধ্যে হাস[১৪]
মায়ে জানে বেটার[১৫] দরদ পরাণ পুড়ে বার মাস।
বিদ্যাশে বিপাকে যার গো বেটা মারা যায়
পাড়াপড়শি জানার গো আগে আগে জানে মায় ॥

www.pathagar.com

অষ্টগুণে পঙ্খমিলে দুইরা[১৬] গুণে মাছ
মাছে চিনে গভীর জল গো পংখিয়ে[১৭] চিনে গাছ।
যেইনা নারী রান্দে[১৮] বাড়ে ওগো স্বামীর আগে খায়
ভরা কলসের পানি দ্যাখো ত্বরাসে শুকায় ॥
সন্ধ্যাবালা[১৯] যেবা নারী ঘরের দুয়ারে দেয় বারি
লক্ষ্মী তখোন উইঠা বলে ছাড়লাম তরও বাড়ি।
সন্ধ্যাবালা যেবা নারী ঠ্যাং মেলিয়া বসে
তাহারও নাকেরও ব্যাসন[২০] ছয় মাসেতে খসে ॥
বনের শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা ডোয়া
নারীর শোভা সিঁথির সিঁদুর দইরার[২১] শোভা খেয়া।
সতী নারীর পতি গো যেমন পর্বতেরই চূড়া
অসতী নারীর গো পতি ভাঙ্গা নায়ের গুড়া ॥
ভাঙ্গা নায়ের গুড়া গো যেমন নটরবটর[২২] করে
অসতী নারীর গো পতি পন্থে পইড়া কান্দে জারে জারে।
নও রে আল্লাহর নাম রে বান্দা নও রে আল্লাহর নাম
নামাজ পড়ো রোজা গো রাখো আখেরই কাম[২৩] ॥

বন্দনা

পরথোমে[২৪] বন্দনা করি আমি পাক নিরাঞ্জন
যাহার নূরে পয়দা গো হইলো এই ত্রিভুবন।
তার শেষে বন্দনা করি দয়াল নবীজী
যাহার নূরে পয়দা গো হইলো আদমের ছবি ॥
তার শেষে বন্দনা করি শাহ মর্তুজ আলী[২৫]
যাহার জন্য সোনার মদিনা হইয়াছিল খালি।
তার শেষে বন্দনা গো করি দয়াল ফাতেমার
আঠার হাজার আলেম যার দাউনে[২৬] হবে পার ॥

তার শেষে বন্দনা করি আমি কালু গাজী পির
সোনার সিংহাসন ছাইড়া যারা হইছিলো[২৭] ফকির।
তার শেষে বন্দনা করি আমি দমেরই মাদার
তিলক দণ্ড দম ফুরাইলে সকলি আন্ধার[২৮]।
মাতা নিন্দা করবেন না গো গর্ভে দিছাল ঠাঁই
পিতা নিন্দা করলে গো পাপের সীমা নাই ॥
তাই ওস্তাদ-গুরু বইন্দা[২৯] গাবো শিক্ষাগুরুর পায়
যে ওস্তাদ হস্ত ধইরা আমায় শিখায় ডাইন ও বায়।
তাই হাইলা যুদি[৩০] হয় মুরুখখ খ্যাতের ভাঙ্গে আইল
ওস্তাদ যুদি হয় মুরুখখ সাগরিদে শোনে গাইল[৩১] ॥

www.pathagar.com

হানিফার যাত্রা

আল্লাহ আল্লাহ বল বান্দা আল্লাহর নামেই ধ্বনি
বিসমিল্লাহ বলিয়া হানিফ ঘোড়া ছাড়িল দক্ষিণি[৩২]।
দক্ষিণও মুল্লুকে হানিফ করিলো ভরমন[৩৩]
সে স্থানে না পাইল শিকার আলীরও নন্দন ॥
সে স্থানে না পাইয়া শিকার চাবুকখানি বুকে
তারপরে ছাড়িল ঘোড়া পশ্চিমও মুল্লুকে।
পশ্চিমও শহরে হানিফ করিলো ভরমন
আরে সে স্থানে না পাইল শিকার আলীরও নন্দন ॥

সে স্থানে না পাইয়া শিকার চাবুকখানি বুকে
তারপরে ছাড়িল ঘোড়া উত্তরও মুল্লুকে।
সে স্থানে না পাইয়া শিকার চাবুকখানি বুকে
তারপরে ছাড়িল ঘোড়া পুবেরও মুল্লুকে ॥

চন্দ্রতাপ ও হানিফার সাক্ষাৎ

পুবেতে আছিল ভাই রে পিপলেরও গাছ
ঘোড়াটা বান্ধিল মর্দ সেই দেরাগেরও সাথ।
আরে ঘোড়াটা বান্ধিল মর্দ দেরাগেরও সাথ
সেইখানেতে হইল গো দেখা চন্দ্রতাপের সাক্ষাৎ ॥
হানিফা বলছে শোন কন্যা শোন গো বয়সী নারী
বিয়াশাদি হইছে কিনা আছো গো কুমারী।
এই কোনো শহরে থাক ছিপাই কোনো শহরে ঘর
কিবা নাম তর[৩৪] মাতা গো পিতার কিবা নামটি তর ॥

মদিনাতে থাকি গো আমি মদিনাতে বাড়ি
আমার নামটি মুহাম্মদ হানিফ পিতা হযরত আলী।
এমন তো আবুইতা[৩৫] নাম গো কভু শুনি নাই
পিতার নামটি আছে নাইড়ার[৩৬] মাতার নামটি নাই ॥
এই কথা শুনিয়া হানিফ গোস্বায়ও জ্বলিল
চুল ধরিয়া কিল মারিলো গোটা দশ ও বারো।
কিলের চোটে আহুট[৩৭] কাটে ভাঙ্গলো পিঠের দারা
কাঁচা হাড় ভাঙ্গিলে ভাই গো না লাগিবে জোড়া ॥

হানিফার সাথে মোছে গেন্দা দেওয়ের সাক্ষাৎ

যাত্রা করে মোহাম্মদ হানিফ যাত্রার চিনে ভাও
আগে যাত্রা কইরা হানিফ বাড়ায় ডাইনও পাও।
চন্দনও চাবুকের কোরা কইষা মারে হরিকালীর গায়
ভাও ভাবিয়া হরিকালী শৈন্যে উইড়া যায় ॥

www.pathagar.com

কতোক দূরে যায় গো হানিফ শুধায়ে গমন
মকরবের[৩৮] ময়দানে যাইয়্যা দিছে দরশন।
মকরবের ময়দানে যাইয়্যা যখোনও পৌছিল
আচম্বিতে এক দেও[৩৯] হানিফার সামনে আসিল ॥

এছাই ভঙ্গিমা দেও সে নামে মোছে গেন্দা
হানিফার সামনে দেখায় নিরুপিয়া ধান্দা
নিরুপিয়া ধান্দা যখন হানিফা দেখিল
ওইখানে থাকিয়া হানিফ গোস্বায়ও জ্বলিল ॥
ওইখানে থাকিয়া হানিফার গোস্বা মনে হইল
মোছে গেন্দার ঘাড়ে ধইরা বর্জা[৪০] কিল মারিল।
কিলের চোটে মোছে গেন্দা মুর্ছা লাইগা লইল
তিনরোজ[৪১] বাদে বাদ[৪২] গো কহিতে লাগিল ॥
কোন্ শহরে থাকো ছিপাই[৪৩] কোন্ শহরে ঘর
কিবা নাম তর মাতা পিতার কিবা নামটি তর?
এই কতা শুনিয়া হানিফ ভাবিতে লাগিল
আপনারও দ্যাশের কথা কহিতে লাগিল ॥
মদিনাতে থাকি আমি মদিনাতে বাড়ি
আমার নাম মোহাম্মদ হানিফ পিতা হযরত আলী।
হযরত আলীর কথা যখন পরিচয়ও দিল
জারজার[৪৪] হইয়া দেও গো কান্দিতে লাগিল ॥
একদিন সে আলীর সনে আমার কথা হইছাল তেড়ি[৪৫],
সেইদিন কিলাইছাল[৪৬] কিল গো গুইণা[৪৭] আড়াই কুড়ি।
কিলের চোটে বুকে পিঠে লাইগা গেছাল খিল
সেদিন আলী করছাল[৪৮] গো দয়া মুখে দিয়া পানি ॥

আলীরও সমন্ধে তুমি হও গো পির ভাই
পারধুলা[৪৯] দেও গো সাহেব আমি মুরিদ[৫০] হইয়া যাই।
এই কথা শুনিয়া হানিফ ভাবিতে লাগিলো
তালপির মুরিদের কথা হানিফা বাতাইল[৫১] ॥
চাইর[৫২] কালেমা পইড়া দেও গো টুপি দিলো মাথে[৫৩]
বিসমিল্লাহ বলিয়া দেওয়ের গো ছড়ি দিলো হাতে।

হানিফাকে মোছো গেন্দা দেওয়ের বিবাহের প্রস্তাব

মোছে গেন্দা বলছে মুরশিদ শোন মন দিয়া
আজ্ঞা হইলে তোমায় আমি করাইতাম এক বিয়া ॥

সিংহ রাজার বাড়িখানা দেখতে পরিষ্কার
লংকাতে রাবণের পুরী রাখতে কারাগার।

www.pathagar.com

লংকাতে রাবণের পুরী রাখতে কারাগার
চন্দ্রতাপে নামে কন্যা আছে সেই রাজার ॥
কী বলিবো সেই কন্যার সুরতেরও কাহিনি
হানিফ বলছে মোছে গেন্দা আবার বলো শুনি।
বত্রিশ কোটি দন্ত বিবির গোঞ্জরে বেমর
অষ্টগজ মাথার চুল গো হাবিয়া চোমর ॥

চলনও গঞ্জনও বিবির আঁখি জ্বলেই ভুরু
অষ্টগজ মাথার চুল গো মান্‌জাখানি সরু।
একবার হেলে ডাইনে[৫৪] মান্‌জা আবার ঘুরে বায়
এমনও সরুয়া মান্‌জা মুষ্টে[৫৫] ধরা যায় ॥

সিংহরাজার বাড়িতে হানিফার যাত্রা

এই কথা শুনিয়া হানিফ কিবা কাম[৫৬] করিল
সিংহ রাজার বাড়ি বিলা[৫৭] রওয়ানা হইলো।
কতেক দূরে যায় রে হানিফ শুধায়ে গমন
রাজপথের মধ্যে যেনো চলছে মহাজন ॥

কতেক দূরে যায়রে হানিফ শুধায়ে গমন
সিংহ রাজার বাড়িত[৫৮] যাইয়া দিলো দরশন।
সিংহ রাজার বাড়িত যাইয়া যখনই পোনছিল[৫৯]
বারামখানা ঘরে যাইয়া দুইজন বসিয়া রহিল ॥
বারামখানা ঘরে যাইয়া দুইজন বসিয়া রহিল
চন্দ্রতাপের রূপ গো হানিফ নজরে দেখিল
চন্দ্রতাপকে দেইখা হানিফ অজ্ঞান হইল
মোছে গেন্দা বলছে আমার মুরশিদ মারা গেল ॥

ভরান ভাদ্দর[৬০] গো মাসে যেমোন[৬১] ফোটে কেওয়া ফুল
নারীরও সুরুত দেইখা হানিফ হইলো ব্যাকুল।

নরজা দেও ও হানিফার যুদ্ধ

এখানেকার কথা আমার এইখানেতে রইল
নরজা নামে দেওয়ের[৬২] কথা আমার মনে পইড়া গেল ॥
নরজা নামের দেও গো ছিল বিবির খেদমতগার
হানিফারে দেইখা দেও গো লাগল ভাবিবার।
আরে ইতুদুল্লা[৬৩] ছিপাই দেখি মুখে চাপদাড়ি
ওই ছোকরারও কাছে আমি যাব তাড়াতাড়ি ॥
কি হিন্দু কি মুসলমান গো আমি পরিচয়ও নিব
ওই ছোকরারে মাইরা[৬৪] আমি জলপানও করিব।

www.pathagar.com

পাহাড় পর্বত খাইছি কতো আমি থুইছি[৬৫] আশেপাশে
ওই ছোকরারে খাইব আমি মনেরও হাউসে ॥
হানিফা বলছে দেও রে তোর বংশের আছে দোষ
আমারে জলপান কইরা খাবা[৬৬] দুইডা অণ্ডকোষ।
এই কথা শুইনা দেওয়ের গোস্বা হইলো অতি
হা কইরা আইল দেও গো হানিফারও প্রতি ॥
তখন ঘোড়া সহিত মোহাম্মদ হানিফ উঠে শূন্যের পরে
তফাৎ থিকা[৬৭] নরজা দেও গো থাপরা[৬৮] দিয়া ধরে।
থাপরা দিয়া নইয়া গেল মুখেরও ভিতরে
হলকুমে ঢাবাইয়া নিল প্যাটেরও ভিতরে ॥

প্যাটের মধ্য যাইয়া হানিফ ভাবিতে লাগিল
খোদার হুকুমে ঘোড়ার জবানও ফুটিল।
পবন ঘোড়া বলছে সাহেব শোন মেরা[৬৯] বাণী
নাড়াইয়ের[৭০] সন্ধান সাহেব আমি কিছু জানি ॥
বাম হস্তে লাগাম খিছে কইষা মারো কোড়া
নরজা দেওয়ের প্যাটে তুমি দৌড়াও একবার ঘোড়া।
এই কতা শুনিয়া হানিফ কি বা কাম করিল
বাম হস্তে লাগাম খিছে কইষা কোড়া মারিল ॥

বাম হস্তে লাগাম খিছে কইষা মারো কোড়া
নরজা দেওয়ের প্যাটে হানিফ দৌড়াইলো ঘোড়া।
ঘোড়ার দাপটে দেও গো বলছে আল্লাহ আল্লাহ
মুসলমান ছেমরারে খাইয়া এ কি হইলো জ্বালা ॥
মুসলমান ছেমরারে খাইয়া এ কি দশা হইল
আইজ বুঝি প্যাটে আমার বাউগলা সান্দাইল[৭১]।
আইজ বুঝি প্যাটে আমার বাউগলা সান্দাইল
মুসলমান ছেমরারে খাইয়া এ কি দশা হইল ॥

আরে পবন ঘোড়া বলছে সাহেব তুমি কারবা পানে চাও
ধল্লা প্রেমের তলোয়ার তুমি টান দিয়া খসাও।
ধল্লা প্রেমের তলোয়ার তুমি টান দিয়া খসাও
নরজা দেওয়ের প্যাটে তুমি ওয়ার[৭২] যে বসাও ॥
এই কথা শুনিয়া হানিফ হেকমত করিলো
কোমড়ে দেওয়াল হানিফ মজবুতও রাখিয়া
ধল্লা প্রেমের তলোয়ার তিনি লইলেন খুলিয়া ॥

এছাই[৭৩] জোরে মারে কোপ সে নরজা দেওয়ের প্যাটে
নরজা দেও রে কাইটা[৭৪] হানিফ আসিলো বাহিরে।

www.pathagar.com

নরজা দেও রে কাইটা হানিফ বাহিরে আসিল
তফাৎ থিকা সিংহ রাজা নজরে দেখিল ॥
তফাত থোনে[৭৫] সিংহ রাজা নজরে দেখিল
আইজ বুঝি আবরু শরম সবই আমার গেল।
আইজ বুঝি আবরু শরম সবই আমার গেল
চন্দ্রতাপে নামে কন্যা সিংহ রাজার ছিল ॥

সিংহ রাজা ও চন্দ্রতাপ

চন্দ্রতাপে নামে কন্যা সিংহ রাজার ছিল
চন্দ্রতাপ চন্দ্রতাপ বইলা রাজায় ডাকিতে লাগিল।
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাকও দিল
চাইরো[৭৬] না ডাকের কালে কন্যা সামনে আসিল ॥

চন্দ্রতাপে বলছে বাবা বলি যে তোমারে
কি কারণে ডাকছ বাবা বলো গো আমারে।
সিংহ রাজা বলছে মাগো বলি যে তোমারে
কোনো থনে যান আইছে ছিপাই বড়ই জোর ধরে ॥
সেও বুঝি তোমারে আইজকা[৭৭] বিয়া কইরা চায় নিতে
এখন যাইয়্যা ধর রণ গো তাহার সাথে।
সিংহ রাজা বলছে মাগো আমার কতা নেও[৭৮]
আইজি রণে সাজাও তুমি তিরিশ কোটি দেও।
এই কথা শুনিয়া কন্যা কি কামও করিল
আন্দর[৭৯] মহলে যাইয়্যা দরশন দিল ॥

চন্দ্রতাপের গোসল

সীসার বাটি চুয়ারে চন্দন কাঁসার বাটিতে তেল
হেলিতে দুলিতে কন্যা গোসল ধুবার[৮০] গেল।
কতক দূরে যাচ্ছে কন্যা সুধায়ে গমন
সানুবান্দার ঘাটে[৮১] যাইয়া দিলো দরশন ॥

পাতা জলে নাইমা[৮২] কন্যা পাতা মাইলন[৮৩] করে
খাড়ু জলে নাইমা কন্যা খাড়ু মাইলন করে।
থোরা জলে নাইমা কন্যা থোরা মাইলন করে
কোমড় জলে নাইমা কন্যা কোমড় মাইলন করে ॥
বুক জলে নাইমা কন্যা বুক মাইলন করে
গলা জলে নাইমা কন্যা পঞ্চ ডুব মারে।
গোসলও করিয়া কন্যা ক্যাশে মারে ঝাঁকি
ছয়মাসের পন্থ নাগাদ হইলো শিলা বিষটি[৮৪] ॥

www.pathagar.com

রাজকন্যা চন্দ্রতাপের সাজন

ঐখান থোনে[৮৫] আইসা কন্যা কি কামও করিল
আন্দরও মহলে যাইয়া দরশনও দিল
আনিলো বেসরঝাপি খুলিলো ঢাকুনি
পাঁচ লোকে বাইছা[৮৬] তুলে আবই চিরুনি ॥
চিরলে চিরিয়া ক্যাশ গো ক্যাশ করিলো নড়া[৮৭]
ক্যাশের গোড়ায় গোড়ায় তুইলা নিলো মানিকেরই ঝরা।
চিরলে চিরিয়া ক্যাশ গো বামে বান্ধে খোঁপা
খোঁপার উপর তুইলা নিলো গন্ধরাজ আর চাঁপা ॥

সেই না খোঁপা বাইন্ধা কন্যা পিছ ঘুরাইয়া চায়
মন মতো না হইল খোঁপা আইলাইয়া[৮৮] ফালায়[৮৯]।
তারপরে বান্ধিল খোঁপা খোপার নামটি ধানী
বৈশাখ মাসে বিষটি হইলে খোঁপায় আটু[৯০] পানি ॥
সেই না খোঁপা বাইন্ধা কন্যা খোঁপার তরফ[৯১] চায়
মন মতো না হইল খোঁপা টান দিয়া খসায়।
তারপরে বান্ধিল খোঁপা খোঁপার নামটি সরু
খোঁপার আউলিত[৯২] বইসা ভাই রে বাঘে ধরে গরু ॥

সেই না খোঁপা বাইন্ধা কন্যা পিছ ঘুরাইয়া চায়
মন মতো না হইল খোঁপা টান দিয়া খসায়।
তারপরে বান্ধিল খোঁপা খোঁপার নামটি রুই
ঘরের তলে বসলে ভাই রে খোঁপায় ঠ্যাকে টুই ॥

এই নাগাদি খোঁপা বান্ধা শেষ হইয়া গেল
শাড়ি পরার কথা কন্যামনে উদয় হইল।
ওখন আনিলো বেসাব ঝাপি খুলিল ঢাকুনি
দশ লোকে বাইছা তুলে আগুন পাড়ের শাড়ি ॥

সেই না শাড়ি পিন্দা[৯৩] কন্যা পিঠ ঘুরাইয়া চায়
মন মতো না হইল শাড়ি টান দিয়া খসায়।
তারপরে পিন্দিল শাড়ি নামে মরিচমতি
ছয় মাসের পন্থে থোনে চোখে লাগে জ্যোতি
সেই না শাড়ি পিন্দা কন্যা শাড়ির দিকে চায়
মন মতো না হইল শাড়ি দাসি রে পরায় ॥
তারপরে পিন্দিল শাড়ি নামে তে হাজারি
এক পাইড়ে[৯৪] হাট বাজার গো আরেক পাইড়ে কাছারি।
সেই না শাড়ি পিন্দা কন্যা পিছ ঘুরাইয়া চায়
মন মতো না হইল শাড়ি দুই পায়ে পারায় ॥

www.pathagar.com

তারপরে পিন্দিল শাড়ি নামে গঙ্গাজল
শাড়ির মধ্যে লেখা আছে চান্দু সদাগর[৯৫]
সেই না শাড়ি পিন্দা কন্যা পিছ ঘুরাইয়া চায়
মন মতো না হইল শাড়ি টান দিয়া খসায় ॥

তারপরে পিন্দিল শাড়ি মধ্যে মধ্যে ডোরা
শাড়ি দেইখা পাগল হয় আশিকাইলা বুড়া[৯৬]।
সেই না শাড়ি পিন্দা কন্যা পিছ ঘুরাইয়া চায়
মন মতো না হইল শাড়ি টান দিয়া খসায় ॥
তারপরে পিন্দিল শাড়ি নামে মেঘনাই মতি
শাড়ির মধ্যে আঁকা আছে শামুক কেচা পাখি।
এ্যাগনা পক্কি[৯৭] মেঘনা পক্কি টগার গুয়া[৯৮] নাল[৯৯]
ডাইলে বইয়া ঘুঘুরে কয় ঠাক্কুর[১০০] গোপাল ॥
হাইরাজাতির পক্কিগুণা[১০১] ছেংগা ধইরা খায়
ইষ্টি কুটুম বাড়িত আইলে[১০২] আগেই কইয়া যায়।
ঝাঁক্কে[১০৩] উঠে ঝাঁক্কে বসে লাফে আধার খায়
ইষ্টি কুটুম বাড়িত আইলে আগেয় কইয়া যায় ॥
এই নাগাদি শাড়ি পিন্দা শেষ হইয়া গেল
আজব ঘটনা একটা মনে উদয় হইল ॥

চন্দ্রতাপ রাজকন্যার দেও আহবান

ঐখানে বসিয়া কন্যা কি কামও করিল
নতিরিশ মন দই ও দুধ জলপান করিল।
ওইখানে বসিয়া কন্যা ভাবিতে লাগিল
দেও দেও বইলা[১০৪] সে যে ডাকিতে লাগিল ॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
চাইরো না ডাকের কালে দেওগণ সামনে আসিল।
দেউগণে বলছে কন্যা বলি আপনারে
কি কারণে ডাকছেন কন্যা বলেন আমাগোরে ॥
চন্দ্রতাপে বলছে দেওগণ বলি যে তোমগোরে
কোন্‌থোনে যান আইছে ছিপাই বড়ই শক্তিধরে।
সেও বুঝি মোরে আইজকা শাদি কইরে চায় নিতে
এখনই তোমরা ধর রণ গো যাইয়ে তাহার সাথে ॥
এই কথা শুনিয়া দেওগণ চলে লম্ফ ভরে
দেখবরে মুসলমান ছেরা ক্যাছা[১০৫] জোর ধরে।
ওইখানে থাকিয়া কন্যা মুখে দিলা পান
ঘরে থোনে বাহির হইল পূর্ণিমার চাঁন ॥
ধীরে ধীরে যায় রে কন্যা ধম্‌কে ফালায় পাও

বসুমাতা উইঠা বলে নড়ে আমার গাও।
না লাগাইছে তামা কাসা না লাগাইছে সীসা
কোন কামিলে গড়াইছে তারে না পাওয়া যায় দিশা ॥
কতক দূরে যায় রে কন্যা সুধায়ে গমন
রাজপথের মধ্যে যে চলছে মহাজন।
আর কতক দূরে যায় রে কন্যা সুধায়ে গমন
মকরুবের ময়দানে যাইয়া দিল দরশন ॥

হানিফা ও দেওদের যুদ্ধ

মকরুবের ময়দানে যাইয়া যখনই পৌছিল
দেওগণে দেইখা হানিফার চিন্তা মনে হইল
দেওগণে দেইখা হানিফার চিন্তা মনে হইল
তলোয়ারের হাইতা তখন টান দিয়া খসাইল ॥
এছাই জোরে মারে কোপ সে দেওগণের ঘাড়ে
ছয়মাসের পন্থে যাইয়া দেওয়ের কাল্লা[১০৬] পরে।
এইভাবেতে পঁচিশ হাজার দেও কাটিয়া ফেলিল
অবশেষে দশ হাজার পালাইয়া গেল ॥
আরে সেইখানে চন্দ্রতাপে একেলাই রহিল
আরে সেইখানে চন্দ্রতাপে একেলাই রহিল
চন্দ্রতাপে বলছে ছিপাই বলি যে তোমারে
আগে আইসা হাইতা খুইলা ওয়ার করো মোরে ॥
আগে আইসা হাইতা খুইলা ওয়ার করো তুমি
শেষেতে বুঝিয়া নিও আমার ছিপাইর মর্দামি।
হানিফ বলছে ওহে কন্যা কি বলব তোর ঠাঁই
মুসলমান হইয়া জঙ্গ আগে করবার নিয়ম নাই ॥
এই কতা শুনিয়া কন্যা গোস্বায় জ্বলিল
তলোয়ারের হাইতা তখোন টান দিয়া খসাইল।
এছাই জোরে মারে কোপ সে হানিফার উপরে
ডাইন হাত বাড়াইয়া হানিফ তলোয়ারটা ধরে।
ডাইন হাত বাড়াইয়া হানিফ তলোয়ারটা ধরে
বাম হাতে পট[১০৭] করিয়া চন্দ্রতাপকে ধরে ॥
চন্দ্রতাপকে ধইরা হানিফ শূন্যে মারে পাঁক
চন্দ্রতাপকে ঘুরায় যেমন কুমারেরই চাক।
মাইরো[১০৮] না মাইরো না ছিপাই মাইরো না মোর জান
সত্য কইরা কইলাম আমি যৈবন করব দান ॥
এই কথা শুনিয়া হানিফ কি কাম করিল
শূন্যে থোনে হানিফারে জমিনে নামাইল।

www.pathagar.com

চন্দ্রতাপে বলছে ছিপাই বলি যে তোমারে
বিয়া করবার ইচ্ছা থাকলে চল আমার সাথে ॥

হানিফা ও চন্দ্রতাপের সিংহ রাজার বাড়ি গমন

এই কতা শুনিয়া দুইজন কি কাম করিল
সিংহ রাজার বাড়ির দিকে রওয়ানা হইল
কতোক দূরে যায় গো দুইজন সুধায়ে গমন
সিংহ রাজার বাড়িত যাইয়া দিলো দরশন ॥

ওইখান যাইয়া কন্যা কি কাম করিল
হানিফারে বসাইয়া দরজার আন্দরে যে গেল।
আন্দর মহলে কন্যা যখনই পৌঁছিল
দেখিয়া সিংহ রাজা জিজ্ঞাসা করিল ॥
সিংহ রাজা বলছে মা তোর মুখখান দেখি কালা
আইজ বুঝি তোমার মর্দামি রসাতলে গেলা।
চন্দ্রতাপে বলছে বাবা কি বলব তোমারে
সেও বেটারে বসাইয়া রাখছি দরজার পরে ॥
মক্কা থোনে আইছে ছিপাই নাইড়া মুসলমান
মালখানার ঘরে নিয়া কাটো দুইডা[১০৯] কান।
এই কথা শুনিয়া রাজা কি কামও করিল
তুরুক নামে এক পুত্র সিংহ রাজার ছিল ॥
তুরুক তুরুক বইলা রাজায় ডাকিতে লাগিল
তুরুক তুরুক বইলা রাজায় ডাকিতে লাগিল
একও ডাক দুইও ডাক তিনও ডাক দিল
চাইরো না ডাকের কালে তুরুক সামনে আসিল ॥
তুরুক মর্দে বলছে বাবা বলি যে তোমারে
কি কারণে ডাকছ তুমি বল তো আমারে ॥
সিংহ রাজা বলছে তুরুক বলি যে তোমারে
কোন্‌থোনে যান আইছে ছিপাই বড়োই জোর ধরে।
সেও বুঝি মোর কন্যা বিয়া কইরা চায় নিতে
এখন যাইয়া ধরো রণ গো যাইয়্যে তাহার সাথে ॥
আন্দর মহলে যাইয়া তুরুক কি কাম করিল
জঙ্গের সাজন গো তুরুক সাজিতে লাগিল।
ঢাল বান্ধে তলোয়ার বান্ধে কাফা উঠায় গায়
দশ মন গুণা[১১০] দিয়া কোমড়ও প্যাচায়।
ষাইট মইনা[১১১] লোহার জারা তুইলা নিলো গায়
আশি মইনা লোহার টপগো তুইলা লয় মাথায় ॥
ওইখান থিকা তুরুক মর্দ কি কাজ করিল

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে তুরুক মর্দ চইলা মেলা দিল।
কতোক দূরে যায় রে তুরুক সুধায়ে গমন
মকরমের ময়দানে যাইয়া দিলো দরশন ॥

হানিফ ও তুরুক রাজপুত্রের মধ্যে যুদ্ধ

মকরমের ময়দানে যাইয়া যখোনই পৌছিল
দেখিয়া মোহাম্মদ হানিফ সামনে আসিল।
হানিফ বলছে ওহে বালক বলি যে তোমারে
শিশু ছাইলা হইয়া আইছো জঙ্গ করিবারে ॥
শিশু ছাইলা হইয়া আইছো জঙ্গ করিবারে
আইজ খুশিভাবে বিদায় নাহি দিছে তর মায়ে ॥

এই কথা শুনিয়া তুরুক গর্জিয়া উঠিল
হানিফার সামনে বাদ গো কহিতে লাগিল
এই কথা শুনিয়া হানিফ গোস্বায় জ্বলিল
বজরা এক চাপট[১১২] গো হানিফ তার গালেতে মারিল ॥
চাপট খাইয়া তুরুক মর্দ বাবা বাবা বলে
ওইখানে থাকিয়া হানিফ লজ্জা পাইলো দেলে[১১৩]।
হানিফা বলছে যে বালক বলিযে তোমারে
আমি তোমার ভগ্নিপতি বাবা ডাকো কারে ॥
এই কতা শুনিয়া তুরুক কি কাম করিল
পটকানা[১১৪] মারিয়া তুরুক উইঠা দৌড় দিল।
দৌড় দিয়া যায় রে তুরুক ফিরা ফিরা চায়
আপনা ছায়া আপনি দেইখা নিজেই আছাড় খায় ॥
দৌড়াদৌড়ি পাইরা তুরুক আন্দরেতে গেল
দেখিয়া তায় সিংহ রাজা জিজ্ঞাসা করিলো।
সিংহ রাজা বলছে তুরুক এর মুখখান দেখি কালো
আইজ বুঝি তোমার মর্দামি রসাতলেই গেল ॥

সিংহ রাজা কর্তৃক হানিফার মস্তকে বাণ নিক্ষেপ

তুরুক মর্দ বলছে বাবা কি বলবো তোমারে
পরথমকার[১১৫] চাপটে দাঁত খসাইলো মোরে।
সিংহাসনে বইসা বাবা বাদশাই করো তুমি
এই রাজ্য ছাইড়া বাবা পলাইবো আমি ॥
এক কতা শুনিয়া রাজায় কি কামও করিল
উজির উজির বইলা রাজায় ডাকিতে লাগিল
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
চাইরো না ডাকের কালে উজির সামনে আসিল ॥

www.pathagar.com

উজির বলছে শোনেন রাজা বলি যে আপনারে
কি কারণে ডাকছেন রাজা বলেন তা আমারে।
সিংহ রাজা বলছে উজির বলি যে তোমারে
কোন্‌খোনে যান আইছে ছিপাই বড়ো জোর ধরে ॥
সিংহ রাজা বলছে উজির বলি যে তোমারে
বিশ লক্ষ বান শিগ্র আইনা দেও মোরে।
এই কতা শুনিয়া উজির কি কামও করিল
বিশ লক্ষ বান গো রাজার হাতে তুইলা দিল ॥
ওইখান থেকে সিংহ রাজা কি কাম করিল
ধীরে ধীরে সিংহ রাজা চইলা মেলা দিল।
কতক দূরে যায় গো রাজা সুধায়ে গমন
মকরবের ময়দানে যাইয়া দিলো দরশন ॥
মকরবের ময়দানে যাইয়া যখনই পৌছিল
দেখিয়া মোহাম্মদ হানিফ সামনে আসিল।
সিংহ রাজা বলছে ছিপাই বলি যে তোমারে
কোন্ শহরে থাক তুমি বলো তা আমারে ॥
কোন্ শহরে থাক ছিপাই কোন্ শহরে ঘর
কিবা নাম তর মাতাপিতার কিবা নামটি তর।
এই কথা শুনিয়া হানিফ কহিতে লাগিল
সিংহ রাজার কাছে বাদ গো কহিতে লাগিল ॥
হানিফ বলছে রাজা বলি যে আপনারে
বিশ লক্ষ বাণ গো মারবা[১১৬] কাহারও উপরে?
সিংহ রাজা বলছে ছিপাই বলি যে তোমারে
বিশ লক্ষ বান মারবো তোমার মস্তকের উপরে ॥

তোমায় বলি ওই হে রাজা মাইরো না গো বাণ
মাইরো না মাইরো না রাজা আমার না জান।
আমি বিনা আমার মায়ের আর তো কেউ নাই
জঙ্গ কইরা মইরা গেছে আমার দুই-ও ভাই ॥
এই কথা শুনিয়া রাজা গোস্বায় জ্বলিল
বিশ লক্ষ বান হানিফার মস্তকে মারিল।
অজ্ঞান হইয়া হানিফ জমিনে পড়িল
হানিফার পবন ঘোড়া ঘুরিতে লাগিল ॥
একেতো হানিফার ঘোড়া না খায় দানাপানি
সাত সমুদ্দুর[১১৭] দিলো পাড়ি খুরে না পায় পানি
ওইখানে থাকিয়া ঘোড়ায় কি কামও করিলো
ফাতেমার কাছে গিয়া কহিতে লাগিলো ॥

www.pathagar.com

হানিফার পুরীতে ঘোড়ার সংবাদ প্রেরণ

পবন ঘোড়ায় বলছে মাগো কি বলবো আপনাকে
আপনার পুত্র মারা গেছে মকরবের ময়দানে।
ফাতেমায় বলছে ঘোড়া বলি যে তোমারে
শিঘ্র কইরা দেও গো খবর বিবি জয়গুনেরে[১১৮] ॥
এই কথা শুনিয়া ঘোড়ায় কি কামও করিল
জয়গুনের বাড়িত যাইয়া দরশন দিল।
জয়গুনের বাড়িত যাইয়া দরশন দিল
বিবির পায়ে ছেলাম রাইখা ঘোড়ায় কহিতে লাগিল ॥

পবন ঘোড়ায় বলছে মাগো বলি যে তোমারে
তোমার স্বামী মারা গো গেছে মকরবের ময়দানে।
যখনই শুনিলো ঘোড়ার নিষ্ঠুর বাক[১১৯]
হায় হায় বলিয়া বিবি শিরে[১২০] দিলো হাত ॥
তোমায় বলছি পবন ঘোড়া বলি যে তোমারে
শিঘ্র কইরা দেও গো খবর সাহা বানুরে[১২১] ॥
এই কথা শুনিয়া ঘোড়া কি কামও করিল
সাহা বানুর বাড়িত যাইয়া দরশন দিল
বিবির পায়ে ছেলাম রাইখা ঘোড়ায় কহিতে লাগিল
বিবির পায়ে ছেলাম রাইখা ঘোড়ায় কহিতে লাগিল
পবন ঘোড়ায় বলছে মাগো বলি যে আপনারে
আপনার স্বামী মারা গো গেছে মকরবের ময়দানে ॥

এই কথা শুনিয়া বিবি কান্দিতে লাগিল
পবন ঘোড়ার কাছে তখোন কহিতে লাগিল
তোমায় বলছি পবন ঘোড়া বলি যে তোমারে
শিঘ্র কইরা দেও গো খবর বিবি সূর্য উজালেরে[১২২] ॥
এই কথা শুনিয়া ঘোড়া কি কাম করিল
সূর্যউজালের বাড়ি গো যাইয়া দরশন দিল
বিবির পায়ে ছেলাম গো রাইখা ঘোড়ায় কহিতে লাগিল।
পবন ঘোড়ায় বলছে মাগো বলি যে আপনারে
আপনার স্বামী মারা গো গেছে মকরবের ময়দানে ॥

যখনই শুনিলো ঘোড়ার নিষ্ঠুর না বাক
হায় হায় বলিয়া বিবি শিরে দিল হাত ॥
তরে বলি পবন ঘোড়া বলি যে তোমারে
শিঘ্র কইরা দেও গো খবর বিবি মল্লিকারে[১২৩]।
মল্লিকার বাড়ি গো যাইয়া দরশন দিল ॥
মল্লিকাতে বাড়িতে যাইয়া দরশন দিল

www.pathagar.com

বিবির পায়ে ছেলাম গো রাইখা কহিতে লাগিল।
পবন ঘোড়ায় বলছে মাগো বলি যে আপনারে
আপনার স্বামী মারা গো গেছে মকরবের ময়দানে ॥
যখনই শুনিলো ঘোড়ার নিষ্ঠুর না বাক
হায় হায় বলিয়া বিবি শিরে দিল হাত ॥

পাঁচ বিবি হানিফার নিকট গমন

একে একে পাঁচ বিবি একত্র হইয়া
মকরবের ময়দানের দিকে গেল রওয়ানা হইয়া ॥
মকবরের ময়দানে যাইয়া দরশন দিল
শূন্যে থনে জয়গুন বিবি নজরে দেখিল।
জয়গুন বলছে ফাতেমারে বলি যে তোমারে
আমার স্বামী যায় নাই মারা ঘুমে নিদ্রা গেছে।
এই কথা শুনিয়া তারা কি কাম করিল
আল্লাহর ইসিম তারা মুখেতে পড়িল ॥
আল্লাহর ইসিম তারা মুখেতে পড়িয়া
বিসমিল্লাহ বলিয়া ফুঁক দিলো হানিফারে চাইয়া।
এক ফুঁক দুই ফুঁক তিন ফুঁক দিল
চাইরো ফুঁকের কালে হানিফ জিন্দা[১২৪] হইয়া গেল ॥
বিবিগণকে দেখে হানিফার শরম নিন্দা হইল
ফাতেমার হুজুরে হানিফা বলিতে লাগিল
হানিফা বলছে মাগো বলি যে তোমারে
পাঁচ বিবি লইয়া যাওগা আপন দেশেতে ॥
ফাতেমা বলছে বাবা বলি যে তোমারে
জঙ্গের আর কাম নাই গো ফিরে চল ঘরে।
হানিফা বলছে মাগো বলি যে আপনারে
পাঁচ বিবি লইয়া যান গো আপনারই ঘরে ॥
পাঁচও বিবি লইয়া যান গো আপনারই দ্যাশে
আরো একবার লড়ব আমি সিংহ রাজার সাথে।
এই কথা শুনিয়া ফাতেমা কি কাম করিল
আপনার দ্যাশে গো যাইয়া দরশন দিল ॥
সেইখানে থাকিয়া হানিফ কি কাম করে
সেইখানে থাকিয়া হানিফ এ্যাছা হাই গো মারে।
সেইখানে থাকিয়া হানিফ এ্যাছাই হাই গো মারে
আষাঢ় মাইসা[১২৫] বিষটির ডাক গো হানিফার চিৎকারে।
হানিফা মারিল ভাই রে এমন হাঁকও হাঁক
গর্ভনারীর গর্ভ থাকলে গর্ভ হয় নিপাত ॥
ওইখানে থাকিয়া হানিফ কি কাম করিল

www.pathagar.com

ছাগলের পালে গো যেনো বাঘ সান্দাইলো[১২৬]।
ওইখান থেকে আবু হানিফ কি কাম করিল
সিংহ রাজার বাড়ির যাইয়া দরশন দিলো ॥
ষাইট[১২৭] গজ টিকি এক বামনের মাথায় ছিল
থাপরা[১২৮] দিয়া ধইয়া টিকি হানিফ মুইড়া দিল।
থাপরা দিয়া ধইয়া টিকি হানিফ মুইড়া দিল
সেইখান থেকে সেই বামনে উইঠা দৌড় দিল ॥

সিংহ রাজা ও বামনের মধ্যে কথোপকথন

বামনে বলছে সিংহ রাজা বলি যে তোমারে
সত্য কইরা কওছে[১২৯] রাজা কন্যা দিলা কারে?
সত্য কইরা কওছে রাজা কন্যা দিলা কারে
রাজা বলছে ওহে বামন বলি যে তোমারে ॥
রাজা বলছে ওহে বামন আমি নাহি জানি
বাড়ির মধ্যে আছে জামাতা পরিচয় লও তুমি।
ওইখানে থাকিয়া হানিফ কি কাম করিল
নিজে নিজেই মোল্লা সাইজা কালেমা পড়াইল।
ওই দ্যাশেরও যত বামন মুসলমান হইল
চন্দ্রতাপের জারি আমার তামাম[১৩০] হইয়া গেল ॥[১]

২. গাজী কালু চম্পাবতীর পালা

গর্ভ যন্ত্রণাকাতর রানি অজুপা সুন্দরীর গান

বয়াতি : ওগো মা বিষে অঙ্গ জ্বলিল আমার।
দোহাররা : মাগোবিষে অঙ্গ জ্বলিল আমার।
বয়াতি : একমাস দুইমাস মায়ের তিন মাস হইল।
দোহাররা : মাগোবিষে অঙ্গ জ্বলিল আমার।
বয়াতি : চাইর মাসের কালে মায়ের হাড়ে মাংসে জোড়া।
দোহাররা : মাগো বিষে অঙ্গ জ্বলিল আমার।
বয়াতি : পাঁচমাসের কালে মায়ের পঞ্চফুল ফুঁটিল।
দোহাররা : মাগো বিষে অঙ্গ জ্বলিলো আমার।
বয়াতি : ছয়মাসের কালে মায়ের ওঠতে বসতে বাজে।
দোহাররা : মাগো বিষে অঙ্গ জ্বলিল আমার।
বয়াতি : ছয়মাসের কালে মায়ের চক্ষে দেখে নীল।
দোহাররা : মাগো বিষে অঙ্গ জ্বলিল আমার।
বয়াতি : আটমাসের কালে মায়ে গড়াগড়ি যায়।
দোহাররা : মাগো বিষে অঙ্গ জ্বলিলো আমার।
বয়াতি : দশমাস দশদিন যখন পুরা হইয়া গেল।
দোহাররা : মাগো বিষে অঙ্গ জ্বলিলো আমার।

www.pathagar.com

বয়াতি : ভূমিষ্ঠে[১৩১] পড়িয়া বাচ্চা কাঁদিতে লাগিল।
দোহাররা : মাগো বিষে অঙ্গ জ্বলিল আমার।

রাজা জঙ্গনামার কন্যা পাঁচতলা বিবি ও সখীদের গান।

বয়াতি : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই (২)
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই।
বয়াতি : খারু জলে নাইমা কন্যা
খারু মইলান করে।
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই।
বয়াতি : গিরু জলে নাইমা কন্যা
গিরু মইলান করে।
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই।
বয়াতি : কোমর জলে নাইমা কন্যা
কোমর মইলান করে।
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই।
বয়াতি : বুক জলে নাইমা কন্যা
বুক মইলান করে।
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই।
বয়াতি : গলা জলে নাইমা কন্যা
গলা মইলান করে।
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই।
বয়াতি : কেশ জলে নাইমা কন্যা
কেশ মইলান করে।
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই।
বয়াতি : পঞ্চডুব দিয়া কন্যা কিনারেতে উঠে।
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই।
বয়াতি : ভিজা বসন রাইখা কন্যা
শুকনা বসন ধরল।
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই।

www.pathagar.com

বয়াতি : সখি যমুনার জল দেখতে ভালো
স্নান করিতে লাগে ভালো।
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই।
বয়াতি : যৌবন ভাসাইয়া নিল
ও সই যমুনার সোতে[১৩২]।
দোহাররা : জলের ঘাটে বাঁশি বাজে লো
কমলা আমরা জলে যাই

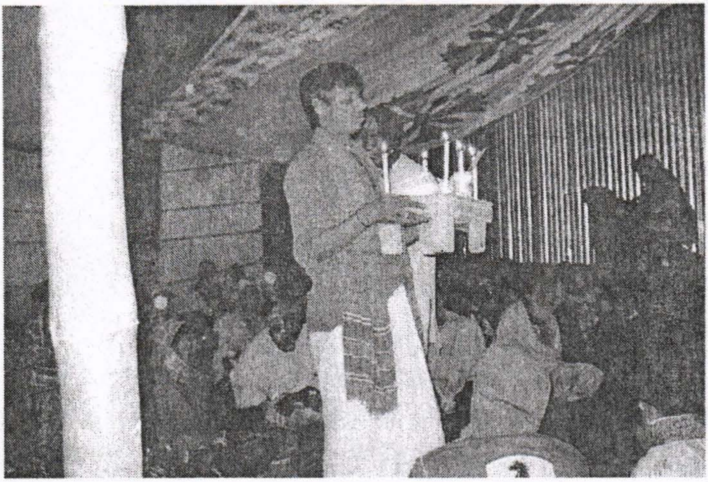

ঘর হতে 'গাজীর আসন' গানের আসরে আনা হচ্ছে

সন্তান জুলহাস-এর শোকে রানি অজুপা সুন্দরীর গান

বয়াতি : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন।
দোহাররা : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন।
বয়াতি : আগে যদি জানতাম বাবা যাইবা রে ছাড়িয়া।
অঞ্চলে বান্দিয়া রাখতাম বুকেতে ধরিয়া। (২)
দোহাররা : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন।
বয়াতি : মায়ের শোভা অইল ছেলে মা বলে ডাক দিব।
কোনো বা দেশ চিনি গো আল্লা কোনোবা দেশে যাব। (২)
দোহাররা : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন,
বয়াতি : কে বা আমায় মা বইলা ডাক দিব
আদর কইরা জড়াইয়া ধইরা মুখেতে চুমা খাব (২)
দোহাররা : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন।
বয়াতি : মরলে পড়ে দিতো মাটি নিত কান্দে করি
কামাই খাবার নাই গো আশা বাবা মইলে দিও মাটি। (২)

www.pathagar.com

দোহাররা : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন,
বয়াতি : মা জানে সন্তানের ব্যথা অন্যে তো জানে না
আমার মতো মা হইলে বুঝতো গো বেদনা। (২)
দোহাররা : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন।
বয়াতি : বিদেশে বিপাকে যার বেটা মারা যায়
দেশের কেহ না জানিলে আগে জানে মায়। (২)
দোহাররা : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন।
বয়াতি : দশমাস দশদিন বাবা রে রাইখ্যাছি উদ্দরে[১৩৩]
সেই সব দুঃখের কথা তোমার কি মনে পড়ে। (২)
দোহাররা : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন।
বয়াতি : এক অঙ্গ সইছি বাবা মাঘ মাইস্যা[১৩৪] শীতে
আর এক অঙ্গ সইছি বাবা গু আর মুতে। (২)
দোহাররা : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন।
বয়াতি : কোথায় রইল্যা প্রাণের আল্লা আমি ডাকি নত স্বরে
আমার বংশের বাতি আল্লা সইপা দিলাম তরে। (২)
দোহাররা : আমার বেটা শোকে গেল রে জীবন।

গাজি ফকিরি জীবন বেছে নেওয়ায় জল্লাদের হাতে সমর্পণ গাজির গান :

বয়াতি : নসিবের ফেরে যদি বিধি হইল রে বাম। (২)
দোহাররা : নসিবের ফেরে যদি বিধি হইল রে বাম।
বয়াতি : কোথায় রইল মা জননী দেইখ্যা যাও মোরে।
জন্মদাতা পিতায় দুঃখ দিল মোরে। (২)
দোহাররা : নসিবের ফেরে যদি বিধি হইল রে বাম।
বয়াতি : কাছে থাকতো যদি মা জননী তুইল্যা নিত কোলে
দোয়া করতো মা জননী আল্লার দরবারে। (২)
দোহাররা : নসিবের ফেরে যদি বিধি হইল রে বাম।
বয়াতি : মাগো তুমি দোয়া কর দুই হাত তুলিয়া,
তোমার বংশের বাতি জল্লাদে নেয় ধরিয়া। (২)
দোহাররা : নসিবের ফেরে যদি বিধি হইল রে বাম।
বয়াতি : আমার মারে কইও খবর বুঝাইয়া শুনাইয়া।
আমার খবর শুইন্যা মায় যাইব বেহুশ হইয়া। (২)
দোহাররা : নসিবের ফেরে যদি বিধি হইল রে বাম।
বয়াতি : মাগো তুমি কইর দোয়া অঞ্চল বিছাইয়া।
মায়ের দোয়া বড় দোয়া সন্তান দরিয়ায় ডুবে না। (২)
দোহাররা : নসিবের ফেরে যদি বিধি হইল রে বাম।

www.pathagar.com

বাদশাহীর পরিবর্তে ফকিরি পথ বেছে নেওয়ার অপরাধে বাদশা সেকান্দরের ছেলে গাজিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার ঘোষণা।

(গাজির গান)

বয়াতি : আমার কেহ নাই, ওরে কেহ নাই রে। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই, ওরে কেহ নাই রে।
বয়াতি : থাকতো জোড়ার ভাই[১৩৫] গো দাঁড়াই তো সামনে গো।
মরণকালে দেখলাম না মাগো তোমার চন্দ্র মুখ গো। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই, ওরে কেহ নাই রে।
বয়াতি : পরের মা'রে মা বলিলে বুকে লাথি মারে।
নিজের মা'কে মা বলিলে বুকে তুইল্যা ধরে। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই, ওরে কেহ নাই রে।
বয়াতি : ছেলে যদি যায় গো কভু বিদেশ চলিয়া।
মায়ের তখন চোখের জলে থাকে পথ চাইয়া। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই, ওরে কেহ নাই রে।
বয়াতি : কবে আইসা প্রাণের বাবা ডাকবে সামনে দাঁড়াইয়া।
মা তুমি কইর দোয়া আঁচল বিছাইয়া। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই, ওরে কেহ নাই রে।
বয়াতি : আইজ বাবা মোরে ক্রুদ্ধ হইয়া।
আমারে দেয় আগুনে ফালাইয়া। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই, ওরে কেহ নাই রে।

ফকিরান্তি পরীক্ষার জন্য বাদশা সেকান্দর গঙ্গা নদীতে একটি সুঁই ফেলে দিয়ে, গাজিকে তা খুঁজে বের করতে বলল।

(গাজির গান)

বয়াতি : গঙ্গা গঙ্গা বইল্যা ডাকিতে লাগিল (২)
দোহাররা : গঙ্গা গঙ্গা মা গো,
বয়াতি : মাগো তুমি কইর দোয়া
আল্লারী দরবারে।
বাবা আমায় নিঠুর হইয়া
সুঁই দিলো সাগরে (২)
দোহাররা : গঙ্গা গঙ্গা মা গো।
গায়েন : কোথায় রইল্যা গঙ্গা মাগো
দোয়া কইর মোরে
তোমার ছেলে যায় যে মারা
ওই দরিয়ায় পড়ে (২)
দোহাররা : গঙ্গা গঙ্গা মা গো।
বয়াতি : এক ডাক দুই ডাক

www.pathagar.com

তিন ডাক দিল
চাইর ডাকে কালে গঙ্গা
সামনে আসিল (২)
দোহাররা : গঙ্গা গঙ্গা মা গো।

ফকির হয়ে রাজত্ব ও মাকে ছেড়ে চলে যাবার সময় গাজির গান।

বয়াতি : ওঠ ওঠ মা জননী গো তুমি কত নিদ্রাই যাও
আমি ডাকি তোমার গাজী চক্ষু মেইল্যা চাও। (২)
দোহাররা : আমার মা মা গো।
বয়াতি : কাইল সকালে কাঁদবা মাগো বুকে থাপ্পর দিয়া।
পাগল হইয়া কাঁদবা মাগো মাথার চুল আউলাইয়া। (২)
দোহাররা : আমার মা মা গো।
বয়াতি : বিদেশ বিপাকে যার বেটা মারা যায়।
দেশের কেউ না জানিলে আগে জানে মায়। (২)
দোহাররা : আমার মা মা গো।
বয়াতি : এক অঙ্গ খাইছে মাগো গু আর মোতে[১৩৬]
আর এক অঙ্গ খাইছে মাগো মাঘ মাইসা শীতে। (২)
দোহাররা : আমার মা মা গো।
বয়াতি : ভিজাতে শুইছ মাগো শুকনায় রাখছ মোরে।
মা ডাক শুইন্যা মাগো তুইল্যা নিছ কোলে। (২)
দোহাররা : আমার মা মা গো।

গাজির গান পরিবেশন বেংরোয়া, নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

বয়াতি : ছেলে যদি যায় গো বিদেশ মা থাকে পথ চাইয়া।
হাসি মুখে মা ডাক দিয়া দাঁড়াবে সামনে আসিয়া। (২)
দোহাররা : আমার মা মা গো।

www.pathagar.com

বয়াতি : অল্প বয়সে মা কাঙালি মাগো বানাইলা আমারে।
আমারে না পাইয়া কাইল, কারে লইয়া বাহির হইব। (২)
দোহাররা : আমার মা মা গো।
বয়াতি : কে বা আমার বান্ধব হইয়া বাবা বলে ডাক দিব।
আমার মারে রাইখ্যা গেলাম আল্লা তুমি দেইখ্যা রাইখ। (২)
দোহাররা : আমার মা মা গো।
বয়াতি : সোনার পুরী আন্ধার[১৩৭] কইরা মাগো যাইতেছি ছাড়িয়া।
আমার লাইগা কইর দোয়া মাগো দুই হাত তুলিয়া (২)
দোহাররা : আমার মা মা গো।

মা নীলাবতীর কাছে প্রেম বেদনায় কাতর রাজকুমারী চম্পাবতীর গান

বয়াতি : কোথায় রইল্যা মনচোরা দেখা দেও আসিয়া
আরে প্রাণ আমার নিল গো নিলে। (২)
দোহাররা : প্রাণ আমার নিল গো।
বয়াতি : অঙ্গুরী বদলাইয়া গেছে
পালঙ্ক বদলাইয়া। (২)
দোহাররা : প্রাণ আমার নিল গো।
বয়াতি : আরে মরিব মরিব আমি
চোরার লাগিয়া। (২)
দোহাররা : প্রাণ আমার নিল গো।

মা নীলাবতীর রানির উদ্দেশ্যে কন্যা চম্পাবতীর গান

বয়াতি : কেন বা পিরিতি রে করলাম। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম্
বয়াতি : কোথায় গেলা প্রাণের বন্ধু
দেইখ্যা যাও মোরে। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।
বয়াতি : আগে যদি জানতাম তুমি
যাইবারে ছাড়িয়া। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।
বয়াতি : দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম
মাথার কেশ দিয়া। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।
বয়াতি : পাখি হলে উড়ে গিয়ে
করতাম আমি দেখা। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।
বয়াতি : মনের কথা কইতাম আমি
বিনাইয়া বিনাইয়া। (২)

www.pathagar.com

দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।
বয়াতি : মালা হলে রাখতাম আমি
গলাতে পড়িয়া। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।
বয়াতি : পানি হইলে রাখতাম আমি
অন্তরে ভরিয়া। (২)
বয়াতি : খোঁপা হইলে রাখতাম আমি
চুলেতে বান্ধিয়া। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।
বয়াতি : নারী হইলে বুঝতে পারতা
নারীর কি বেদনা। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।
বয়াতি : আমার জায়গায় হইলে বুঝতা
আমার কি বেদনা। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।
বয়াতি : আকাশেতে উড়ে পাখি দূরে
যায় চলিয়া। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।
বয়াতি : বিনা দোষে দোষি কইরা
যাইও না ছাড়িয়া। (২)
দোহাররা : কেন বা পিরিতি রে করলাম।

ঘুম থেকে স্বপ্ন ভেঙে চম্পাবতীকে না পেয়ে
ছোট ভাই কালুর উদ্দেশ্যে গাজীর গান।

বয়াতি : আমার কেহ নাই কেহ নাই রে। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই নাই রে।
বয়াতি : মাতাহারা পিতাহারা আমি এক পাপিরে।
থাকতো জোড়ার ভাইগো তুইল্যা নিল কাঁধেরে। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই নাই রে,
বয়াতি : কোথায় রইল্যা প্রাণের ভাইগো দেইখ্যা যাও আমারে।
বিদেশে আসিয়া মাগো দেখলাম না তোমারে (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই নাই রে।
বয়াতি : বিদেশ বিপাকে যার বেটা মারা যায় রে
আগে কেহ না জানিলে জানে আগে মায় রে। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই নাই রে,
বয়াতি : মরণকালে না দেখিলাম আমার মায়ের মুখ রে।
যার মইরাছে লায়েক বেটা[১৩৮] সেই জানে বেদনা রে। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই নাই রে।

www.pathagar.com

বয়াতি : আমার মায়েরে রাইখ তোমরা বুঝাইয়া শুনাইয়া রে।
ছেলে যদি যায় বিদেশে মা থাকে পথ চাইয়া রে। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই নাই রে।
বয়াতি : কবে আইসা প্রাণের বাবা মা বলে ডাক দিব রে।
পরের মায়রে মা বলিলে বুকে দিবে লাথি রে (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই নাই রে।
বয়াতি : নিজের মাকে মা বলিলে বুকে তুইল্যা নিবেরে
আদর কনরা বুকে তুইলা মুখে চুমা দিবে রে। (২)
দোহাররা : আমার কেহ নাই নাই রে।

চম্পা রানির প্রেমে আসক্ত হয়ে
ভাই কালুর উদ্দেশ্যে গাজীর গান

গাজী : কালার মাথায় দেইখ্যা আইলাম চুল হায় রে
রাজার মেয়ে মারল জাতি কুল হায় রে। (২)
দোহাররা : হায় রে রাজার মেয়ে মারল জাতি কুল।
গাজী : হার কালা দেহ কালা কালা মাথার কেশ।
তোর লাগিয়া ছাইড়া আইলাম বাপ মায়ের দেশ রে। (২)
দোহাররা : হায় রে রাজার মেয়ে মারল জাতি কুল।
গাজী : পুরুষের বসন্তকালে হাতে মোহন বাঁশি
নারীর বসন্তকালে মুখে মুচকি হাসি। (২)
দোহাররা : হায় রে রাজার মেয়ে মারল জাতি কুল।
গাজী : নদীর বসন্তকালে ভাঙে পারের মাটি
মাছের বসন্তকালে ধরে উজান ভাঁটি। (২)
আকাশে উড়ে পাখি দূরে যায় চলিয়া
জীবনে মরণে বন্ধু যাইও না ভুলিয়া। (২)
দোহাররা : হায় রে রাজার মেয়ে মারল জাতি কুল।
গাজী : বাপ ছাড়লাম মাও ছাড়লাম ছাড়লাম ঘর বাড়ি
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু হইলাম কলঙ্কিনী। (২)
দোহাররা : হায় রে রাজার মেয়ে মারল জাতি কুল।

মুকুট রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে কালুকে জল্লাদের হাতে
তুলে দিলে ভাই গাজীর উদ্দেশ্যে কালুর গান।

বয়াতি : ও গুণের ভাই ভাই রে আমার। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাই রে।
বয়াতি : ভাই জানে ভাইয়ের দরদ ভাই গো
অন্যে কি তাই জনে রে। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাই রে।
বয়াতি : ভাই হারাইলে ঘরে যাইয়া

www.pathagar.com

কারে ভাই বলিব রে। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাই রে।
বয়াতি : যদি ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে
দুয়ারে দেয় কাটা রে।
বিপদকালে উইঠা বলে আমরা
একই মায়ের বেটা রে। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাই রে।
বয়াতি : জোড়ার ভাই মরিলে গো আল্লা
ভাই বলিব কারে।
কোথায় রইলা মা জননী
দেইখ্যা যাও আমারে। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাই রে।
বয়াতি : মাগো তুমি কইর দোয়া
জায়নামাজ বিছাইয়ারে। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাই রে।
বয়াতি : মরণকালে আমি না দেখিলাম
মায়ের চন্দ্রমুখ রে। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাইরে।
বয়াতি : আমার মায়ে খবর পাইলে
যাইব বেহুশ হইয়ারে। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাই রে।
বয়াতি : কে বা আমার বান্ধব হইয়া
তুইল্যা নিব কোলে রে। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাই রে।
বয়াতি : লায়েক বেটা হইতাম মাগো
তোমার সিথানের প্রহরীরে। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাই রে।
বয়াতি : মরলে পড়ে দিতাম মাটি
নিতাম কান্দে করিয়ারে। (২)
দোহাররা : ও গুণের ভাই ভাই রে।

গাজির নির্দেশে কালুকে উদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণনগরে বাঘ নিয়ে যাত্রা

(বাঘদের নিয়ে গাজীর গান)

বয়াতি : বাঘ সাজিল সাজিল রে। (২)
দোহাররা : বাঘ সাজিল সাজিল রে।
বয়াতি : প্রথমে সাজিল বাঘ নামে বেড়াভাঙা।
তারপরে সাজিল বাঘ নামে খান দেওলা। (২)
দোহাররা : বাঘ সাজিল সাজিল রে।

www.pathagar.com

বয়াতি : তারপরে সাজিল বাঘ ধীরে ধীরে চায়।
আকাশে সূর্য যেন ধইরা খাইতে চায়। (২)
দোহাররা : বাঘ সাজিল সাজিল রে।
বয়াতি : তারপরে সাজিল বাঘ নামে ফুলেশ্বরী
পাইলে সে ভেড়ার মাংস খায় যে তাজা ধরি। (২)
দোহাররা : বাঘ সাজিল সাজিল রে।
বয়াতি : তারপরে সাজিল বাঘ নামে লোহা জুড়ি
পাইলে সে গরু মহিষ ঘাড়ে গিয়া ধরি। (২)
তারপরে সাজিল বাঘ ধীরে ধীরে চলে
পাইলে সে কুকুর বিড়াল ঘাড়ে গিয়া ধরে। (২)
দোহাররা : বাঘ সাজিল সাজিল রে।

৩. সঙযাত্রা

বাংলাদেশের লোকনাট্যের একটি অন্যতম শাখা 'সঙযাত্রা'। সঙযাত্রা 'সঙখেলা' নামেও পরিচিত। এটি একটি দলগত পরিবেশনা। সঙযাত্রার নির্দিষ্ট কোনো পাণ্ডুলিপি থাকে না। সঙদলের ম্যানেজার ও অন্যান্য শিল্পীরা একত্রে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সঙযাত্রার কাহিনি, গান ও সংলাপ তৈরি করে থাকে। সমসাময়িক ঘটনাকে উপজীব্য করে হাস্যরস, ব্যঙ্গরস ও আদিরসের সমন্বয়ে তৈরি হয় সঙ-এর কাহিনি। একটি কাহিনির মধ্যে একটি সঙ-এর সমাপ্তি হয়। কাহিনিও হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দুটো, তিনটা কিংবা চারটা দৃশ্যের মধ্যেই একটি সঙ-এর পরিসমাপ্তি ঘটে। সর্বোচ্চ সময় লাগে পনের মিনিট থেকে পঁচিশ মিনিট।

গ্রামের অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সঙযাত্রার দল। কাজেই সঙযাত্রায় হাস্যরস, ব্যাঙ্গরসের পাশাপাশি আদিরস বা অশ্লীলতার ভাগই থাকে বেশি। সঙযাত্রার নামকরণও হয়ে থাকে আঞ্চলিক ভাষায় এবং খুবই আকর্ষণীয়।

টাঙ্গাইল অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে পরিবেশিত কয়েকটি সঙযাত্রা পালার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. কিস্তি, ২. এ্যাঞ্জেনা, ৩. বিয়া বিয়া, ৪. তিলিং তিলিং, ৫. ঢাহা যামু ৬. বেকার বিলু, ৭. ফুটানি, ৮. ক্যাতুর কুতুর, ৯. ঘোতর ঘোতর, ১০. ফোট্‌টুয়েনটি, ১১. গাববুইড়া ছার, ১২. ঘোড়ার আণ্ডা, ১৩. বউ-শাশুড়ির ঝগড়া প্রভৃতি।

একটি সঙযাত্রার দুই থেকে পাঁচটি পর্যন্ত চরিত্র থাকে। সঙযাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো 'জোকার'। একটি সঙযাত্রা দলে একাধিক জোকার থাকে। অভিনয়, নৃত্য, সংলাপ, গান এ চারটি বিষয়ে পারদর্শী শিল্পীই সঙযাত্রার জোকার নির্বাচিত হয়। জোকারের পাশাপাশি অবশ্যই নারী চরিত্র থাকবে। তবে সংখ্যায় একজন কিংবা দুইজন। পুরুষরাই নারী সেজে অভিনয়, সংলাপ, নৃত্য ও গান গেয়ে থাকে। নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে অল্পবয়সী ও সুদর্শন কিশোর হতে হবে। জোকার ও নারী চরিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীর পায়ে ঘুঙুর থাকে। এছাড়াও থাকে দু'একটি পার্শ্ব চরিত্র। সঙযাত্রার চরিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

www.pathagar.com

১. কাইনছার মাও, ২. কোদাইলা, ৩. পটল, ৪. মতি, ৫. আচমকা, ৬. চুমুলি, ৭. ছেনদি, ৮. ছেনদা, ৯. কুইরা, ১০. কেতুইরা, ১১. কুইচা মুরগী ইত্যাদি।

সঙযাত্রায় চার/পাঁচ ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যেমন–

১. বাঁশের বাঁশি, ২. পাতার বাঁশি, ৩. খোল, ৪. করতাল, ৫. হারমোনিয়াম ইত্যাদি।

সঙ শিল্পীদের পোশাক, সাজ দুই ই অদ্ভূত ও বিচিত্র ধরনের।

ক) জোকারের পোশাক– ছেঁড়া ফুল প্যান্ট। এক অংশ হাঁটুর ওপর পর্যন্ত কাটা। জুতা- এক পায়ে একটি অথবা দু'পায়ের দুটো দুই মডেলের। সার্ট- এক হাতা বিশিষ্ট উল্টোভাবে নীচের বোতাম ওপরের ঘরে লাগানো হয়। চশমা- ছোট আকারের তৈরি বাঁশের ঠোনা বা ঠুলি। টাই- মোটা দড়ি দিয়ে তৈরি গলা থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত লম্বা। টাইয়ের নীচের মাথায় বদনি বাঁধা। অন্যান্য পুরুষ চরিত্রেও প্রায় একই ধরনের পোশাক থাকলেও জোকারের পোশাক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

খ) নারীদের পোশাক উপকরণ– চড়া রঙের খাটো পেটিকোট। ব্লাউজ, বক্ষবন্ধনী। গামারী গোটার মালা। কালো রঙের লম্বা পরচুলা অথবা বেনী। জুতা- চপ্পল অথবা হাইহিল। সঙযাত্রা শিল্পীদের সাজ গ্রহণের উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

১. সফেদা, ২. সিঁদুর, ৩. আলতা, ৪. কালি, ৫. আয়না, ৬. চিরুনি, ৭. বেলের কষ, ৮. নদীর পানি, ৯. ম্যাচের কাঠি, ১০. গামছা ইত্যাদি।

মঞ্চ কিংবা আসরের সন্নিকটে কোনো গৃহস্থবাড়ির কাচারি ঘর সঙযাত্রা দলের শিল্পীদের 'সাজঘর' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বছর চৈত্র মাসে চড়ক পূজায় নিয়মিত সঙযাত্রা হতো। এখন ততোটা হয় না। সামাজিক অস্থিরতা, ধর্মীয় গোড়ামী, গ্রাম্য কোন্দল, আর্থিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও হিন্দুদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান যেমন– বিয়ে ও অন্নপ্রাসন উপলক্ষে সঙযাত্রা হয়ে থাকে। দিনে কিংবা রাতে যেকোনো সময় সঙ পরিবেশিত হতে পারে। তবে রাতই সঙযাত্রা পরিবেশনের উপযুক্ত সময়। এ সময় মানুষের কাজ থাকে না। একই সঙ দলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পী থাকতে পারে। সঙযাত্রার পরিবেশনার সময় পরিধিকাল হয় প্রায় তিন ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা।

সঙযাত্রার মঞ্চ কোনো ধনী গৃহস্থবাড়ির ওঠোন, বাড়ির আঙ্গিনা কিংবা মাঠের মাঝখানে অথবা একপাশে নির্মাণ করা হয়। মঞ্চের চতুর্দিকে কিংবা তিন দিকে গোল হয়ে বসে দর্শক-শ্রোতা। শুধুমাত্র সুবিধাজনক স্থান দিয়ে শিল্পীদের আগমন-প্রস্থানের জন্য জায়গা রাখা হয়। চৌকি সাজিয়ে সঙযাত্রার মঞ্চ করা হয়। দর্শক-শ্রোতা সাধারণত খড়, ধারী বা চাটাই বিছিয়ে অথবা মাটিতে বসেই সঙযাত্রা উপভোগ করে।

পরিচয়গীত ও বন্দনাগীত সঙযাত্রার অপরিহার্য অংশ। সব সঙযাত্রাদলের পরিচয়গীত ও বন্দনাগীত প্রায় একই ধরনের। পরিচয় গীতে সঙযাত্রার নাম, দলের ঠিকানা, শিল্পীদের নাম, কে কোনো চরিত্রে অভিনয় করবে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়। একটি পরিচয়গীত নিম্নে তুলে ধরছি।

ভালো ফলদা গ্রামে
বীণাপাণি নামে

www.pathagar.com

সঙযাত্রার গান।
এই দলেরই ওস্তাদ আছে
বলাই বাবু নাম ॥
এই দলেরই ম্যানেজার আছে
সুধাংশু বাবু নাম ॥
এই দলেরই জোকার আছে
কার্তিক বাবু নাম ॥
এই দলেরই জোকার আছে
পবন বাবু নাম ॥
ভালো ফলদা গ্রামে
বীণাপাণি নামে
সঙযাত্রার গান ॥
এই দলেরই বাঈজি আছে
অতুল বাবু নাম ॥
ভালো ফলদা গ্রামে
বীণাপাণি নামে
সঙযাত্রার গান ॥

বন্দনাগীত

১.

করি দুনিয়া বন্দনা
ঘরের মানুষ ভালা না হইলে
সংসারই চলে না
করি দুনিয়া বন্দনা ॥

বন্দনাগীতের এই মূল পয়ারটির সাথে পূর্বে- ভানুশ্বর, পশ্চিমে- মক্কা শহর, উত্তরে- হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে- ক্ষীর নদীর সাগর ও ওস্তাদের নাম বন্দনা করে থাকে। বন্দনা গান শেষ হলে সঙয়ের পালার নাম ঘোষণা করা হয়। তারপর সঙয়ের গান গেয়ে সঙ পালার অভিনয় শুরু হয়।

সঙের গান

২.

এত বড় হইছি বাবা বিয়া করাও না।
বিয়া না করাইলে বাবা গো
তোমার ছাকনির হাডডি[১৩৯] থুমু না ॥
বেক্কের[১৪০] বাবা বিয়া করায় গো
আমার জাইরা[১৪১] বাবায় করায় না ॥
এবার বিয়া না করাইলে গো বাবা

www.pathagar.com

ছামনে পাত্রী পাওয়া যাবে না ॥
আমারে বিয়া না করাইও গো
ভাইরে বিয়া না করাইও গো
বাবা তুমি একখান করো না ॥[২]

৩.

কলির খেলা আজব নিলা
দেখবি যদি আয় ॥
বউরা সবে পাড়ায় ফিরে
বুড়িরে ঘুরাইয়া মার।
ছেলেরা সব তামাক ভরে
বউরা বসে ঠেং নাচায়[১৪২] ॥
ছোট বউ কয় ওলো দিদি
আমি কী সকলের বান্ধি।
মাঝ বউ কয় আমি রান্ধি
গোষ্ঠি শুদ্ধা খায় ॥
বউরা পিন্দে ঢাকাইয়া শাড়ি
ছিঁড়া তেনা পায় না মায় ॥[৩]
ও আমার আল্লাদের[১৪৩] স্বামী
ভাইয়ে আইছে নাওর নিতে
যাইতে দিবানি ॥

সঙ খেলা

স্বামী হাত ধরিয়া কই
স্বামী পায় ধরিয়া কই

www.pathagar.com

বাড়িতে আইছে শাখা আল্লাওয়ালা
রাইখা দিবানি ॥
এই নেও বাস্কের ছোরানি[১৪৪]
এই নেও টাংকের ছোরানি
বাড়িতে আইছে শাখা আল্লাওয়ালা
শাখা রাইখা দিবানি ॥[৪]

৫.

ও দাদা গো
দাদা ধরি তোমার পায়
বিয়ার বয়স পার হইয়া যায়
বিয়া কেনে না করাও
দাদা ধরি তোমার পায় ॥
ও দাদা গো
কন্যা একখান দেইখা আইলাম
গেরাম চাটাকুড়ি।
ঐ কন্যারে না পাইলে গলায় দিব দড়ি
দাদা ধরি তোমার পায়
আমি কী করি উপায় ॥[৫]

৬.

পিঁপড়ায় কয় লাথি দিয়া
রেল গাড়িটি ফেলে দেব
উরচুঙ্গায়[১৪৫] কয় উড়াল দিয়া
হেলিকপ্টার টাইনা আনব ॥
তাই দেখে কয় কালা কুকুর
আমি হবো কৃষ্ণ ঠাকুর (২)
কদম তলায় লেজ ঘুমাইয়া
সখিগণের মন জোগাব ॥
তাই দেখে কয় কুনি ব্যাঙে
কত মানুষ মইল আমার ঠ্যাঙে (২)
আমি লম্ফ দিয়ে লংকায় দিয়ে
রাবণ মেরে রাজা হবো ॥
তাই দেখে কয় জুনি পোকা[১৪৬]
কারেন্টের দাম বেশি টেকা (২)
ওরে আমার গোয়ায়[১৪৭] বাতি জ্বালাইয়া
পল্লী বিদ্যুৎ বিদায় করব।[৬]

www.pathagar.com

৭.

ব্যাঙে কয় দম্প[১৪৮] করে
আমি লম্ফ দিয়া লংকায় যাব
লংকায় যাইয়া রাবণ হব
সুখের রাজত্ব পাব ॥
শুইনা কয় ভেচকি কুকুর
আমি হবো কিষ্ট ঠাকুর
কদম তলায় বসে বসে
গুপিগণের মন যোগাব ॥
শুইনা কয় জোনাক পোকা
তৈলের দাম চল্লিশ টাকা
কেরাসিনের দ্বার দ্বারি না
আমরা গোয়া দিয়াই আলো দেব ॥[৭]

সঙ পালা

৪. বউ-শাশুড়ির ঝগড়া

চরিত্র	অভিনেতা
কেতুইরা	: জগদীশ চন্দ্র দত্ত
কেতুইরার মাও	: অতুল চন্দ্র দাস
হুবুচুনি	: হিজরা শহীদুল ইসলাম
হুবুচুনির মাও	: নিশিকান্ত দাস

প্রথম দৃশ্য

কেতুইরার মাও : বউ মা, বউ মা। আ-বউ মা, ও-বউ মা। কই, কতো, বেইল[১৪৯] অইলো[১৫০]। ঘোমে থিকা[১৫১] উঠো। উইঠা[১৫২] থালি-নোটা[১৫৩] মাইনজা[১৫৪] আত[১৫৫] মুখ ধুইয়া ভাত খাও। উঠো বউ মা।

হুবুচুনি : আই আই আই আই। কিবা[১৫৬] হরি[১৫৭] গো। ক্যাবোল[১৫৮] সাতদিন ধইরা[১৫৯] বিয়া অইছে[১৬০]; আইজি[১৬১] থালি নোটা মাইনজা ভাত খাবার কয়। কিবা হরির পাল্লায় পড়লাম গো। আই- আই- আই, ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

কেতুইরার মাও : কিবা বউ গো। ওই বউ, আইজি মোহে মোহে[১৬২] জব[১৬৩] দেয়। তর মতো ছিলান[১৬৪] বউ হলাটি[১৬৫] দিয়া বাইরাইয়া[১৬৬] ছয়জন খ্যাদাইছি[১৬৭]। আল্লারে কিবা বউ গো। কোনো শরম-লজ্জা নাই। হরির মোহে মোহে জব দেয়।

হুবুচুনি : আমিও কোম না[১৬৮] লো। তর মতো হরি ম্যালা[১৬৯] দেখছি। নিহা-বিয়া আগে আরো সাত জাগায়-অইছাল।

কেতুইরার মাও : আই-আই, আই-আই। ওর বিয়া বোলে[১৭০] আরো সাত জায়গায় অইছাল[১৭১]। হেই জন্যেই তো এতো জাইরা[১৭২] গো। ওই নটি[১৭৩]

ছিলান বউ, তুই আমার বাড়ি থিকা[১৭৪] যা। [চড় থাপ্পর মেরে বাড়ি থেকে বেড় করে দেয়। এমন সময় কেতুইরা বাড়ি আসে]

কেতুইরা : মা, ও মা, মাগো।

কেতুইরার মাও : ওই ড্যাহর[১৭৫]। ড্যাহর মা-মা করিস না।

কেতুইরা : ক্যা[১৭৬] মা! কি অইছে। তোমগোর[১৭৭] বউরে তো দেখতাছি না?

কেতুইরার মাও : তুই অরই কতা কস[১৭৮]। ওই জাইরা বউয়ের কতা কস। কী অইছিলো জানস। আমগোর[১৭৯] বরই গাছের ডাইলে[১৮০] একটা বল্লার চাইক[১৮১] আছিলো[১৮২] না?

কেতুইরা : হ মা হ। বল্লার চাইকে কী অইছে। কেউ চাইক কাইটা মধু চুরি করছে?

কেতুইরার মাও : নারে বাজান না। হেই চাইকের মধ্যে তর বউ ড্যাল[১৮৩] দিছাল। বল্লায় না আইয়্যা[১৮৪] তর বউরে কামড়ান শুরু করে। আমি দিশবিশ[১৮৫] না পাইয়্যা হলা হাছুন[১৮৬] দিয়া বাইরাইরা থাপরাইয়া[১৮৭] থাপরাইয়া হেই বল্লা ছাড়াইয়া দিছি। হেই জইন্যে[১৮৮] তর বউ বাপের বাড়ি চইলা গেছে। আমি কতো না করলাম। কোনো কতাই মানলো না। রাগ কইরা চইলা গেল। অরে আর আনমু[১৮৯] না।

কেতুইরা : হ, মাহ, হ। ওইডা আর আনমু না। ন্যাগো মা?

কেতুইরার মাও : আমার পোলার[১৯০] কত্তো বুদ্ধি। কত্তো জ্ঞান গো। জ্ঞান বুদ্ধি অবো না[১৯১] ক্যা। ওয়ানটি ওয়ান[১৯২] পাস করছে। জ্ঞান বুদ্ধি তো অবোই।

কেতুইরা : ও মা, মাগো। তরে একটা কতা কই।

কেতুইরার মাও : ক বাজান। আজারডা[১৯৩] 'ক'।

কেতুইরা : মা, মা গো একটাবার আনি গা[১৯৪]।

কেতুইরার মাও : ড্যাহর, ঐ ড্যাহর, ওই বউ আমি আর আনবার দিমু না[১৯৫]। তরে আবার বিয়া করামু। ওই বউ আর আবো না।

কেতুইরা : ও মা আমি একটা বুদ্ধি দেই। মানবি কিনা তাই 'ক'? তুই আর আমি যাইয়্যা পায়ে ধইরা পইড়া যামু গা[১৯৬]। তাও কি অবো না?

কেতুইরার মাও : আমি! আমি ধরমু ঐ হারামির বাচ্চার পাও[১৯৭]!

কেতুইরা : মা- নু[১৯৮] যাই। আর একটাবার যাই। শ্যাষম্যাষ রিক্‌স[১৯৯] নেই।

কেতুইরার মাও : আলাইনা ফালাইনা না[২০০] তুই আমার একটামাত্র পোলা। আমার কনলজার[২০১] টুকরা। নু, নু যাই।

হুবুচুনির মাও : আ- আহারে। আইজ সাতদিন ধইরা ম্যায়াডারে[২০২] দেহি না[২০৩] গো। কিবা জাগায় বিয়া দিলাম কিছুই জানি না। [এমন সময় হুবুচুনির প্রবেশ]

হুবুচুনি : [কেঁদে কেঁদে] ও মা, মা গো। আমারে না কিবা কনরাই[২০৪] মারলো গো। ও মা গো। মারতি মারতি[২০৫] আমারে তক্তা বানাইয়াই ফালাইছে গো, ও মা গো মা?

www.pathagar.com

হুবুচুনির মা : আইছোস তুই? আহারে আয় আয় তর কতাই কইতাছি। তর কি অইছে, অবা কইরা কান্দস ক্যা[২০৬]?

হুবুচুনি : দ্যাহোনা[২০৭]? আমারে মাইরা কিছু থয়[২০৮] নাই। [পিঠ দেখায়]

হুবুচুনির মা : তরে মারছে? কোনো সতীনে মারছে? তার কইলজাডা[২০৯] আমি টান দিয়া ছিঁড়া হালামু[২১০]।

হুবচুনি : খালি[২১১] মারে নাই মা। গাইলও[২১২] দিছে। আমি বোলে[২১৩] বেশি ভাত খাই, তুমি বলে ঘষি[২১৪] চুরি করো, এইগনা[২১৫] কইয়া মাগো মা... আমারে মারছে।

হুবুচুনির মা : তাই নাহি[২১৬]?

হুবুচুনি : [করুন সুরে গান ধরে]

দারুণ শ্বাশুড়ির জ্বালায় প্রাণে বাঁচা দায়
দারুণ শ্বাশুড়ির জ্বালায় প্রাণে বাঁচা দায়
কোনো কিছু কইলে পরে ঝাটা মারে আমার গায়,
দারুণ শ্বাশুড়ির জ্বালায় প্রাণে বাঁচা দায় ॥
মাগো তুমি করছাও[২১৭] ঘষিগো চুরি
আমি নাকি ভাত খাই বেশি গো
মাগো কোনো কিছু কইলে পরে
স্বামী দিয়া বাপ বানায়
দারুণ শ্বাশুড়ির জ্বালায় প্রাণে বাঁচা দায় ॥
(কেতুইরা ও কেতুইরার মায়ের প্রবেশ।)

কেতুইরার মাও : বিয়াইন[২১৮]। ও বিয়াইন। বিয়াইন, বিয়াইন।

হুবুচুনির মা : বিয়াইন বিয়াইন করিস না লো। বিয়াইন অতো সুখের না। আমার ম্যায়াডারে মাইরা কিছু থস[২১৯] নাই লো। সতীনের সতীন লো। ওই সতীন?

কেতুইরার মাও : ওই বিয়াইন আমি আন্নের[২২০] ম্যায়ারে কইল মারি নাই। আমি বল্লা খ্যাদাবার[২২১] যাইয়্যা থাপরাইয়া থাপনাইয়া খালি বল্লাগোনা ছাড়াইয়া দিছি। তাই না রে গ্যাদা[২২২]?

কেতুইরা : হ মা হ। তুই খালি বল্লা ছাড়াইছস। [হুবুচুনির কাছে গিয়ে] তুমি কিবা আছো হুবুচুনি?

হুবুচুনির মাও : ওই ড্যাহর। নিমুরাইদা[২২৩] ড্যাহর তুই আমার ম্যায়ার কাছে যাবি না। তর মায় আমার ম্যায়াডারে বারি দিয়া পিঠ ফাটাইয়া ফালাইছে। তুই বালবালাই[২২৪] করিস না।

কেতুইরা : বারি দিছে বালা কতা। টিন আইনা ঘর তুলমু[২২৫]।

হুবুচুনির মাও : ওই ড্যাহর। মারছে ... মারছে। আর তুই কস ঘর তুলমু।

www.pathagar.com

কেতুইরা : আগে তো কইন[২২৬] নাই। যাইগ্যা[২২৭]। নও[২২৮] এহোন[২২৯] বাড়ি যাই।
হুবুচুনি : আমি যামু না। ওই মা আহোছে[২৩০] আমরা কিরা[২৩১] দিয়া দেই।
হুবুচুনির মাও : হ, নু কিরা দেই।
হুবুচুনি
হুবুচুনির মাও : ডেহির[২৩২] পাড়ে অক্ত[২৩৩]
কিরা অইলো[২৩৪] শক্ত।
কিরা অইলো শক্ত
কিরা অইলো শক্ত
কিরা অইলো শক্ত।
কেতুইরা : মা গো- মা। আমগোরে কিরা দিছে। তর কিরা নাই মা? আয় আমরা কিরা তুইলা দেই।
কেতুইরা
কেতুইরার মাও : নদীর পাড়ে কাইশা
কিরা গেল ভাইসা[২৩৫]।
কিরা গেল ভাইসা
কিরা গেল ভাইসা
কিরা গেল ভাইসা ॥
হুবুচুনি
হুবুচুনির মাও : কান্দার উপুর কান্দা
তরা মাও-পুত হুন্দা[২৩৬] বান্দা।
বান্দা লো মাগি মান্দা
বান্দা লো মাগি মান্দা
বান্দা লো মাগি মান্দা ॥
কেতুইরা
কেতুইরার মাও : মামুগো বাড়ি বউরা বাঁশ
বউরা বাঁশ কাইটা[২৩৭]
চুঙ্গা[২৩৮] একটা বানাইয়া
তর সব কিরা ভইরা
ম্যাচের কাটি ঘাও দিয়া
কিরা দিলাম পুইড়া[২৩৯]।
কিরা দিলাম পুইড়া লো মাগি
কিরা দিলাম পুইড়া লো মাগি
কিরা দিলাম পুইড়া ॥

[ঝগড়া শেষে দুপক্ষ মিলে যায় এবং এভাবেই সঙযাত্রাটি শেষ হয়।]

www.pathagar.com

২. নারী পুরুষের পালা

রচনা : জলিল আকন্দ, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল।

গান.

(সমবেত সংগীত গেয়ে গেয়ে সবাই মঞ্চে যাবে।)
টাঙ্গাইল জেলাতে ভূঞাপুর
টাঙ্গাইল জেলাতে ভূঞাপুর
ভূঞাপুর থিয়েটার ভূঞাপুর
ভূঞাপুর থিয়েটার ভূঞাপুর
রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ মোরা গড়বই
জনতাকে সাথে নিয়ে লড়বই লড়বই লড়বই
এদেশ থেকে দালাল যত করে দেব মোরা দূর ॥
অন্যায় অবিচার মানব না মানি না মানি না,
মিথ্যে ভাষণ আর প্রতিশ্রুতি জানি না জানি না জানি না
সোনারই বাংলা গড়ব মোরা
নয় নয় নয় বহুদূর ॥
(গান শেষে সবাই মঞ্চের পিছনে বসবে।)

একজন : ভাই সব, আপনারা গণ্ডগোল না করে চুপচাপ বসুন। আমাদের বাউলগান এখনি শুরু হবে। (১ম বাউল দাঁড়িয়ে বন্ধনা গান গায়)।

১ম বাউল : বন্দি[২৪০] মাতা বন্দি পিতা বন্দি সবজনায়[২৪১] গো
আমার সুখের সীমা নাই গো
আমার সুখের সীমা নাই গো

পাছদোহার[২৪২] : বন্দি মাতা বন্দি পিতা বন্দি সবজনায় গো
আমার সুখের সীমা নাই গো
আমার সুখের সীমা নাই গো

প্রথম বাউল : বন্দি আমি সৃষ্টিকর্তা
আরো বন্দি আদি পিতা
আরো বন্দি আদি পিতা
বন্দি কুরআন, বাইবেল গীতা
বন্দি কুরআন, বাইবেল গীতা
বন্দি চারিধার গো
আমার সুখ হইল অপার[২৪৩]
আমি সবারে জানাই ॥

এই আসরের জ্ঞানী গুণি
আছেন যারা ধনের ধনি
আছেন যারা ধনের ধনি
ক্ষমা চাইয়া যাই গো

আমার দুঃখ নাই ॥
বন্দি ওস্তাদেরই চরণ
যে শিখাইল বাউলের গান
যে শিখাইল বাউলের গান
বন্দি দেশের সব শহীদান[২৪৪]
বন্দি দেশের সব শহীদান
বন্দনা ফুরাইগো আমার সময় বেশি নাই
(অন্য সুরে) বন্দি মাতা, বন্দি পিতা সবজনায় গো
আমার সুখের সীমা নাই ॥

কথা : যা হোক, আমি ছোট একটি বন্দনাগান গাইলাম। আজকের এই বাউল আসরের যিনি সভাপতি তিনি পালা ঠিক করে দিয়েছেন। আজকের পালা হবে নারী এবং পুরুষ আমাকে দেওয়া হয়েছে নারী আর আমার বিপক্ষ বাউল গাবেন পুরুষ। দেখা যাক উনি কেমন পুরুষ। একটু টেস্ট[২৪৫] কইরা নেই, নাকি বলেন? উনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, আপনি এমন একজন পুরুষের কথা বলেন, যে একজন সাধারণ প্রজা হয়েও রাজ কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। যদি আপনার জানা থাকে তবে ঝট্‌পট্‌ জবাব দিয়েন।

গান : এইতো আমার জিজ্ঞাসনা[২৪৬]
জবাব দিও থাকলে জানা
জবাব দিও থাকলে জানা
সই[২৪৭] দিব না তা না-না না[২৪৮]
সই দিব না তা না-না না
সঠিক জবাব চাই গো
আমার সময় বেশি নাই ॥
(প্রথম বাউল বসে পরে)

দ্বিতীয় বাউল : বড় ভাব জাগাইয়া গেলি মনে রে
বড় ভাব জাগাইয়া গেলি মনে রে
বড় ভাব জাগাইয়া গেলি মনে-এ ॥

কথা : যা হোক, আমাকে একটি প্রশ্ন করেছে যে, এমন একজন পুরুষের কথা বল যে, সাধারণ প্রজা হয়েও রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিল। এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

গান : হারে বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানা-
সেই থানারই ফলদা গ্রামের ইতিহাস জানা
সেইখানে এক রাজা ছিলেন
সেইখানে এক রাজা ছিলেন
যশোধর নামে রে
বড় ভাব জাগাইয়া গেলি মনে রে
বড় ভাব জাগাইয়া গেলি মনে রে।

www.pathagar.com

কথা : বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার ভূএ্রাপুর থানায় যে ফলদা গ্রাম আছে। সেখানে এক রাজা ছিলেন নাম তার যশোধর। তার ষোড়শী কন্যা ঘোষণা দিলেন... (বাউল বসে পরে) (আসে ঘোষক)

ঘোষক : খবর আছে খরব।

প্রথম যুবক : খবর, কিসের খবর?

ঘোষক : খবর বড় জব্বর[২৪৯]।

দ্বিতীয় যুবক : জব্বর খবর!

তৃতীয় যুবক : কও কিসের খবর।

প্রথম যুবক : রাজা মহাশয় কি খাজনা মওকুব[২৫০] করে দিয়েছেন?

ঘোষক : না, না।

দ্বিতীয় যুবক : তবে কি রাজবাড়ীতে পুজোর নেমন্তন্[২৫১] করেছেন?

ঘোষক : না হে মুর্খ, না।

তৃতীয় যুবক : তয় কি যুদ্ধে যাবার জন্য ডাকছেন?

ঘোষক : তাও না।

সবাই : তবে?

ঘোষক : ভাই সব আমাদের মহাপরাক্রমশালী রাজা যশোধরের ষোড়শী যুবতী কন্যা...।

প্রথম যুবক : রাজকন্যা?

ঘোষক : সুনয়না।

দ্বিতীয় যুবক : বাহ্ বাহ্।

ঘোষক : চাঁদ বদনী।

প্রথম যুবক : যা বলেছেন ভাই।

ঘোষক : ঘোষণা দিয়েছেন তিনি স্বয়ম্বর[২৫২] হবেন।

প্রথম যুবক : স্বয়ম্বর হবেন!

দ্বিতীয় যুবক : স্বয়ম্বর হবেন!

তৃতীয় যুবক : স্বয়ম্বর হবেন!

প্রথম যুবক : আমাদের রাজকন্যা তার নিজের স্বামী নিজেই বেছে নিবেন।

ঘোষক : হ্যাঁ, কিন্তু–

সবাই : কিন্তু

ঘোষক : শর্ত আছে।

প্রথম যুবক : কি শর্ত?

ঘোষক : যে যুবক চারটি নতুন কথা রাজকন্যাকে শোনাতে পারবে সেই হবে রাজকন্যার স্বামী..।

প্রথম যুবক : নতুন কথা শোনাতে হবে?

দ্বিতীয় যুবক : চারটি?

ঘোষক : যদি শোনাতে পার, তবে তুমিও হতে পার রাজ জামাতা...।

দ্বিতীয় যুবক : আমরাও?

www.pathagar.com

তৃতীয় যুবক : রাজ জামাতা!

প্রথম যুবক : জান নাকি ভাই নতুন কথা?

তৃতীয় যুবক : ধুরু[২৫৩], নতুন কতা[২৫৪] পামু কই? খালি পুরান কতা মনের মধ্যে ভাসান দেয়। সেই যে কলেরা অনয়া[২৫৫] বাজানে মইরা[২৫৬] গেল হেই[২৫৭] কতা আইজও[২৫৮] ভুলবার পারি না। গেল বন্যায় তিনদিন না খাইয়া গাছের ডালে বইসা আছিলাম। হেইডাও[২৫৯] তো পুরান কতা।

প্রথম যুবক : ধ্যাত্ কিসের মধ্যে কি।

ঘোষক : যদি কেউ শোনাতে গিয়ে চারটি নতুন কথা শোনাতে না পার তবে তাকে কারাগারে আজীবন বন্দি করে রাখা হবে...। (ঘোষক চলে যায়)

দ্বিতীয় যুবক : বন্দি করে রাখা হবে?

তৃতীয় যুবক : কাম[২৬০] নাই আমাগো[২৬১] নতুন কতার। এই সব রাজাগজার[২৬২] কাম। আস যাইগা। (সবাই চলে যায়। এখানে একটি কৃষকের বাড়ির সেট দেখানো যেতে পারে।)

রাখাল : চাচা, ও চাচা।

বৃদ্ধ : কেডারে; ও ভাইস্তা[২৬৩]। কি কস?

রাখাল : আমার একটা ছাগলের কতা কবার[২৬৪] পারবা?

বৃদ্ধ : কবার পারি কিন্তু বেশি ভালা[২৬৫] অয়না[২৬৬]।

রাখাল : অমনিই কও[২৬৭]।

বৃদ্ধ : আইচ্ছা[২৬৮]- ভ্যা...।

রাখাল : ধুরু চাচা। তোমার খালি[২৬৯] তামাশা।

বৃদ্ধ : ক্যান, তুই-ই তো কইলি একটি ছাগলের কতা কবার[২৭০] পারবা[২৭১]?

রাখাল : আমার ফট্কা ফট্কি[২৭২] ছাগলডা আরায়া[২৭৩] গেছে, খবর জানলে কও?

বৃদ্ধ : ছাগল গরুর খবর অহন[২৭৪] কি কেউ রাহে[২৭৫]। খালি নতুন কতার খবর।

রাখাল : থও[২৭৬] তোমার নতুন কথা।

বৃদ্ধ : আইচ্ছা ভাইস্তা, তুই যে আমারে একদিন কয়ড়া[২৭৭] কতা হুনাইছিলি[২৭৮] হেইগুলাওতো[২৭৯] নতুন কতা অবার[২৮০] পারে।

রাখাল : চাচা যে কি কও। এ হগল[২৮১] কতা রাজা বাদ্শাগো সামনে কওন যাইবো?

বৃদ্ধ : ক্যান যাইবো না। ল[২৮২] যাই।

রাখাল : হ, যাই আর আমাগোরে[২৮৩] কয়েদ খানায় ভইরা রাখুন।

বৃদ্ধ : রাহে রাহুক। কয় দিনই আর বাঁচুম।

রাখাল : চাচা, তুমি আমারে ভালাবাস জানি কিন্তু এত ভালাবাস বুঝবার পারি নাই। আমার জন্য তুমি ফাটকে[২৮৪] যাইতেও রাজি। বাপ-মা

www.pathagar.com

মইরা গেলে তোমাগো[২৮৫] কাছে কাম কইরা খাইয়াই বড় অনলাম[২৮৬]। তোমরা আমারে ভালা না বাসলে আমার আর কেডা[২৮৭] আছে কও?

বৃদ্ধ : ঐ যে পুরান কতা তুইলা নইলো। ঐ সগল[২৮৮] কতা রাখ। অহন নতুন কতা, ল যাই।

রাখাল : তুমি কি পাগল অইলা চাচা? কোনে[২৮৯] রাজকন্যা আর কোনে আমি। কত রাজার পোলারা পারে নাই। হেরা[২৯০] অহন কয়েদ খানায়।

বৃদ্ধ : হেতে[২৯১] কি অইছে[২৯২]?

রাখাল : যা কমু[২৯৩] তাতো নতুন কতা অইবোই না[২৯৪] রাখবো কয়েদখানায় ভইরা। হ, বুদ্ধি খারাপ কর নাই। বইয়া বইয়া খাওন যাবো। পুরান ছোন দিয়া ঘর ছাইছিলাম মুরগীয়ে আচুইলা[২৯৫] ফালায়া দিছে। বৃষ্টি অইলে পানি পরে। খ্যাতা বালিশ গোছায়া[২৯৬] বইয়া[২৯৭] থাকি। কয়েদখানায় গেল তো বৃষ্টি তুফানে পাব না। না কি কও?

বৃদ্ধ : খালি প্যাঁচাল পারে। প্যাঁচাল বাদ দে। আয় যাই। (বৃদ্ধ রাখালকে টানতে থাকে)।

রাখাল : কি ব্যাজাল বাজাইলা। আমি মরি ছাগলের চিন্তায় হে কয় রাজকন্যা। (উভয়ে চলে যায়)। (রাজ প্রাসাদের গেট। আসে ভাটিরাজ্যের যুবরাজ ও সহচর)।

সহচর : ভাটিরাজ্যের যুবরাজ সয়ম্বর সভায় হাজির...।

অন্যান্য : যুবরাজের জয় হোক। (সখি সহচর ও কোতোয়ালসহ আসে রাজকুমারি)।

ঘোষক : আমাদের মহামান্য, সর্বজ্ঞানী, রাজকুমারি স্বয়ম্বর সভায় হাজির...।

রাজকুমারি : কোতোয়াল।

কোতোয়াল : আদেশ করুন রাজকুমারি।

রাজকুমারি : উনাকে জিজ্ঞেস কর, উনি কোনো রাজ্যের যুবরাজ।

যুবরাজ : আমি ভাটিরাজ্যের যুবরাজ।

রাজকুমারি : কোতোয়াল।

কোতোয়াল : হুকুম দেন রাজকুমারি।

রাজকুমারি : উনাকে আমার শর্ত জানিয়ে দাও।

যুবরাজ : আমি সব জেনে শুনেই এসেছি রাজকুমারি।

রাজকুমারি : তাহলে বলুন আপনার নতুন কতা।

যুবরাজ : আমার প্রথম নতুন কথা হচ্ছে আমি একমাত্র যুবরাজ যে যুদ্ধক্ষেত্রে দু হাতে তরবারী চালাতে পারি।

যুবরাজের সহচর : যুবরাজের জয় হোক। যুবরাজের জয় হোক।

রাজকুমারি : এটা কোনো নতুন কথা নয়। আমার দ্বাররক্ষীও দু হাতে তলোয়ার সুরকী চালাতে পারে।

www.pathagar.com

রাজকুমারির-
সহচর : রাজকুমারির জয় হোক। রাজকুমারির জয় হোক।
যুবরাজ : আমার দ্বিতীয় নতুন কথা হচ্ছে...।
রাজকুমারি : আর কোনো প্রয়োজন নেই। কোতোয়াল-
কোতোয়াল : আদেশ করুন রাজকুমারি।
রাজকুমারি : এদের সবাইকে কারাগারে নিক্ষেপ কর।
জনৈক সহচর : দয়া করুন, ক্ষমা করুন রাজকুমারি।
রাজকুমারি : কোনো কথা নয়। নিয়ে যাও।
রাজকুমারির-
সহচর : রাজকুমারির জয় হোক।
কোতোয়াল : চল। (সবাই চলে যায়।)
দ্বিতীয় বাউল : বড় ভাব জাগাইয়া গেলি মনে রে।
বড় ভাব জাগাইয়া গেলি মনে রে।
বড় ভাব জাগাইয়া গেলি মনে রে।
দোহার : বড় ভাব জাগাইয়া গেলি মনে রে।
দ্বিতীয় বাউল : হারে এই ভাবেতে কত রাজ্যের কত যুবরাজ,
স্বয়ম্বরে আসে পরে নব নব সাজ,
হয় না কারোর নতুন কথা।
হয় না কারোর নতুন কথা।
দোহার : হয় না কারোর নতুন কথা।
দ্বিতীয় বাউল : রাজকুমারি বলে রে ॥ (বাউল বসে। আসে রাখাল ও বৃদ্ধ।)
বৃদ্ধ : কৈ, কাউরেই তো দেহি না[২৯৮]। রাজবাড়িতে কেউ কি নাই?
রাখাল : চাচা নও যাইগা। অহনও সময় আছে। (রাখাল যেতে অগ্রসর হয়)
বৃদ্ধ : খাড়া[২৯৯]। (আসে কোতোয়াল।)
কোতোয়াল : কে তোমরা। কি চাও?
বৃদ্ধ : আমরা নতুন কতা হুনাবার[৩০০] আইছি[৩০১]।
কোতোয়াল : দেখেতো কোনো যুবরাজ মনে হয় না। যাও যাও।
বৃদ্ধ : যামু ক্যান? ঘোষণায় তো খালি যুবরাজের কথা নাই। যে কোনো যুবকের কথা আছে।
রাখাল : চাচা আহ যাইগা। আমার আত্ পাও[৩০২] কাঁপতাছে।
বৃদ্ধ : চুপ কর।
কোতোয়াল : ঘোষণায় না থাকলেও বুঝে নিতে হবে।
বৃদ্ধ : অত বুঝি না। রাজকন্যার কাছে যামু।
কোতোয়াল : সেখানে যেতে হবে না। আমিই যথেষ্ট।
রাখাল : আপনে কেডা?
কোতোয়াল : আমি কোতোয়াল।
রাখাল : ওরে বাবারে... গর্দান যাবো। (রাখাল পালাতে নেয়, বৃদ্ধ ধরে।)
বৃদ্ধ : খাড়া, উনার কাছেই ক[৩০৩]।

www.pathagar.com

রাখাল : আমার ডর করে।
বৃদ্ধ : ক।
রাখাল : আমার নতুন কতা অইলো[৩০৪]
অক্ষির[৩০৫] উপর পক্ষির বাসা,
জলকে দেখলাম শুলে[৩০৬]।
ডনপায়[৩০৭] উঠল চার পায়ের উপর
দু পায়ে নিলো ডালে।
কোতোয়াল : হয়েছে, হয়েছে। এই হ্যাচর প্যাচর[৩০৮] কতা তোমার নতুন কতা। (দুজনকে ঘাড় ধরে।) যাও।
রাখাল : আমি তহনই করছিলাম চাচা।এখন খুব ভালা অইছে। (আসে রাজকুমারি।)
রাজকুমারি : কোতোয়াল।
কোতোয়াল : আদেশ করুন রাজকুমারি।
রাখাল : চাচা, আহ যাইগা পরীয়ে ধরবো।
বৃদ্ধ : খাড়া, পরী না রাজকুমারি।
রাজকুমারি : অরা কি বলে?
কোতোয়াল : বেটাদের সাহস দেখেছেন? নতুন কথা শোনাতে এসেছে?
রাজকুমারি : নতুন কথা। ঠিক আছে শোনাও।
বৃদ্ধ : রাজকুমারির জয় হোক।
কোতোয়াল : এ কোনো যুবরাজ নয় রাজকুমারি। পথের ভিখারী। কি আবোল তাবোল কথা বলে।
রাজকুমারি : থাক। কারাগারে যেতে সাধ হয়েছে যাক।
রাখাল : চাচা, আহ[৩০৯] যাইগা। (বৃদ্ধ টেনে ধরে।)
বৃদ্ধ : খাড়া। ক, রাজকুমারির সামনে ক?
রাখাল : চাচা।
বৃদ্ধ : কি কস[৩১০]?
রাখাল : আমারে জোরে কইরা একটা চিমটি দেও[৩১১]।
বৃদ্ধ : ক্যান?
রাখাল : দেহছিন[৩১২] আমি মরছি না আছি।
বৃদ্ধ : চুপ কর। খালি আকতা কুকতা কয়। নতুন কতা ক।
রাখাল : আমি পারমু না। তুমি কও।
বৃদ্ধ : আবার কতা কয়।
রাখাল : আমার পরথমকার[৩১৩] নতুন কতা অইল, 'অক্ষির উপর পক্ষির বাসা'।
রাজকুমারি : অক্ষির উপর পক্ষির বাসা। মানে চোখের মধ্যে পাখির বাসা। এটা একটা নতুন কথা বটে। কিন্তু অসম্ভব এটা হতেই পারে না। যুবক, তোমার কথার প্রমাণ দাও।

www.pathagar.com

রাখাল : রাজকুমারি কি কমু। আমাগো[৩১৪] দক্ষিণ চড়া একদিন গরু চড়াইতে গিয়া দেহি, একটা মরা মানুষের মাথার খুলি পথের মধ্যে পইড়া[৩১৫] রইছে। মানুষের লাত্থি[৩১৬] গুতা লাগবার পারে মনে কইরা খুলিডা আমি শেওড়া গাছের ডালের লগে আটকায়া[৩১৭] রাখলাম। কয়েকদিন পরে গিয়া দেহি, খুলিডায় চোখের যে গর্ত তার মধ্যে টুনটুনি পাখি বাসা বানায়া ডিম দিছে। তাই কতা বানাইলাম অক্ষির উপর পক্ষির বাসা।

রাজকুমারি : চমৎকার। চমৎকার তোমার নতুন কথা।

বৃদ্ধ : রাখাল ছেলের জয় হোক।

সহচর : রাজকুমারির জয় হোক।

কোতোয়াল : রাজকুমারি আপনি ভুল করছেন। বলল অক্ষির উপর পক্ষির বাসা। এখন বলে মরা মানুষের চোখের কথা।

বৃদ্ধ : ভাইস্তাতো চোখের মইধ্যে পাখির বাসার কতাই কইছে। হেইডা তাজা মানুষের চোখে না মরা মানুষের চোখে না কোনো জন্তু জানোয়ারের তা তো কয় নাই।

কোতোয়াল : না, এটা হবে না।

রাজকুমারি : তুমি চুপ কর। যুবক তোমার দ্বিতীয় কথা শোনাও।

রাখাল : আমার আরেক নতুন কতা অইল, 'জলকে দেখলাম শুলে'।

রাজকুমারি : জল শুলে দেখেছ?

কোতোয়াল : অসম্ভব, জলকে শুলে দেওয়া যাবে না। গড়িয়ে পরে যাবে।

রাজকুমারি : এবার বল।

রাখাল : পৌষ মাইসা সক্কাল[৩১৮] বেলা মাঠে যাইয়া দেহি শিশির পইড়া ঝলমল করতাছে।

রাজকুমারি : বড় সুন্দর দৃশ্য।

কোতোয়াল : শীতের দিনে শিশির পড়বেই। এ আর নতুন কথা কি?

রাখাল : নতুন কতা অইল। দুর্বা ঘাসের চিকন ডগা। যেইডা শুলের মতো চোখা, সেই ঘাসের ডগায় জইমা[৩১৯] রইছে শিশির বিন্দু। এক ফোঁটা পানি। যেইডা গড়াইয়া পরে না। তাই দেইখা আমি কতা বানাইলাম, জলকে দেখলাম শুলে।

রাজকুমারি : হয়েছে, নতুন কথা হয়েছে।

বৃদ্ধ : জয়, রাখাল ছেলের জয়।

সহচরবৃন্দ : জয়, রাজকুমারির জয়।

কোতোয়াল : রাজকুমারি এটা কোনো...।

রাজকুমারি : তুমি চুপ কর।

রাখাল : আমার আর একটা নতুন কতা অইল, 'নিপায় উঠল চাইর পায়ের উপর। দুপায়ে নিল ডালে'।

কোতোয়াল : হতেই পারে না। যার পা নেই সে উপরে উঠবে কি করে?

www.pathagar.com

রাজকুমারি : এটাও একটা নতুন কথা। এবার বল।

রাখাল : আমি একদিন গরুর গা ধোয়াইতেনিছি। হঠাৎ একটা বোয়াল মাছ লাফ দিয়া উঠল গরুর পিঠের উপর। আর যেই উঠা অমনিই একটা চিল তারে ছো মাইরা নিয়া গেল। যাইয়া বসল নদীর ঘাটের বট গাছটায়। এইবার কন মাছের পাও আছে?

সকলে : নাই।

রাখাল : গরুর কয় পাও?

সকলে : চার পা।

রাখাল : যে পাখিয়ে নিল। তার কয় পাও?

সকলে : দুই পা।

রাখাল : তাই আমি কতা বানাইলাম, 'নিপায় উঠল চাইর পায়ের উপর। দু পায়ে নিলো ডালে'।

কোতোয়াল : এসব কথা আমিও জানি রাজকুমারি।

রাজকুমারি : তুমি জান? আগে বলনি কেন?

কোতোয়াল : ভয়ে।

রাজকুমারি : ঠিক আছে- আমি অভয় দিচ্ছি। তুমি পরের নতুন কথা শোনাও। কি চুপ করে রইলে কেন?

কোতোয়াল : মনে পড়ছে না। (আগে চুপ করে থাকবে)।

রাজকুমারি : এখন মনে পড়ছে না। মিথ্যুক। যুবক তোমার শেষ নতুন কথা শোনাও।

বৃদ্ধ : রাজকুমারির জয় হোক।

রাখাল : আমার শ্যাষ কতা অইল। 'শোন কন্যা বিবরণ ইন্দুরে[৩২০] বিলাই[৩২১] মারল কি কারণ'।

কোতোয়াল : বাজে কথা। বিড়ালে ইঁদুর মারে। ইঁদুরে কি বিড়াল মারতে পারবে?

বৃদ্ধ : পারে বইলাইতো[৩২২] নতুন কতা।

রাখাল : আমি তহন এই চাচার বাড়িতে কাম করি। একদিন খাইতে বইছি। চাচার বিলাইডা আমার চাইর পাশ দিয়া ঘুরতাছে আর কাটা খাইতাছে। ঐ ঘরের ধন্নায় আছিল একটা ছিকা বান্ধা। সেই ছিকায় আছিলো একটা বিরাট কাঁঠাল। বিলাইতো নীচে বইসা কাঁটা খাইতাছে এমন সময় ইন্দুরে দিছে ছিকা কাইটা। কাঁঠাল পড়ল বিলাইর উপরে। বিলাই মইরা চ্যাপ্টা। তাই কতা বানাইলাম, 'শোন কন্যা বিবরণ ইন্দুরে বিলাই মারল কি কারণ'।

রাজকুমারি : তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন? এদের অতিথিশালায় নিয়ে যাও। আপ্যায়ন কর।

বৃদ্ধ : জয়, রাখাল ছেলের জয়। জয়, রাজকুমারির জয়। (রাখালকে জড়িয়ে ধরে।) কইছিলাম না এইগুলা নতুন কতা অবার[৩২৩] পারে?

www.pathagar.com

রাখাল : চাচা।
বৃদ্ধ : ক।
রাখাল : আহ যাইগা।
বৃদ্ধ : ক্যান?
রাখাল : বিয়া আমি করমু না। আমার সময় নাই।
বৃদ্ধ : কস কি?
রাখাল : তুমিই তো ব্যাজালডা বাজাইলা। আমার ছাগল আরায়া[৩২৪] গেছে, তালাশ করণ লাগবো।
বৃদ্ধ : চুপ কর। রাজকন্যা থুইয়া[৩২৫] তর ছাগল বড় অইলো।
রাখাল : বিয়া করবার পারি, কন্যার কাছে হোন[৩২৬], আমার কিছু শর্ত আছে।
বৃদ্ধ : তর আবার শর্ত কি? চুপ কর।
রাখাল : ক্যান, রাজকন্যার শর্ত থাকবার পারে আমার পারে না?
রাজকুমারি : বল তোমার শর্ত।
রাখাল : আমার পরথম শর্ত অইল নতুন কতা কইতে আইসা যারা বন্দি অইছে বেবাকেরেই[৩২৭] ছাইড়া দেওন লাগবে।
রাজকুমারি : ঠিক আছে, ছেড়ে দেব।
রাখাল : আর হোনেন[৩২৮]। এই যে, এই দিকে আহেন[৩২৯]। আপনের[৩৩০] এই কোটাল[৩৩১] ব্যাটা আমার কতার মইধ্যে খালি বাইআত[৩৩২] দিছে। আর একটা কাম করছে হেইডা এহন কওন যাইবো না। হের আমগো কাছে মাফ চাওন লাগবো।
রাজকুমারি : কোতোয়াল।
কোতোয়াল : আদেশ করুন রাজকুমারি।
রাজকুমারি : এদের কাছে ক্ষমা চাও।
কোতোয়াল : রাজকুমারি।
রাজকুমারি : চাও।
বৃদ্ধ : অইছে। আপনে যহন কইছেন তহন অইছে।
রাখাল : চাচা যহন মাফ কইরা দিছে তহন আমিও মাফ কইরা দিলাম। আর হোনেন, এই দিকে আহেন।
বৃদ্ধ : একবার একদিক একবার ঐদিন এমুন করতাছস ক্যান?
রাখাল : দ্যাখতাছি কতাবার্তা ঠিকমত হুনবো[৩৩৩] কিনা। হোনেন, এই যে, এই দিকে আহেন। এই রাজ্যের যত রাখাল আছে সবাইরে দাওয়াত কইরা খাওয়াইতে অইবো[৩৩৪]। আর চাচারে একটা বড় পদ[৩৩৫] দেওন লাগবো।
রাজকুমারি : আমি সব শর্তেই রাজি।
বৃদ্ধ : বাজাও বাদ্য, বাজাও। জয় রাজকুমারির জয়। জয় রাখাল ছেলের জয়।

www.pathagar.com

সবাই : জয় রাজকুমারির জয়। জয় রাখাল ছেলের জয়।
সহচর : আসুন আপনারা ভিতরে আসুন।
দ্বিতীয় বাউল
গান : বড় ভাব জাগায়া গেলি মনে রে।
বড় ভাব জাগায়া গেলি মনে রে।
এই ভাবেতে রাজকুমারির বিয়া হইয়া যায়,
রাখাল ছেলে বিয়া কইরা রাজ জামাতা হয়।
রাখাল ছেলের হইল বিয়া।
রাখাল ছেলের হইল বিয়া।
রাজকুমারির সনে ॥
কথা : তোমার কথা জবাব দিলাম। এইবার তোমার কাছে আমার প্রশ্ন। আমার প্রথম প্রশ্ন চৌকানা অঙ্গ তার দন্ত সারি সারি/ আহার করিতে যায় অমরার পুরী। অমরার পুরী যাইরা করে মহারণ/ ঠোঁটে কইরা আনে জীব না করে ভক্ষণ। আমার প্রশ্ন এই জিনিসটা কি? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন তুমি এমন একজন নারীর কথা বলো যে সাধারণ নারী হয়েও বুদ্ধিতে রাজা এবং তার উজিরকে হারিয়েছিল।
গান : এই তো আমার প্রশ্ন তোমায় জিজ্ঞাসা রহিল,
কোনো কুমারী বুদ্ধি বলে মন্ত্রীকে হারাল,
থাকলে জানা দিও জবাব
থাকলে জানা দিও জবাব
এই আসরের মাঝে রে॥ (বসে পরে)
প্রথম বাউল : আমায় উদাসী বানাইয়া গেল
আমায় উদাসী বানাইয়া গেল
বসন্তেরই কালে রে মরার কোকিলে
আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেল রে মরার কোকিলে ॥
কথা : আমাকে দুইটি প্রশ্ন করে গেছে। এক. চৌকোণা অঙ্গ তার দন্ত সারি সারি, আহার করিতে যায় অমরার পুরী। অমরার পুরী যাইয়া করে মহারণ, ঠোঁটে কইরা আনে জীব না করে ভক্ষণ। এই জিনিসটি কি? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এমন একজন নারীর কথা বল যে সাধারণ নারী হয়েও বুদ্ধিতে মন্ত্রী ও তার রাজাকে হারিয়েছিল।
গান : আমায় উদাসী বানাইয়া গেল
বসন্তেরই কালে রে মরার কোকিলে ॥
আমার কাছে দুইটি প্রশ্ন করিয়া
ভুলি নাই ভুলি নাই কথা মনেতে আছে।
একে একে দিব জবাব
একে একে দিব জবাব
এই আসরে মাঝেতে ॥

www.pathagar.com

কথা : যা হোক। প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে চিরুনি। দর্শক শ্রোতা উকুন আনার খাটো কালো চিরুনি দেখেছেন। চৌকোণা অঙ্গ তার। তার চারটা কানি আছে। দন্ত সারি সারি। দেখেছেন। চিরুনিতে কি পরিমাণ দাঁতের মতো খিল আছে। সেই চিরুনি মাথা থেকে যখন উকুন আনে এক রকম যুদ্ধই হয় বলা চলে। উকুন মাথা থেকে ছাড়তে চায় না। চিরুনিয়ে ছাড়ায়। কিন্তু সেই উকুন কি চিরুনিয়ে খায়? খায় না। ঠোঁটে কইরা আনে জীব না করে ভক্ষণ।

গান : আমার ঘুম ভাঙ্গায়া গেল রে
মরার কোকিলে
তোমার কথার জবাব আমার মনেতে আছে,
প্রথম প্রশ্নের জবাব তোমার হইয়া গিয়াছে
পরের প্রশ্নের দিব জবাব
পরের প্রশ্নের দিব জবাব
এই আসরের মাঝে রে ॥

কথা : দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলছি টাঙ্গাইল জেলার হেমনগরে এক অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তার প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ উজিরও ছিলেন কুচক্রী। রাজা একদিন হাঁটতে হাঁটতে তার উজিরকে বললেন- (রাজা ও উজির আসরে আসেন)

রাজা : উজির।

উজির : আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা : আমার বৃদ্ধ হাতিকে মেরে এর দাঁত ও হাড় দিয়ে এবার কি বানানো যায় বল দেখি।

উজির : হাতির দাঁত এবং হাড় দিয়ে অনেক কিছুই বানানো যাবে মহারাজ। কিন্তু হাতি মারতে হবে কেন?

রাজা : বৃদ্ধ হয়েছে। একে দিয়ে তো কোনো কাজ চলে না। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায়ে কি লাভ? তার চেয়ে আগামী দিন হাতিটাকে মেরে দাঁত ও হাড় সংগ্রহ করবে।

উজির : বসিয়ে খাওয়ালে লোকসান হবে। আবার মেরে ফেললেও খেল[৩৩৬] খতম। তার চেয়ে আপনি হাতিটাকে ছেড়ে দিন।

রাজা : ছেড়ে দেব? ছেড়ে দিলে আমার কি লাভ হবে?

উজির : লাভ হবে। সে বুদ্ধিই তো আপনাকে দিচ্ছি মহারাজ। হাতি ছেড়ে দিয়ে সারা রাজ্যে ঘোষণা দিন। যে গ্রামে গিয়ে এই হাতি মরবে সেই গ্রামবাসীর হবে এক লক্ষ টাকা জরিমানা। আর যে হাতি মরার খবর দিবে তার হবে আরো এক লক্ষ টাকা জরিমানা। আর যদি কোনো লোক খবর নিয়ে না আসে, তবে ঐ গ্রামবাসীর দিতে হবে দশ লক্ষ টাকা জরিমানা।

রাজা : চমৎকার বুদ্ধি। এজন্যই তো তোমাকে আমার উজির বানিয়েছি।

www.pathagar.com

উজির : হাতি ছেড়ে দিলে না খেতে পেয়ে একদিন মরবেই। তখন আপনি দাঁত ও হাড় পাবেনই। আরো পাবেন লক্ষ লক্ষ টাকা।

রাজা : হাঃ হাঃ। ঠিক আছে চল। (রাজা ও উজির চলে যায়। আসে গ্রামবাসী।)

প্রথম গ্রামবাসী : ভায়েরা আপনেরা চুপ কইরা বহেন[৩৩৭]। অহন আমাগো উপর দিয়া লোহার চঙ্গের মই যাইতাছে।

দ্বিতীয় গ্রামবাসী : হ, হ। রাজার অত্যাচার অহন আর সহ্য অয় না।

তৃতীয় গ্রামবাসী : সহ্য না অয় রাজ্য ছাইয়া চইলা যাও।

প্রথম গ্রামবাসী : চইলা যাওন ছাড়া আমাগো কোনো উপায় নাই।

তৃতীয় গ্রামবাসী : যাবা কোনো রাজ্যে, বেবাকই এক রহম।

দ্বিতীয় গ্রামবাসী : কিসের এক বুইড়া[৩৩৮] হাতি ছাইড়া দিয়া আমাগো বিপদে ফালাইছে।

প্রথম গ্রামবাসী : খালি বিপদ? বিপদের উপর বিপদ। হাতি মরলেও রাজারে ট্যাকা দেওন লাগব। খবর দিলেও ট্যাকা দেওন লাগব। খবর না দিলেও ট্যাকা দেওন লাগব।

তৃতীয় গ্রামবাসী : এইডা মহা অন্যায় আমরা মানি না। আস আমরা রাজার কাছে যাই। এই আদেশ তুইলা নেওন লাগব।

দ্বিতীয় গ্রামবাসী : তুমি গেলে যাও আমি যাবার পারমু না। জীবন আরাবার কও?

প্রথম গ্রামবাসী : বুদ্ধি একটা আছে।

সকলে : বুদ্ধি আছে?

প্রথম গ্রামবাসী : হ্যাঁ আছে।

সকলে : কি বুদ্ধি?

প্রথম গ্রামবাসী : আস আমরা সবাই মিলা আমগো গেরামের সীমানা পাহারা দেই। হাতি আসলেই খ্যাদায়া দিমু। আমগো গেরামের সীমানায় ঢুকতে দিমু না।

তৃতীয় গ্রামবাসী : হা এইডাই ঠিক। রাইত দিন আমরা গেরামের চাইর দিক খাড়ায়া থাকমু।

সকলে : হ, চল। (চলে যায়। আলো বন্ধ। হাতির সেট হলে আলো জ্বলবে এবং গ্রামবাসী হাতি তাড়াবার চেষ্টা করবে।)

প্রথম গ্রামের : ও...... হো ...... (২ বার)

দ্বিতীয় গ্রামের : ও...... হো ...... (২ বার)

(সবাই হাতি ঘিরে ধরবে ও সেট ভেঙ্গে যাবে।)

প্রথম বাউল : আমায় উদাসী বানাইয়া গেল (২ বার)
বসন্তেরই কালে রে মরার কোকিলে
আমার ঘুম ভাঙ্গায়া গেল রে মরার কোকিলে
হারে- এই ভাবেতে হাতি লইয়া চলে হাতাহাতি
কারো চোখে ঘুম নাই দিবস আরো রাতি
লাঠি হাতি রয় দাঁড়ায়া গায়ে সীমার আইলে রে ॥

www.pathagar.com

কথা : এই ভাবে সেই গ্রামের মানুষই গ্রামের চারদিকের সীমানা পাহাড়া দেয়। এই গ্রামে হাতি আসলে ধাক্কায়া ঠেইলা দেয় ঐ গ্রামে। হেরা আবার তাড়ায়া দেয় আরেক সীমানায়। এইভাবে হাতি কোনো জায়গায়ই দাঁড়াবার পারে না খাবারও পারে না। শেষে একদিন হাতিটা মরল। তারপর– (বাউল বসে পরে, আসে গ্রামবাসী।)

প্রথম গ্রামবাসী : মরণের আর জাগা পাইল না হাতিডা। আমগো গেরামে আইসা মরল।

দ্বিতীয় গ্রামবাসী : আরে কথায় আছে না। কপাল যদি আলে[৩৩৯] গাই[৩৪০] বিয়ায়না পালে। আমগো কপাল খারাপ।

তৃতীয় গ্রামবাসী : অহনও এক লাখ ট্যাকাই জোগাড় অইল না। এই ট্যাকা জোগাড় অইলে নিয়া যাব কেডা হেইডাও চিন্তা।

প্রথম গ্রামবাসী : মাত্বর সাব বুদ্ধি দেন।

মাতব্বর : এত প্যাঁচাল পার ক্যা। যে কয় টেকা বাকি আছে তোল। তুইলা নিয়া উত্তর পাড়া গেদু শেখের কাছে যামু। হেরে[৩৪১] পাঠামু[৩৪২]

দ্বিতীয় গ্রামবাসী : হ। তাছাড়া আর যাবো কেডা।

তৃতীয় গ্রামবাসী : জাইনা শুইনা[৩৪৩] কেউ যাইতে চাবো?

মাতব্বর : আপন ইচ্ছায় কি কেউ যাবো। জোর কইরা পাঠামু।

প্রথম গ্রামবাসী : হ। মাত্বর সাব আপনে কইলে আর না করবার সাহস পাব না।

দ্বিতীয় গ্রামবাসী : না করলে অর ঘরবাড়ী জ্বালায়া দিমু।

তৃতীয় গ্রামবাসী : হ। গেদুরে পাঠাবার পারলে মাত্বর সাবের লাভই অইব খবরের ট্যাকা গেদু জোগাবার পারবই না। গেদুর অইবো ফাঁসি। আর গেদুর মাইয়া সোহাগী অইব একা। মাত্বর সাব ইচ্ছা করলে তহন তারে পাঁচ নম্বর বিবি বানাবার পারবেন।

মাত্বর : আবার বিয়ার কথা কও? তা তোমরা যহন কও তহন আমি রাজি। কারণ তোমাগো কথা তো আমি ফ্যালবার পারি না। চল যাই।

সকলে : চলেন। (আলো বন্ধ। গেদুর বাড়ির সেট তৈরি হয় আলো জ্বলে।)

প্রথম গ্রামবাসী : গেদু বাড়ি আছ?

গেদু : কেডা, ও আপনেরা?

মাতব্বর : হ, আইলাম। তোমার অহন রাজবাড়ীতে যাওন লাগব। হাতি মারার খবরটা দিয়া আস।

গেদু : কন কি, আমি?

দ্বিতীয় গ্রামবাসী : আসমান থিকা[৩৪৪] পড়লা মনে অয়। মাতবর সাব কি কয় বুজলানা?

গেদু : আইজ সকাল থিকা বাড়িতে খাওন নাই। আমার মাও মরা একমাত্র মাইয়াডার মুখের দিকে চাবার পারতাছি না। আর আপনেরা কন আমি হাতি মরার খবর দিমু।

www.pathagar.com

তৃতীয় গ্রামবাসী : হ, দিবা।

গেদু : হাতি মরার খবরের ট্যাকা পামু কই?

মাতব্বর : এ্যাত কথা বুঝি না। তুমি খবর দিবা এই আমাগো শ্যাষ কথা।

সোহাগী : আপনে তো এমুন কতা কবেনই। দেশের রাজা বেআইনী কইলে, গেরামের মাত্‌বর আর কেমুন কথা কইব।

গেদু : মা সোহাগী, তুই এইহানে আইলি ক্যান?

সোহাগী : আমি যামু বাজান। খবর দিতে আমি যামু।

মাতব্বর : না, না। তুমি যাবা ক্যান? তোমার বাপে যাইব।

সোহাগী : চুপ করেন। আপনেরা যহন কেউ যাবেন না। তহন চুপ করেন। আমরা বাপ বেটিয়ে বুজুম কেডা যামু।

গেদু : না মা, তুই যাবি না, আমি যামু।

সোহাগী : না বাজান, মরতে অয় আমি মরমু।

গেদু : আমি বাইচা[৩৪৫] থাকতে তরে মরতে দিমু না মা।

সোহাগী : চল বাজান, আমরা দুইজনেই যামু। এই জুলুমের চাইতে আমগো মরাই ভালা। আস।
(উভয়েই চলে যায়)।

মাতব্বর : ও সোহাগী, কর কি? কর কি? হোন, ও সোহাগী। (সবাই চলে যায়।)

১ম বাউল

গান : আমায় উদাসী বানাইয়া গেল
বসন্তেরই কালেরে ॥

কথা : যা হোক- এইভাবে গ্রামের লোকে জোর কইরা গেদু আর তার মেয়েরে পাঠাইলো। গরীব মানুষ মরে ওরাই মরুক। গেদুর মেয়ে সোহাগী যায় আর বুদ্ধি করে কিভাবে বাঁচা যায়। এই দিকে রাজা (বাউল বসে যায়।)

রাজা : উজির।

উজির : আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা : হাতিটার কোনো খবর পেয়েছ?

উজির : না মহারাজ। (আসে সোহাগী আর গেদু।)

উভয়ে : মহারাজের জয় হোক।

রাজা : কে তোমরা? কি বল।

সোহাগী : রাজা মহাশয় শ্লোক গড়ুয়া[৩৪৬]
উজির মহাশয়ও ত্যান[৩৪৭]
কি জানি মইরা রইছে এমুন মোটা মোটা ঠ্যাং

উজির : তবে কি হাতি মইল?

সোহাগী : আমি কিন্তু কইনাই[৩৪৮] রাজা মহাশয়। আপনার উজির মহাশয় কইল।

www.pathagar.com

উজির : মহারাজ হাতি মরার খবর এনেছে। এবার টাকা চান।

গেদু : হাতি মরার কথা তো আমরা কইনাই মহারাজ। আপনার উজিরে কইছে।

রাজা : তোমরা কি বলেছ?

সোহাগী : আমরা কইছি,
রাজা মহাশয় শ্লোক গড়ুয়া-
উজির মহাশয়ও ত্যান,
কি জানি মইরা রইছে এমুন মোটা মোটা ঠ্যাং।

রাজা : উজির তুমি কি বলেছ?

উজির : আমি বলেছি- তবে কি হাতি মইল?

সোহাগী : আবারও আমি কিন্তু কই নাই। আপনার উজির মহাশয় কইল।

রাজা : উজির বুদ্ধিতে তুমি হেরে গেছ। হাতি মরার কথা তোমার মুখ দিয়েই বেরিয়েছে। অতএব খবরের এক লক্ষ টাকা তুমিই দিবে। আর বুদ্ধিটা তুমিই আমাকে দিয়েছিলে।

গেদু, সোহাগী : মহারাজের জয় হোক।

উজির : মহারাজ। এক লক্ষ টাকা আমি–

রাজা : হ্যাঁ, তুমিই দেবে।

সোহাগী : আমি গেরামের এক লক্ষ ট্যাকা আনছি মহারাজ। নেন।

রাজা : না। ও টাকা আমি তোমাকেই দিয়ে দিলাম।

গেদু, সোহাগী : মহারাজের জয় হোক।

রাজা : উজির।

উজির : আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা : সত্যি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। তোমার বুদ্ধির পুরষ্কার স্বরূপ আমি তোমাকে আরো এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দেব।

গেদু, সোহাগী : মহারাজের জয় হোক।

রাজা : উজির।

উজির : আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা : চল। (রাজা উজির সামনে এবং গেদু ও সোহাগী পেছনে জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে যায়)

প্রথম বাউল : আমায় উদাসী বানাইয়া গেল
বসন্তেরই কালেরে মরার কোকিলে ॥
হারে- এই ভাবেতে বুদ্ধিবলে উজিরকে হারাল।
জরিমানার লক্ষ টাকা কন্যা যে পাইল
স্বর্ণ মুদ্রা পাইল আরো (২ বার)
অধম বাউল বলে রে ॥

কথা : যা হোক, উনার প্রশ্নের জবাব দিলাম। এবার উনার কাছে আমার প্রশ্ন। আঠার বিশ বছরের এক মেয়ে আট দশ বছরের এক ছেলেকে নদীর ঘাটে গোসল করাইতেছে। নদী দিয়া যাইতে ছিল এক সওদাগরের নৌকা। নৌকা থেকে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল। দেখে তো মনে হয় না তুমি ছেলের মাও, তুমি কার গা ধোয়াও? মেয়েটি উত্তর দিল- ওর বাপ যার শ্বশুর, তার বাপ আমার শ্বশুর'। আপনাকে বলতে হবে মেয়েটির জবাব অনুযায়ী মেয়ে এবং ছেলেটির মধ্যে সম্পর্ক কি? আর দ্বিতীয় প্রশ, আপনি এমন একজন পুরুষের কথা বলুন যার সামান্য ভুলের জন্য একটি রাজ বংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে বলতে হবে সেই পুরুষটি কে, রাজবংশটি কোথায় ছিল এবং কিভাবে ধ্বংস হল।

গান : আমায় উদাসী বানাইয়া গেল
বসন্তেরই কালেরে
মরার কোকিলে ॥ (১ম বাউল বসে পরে। ২য় বাউল উঠে দাঁড়িয়ে।)

দ্বিতীয় বাউল

গান : লোকে বলে আমার ঘরে নাকি চাঁদ উঠেছে,
নয় গো নয় চাঁদ নয়
আমার বন্ধু এসেছে ॥

কথা : যা হোক আমাকে দুইটি প্রশ্ন করেছে। এক. দেখেতো মনে হয় না তুমি ছেলের মাও, তুমি কার গা ধোয়াও। মেয়েটি বলে- 'ওর বাপ যার শ্বশুর তার বাপ আমার শ্বশুর'। মেয়েটির জবাব অনুযায়ী মেয়ে এবং ছেলেটির মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে ভাই-বোন। দুজনের বাবাই যার শ্বশুর সে হচ্ছে মেয়েটির স্বামী। আর তার বাপ আমার শ্বশুর মানে স্বামীর বাপ মেয়েটির শ্বশুর। অতএব মেয়ে এবং ছেলেটির মধ্যে সম্পর্ক ভাই এবং বোন।

গান : লোকে বলে আমার ঘরে নাকি চাঁদ উঠেছে,
নয় গো নয় চাঁদ নয়
আমার বন্ধু এসেছে ॥

কথা : দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এমন একজন পুরুষের কথা বল যার সামান্য ভুলের জন্য একটি রাজ বংশ ধ্বংস হয়েছিল। কোথায় এবং কিভাবে?

গান : বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতীতে যান...।
সেই থানায় এক গ্রাম আছে
রতনগঞ্জ নাম।
তোমরা সবাই আস না

www.pathagar.com

নিজের চোখে দেখ না (২ বার) ও
সেইখানেতে রতন নামে এক
রাজা ছিলো যে ॥

কথা : যা হোক বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানায় রতনগঞ্জ নামে যে গ্রাম আছে সেখানে এক রাজা ছিলেন, নাম তার রতন রাজা। তিনি একদিন বৈঠক খানায় বসে আছেন, এমন সময়- [চেয়ারের সেট (রাজা বসে আছে আসে সৈনিক)]

সৈনিক : প্রণাম রাজা মহাশয়, প্রণাম।

রাজা : কে তুমি সৈনিক?

সৈনিক : আমি গৌড় রাজ্যের দূত।

রাজা : গৌড় রাজ্যের দূত? বল দূত কি সংবাদ?

সৈনিক : গৌড় রাজ আপনাকে পত্র দিয়েছেন?

রাজা : পত্র দিয়েছেন? কই দাও। (পত্র নিয়ে পাঠ করে।) আমাকে যুদ্ধে যেতে বলেছেন? সেনাপতি।
(আসে সেনাপতি)

সেনাপতি : আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা : সৈন্য সাজান। এক্ষুণি যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরি হোন।

সেনাপতি : যুদ্ধ! কোথায় মহারাজ।

রাজা : আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় বন্ধু গৌড়ের রাজাকে শত্রুরা আক্রমণ করেছে। তাই তাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে পত্র দিয়েছেন।

সৈনিক : হ্যাঁ মহামান্য সেনাপতি। শত্রুরা আমাদের প্রজাদের ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

সেনাপতি : তাহলে তো যেতেই হবে মহারাজ। আমাদের রাজ্য যখন কোচ রাজা আক্রমণ করেছিল। তখন আপনার বন্ধু ঐ গৌড়ের রাজাই তো আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তার বিপদে তো আমরা বসে থাকতে পারি না।

রাজা : হ্যাঁ সেনাপতি আপনি যান। হাতি ঘোড়া সাজান।

সেনাপতি : তাই যাচ্ছি মহারাজ। (সেনাপতি চলে যায়।)

রাজা : দূত।

সৈনিক : আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা : তুমি গিয়ে বন্ধু গৌড় রাজাকে বলো, আমি তোমার পিছনে পিছনেই আসছি।

সৈনিক : যথা আগ্গা মহারাজ। প্রণাম মহারাজ, প্রণাম। (চলে যায়)

রাজা : রানি। চন্দ্রা, চন্দ্রাবতী।

রানি : আদেশ করুন রাজা।

www.pathagar.com

রাজা : আমি যুদ্ধে যাচ্ছি চন্দ্রা, তুমি ভাল থেকো।

রানি : শুনলাম রাজা। রানি হয়ে আমি যুদ্ধে যেতে বারণ করতে পারি না। তবুও মন মানে না। যদি কোনো অমঙ্গল...।

রাজা : তুমি কোনো চিন্তা করো না রানি আমি যুদ্ধে জয়ী হয়েই ফিরব।

রানি : তাই যেন হয়।

রাজা : শোন, আমার সঙ্গে আমার পোষা কবুতর জোড়া, পবন দূত নিয়ে যাচ্ছি। যুদ্ধে জয়ী হইতো ভাল। যদি পরাজিত হই তবে পবন দূত কবুতর জোড়া ছেড়ে দেব। তুমি ঐ কবুতর জোড়া দেখলেই বুঝবে আমি যুদ্ধে হেরে গেছি। তখন শত্রুর হাতে অপমানিত হওয়ার চেয়ে রাজপুরীর রাজদীঘিতে রাজবংশের সকলকে নিয়ে পংখি নৌকা ডুবিয়ে দিও।

রানি : রাজা। ও কথা বলো না। তুমি যুদ্ধে জয়ী হবে।

রাজা : আমাদের একমাত্র ছয় মাসের শিশু পুত্রকে তুমি দেখে রেখো। বিদায় রানি। বিদায়।

রানি : বিদায়। (উভয়ে চলে যায়।)

দ্বিতীয় বাউল : ও লোকে বলে আমার ঘরে
নাকি চাঁদ উঠেছে।

কথা : যা হোক, রতন রাজা তার বন্ধুর সাথে যুদ্ধে যোগ দিল। সাত দিন সাত রাত মরণপণ যুদ্ধ করল রতন রাজা। শেষে যুদ্ধে জয়ী হলো। হাসি ফুটল গৌড় রাজার মুখে। বন্ধু রতন রাজাকে অনেক উৎসব আনন্দের পর একদিন বিদায় দিল। চতুরঙ্গ নিয়ে রতন রাজা বাড়ি ফিরছে-

গান : ভাগ্য তো বিধির বিধান বুঝা বড় দায়
তার খেলা সে খেলে চলে বসে নিরালায়।
সাধের কবুতর ছুটে যায়।
রাজা করে হায় হায়।
ও পবনদূত কবুতর জোড়া ছুটে গিয়েছে ॥

কথা : যা হোক, একটু অসাবধানতার জন্য সাথের পবনদূত ছুটে গেল। রতন রাজা হায় হায় করে উঠলেন। সর্বনাশ এখন কি হবে? রাজ পাগলের মতো ঘোড়া ছোটাতে লাগলেন। চাবুকের পর চাবুক মেরে ঘোড়ার পিঠ রক্তাক্ত করে দিলেন। এদিকে রানি....।

রানি : ও কি? ঐতো পবনদূত কবুতর। হায় ভগবান। রাজা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে?

মাঝি : এখন কি হবে রানি মা?

রানি : মৃত্যু। শত্রুর হাতে অপমানিত হওয়ার চেয়ে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

মাঝি : রানি মা। আমরা সবাই মরে যাব। হায় ভগবান।

রানি : মাঝি নৌকা সাজাও আমি আসছি। (নৌকার সেট।)

মাঝি

গান : নৌকা সাজিল রে
সোনার নাও পবনের বৈঠা সাজিল রে
হারে- পরথমে সাজিল নৌকা
নামে পংখীরাজ...।
ছয় মাসের পথ চলে ছয় দিনের মাঝর ॥
হারে- তার পরে সাজিল নৌকা
নামে টাংগানিয়া...।
মেঘের মতো সেই নৌকা
চলে উড়াল দিয়ারে ॥

রানি : মাঝি থামাও তোমার গান, ভিড়াও ময়ুর পংকী নৌকা।

মাঝি : রানি মা। মরার আগে শেষ বারের মতো একটু গাইলাম। আর তো গাব না।

রানি : বিদায় আমার দেশের মানুষ, বিদায়
বিদায় চন্দ্র, বিদায় সূর্য। (নৌকায় কুঠার মারার কাজ করে। নৌকা ডুবে যায়।)
হামিং : হায়, হায়, হায়... (রতন রাজা আসে।)

রতন রাজা : চন্দ্রা, চন্দ্রা, চন্দ্রাবতী, রানি... আমি আসছি। আমি যুদ্ধে হারিনি। একি রাজ দিঘিতে কি ভাসছে? হায় ভগবান। ঐ তো ময়ুর পংখী নৌকার মাস্তুল ভেসে আসে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ তো পানিতে ভাসছে খোকার দুধের বাটি। হয়তো শেষবারের মতো দুধ খেয়েছিল কুমার। (কান্না) ভাসছে তার খেলনা। ঐ তো রানির আলতা বরণ চন্দন কাঠের পাদুকা ভাসছে। ভগবান আমার আর বেঁচে থেকে কি হবে। আমার জন্যই আজ- না, না আমিও দিঘির জলে ডুবে মরব। আমি আসছি রানি। বিদায় বিদায় আমার রাজ্যবাসী। বিদায় আকাশ, বিদায় বাতাস, বিদায়। (রাজা দিঘিতে ডুবে মরল।)

প্রথম বাউল
ও
দ্বিতীয় বাউল : আজকের মতো পালা মোদের করে দিলাম শেষ,
সুখে থাকুন শ্রোতা, ভাল থাকুক দেশ।

৩. তাঐ-মাঐ

প্রথমে মাঐ মঞ্চে গিয়ে সংলাপ বলবে- কতদিন হইয়া গেল কোনো আত্মীয় স্বজন আইসে না, এই যে শীতের দিন একদিন পিঠা পায়েস কিছুই খাইয়া হারলাম না। খ্যাম[৩৪৯] ছাড়া মর্দ্দার কাছে বিয়া বইসা জীবনডা শেষ হইয়া গেল।

(পুরুষের প্রবেশ)- কনে গেলা গো বাইত্তে[৩৫০] আছ।

www.pathagar.com

মহিলা : তুমি আইছ আইজক্যা[৩৫১]? বাড়িতে আহ, আইজকা তোমার একদিন কি আমার একদিন।

পুরুষ : তুমি আইজক্যা এত হাটাইয়া[৩৫২] রইছ, তেল মর্বিল ছাড়াই ইস্টার নেও।

(পুতুরার[৩৫৩] প্রবেশ)- তাঐ গো মাঐ ও তাঐ মাঐ বাইতে আছেন। ক্যারে কথা কয় না ক্যা, বাড়িতে কেউ নাই।

মাঐ : কেরা গো ডাহে[৩৫৪]?

পুতুরা : আমি আপনেগরে হেই পেটকি চোরা।

তাঐ : আহারে পেটকি চোরা আইছে। আহ ভিতরে আহ।

পুতুরা : এহনো আইসা হারি নাই।

তাঐ : (হাত ধইরা টান দিয়া) আরে বাপুরে তাড়াতাড়ি ভিতরে আহ।

পুতুরা : টান দেন ক্যা? হাত কি আপনের বাপের। যদি ছিঁড়া যায় জোড়া দিয়া হাবেন[৩৫৫]?

তাঐ : যাইগ পুতুরা তোমার মার বাবা দাদা দাদি কাহা[৩৫৬] কাহি তোমার চৌদ্দ গোষ্ঠী কিবা[৩৫৭] আছে?

পুতুরা : আরে বাপুরে দোম লেন একবার। এত গুণার[৩৫৮] নাম কইলে কমু কেমনে?

মাঐ : আঃ পুতুরা তা কি মনে কইরা আইলা[৩৫৯]?

পুতুরা : আহারে মাঐ কি কমু দুঃখের কথা বুকটা আমার ফাইটা যায়।

মাঐ : ক্যা পুতুরা কি হইছে?

পুতুরা : মাঐ গো আপনে তো জানেন? আঃ বুকটা আমার ফাইটা যায়?

মাঐ : আরে বাপুরে কি হইছে হেইডা কও[৩৬০]।

পুতুরা : ঐ যে আমাগরে দুই বলদ আছাল[৩৬১] না। ঐ যে পাঁচ সের কইরা দুধ হইছে। তার একটা বলদ মইরা গেছে। তাই যেডা আছে হেই বলদডা বেচি ১০, ০০০ টেহা। হেই টেহা[৩৬২] দিয়া আরেকটা গরু কিনবার আইছি।

মাঐ : (তাঐর কানে কানে কথা বলে)।

তাঐ : পুতুরা একটা কথা কবার[৩৬৩] চাই, কথাডা রাখবা।

পুতুরা : কি কথা কবেন? কন।

তাঐ : কথা মানে মেলাদিন ধইরা আমার পিঠা পায়েস খাই না। কয়ডা টেহা পয়সা দিলে তুমি খাইলানি[৩৬৪], আমরাও খাইলাম নি।

পুতুরা : হ বাবার টেহা দেখছেন তো তাই পায়েস খাবার মনে অইলো।

মাঐ : দেও গো পুতুরা। তোমারও ভাল অইল আর আমাগো উপকার অইল।

www.pathagar.com

পুতুরা : এহন[৩৬৫] ধরছেন যহন তহন[৩৬৬] তো ছাড়বেন না। কইয়া করছি ভুল। কি করমু এই নেন। (টাকা প্রদান)

তাঐ : পুতুরা কিবা কইরা পায়েস খায়? আমরা কোনোদিন খাই নাই।

পুতুরা : আপনেরা খান নাই। আমার তো অভ্যাস নাই।

তাঐ : তা কি কি লাগবো একটা যায় দিলে[৩৬৭] হদাইডা কিনা আনলামনি।

পুতুরা : এ্যাত কইতাছেন যহন। খাতা কলম ধরেন।

তাঐ : আচ্ছা কও।

পুতুরা : এই ধরেন ২৫টা বিলাতি।

তাঐ : বিলাতি দিয়া কি অব?

পুতুরা : বিলাতি না দিলে পায়েস মজা অইব না।

তাঐ : বাবারে পুতুরার বুদ্ধি। তারপর কি?

পুতুরা : এই ধরেন দুইমন মিঠা আলু।

তাঐ : আলু দিয়া কি অইব?

পুতুরা : তা না অইলে পায়েস পিচলা অইব না। তারপর দুই বস্তা লবণ।

তাঐ : লবণ দিয়া কি অব?

পুতুরা : তা না হইলে পায়েস ধক[৩৬৮] অইব না। তারপর লাগবো দুই মণ হলুদ।

তাঐ : হলুদ দিয়া কি হব?

পুতুরা : হলুদ না দিলে পায়েস সাদা অইব না।

তাঐ : বাবারে পুতুরার বুদ্ধি। তারপর কি লাগব?

পুতুরা : চার বস্তা ছোডা।

তাঐ : ছোডা দিয়া কি হব?

পুতুরা : আরে বাবারে বুঝেও না ক্যান। ছোডা দিয়া পায়েস খারে[৩৬৯] দেওন লাগবো না।

তাঐ : বাবারে পায়েস আবার খারে দেওন লাগব। তারপর কি লাগব?

পুতুরা : তারপর লাগবো এক হাজার গাব।

তাঐ : গাব দিয়া কি হব?

পুতুরা : ক্যা পায়েস ফাইটা গেলে তার বাইন[৩৭০] দেওন লাগব না।

তাঐ : বাবারে পায়েস আবার ফাইটাও যায়।

পুতুরা : আরে তাঐ যাতা[৩৭১] পরলে ঠিকই ফাটে।

তাঐ : আরো কিছু লাগব?

পুতুরা : না বাপু আর লাগব না। আর কিছু কইলেই, যে টেহা কয়ডা আছে তাও দিয়া দেওন লাগব। তাঐ হাটের বেলা অইয়া গেছে তো গরু কিনবার গেলাম, গরু কিনা তারপরে আইসিরো[৩৭২]।

তাঐ : পুতুরা হাটে তো যাবা তাই না। যদি গরু কিনার পর বেলা থাকে, তাহলে ঐ রাস্তা দিয়া বাড়িতে যাইও গা।

পুতুরা : হালার পোলার[৩৭৩] কথা হুনছ[৩৭৪]। বেলা থাকলে ঐ রাস্তায় বাড়িতে যাবার কয়। বাবাইতা[৩৭৫] টেহা নিছ তো, এহন কবাই[৩৭৬] যাবার নিগা[৩৭৭]। হালা হারামজাদা তাঐ। (প্রস্থান)

তাঐ : এই যে, হুনছ, তাড়াতাড়ি বস্তা দেও আর ঝাহা[৩৭৮] দেও।

মাঐ : বস্তা দিয়া কি হব?

তাঐ : বস্তা নিয়া দুধ আনবার যামু।

মাঐ : মর্দা[৩৭৯] বস্তায় কইরা দুধ আনবার যায়। (দুধওলার প্রবেশ)।

দুধঅলা : দুধ রাখবেন দুধ।

তাঐ : ঐ দুধআলা আহ।

দুধআলা : কি কন কাহা[৩৮০]?

তাঐ : দুধ কতা হানি[৩৮১]?

দুধআলা : দুই গাইয়ের দুধ।

তাঐ : দূর হালা কত কইরা সের।

দুধআলা : ছয় মাস ধইরা বিয়াইছে।

তাঐ : আমি কই কি হালায় কয় কি? বাড়ি কোনো?

দুধআলা : কালা গাইয়ের দুধ।

তাঐ : তোর নাম কি?

দুধআলা : বাড়ি ফলদা।

তাঐ : এই দুধ দে হালা, হারামজাদা।

দুধআলা : কাহা টেহা দেন, বাড়িতে পোলাপান[৩৮২] না খাইয়া রইছে।

তাঐ : হারামজাদায় কয় কিরে? জীবনে কোনোদিন কোনো কিছু কিনা টেহা পয়সা দেই নাই। আইজ ক্যা বলে দুধের দাম দিমু। যা হারামজাদা।

দুধআলা : কামডা ভাল করলেন না। আল্লায় বিচার করব। (প্রস্থান)।

তাঐ : যা হা লা। যা অয় অবনি[৩৮৩]। এই যে হুন, তাড়াতাড়ি পায়েস রাইন্ধা হালাও[৩৮৪]। পুতুরা আবার আইসা পড়বো। (দুইজনে খাওয়া দাওয়া কইরা শুইয়া থাকে) (পুতুরার প্রবেশ)

পুতুরা : তাঐ- ও মাঐ। কি বেপার। বাড়ি নিটাল[৩৮৫] কেরে; কোনে[৩৮৬] গেল সব। এ তাঐ- গো। মাঐ। (ডাকতে থাকবে, কিছুক্ষণ পর কথা বলবে)

তাঐ : কেরা গো?

পুতুরা : আমি আপনেগোর হেই পেটকি চোরা।

তাঐ : ও পুতুরা আইছ, তা আবার ফিরা আইলা[৩৮৭] ক্যা? বাড়িতে যাইয়া হারলা[৩৮৮] না। এহন উইঠা হামু না[৩৮৯]। ঐ যে কুরকার খোওয়ার[৩৯০] আছে। হেনে হুইয়া পড়োগা[৩৯১], যাও।

www.pathagar.com

পুতুরা : হুনছ কথার ছাইছ[৩৯২]। আমার টেহা দিয়া পায়েস খাইয়াছে। এহন আমার কোনো দাম নাই। খারাও পায়েস খাওয়াইতাছি। (শুইয়া বলতে থাকে, দশ হাজার টাকা বট গাছের নিচে রাইখা আইলাম, কেউ নেয় নাকি। তাঐ আইসা কাত পেতে শুনতে থাকে। সব শুনে চলে যাবে, মাঐ জেগে উঠবে এবং ডাকবে)

মাঐ : পুতুরা। ও পুতুরা উঠছো?

পুতুরা : কি- কি- কি হইছে মাঐ?

মাঐ : তোমার তাঐ কোনে গেছে কওছে দেহি[৩৯৩]।

পুতুরা : ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এই বুড়া বয়সে এইডা আপনেগর[৩৯৪] কাম।

মাঐ : ক্যা- কি হইছে?

পুতুরা : কি কমু হেই কথা। কোনো থিকা এটা বেটি আইল, ঠিক আপনের মতো দেখতে। তাঐরে কান ইশারা দিল। আর তাঐ তার পাছে গেল গা।

মাঐ : কি। বুড়া মর্দ্দার এত্তবড় সাহস। বুড়াকালে মাইয়া মাইষের সাথে যায়। কোনোদিকে গেল গো পুতুরা?

পুতুরা : এই পশ্চিম দিকে গেছে। তাড়াতাড়ি যাইন।
(মাঐর প্রস্থান, পুতুরা শুইয়া থাকে। তাঐর প্রবেশ)

তাঐ : শালার পুতুরা। আমারে কি ঠক দিল। কয় যে বটগাছের নিচে টেহা থুইয়া আইছি। যাইয়া আতাইলাম। খালি কুত্তার গু। কোনে গেলা গো, কেরে কথা কয় না ক্যা? পুতুরা। এই পুতুরা। উঠছ।

পুতুরা : কি- কি- কি হইছে ও তাঐ। কি অইছে?

তাঐ : তোমার মাঐ কোনে গেছে গো?

পুতুরা : ছিঃ ছিঃ ছিঃ এইডা আপনেগোর কাম?

তাঐ : ক্যা- কি হইছে?

পুতুরা : আর কইয়েন না। আগে জানলে আপনেগোর বাড়িতে আইতাম না। কোনো থিকা এক ফকির বেটা আইসা মাঐরে ডাক দিল। তার সাথে মাঐ গেল গা।

তাঐ : কি। মাগির এত বড় সাহস। বুড়াকালে ফকিরের সাথে যায়। (মাঐর প্রবেশ)।

মাঐ : এই তুমি কোনে গেছিলা। (দুইজনে মারামারি করে। মাঐ মাইর খায়)।

পুতুরা : কিবা লাগে মাইর। কিবা লাগে? আমারে থুইয়া পায়েস খাওয়ার মজা।[৮]

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. শামছুল হক বয়াতি, বয়স : ৬৮, পেশা : কবিরাজী, গ্রাম : নিকলা দড়িপাড়া, ডাকঘর : নিকলা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৭.৭.২০১১।
২. গায়ক : শিপন, বয়স : ২৭ বছর, গ্রাম : বড় বাশালিয়া হাটখোলা, উপজেলা : টাঙ্গাইল সদর, জেলা : টাঙ্গাইল, নিরক্ষর, পেশা : ব্যবসা, তারিখ : ২৬.১১.২০১১।
৩. তারক চন্দ্র পাল, বয়স : ৮৫ বছর। গ্রাম : সূতি কালীবাড়ী, ডাকঘর : সূতি, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, সংগ্রহ : ০৮.০৭.২০১১।
৪. মো. আবদুর রাজ্জাক, বয়স : ৬২ বছর। গ্রাম : সূতি দিঘুলিয়াপাড়া, ডাকঘর : সূতি, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, অষ্টম শ্রেণি পাস, পেশা : স্বর্ণশিল্পী, তারিখ : ০৮.০৭.২০১১।
৫. কার্তিক চন্দ্র শীল, বয়স : ৫৯ বছর, গ্রাম : ফলদা, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৭.১০.২০১১।
৬. জগদীশ চন্দ্র দত্ত, বয়স : ৩৯ বছর। গ্রাম : ফলদা হিন্দুপাড়া, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলাঃ ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, নবম শ্রেণি পাস, পেশা : ব্যবসা, তারিখ : ০৯.০৯.২০১১।
৭. নারায়ণ চন্দ্র শীল, বয়স : ৮২ বছর, গ্রাম : বাগবাড়ী, ডাকঘর : বাগবাড়ী, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, নিরক্ষর, পেশা : ব্যবসা, তারিখ : ১৫.০৯.২০১০।
৮. জগদীশ চন্দ্র দত্ত, বয়স : ৫০, পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসা, গ্রাম : ফলদা, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ১২.০৫.২০১২।

আঞ্চলিক শব্দার্থ

১. পইড়া < পড়ে, পাঠ করে। ২. খালি– শুধুমাত্র। ৩. বইলো– বলো। ৪. ব্যাজার– মন খারাপ ৫. আইয়াল– প্রথমে অর্থে। ৬. দিনডা চারি– দু'চার দিন। ৭. জরমো– জন্ম। ৮. আইজি– আজই। ৯. কাইলি– কালই। ১০. চিরিজন– সৃজন। ১১. জোম– < যম, অর্থাৎ মৃত্যু। ১২. হেকমত– কৌশল। ১৩. নারকোইলের– নারকেলের। ১৪. হাস– সাস। ১৫. বেটার– ছেলের। ১৬. দুইরা– বাঁশের তৈরী মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ। ১৭. পংখিয়ে– পাখিয়ে। ১৮. রান্দে– রাধে। ১৯. সন্ধ্যাবালা < সন্ধ্যাবেলা। ২০. ব্যাসন– নাক ফুল। ২১.দইরার– দরিয়ার, নদীর। ২২. নটরবটর– নড়বড়ে। ২৩. কাম– কাজ। ২৪. পরথোম– প্রথম। ২৫. শাহা মর্তুজ আলী– হযরত আলী (রাঃ)। ২৬. দাউনে– নবী বা গুরুর প্রদর্শিত পথে। ২৭. হইছিলো– হয়েছিলো। ২৮. আন্ধার– আঁধার, অন্ধকার। ২৯. বইন্দা– বন্দনা করে। ৩০. যুদিল– যদি। ৩১. গাইল– গালি। ৩২. দক্ষিণি– দক্ষিণ।৩৩. ভরমন– ভ্রমণ। ৩৪. কিবা নাম তর– কি নাম তোর। ৩৫. আবুইতা– আজগবী। ৩৬. নাইড়ার– নেড়া মাথাওয়ালার। ৩৭. আহুট– ঠোঁট। ৩৮. মকরবের– একটি স্থানের নাম। ৩৯. দেও– দৈত্য, দানব। ৪০. বর্জা– বজ্রমুষ্ঠি করে। ৪১. তিনরোজ– তিনদিন। ৪২. বাদ– বাদানুবাদ। ৪৩. ছিপাই– সিপাহী। ৪৪. জারজার– অতিশয় ব্যথিত। ৪৫. তেড়ি– বাকা। ৪৬. কিলাইছাল– কিলিয়েছিল। ৪৭. গুইণা– গুণে। ৪৮. করছাল– করছিলো। ৪৯. পারধুলা < পায়ের ধুলা- এখানে আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে। ৫০. মুরিদ– শিষ্য। ৫১. বাতাইলো– বুঝিয়ে দিলো। ৫২. চাইর– চার। ৫৩. মাথে– মাথায়। ৫৪. ডাইনে– ডানে। ৫৫. মোষ্টে– মুঠে। ৫৬. কাম– কাজ। ৫৭. বিলা– দিকে অর্থে। ৫৮. বাড়িত– বাড়িতে ৫৯. পোনছিলো– পৌছিলো। ৬০. ভরান ভাদ্দর– ভরা ভাদ্র। ৬১. যেমোন– যেমন। ৬২. দেওয়ের– দৈত্যের, দানবের। ৬৩. ইতুদুল্লা– খুব ছোট। ৬৪. মাইরা–

মেরে। ৬৫. থুইছি– রেখেছি। ৬৬. খাবা– খাবে। ৬৭. থিকা– থেকে। ৬৮. থাপরা– থাবা ৬৯. মেরা– মোর, আমার। ৭০. নাড়াই– জঙ্গর, লড়াই। ৭১. সান্দাইয়া– ঢুকে। ৭২. ওয়ার– কোপ। ৭৩. এছাই– এতোই। ৭৪. কাইটা– কেটে। ৭৫. থোনে– থেকে। ৭৬. চাইরো– চার। ৭৭. আইজকা– আজ। ৭৮. নেও– নাও। ৭৯. আন্দর– অন্দর। ৮০. গোসল ধুবার– গোসল করতে। ৮১. সানুবান্দার ঘাটে– সানবাঁধানো ঘাটে। ৮২. নাইমা– নেমে। ৮৩. মাইলন– মাজে, পরিষ্কার করে। ৮৪. বিষটি– বৃষ্টি। ৮৫. থোনে– থেকে। ৮৬. বাইছা– বেছে। ৮৭. নড়া– ঝরঝরা। ৮৮. আইলাইয়া – এলোমেলো করে। ৮৯. ফালায়– ফেলে। ৯০. আটু– হাটু। ৯১. তরফ– দিকে। ৯২. আউলিত– আড়ালে। ৯৩. পিন্দা– পরিধান। ৯৪. পাইড়ে– পাড়ে। ৯৫. চান্দু সদাগর– চাঁদ সওদাগর। ৯৬. আশিকাইলা বুড়া– আশি বছর বয়সী বৃদ্ধ। ৯৭. পক্কি– পাখি। ৯৮. গুয়া– পাছা। ৯৯. নাল– লাল। ১০০. ঠাক্কুর– ঠাকুর। ১০১. পক্কিগুণা– পাখিগুলো। ১০২. বাড়িত আইলে– বাড়িতে আসলে। ১০৩. ঝাঁক্কে– ঝাঁকে। ১০৪. বইলা– বলে। ১০৫. ক্যাছা– কী। ১০৬. কাল্লা– কল্লা, ধড়। ১০৭. পট– অতি সত্বর। ১০৮. মাইরো– মেরো। ১০৯. দুইডা– দুটো। ১১০. গুণা– লোহার চিকন তার। ১১১. ষাইট মইনা– ষাট মন ওজনের। ১১২. চাপট– থাপ্পর। ১১৩. দেলে– অন্তরে। ১১৪. পটকানা– ঝাঁকি। ১১৫. পরথমকার– প্রথমবারের। ১১৬. মারবা– মারবে। ১১৭. সমুদ্দুর– সমুদ্র। ১১৮. জয়গুনেরে– জয়গুণকে। ১১৯. বাক– কথা। ১২০. শিরে– মাথায়। ১২১. সাহা বানু– সাহেরা বানু। ১২২. সূর্য উজালেরে– সূর্য উজালকে। ১২৩. মল্লিকারে– মল্লিকাকে। ১২৪. জিন্দা– জ্যান্ত। ১২৫. মাইসা– মাসের। ১২৬. সান্দাইলো– ঢুকলো। ১২৭. ষাইট– ষাট। ১২৮. থাপরা– থাবা। ১২৯. কওছে– বলতো। ১৩০. তামাম– শেষ, সমাপ্ত। ১৩১. ভূমিষ্টে–ভূমিতে। ১৩২. সোতে–স্রোতে। ১৩৩. উদ্দরে– পেটে ১৩৪. মাইস্যা– মাসের। ১৩৫. জোড়ার ভাই– আপন ভাই। ১৩৬. গু আর মোতে– মল আর মূত্রে ১৩৭. আন্ধার– অন্ধকার। ১৩৮. লায়েক বেটা– যুবক ছেলে। ১৩৯. ছাকনির হাড্ডি- পাঁজরের হাড়। ১৪০. বেক্কে- সকলে। ১৪১. জাইরা- জারজ সন্তান; দুষ্ট প্রকৃতির লোক। ১৪২. ঠ্যাং নাচায়- সুখে পা দোলায়। ১৪৩. আল্লাদ- সোহাগ। ১৪৪. ছোরানি- চাবি। ১৪৫. উরচুঙ্গা- আরশোলা জাতীয় পোকা। যা পাটক্ষেতে থাকে। ১৪৬. জুনি পোকা- জোকানি পোকা। ১৪৭. গোয়া- গুহ্যদেশ। ১৪৮. দম্প < দম্ভ- গর্ব। ১৪৯. বেইল- বেলা ১৫০. অইলো- হলো ১৫১. ঘোমে থিকা- ঘুম থেকে ১৫২. উইঠা- উঠে, ওঠে। ১৫৩. থালি নোটা- থালাবাসন। ১৫৪. মাইনজা- মেজে, ঘষে। ১৫৫. আত- হাত। ১৫৬. কিবা- কেমন। ১৫৭. হরি- শাশুড়ি। ১৫৮. ক্যাবোল- কেবল, সবেমাত্র। ১৫৯. ধইরা- ধরে। ১৬০. অইছে- হয়েছে। ১৬১. আইজি- আজই। ১৬২. মোহে মোহে- মুখে মুখে। ১৬৩. জব- জবাব, উত্তর, প্রতিউত্তর। ১৬৪. ছিলান- দুশ্চরিত্রের মহিলা। ১৬৫. হলাটি- ঝাটা। ১৬৬. বাইরাইয়া- বাড়ি দিয়ে দিয়ে। ১৬৭. খ্যাদাইছি- তাড়িয়ে দিয়েছি। ১৬৮. কোম না- কম না। ১৬৯. ম্যালা- অনেক। ১৭০. বোলে- নাকি। ১৭১. অইছাল- হয়েছিলো। ১৭২. জাইরা- দুষ্ট, জারজ সন্তান। ১৭৩. নটি- বেশ্যা। ১৭৪. থিকা- থেকে। ১৭৫. ড্যাহর- গালি বিশেষ। ১৭৬. ক্যা- কেন, কেনো। ১৭৭. তোমগোর- তোমাদের। ১৭৮. কস- বলস। ১৭৯. আমগোর- আমাদের। ১৮০. ডাইলে- ডালে। ১৮১. বল্লার চাইক- মৌমাছির চাক। ১৮২. আছিলো- ছিলো, ছিলো। ১৮৩. ড্যাল- ঢিল। ১৮৪. আইয়্যা- এসে। ১৮৫. দিশবিশ- দিশে। ১৮৬. হলা হাছন- ঝাড়ু দেওয়ার ঝাটা। ১৮৭. থাপরাইয়া- থাপ্পর দিয়ে। ১৮৮. জইন্যে- জন্যে। ১৮৯. আনমু না- আনবো না। ১৯০. পোলার- ছেলের। ১৯১. অবো না- হবে না। ১৯২. ওয়ানটি ওয়ান- প্রথম শ্রেণি। ১৯৩. আজারডা- হাজারটা। ১৯৪. আনি গা- নিয়ে আসি অর্থে। ১৯৫. দিমু না- দেব না, দেবো না। ১৯৬. যামু গা- যাবো। ১৯৭. পাও- পা-ও। ১৯৮. নু- চল্, চলো। ১৯৯. রিক্স- ঝুঁকি। ২০০. আলাইনা-

www.pathagar.com

ফালাইনা– অবহেলিত নয়। ২০১. কইলজার– কলিজার। ২০২. ম্যায়াডারে– মেয়েটাকে। ২০৩. দেহি না– দেখি না। ২০৪. কইরাই– করেই। ২০৫. মারতি মারতি– মেরে মেরে। ২০৬. কান্দস ক্যা– কান্না করিস কেন। ২০৭. দ্যাহো না– দেখো না। ২০৮. থয়– রাখে। ২০৯. কইলজাডা– কলিজাটা। ২১০. হালামু– ফেলবো। ২১১. খালি– শুধু। ২১২. গাইলও– গালিও। ২১৩. বোলে– নাকি। ২১৪. ঘষি– শুকনো গোবর। ২১৫. এইগনা– এগুলো। ২১৬. নাহি– নাকি। ২১৭. করছাও– করেছো। ২১৮. বিয়াইন– বেয়াইন। ২১৯. থস– রাখস। ২২০. আন্নের– আপনার। ২২১. খ্যাদাবার– তাড়িয়ে দেওয়ার। ২২২. গ্যাদা– ছেলে। ২২৩. নিমুরাইদা– মুরোদহীন। ২২৪. বালবালাই– আড়ালে ক্ষতি করে সামনে প্রশংসা করা। ২২৫. তুলমু– তুলবো। ২২৬. কইন– বলেন। ২২৭. যাইগ্যা– যাইগে। ২২৮. নও– চল, চলো। ২২৯. এ্যাহোন– এখন, এখোন। ২৩০. আহোছে– এসোতো। ২৩১. কিরা– অভিশাপ। ২৩২. ডেহির– ঢেঁকির। ২৩৩. অক্ত– রক্ত। ২৩৪. অইলো– হলো। ২৩৫. ভাইসা– ভেসে। ২৩৬. হুদ্দা– সহ। ২৩৭. কাইটা– কেটে। ২৩৮. চুঙ্গা– বাঁশের চোঙ্গা। ২৩৯. পুইড়া– পুড়ে। ২৪০. বন্দি– বন্দনা করি। ২৪১. সবজনায়– সবাইকে। ২৪২. পাছদোহার– পাল দোহার। ২৪৩. অপার– অনেক। ২৪৪. শহীদান– শহীদগণ। ২৪৫. টেস্ট– যাচাই। ২৪৬. জিজ্ঞাসনা– জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন। ২৪৭. সই– সত্য বলে মেনে নেওয়া। ২৪৮. তা না-না না– আবোল তাবোল। ২৪৯. জব্বর– মজার। ২৫০. মওকুব– মওকুফ, মাফ, ক্ষমা। ২৫১. নেমনতন– নিমন্ত্রণ, দাওয়াত। ২৫২. সয়ম্বর– নিজ ইচ্ছায় স্বামী বেছে নেওয়া। ২৫৩. ধুরু– ধেৎ। ২৫৪. কতা– কথা। ২৫৫. অইয়া– হয়ে। ২৫৬. মইরা– মরে। ২৫৭. হেই– সেই। ২৫৮. আইজও– আজোও। ২৫৯. হেইডাও– সেটাও। ২৬০. কাম– কাজকর্ম ২৬১. আমগো– আমাদের। ২৬২. রাজাগজার– রাজাবাদশার। ২৬৩. ভাইস্তা– ভাইপো। ২৬৪. কবার– কথা বলতে। ২৬৫. ভালা– ভাল। ২৬৬. অয়না– হয় না। ২৬৭. কও– বল, বলো। ২৬৮. আইচ্ছা– আচ্ছা। ২৬৯. খালি– শুধু। ২৭০. কবার– বলবার। ২৭১. পারবা– পারবে। ২৭২. ফটকাফটকি– ফুটিফুটি। ২৭৩. আরায়া– হারিয়ে। ২৭৪. অহন– এখন। ২৭৫. রাহে– রাখে। ২৭৬. থও– রাখো। ২৭৭. কয়ডা– কয়টা। ২৭৮. হুনাইছিলি– শুনিয়েছিলে। ২৭৯. হেইগুনাইতো– সেগুলোইতো। ২৮০. অবার– হতে। ২৮১. হগল– সকল। ২৮২. ল– চল। ২৮৩. আমগোরে– আমাদের। ২৮৪. ফাটকে– জেলখানায়। ২৮৫. তোমাগো– তোমাদের। ২৮৬. অইলাম– হলাম। ২৮৭. কেডা– কে ২৮৮. সগল– সকল। ২৮৯. কোনে– কোথায়। ২৯০. হেরা– তারা। ২৯১. হেতে– তাতে। ২৯২. অইছে– হয়েছে। ২৯৩. কমু– বলবো ২৯৪. অইবোইনা– হবেই না ২৯৫. আচুইলা– তাড়াতাড়ি অর্থে ২৯৬. গোছায়া– গুছিয়ে ২৯৭. বইয়া– বসে। ২৯৮. দেহি না– দেখি না। ২৯৯. খাড়া– দাঁড়া। ৩০০. হুনবার– শুনবার। ৩০১. আইছি– এসেছি। ৩০২. পাও– পা। ৩০৩. ক– বল। ৩০৪. অইলো– হলো। ২০৫. অক্ষির– চোখের। ৩০৬. শুলে– মৃত্যুদণ্ড ব্যক্তিদে হত্যা করার এক প্রকার পদ্ধতি। ৩০৭. নিপায়– পা ছাড়া। ৩০৮. হ্যাচর প্যাচর– অবাঞ্ছিত কথাবার্তা। ৩০৯. আই– আয়। ৩১০. কস– বলিস। ৩১১. দেহছিন– দেখো তো। ৩১২. আকতব কুকথা– অমঙ্গলের কথাবার্তা। ৩১৩ পরথমকার– প্রথমবার। ৩১৪. আমাগো– আমাদের। ৩১৫. পইড়া– পড়ে। ৩১৬. লাত্থি– লাথি। ৩১৭. আটকায়া– আটকিয়ে। ৩১৮. সক্কাল– সকাল। ৩১৯. জইমা– জমে। ৩২০. ইন্দুরে– ইঁদুরে। ৩২১. বিলাই– বিড়াল। ৩২২ বইলাইতো– বলেই তো। ২২৩. অবার– হবার। ৩২৪. আরায়া– হারিয়ে। ৩২৫. থুইয়া– রেখে। ৩২৬. হোন– শোন। ৩২৭. বেবাকেরেই– সবাইকে। ৩২৮. হোনেনে– শোনেন। ৩২৯. আহেন– আসেন। ৩৩০ আপনের– আপনার। ৩৩১. কোটাল– কোতোয়াল। ৩৩২. বাইআত– বাম হাত। ৩৩৩. হুনবো– শুনবে। ৩৩৪. অইবো– হবে। ৩৩৫. পদ– পদবী অর্থে। ৩৩৬. খেল– খেলা। ৩৩৭. বহেন– বসেন। ৩৩৮. বুইড়া– বৃদ্ধ।

www.pathagar.com

৩৩৯. আলে- হালে, হেলে। ৩৪০. গাই- গাভী। ৩৪১. হেরে- তাকে। ৩৪২. পাঠামু- পাঠাবো। ৩৪৩. জাইনা শুইনা- জেনে শুনে। ৩৪৪. থিকা- থেকে। ৩৪৫. বাইচা- বেঁচে। ৩৪৬. গাড়ুয়া- একরোখা অর্থে। ৩৪৭. ত্যান- তেমনই। ৩৪৮. কইনাই- বলিনি। ৩৪৯. খ্যাম- ক্ষমতা। ৩৫০. বাইত্তে- বাড়িতে। ৩৫১. আইজক্যা- আজকে। ৩৫২. হাটাইয়া- রেগে। ৩৫৩. পুতুরা- বিয়াইয়ের পুত্র। ৩৫৪. ডাহে- ডাকে। ৩৫৫. হাবেন- পারবেন। ৩৫৬. কাহা- কাকা। ৩৫৭. কিবা- কেমন। ৩৫৮. গুণার- গুলোর। ৩৫৯. আইলা- আসলা। ৩৬০. কও- বলো। ৩৬১. আছাল- ছিলো। ৩৬২. টেহা- টাকা। ৩৬৩. কবার- বলবার। ৩৬৪. খালাই নি- খেতে পারতে। ৩৬৫. এহন- এখন। ৩৬৬. তহন- তখন। ৩৬৭. যায় দিলে- তালিকা দিলে। ৩৬৮. ধক- স্বাদ। ৩৬৯. খারে- পরিষ্কার। ৩৭০. বাইন- তক্তার সাথে তক্তার সংযোগ। ৩৭১. যাতা- চাপ। ৩৭২. আইসিরো- আসব। ৩৭৩. পোলার- ছেলের। ৩৭৪. হুনছ- শুনছ। ৩৭৫. বাবাইতা- বাপের। ৩৭৬. কবাই- বলবাই। ৩৭৭. যাবার নিগা- যাওয়ার জন্য। ৩৭৮. ঝাহা- ঝুড়ি। ৩৭৯. মর্দা, মরদ। ৩৮০. কাহা- কাকা, ৩৮১. কতাহানি- কতটুকু, ৩৮২. পোলাপান- ছেলেমেয়ে। ৩৮৩. অবনি- হবেনি, ৩৮৪. রাইন্ধা হালাও- রেঁধে ফেল, ৩৮৫. নিটাল- শান্ত, ৩৮৬. কোনে- কোথায়, ৩৮৭. আইলা- আসলা, ৩৮৮. যাইয়া হারলা- যেতে পারলে, ৩৮৯. উইঠা হামু না- উঠতে পারবো না, ৩৯০. কুরকার খোওয়ার- মুরগির থাকার ঘর, ৩৯১. হেনে হুইয়া পড়োগা- সেখানে শুয়ে পড়, ৩৯২. ছাইছ- ধরন, ৩৯৩. কওছে দেহি- বলতো দেখি, ৩৯৪. আপনেগর- আপনাদের।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

ক. লৌকিক খেলা

মানুষ সার্বক্ষণিক কাজ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের অবসরের প্রয়োজন। আবার শুধু বিশ্রামও শরীর ও মনকে বিষিয়ে তুলতে পারে। তাই মানুষ অবসর সময়ে একটু আনন্দ বিনোদন করতে চায়। গ্রামের মানুষের বিনোদনের মাধ্যম হলো– নাচ-গান, ভ্রমণ, শিকার ও খেলাধুলা ইত্যাদি। বৈচিত্র্যের দিক থেকে শরীর ও মন চাঙ্গা রাখার জন্য খেলাধুলাই উত্তম। গ্রামপ্রধান টাঙ্গাইল জেলার অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে কিংবা বয়স্করাও বিভিন্ন লৌকিক খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য লৌকিক খেলাধুলার মধ্যে রয়েছে– হাডুডু, গোল্লাছুট, তিনগুটি, চারগুটি, ধাপ্পা, শিশু ঘন্টি, কুতকুত, দারিয়াবান্ধা, পাঁচগুটি, গামছাবাড়ি, চড়ুই, ঘুড়িখেলা ইত্যাদি।

১. লাঠি খেলা

লোকজ খেলার মধ্যে অন্যতম উপভোগ্য খেলা হলো লাঠি খেলা। লাঠি খেলা গ্রামের মানুষের অত্যন্ত জনকপ্রিয় খেলা। টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, উপজেলা পরিষদ ও গোপালপুর পৌরসভার সহযোগিতায় লাঠি খেলা এবং বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলার আয়োজন করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে সূতী ভি এম পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রামীণ খেলার প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ইউনুছ ইসলাম তালুকদার ঠান্ডু। বিশেষ অতিথি ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ সিটি ও মরিয়ম আক্তার মুক্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তফা কবির, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ, অধ্যাপক বাণীতোষ চক্রবর্তী, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা তোরাপ আলী শিকদার প্রমুখ লাঠি খেলার আয়োজন করেন।

লাঠিখেলার ডাক

ডাক ১.

পর্তম[১] আল্লা বিসগোমিল্লা[২]
নৈতে[৩] করলাম শুরু
অনাতেরও[৪] নাত[৫] গো আল্লা
দয়া করবেন গুরু।

২.

বিসমিল্লা বলিয়া আমি
লাঠি নইলাম[৬] হাতে
যার মস্তকে মারবো বাড়ি
মস্তক যেন ফাঁটে।

www.pathagar.com

লাঠি খেলার দৃশ্য

৩.

কিরে! কি কর গো ফাতেমা
পালঙ্কে বসিয়া
তোমার পুত্র রণে যাচ্ছে
জয় দ্যাও[৭] আসিয়া।

৪.

কিরে! আসমানে উঠিল চন্দ্র
সঙ্গে নইয়া[৮] তারা
সিপাইগণ চলিল যেমন
করিয়া পায়তারা।

৫.

কিরে! কোনো শহরে থাক লাইঠাল
কোনো শহরে ঘর
কি বা নাম তোর মাতা-পিতা
কি বা নামটি তোর।

৬.

কি রে ! কোথায় তোমার ঢুলি ভাই রে
কোথায় তোমার ঝুলি
এই আসরে আইসা তুমি
কি নাম কর বুলি।[৯]

www.pathagar.com

সাধারণত দুই পক্ষের লাঠিয়াল বাহিনীর মধ্যে প্রশ্নোত্তরমুলকভাবে নিম্নের 'লাঠিখেলার ডাক' ব্যবহার হতে দেখা যায়।

১. প্রশ্ন :
হাড়ের[৯] অয়নাই[১০] মুসলমানি
গাইয়ের অয়নাই বিয়া
দুধভাত খাও তুমি
কোনো কালাম দিয়া?
উত্তর ঃ
হাড়ের হইছে মুসলমানি
গাইয়ের হইছে বিয়া
দুধ ভাত খাই আমি
বিসমিল্লাহ বলিয়া।

২. প্রশ্ন ঃ
আগুন জ্বলে দবদবাইয়া[১১]
চেরাগ ধরে রাতি
তুমি সে কথা কও
জোলা না তাঁতি।
উত্তর :
আগুন জ্বলে দবদবাইয়া
দোয়াত[১২] জ্বলে শীষে
তুমি যে কথা কও
মুখ থুইয়ে কিসে।

৩. প্রশ্ন :
হাসো যে খপর খপর[১৩]
হাস[১৪] পাইলা কোনো নগর?
উত্তর :
তোর বাপে আছাল কলুর বলদ
চারিতে[১৫] খাইছাল ঘাস
তাই দেইখা আমার আইছাল হাস।

৪. প্রশ্ন :
কোথায় থনে[১৬] আইলা[১৭] তুমি
উঠানে দিয়া পাও
আমার উঠান যে ফাইরা[১৮] গেল
শিলাই কইরা দিয়া যাও।
উত্তর :
বাঁটা ভরা আনো পান
গাল ভইরা[১৯] খাই

www.pathagar.com

তোমাগো উঠান কাত কর
শিলাই কইরা দিয়া যাই।
৫. প্রশ্ন :
বড় বাড়ির বড় ঘর
পাট সোলার তার বেড়া
পানি চাইয়া পানি পাই না
তুমি কোনো ছ্যারা[২০]?
উত্তর :
বড় বাড়ির বড় ঘর
পাট সোলার তার বেড়া
আমার কাছে পানি চাইছে
কান কাটা এক ভেড়া।
৬. প্রশ্ন :
হাতে লাঠি কাঁধে বোসকা[২১]
কোথায় চলছেন দিল্লীর বাদশা?
উত্তর :
তক্কে বলে বলদে টানে
বড় লোকের খবর বড় লোকে জানে।
৭. প্রশ্ন :
আয়নারে ঝিকিমিকি
আয়নারে আশি
সঙ্গে করে নিয়ে যাও তারে।
মাও না মাসি?
উত্তর :
আয়নারে ঝিকিমিকি
আয়নারে আশি
সঙ্গে করে নিয়ে যাই
পাক[২২] করার দাসি।
৮. প্রশ্ন :
আমি যারে কই নাই তারে
পোলা দিয়া কইয়ালি তারে
এমন জায়গায় বসাইলি তারে
যাইতেও তারে আইতেও তারে
শালী একদিক ধরমু
তোরে আর তারে।
উত্তর:
তুমি যারে কও নাইকা[২৩]
আমি তারে কইলাম[২৪]।

www.pathagar.com

অন্তর দিয়া ভালবাইসা
প্রাণের সখা বানাইলাম।
তারে যদি ধর স্বামী
তোমারে ফালাইয়া যামু আমি।
৯. প্রশ্ন :
পান খাও পানওয়ালা ভাই
কথা বল ঠাঁরে[২৫]
পান সুপারির জন্ম লইল
কোনো অবতারে?
পান খাইয়া যদি না কও
পানের জন্ম কথা
শুয়োর হইয়া খাও তুমি
গেচু কচুর মোতা[২৬]।
গেচু[২৭] খাও কচু খাও
জঙ্গলে তোমার বাসা
অনুমানে বুঝলাম আমি
লাঙ্গল ধরা চাষা।
উত্তর:
পান খাই পানওয়ালা ভাই
কথা বলি ঠারে
পান সুপারির জন্ম লইছে
কৃষ্ণ অবতারে।
পান খাইয়া কইলাম আমি
পানের জন্ম কথা
তুমি যে এসব কথা বললা আমারে
তোমার কেটে দিমু কানের মোতা।[২]

২. হা-ডু-ডু খেলা

টাঙ্গাইলের লোকজ খেলার মধ্যে হা-ডু-ডু খেলা খুবই জনপ্রিয়। হা-ডু-ডু খেলার জন্য মাঠ থাকে। মাঠে খেলার উপযোগী করে দাড়ি দেওয়া হয়। দুইটি পক্ষ খেলার মাঠে খেলতে নামে। উভয় পক্ষে সাতজন করে খেলোয়াড় থাকে। খেলোয়াড়গণ খেলোয়াড়ি পোষাক পরে মাঠে নামেন। একজন রেফারি ও একজন সহকারি রেফারি থাকে খেলার বিচার করার জন্য। হা-ডু-ডু খেলায় হা-ডু-ডু বলে দম দেয়। আবার কেউ কেউ টক টক বলেও দম দেয়। দম দিয়ে অপরপক্ষের খেলোয়াড় ছুঁইয়ে আনতে পারলে এক পয়েন্ট হয়। আবার দম দেওয়া খেলোয়াড়কে ধরে রাখলেও এক পয়েন্ট হয়। অথবা যাকে ছুঁয়ে আসেন সে মারা যায়। কিংবা দম দেওয়া খেলোয়াড়কে ধরে রাখলে সেও মারা যায়। পয়েন্ট বা মারা যাওয়া উভয় নিয়মেই খেলা চলে। অঞ্চলভেদে খেলার

www.pathagar.com

নিয়ম ভিন্ন হয়। এমনি করে যে পক্ষের খেলোয়াড় সাতজনই মারা যায়, তার বিপরীত পক্ষের এক গেম হয়। এমনি করে যাদের বা যে পক্ষের গেম বেশি হয় তাদের জয় হয়। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে হা-ডু-ডু খেলার প্রচলন বেশি লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য মৌসুমেও কম বেশি খেলা হয়। হা-ডু-ডু আমাদের জাতীয় খেলা। টাঙ্গাইল জেলায় অনেক জাতীয় খেলোয়াড়ের জন্ম হয়েছে। টাঙ্গাইলের রতন দাস, আমীর হামজা, মোতালেব, কাদের সরকার, আলী হোসেন, আজগর প্রমুখ জাতীয় দলের খেলোয়াড় ও দলনেতা ছিলেন। হা-ডু-ডু খেলাটি বর্তমানে কাবাডি খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে।[৩]

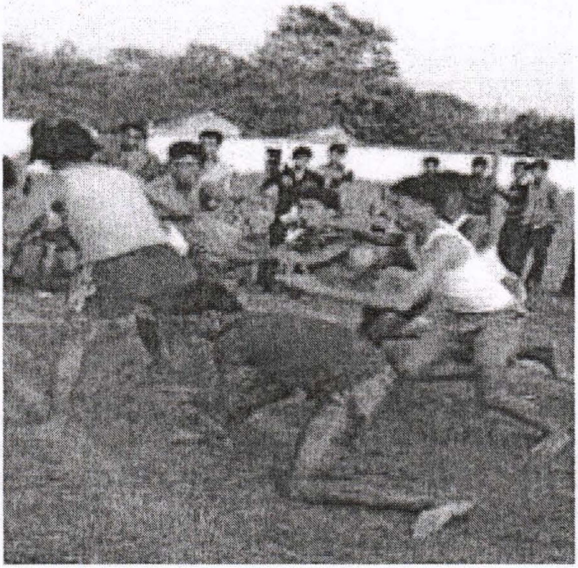

হা-ডু-ডু খেলা

৩. দাড়িয়াবান্ধা

দাড়িয়াবান্ধা বহুল প্রচলিত ও অত্যন্ত জয়প্রিয় একটি লোকক্রীড়া। এতে ছেলে-মেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে। পল্লির কিশোর-কিশোরি কিংবা যুবক-যুবতী সকলে এ খেলা খেলতে যেমন পছন্দ করে তেমনি দর্শক হিসেবে উপভোগ করতেও তাদের আনন্দের কমতি নেই। প্রথমে আয়তকার একটি দীর্ঘ বেত্র তৈরি করে বেত্রটিতে ঠিক সমদূরত্বে আড়াআড়িভাবে তিন বা চারটি দাগ কাটা হয়। এতে মূল বেত্রটি চার বা পাঁচটি অংশে বিভক্ত হয়। অতঃপর মূল বেত্রটির প্রস্থ রেখার মধ্যে বিন্দু থেকে লম্বালম্বি একটি দাগ কেটে মূল বেত্রটিকে বিভক্ত করা হয়। দুটি দলে খেলা হয়। এক দলের সকল সদস্য দাগ কেটে তৈরি করা ঘরগুলোর প্রান্তের একটিতে সমবেত হবে। অন্য দলের সমান সংখ্যক সদস্য আড়াআড়ি ও লম্বা দাগের ওপরে দাঁড়াবে। ঘরে অবস্থানরত খেলোয়ারগণ ঘর থেকে বের হয়ে অন্য প্রতিটি ঘরের প্রতিবন্ধকতা পার

www.pathagar.com

হয়ে আবার পূর্বের অবস্থানে ফেরত আসবে। দাগের ওপর দাঁড়ানো প্রতিপর্বের খেলোয়ারগণ পা দিয়ে ঘা মেরে অন্য পর্বের খেলোয়ারকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থানে পা দ্বারা স্পর্শ করলেই কেবল স্পর্শিত ব্যক্তি মারা পড়বে নচেৎ নয়। যারা স্পর্শ বাঁচিয়ে সমস্ত ঘর ডিঙিয়ে পূর্বের স্থানে ফিরে যাবে তারা আবার আগের মতোই খেলতে থাকবে। সকলে স্পর্শ লাভ করে মারা পড়লে সে দলের সবাই দাগের উপর অবস্থান করবে এবং অপর দল ঘরে গিয়ে খেলতে শুরু করবে।[৪]

৪. চড়ুই খেলা

এই খেলাটি খেলতে কয়েকজন ছেলেমেয়ে মাটিতে হাতের আঙ্গুল ফাঁক করে রাখে। একজন খেলোয়াড় ছড়া কেটে আঙ্গুল স্পর্শ করে। যার যে আঙ্গুলে এসে ছড়া শেষ হয়। সে সেই আঙ্গুলটি গুটে নেয়। এমটি করে সব আঙ্গুল গুটানো শেষ হলে যার যার হাত পিছে নিয়ে তারপর মুখের কাছে এনে চুমু খায়। এই খেলাটির লোকজ ছড়াটি হলো–

চড়ুই পাখি বারটি
ডিম পারে তেরটি
একটা ডিম নষ্ট
চড়ুই পাখির কষ্ট।[৫]

৫. শিশু ঘন্টি

এই খেলায় একজন চোর থাকে। তার কাছে গাছের নাম জিজ্ঞেস করে অন্যান্য খেলোয়াড়। চোর নামের খেলোয়াড়টি যে কোনো ফল গাছের নাম বলে। অন্যান্য খেলোয়াড় সেই গাছের দিকে দৌড়াইয়া যায়। আর মুখে মুখে বলে– আম খাব না খাব কি অথবা, জাম খাব না খাব কি কিংবা কাঁঠাল খাব না খাব কি, ইত্যাদি। অর্থাৎ যে গাছের নাম বলে দিবে সেই গাছের নাম বলে বলে দৌড়ে গাছের কাছে যাবে এবং গাছটি ছুয়ে বা পাতার অংশবিশেষ ছিড়ে নির্দিষ্ট স্থানে আসবে। একদমে গাছ ছুঁয়ে আসতে না পারলে সে খেলোয়াড়কে চোর নামের খেলোয়াড়টি ছুঁয়ে দিতে পারলে সে চোর হয়। কোনো দুর্বল খেলোয়াড় দম দিয়ে আসতে না পারলে তাকে সবল খেলোয়াড় দম দিয়ে নিয়ে আসে। সে তখন বলে-

শিশু ঘন্টি করবকি
ঘন্টি লইয়া দাঁড়াইছি।

দুর্বল খেলোয়াড় ঘরে এনে বা নির্দিষ্ট স্থানে এনে আবার গাছের নাম জিজ্ঞেস করে। এভাবে খেলা শুরু করে এবং শেষ করে।[৬]

৬. গামছাবারি খেলা

এই খেলায় খেলোয়াড়রা সামনাসামনি মুখ করে গোল হয়ে বসে। একজন খেলোয়াড় একটা রুমাল বা গামছা কিংবা কাপড়ের টুকরার একদিকে গিট বেঁধে গোল হয়ে বসে থাকা খেলোয়াড়দের চারদিকে ঘুরে। ঘুরার সময় অতি কৌশলে একজনের পিছনে চুপ

www.pathagar.com

করে গামছাটা রেখে সে আবার দ্রুত ঘুরে আসে। যার পিছনে গামছা রাখা হয়েছে সে যদি টেয় না পায় তবে তাকে ঐ গামছার বারি খেতে হয়। এটাই এ খেলার আনন্দ। গামছাবারি খেলায় প্রথমে হাত পা টিয়ে নির্ধারণ করা হয় কার কাছে প্রথমে গামছা থাকবে। এইভাবে খেলা চলাকালে যার পিছনে গামছা রাখা হয় সে যদি গামছাধারীর ঘুরে আসার আগেই টের পায়, তবে টের পাওয়া খেলোয়াড়টি গামছাটা নিয়ে আগের খেলোয়াড়ের মতই চক্রাকারে ঘুরে। আগের ব্যক্তি নতুন গামছাধারীর স্থানে বসে। আর না বসতে পারলে গামছার বারি খেতে হয়। এমন করে পর্যায়ক্রমে খেলাটি চলে।[৭]

৭. পানি গোল্লাছুট খেলা

এই খেলাটি নদীর কিনারা বা বিলের প্রান্তে খেলা হয়। খেলার নিয়ম গোল্লাছুটের মতোই। গোল্লা বা দলনেতা গলা পানিতে একস্থানে গোল্লাস্থান ঠিক করে দাঁড়িয়ে থাকে। বিপক্ষে দল হাটু কিংবা কোমড় পানিতে দাঁড়িয়ে থাকে। দৌড়ের পরিবর্তে ডুপ বা সাঁতার দিয়ে কিনারায় উঠতে পারলেই জিত হয়। মাঝপথে ছোয়া বা মারা গেলে আবার বিপক্ষ দল পাল্লা শুরু করে। কিশোর কিশোরিরা এই খেলাটি পানির মধ্যে খেলে থাকে।[৮]

৮. বিয়াবিয়া খেলা

বিয়াবিয়া কথাটি শুনলেই হয়তো মনে করতে পারেন যে, ইহা বর ও কনের বিয়া। আসলে তা নয়। ইহা ছেলে মেয়েদের পানিতে নেমে একটি আনন্দদায়ক গ্রাম্য খেলার নাম। খেলাটিতে গামার গোটা বা ছোটো বল জাতীয় ভাসমান কিছু একটা হলেই হয়। কয়েকজন খেলোয়াড় পেট পানিতে নেমে একজন গুটা দিয়ে পানিতে ড্রপ দেয়। তারপর সবাই সেই স্থানের পানিতে থৈ থৈ করে। এই ফাঁকে গুটিটি একটু দূরে গিয়ে ভাসে। যে আগে গুটিটি দেখতে পায় সে টপ করে গুটি ধরে ডুপ দেয়। আর গুটি ধরে ডুব দিতে পারলেই তার একটি বিয়া হয়। তারপর আবার যে পানিতে গুটিটি ড্রপ দেয় সবাই আগের মতো থৈ থৈ করে। যে গুটি দেখে ধরে ডুব দিতে পারে তারই বিয়া হয়। এমন করে খেলে যার বিয়া বেশি হয় আরই জিত হয়।[৯]

৯. টুনটুনি পাখি খেলা

টাঙ্গাইল অঞ্চলে ছেলে মেয়েদের মাঝে একটি ছড়ার খেলার প্রচলন আছে। তার নাম টুনটুনি পাখি খেলা। খেলাটিতে খেলার নাচানাচি দৌড়াদৌড়ির চেয়ে ছড়ার আকষর্ণই বেশি। যেমন-

টুনটুনি পাখি
নাচেন তো দেখি
না বাবা নাচব না
পরে গেলে বাঁচব না।
বড় আপুর বিয়ে
নাক্স সাবান দিয়ে

নাক্স সাবান ভালো না
আপুর বিয়ে হলো না।

এই ছড়া বলে হাত মুখের অভিনয় করে দেখায়। অঞ্চলভেদে আরো অনেক নিয়ম রয়েছে। এই ছড়া বলে বিভিন্ন নিয়মের খেলার পর্বগুলো সেরে খেলা শেষ করে।[১০]

১০. চাক্কা খেলা

সাইকেল, রিকশার চাকা বা মাছ ধরার পলোর চাকা দিয়ে চাক্কার খেলা খেলে টাঙ্গাইল অঞ্চলের ছেলেরা। চাকা চালনার জন্য বাঁশের কুচি লাগে। বাঁশের কুনচিটি হেনডেল হিসেবে ব্যবহার হয়। গ্রামাঞ্চলের ছেলেদের মধ্যে খেলাটি মাধ্যমে প্রতিযোগিতা হয়। কে কতটা দক্ষ চালক, তারা তার প্রমাণ করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। সাধারণত যারা দৌড়ে এবং কলা-কৌশলে পারদর্শী কেবলমাত্র তারাই খেলাটিতে জিততে পারে।[১১]

১১. গোল্লাছুট

বাংলাদেশের সর্বত্র এ খেলা কম বেশি প্রচলিত আছে। গোল্লাছুট দলগত খেলা। সমতল মাঠে এ খেলা হয়ে থাকে। গোল্লাছুট খেলায় দুই পক্ষে আট-দশজন খেলোয়ার অংশ নেয়। যে পক্ষ দৌড়ে পারদর্শী তাদের জিত হয়।[১৩]

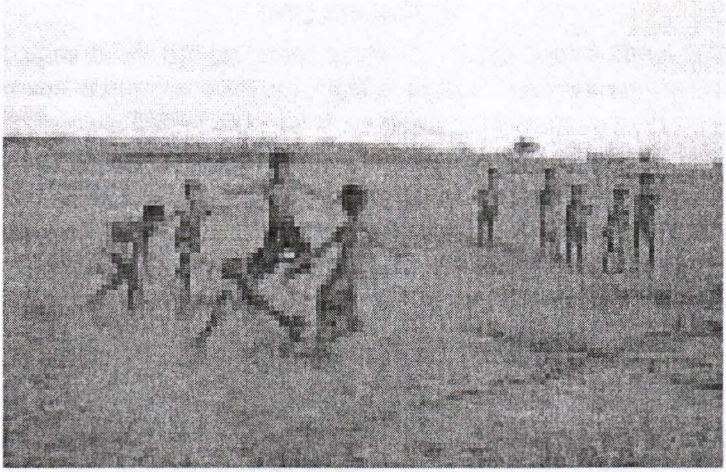

গোল্লাছুট খেলা

১২. কুতকুত খেলা

মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় কুতকুত খেলা। এটি দ্বৈত বিনোদনমূলক খেলা। মাটির উপর দাগ কেটে কুতকুত খেলার ঘর তৈরি করা হয়। এ খেলায় এক থেকে দুই ইঞ্চি দৈর্ঘ্য প্রস্থের একটি মৃৎপাত্রের টুকরো লাগে। টাঙ্গাইল অঞ্চলে মৃৎপাত্রের টুকরোটিকে কুতকুতের গুটি বলা হয়। কুতকুত খেলায় পাঁচ থেকে ৭টি ঘর বানানো হয়। শেষের ঘরটি সামান্য বড় থাকে। প্রতিটি ঘরকে 'নদী' বলা হয়। ছোটো ঘরকে ছোটো নদী

www.pathagar.com

এবং সর্বশেষের বড়ো ঘরকে বড়ো নদী বলা হয়। প্রথমে একজন খেলোয়ার ১নং ঘরে গুটিটি ছেড়ে দেয় এবং কুতকুত কুতকুত দম দিতে দিতে এক পা উঁচু করে অন্য পায়ের আঙ্গুল বা পাতার সাহায্যে বড়ো নদী পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং দম ছেড়ে দেয়। একইভাবে গুটিটা নিয়ে ফেরত আসে। এভাবে যতগুলো ঘর বা নদী আছে পার হতে হয়। যদি গুটিটি দাগের উপর পড়ে, কিংবা ঘরে বাইরে পড়ে, কিংবা খেলার সময় দম কাটে, কিংবা দুই পা মাটিতে পড়ে তাহলে সে মরা হবে এবং দাইন হারাবে। এই খেলায় ঘর কেনার নিয়ম আছে। ঘর ক্রেতা ইচ্ছে করলে অপর খেলোয়ারকে পারাপারের জায়গা দিতে পারে- নাও পারে। যদি জায়গা না দেয় তাহলে সে ঘর ডিঙ্গিয়ে পার হতে হবে এবং সে ঘরে গুটি থামতে পারবে না।[১২]

১৩. তিনগুটি খেলা

তিনগুটি দ্বৈত খেলা। মাটিতে দাগ কেটে তিনগুটি খেলার ছক বানানো হয়। এ খেলার ছকে নয়টি বিন্দু থাকে। সামনাসামনি বসে তিনটি করে গুটি সাজিয়ে নিতে হয়। যে আগে সমান্তরালে এক লাইনে তিনটি গুটি সাজাতে পারে সে বিজয়ী হয়। তিনগুটি সব বয়সের লোকেই খেলতে পারে।[১৪]

১৪. চারগুটি খেলা

চারগুটি খেলার উপকরণ দেড় থেকে দুই ইঞ্চি পরিমাপের মোটা পাটখড়ির টুকরো। উল্লিখিত আয়তনের পাটখড়ির দুটো টুকরোকে মাঝামাঝি ভাগ করে চারটি গুটি বানানো হয়। এ খেলায় দুই বা ততোধিক খেলোয়ার থাকতে পারে। চারটি গুটি উপর করে পড়লে চার পয়েন্ট, চিৎ করে পড়লে ষোলো পয়েন্ট ধরা হয়। প্রথম জন চারটি গুটি মাটিতে চালবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সবগুলো গুটি উপর হয়ে না পড়বে ততক্ষণ পর্যায়ক্রমে অন্যান্য খেলোয়াররাও চালতে থাকবে। গুটি চেলে যে প্রথম চারটি গুটিই উপর করে ফেলতে পারবে সেই পরবর্তীতে দান থেকে টোকা দেওয়ার সুযোগ পাবে। কত পয়েন্টের খেলা হবে তা পূর্বেই নির্ধারিত হয়। এভাবে যে নির্দিষ্ট পয়েন্ট পর্যন্ত আগে পৌছাতে পারবে তার জয় হবে। বৃষ্টির দিনে চারগুটি খেলা বেশ জমে ওঠে।[১৫]

১৫. ধাপ্পা বা ফুলনা খেলা

ধাপ্পা গ্রামের কিশোরিদের অবসর বিনোদনের খেলা। ধাপ্পা খেলাকে 'ফুলনা খেলা', 'একশ মনি খেলা'ও বলা হয়। ধাপ্পা খেলায় পাঁচটি গুটি ব্যবহৃত হয়। গুটিগুলো মার্বেলের সমান আকৃতির ইটের টুকরো কিংবা পাথর টুকরো দিয়ে বানানো হয়। ধাপ্পা খেলায় দুইজন খেলোয়ার থাকে। মাঝখানে দুই থেকে আড়াই ফুট পরিমাণ জায়গা রেখে দুইজন খেলোয়ার মুখোমুখি হয়ে বসে। প্রথমে ধাপ্পা গুটিগুলো যে কোনো একজন খেলোয়ার এক হাতে কিংবা দুই হাতে ধরে প্রায় দেড় থেকে দুই ফুট উঁচুতে তুলে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। এরপর পাঁচটি গুটি থেকে যে কোনো একটি গুটি প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট থেকে চেয়ে নেয়। অতঃপর সমপরিমান শূন্যে ছুঁড়ে বাকী গুটিগুলো নিয়মানুযায়ী শূন্যে ছুঁড়ে মারা গুটিসহ ধরতে হয়। এ সময় খেলোয়ারকে মুখে ছড়া কাটতে হয়।

www.pathagar.com

প্রথম দানে একটি একটি করে, দ্বিতীয় দানে একটি একটি এবং শেষে দুইটি, তৃতীয় দানে একটি এবং শেষে একত্রে তিনটি গুটি একই পদ্ধতিতে ধরতে হয়। ধাপ্পা বা ফুলনা খেলার ছড়াটি এ রকম–

ফুলনা ফুলনা ফুলনাটি
একেতে দোলনাটি
জামোনা জামোনা জামোনাটি
একেতে জোড় জামোনাটি।
বকুল বকুল বকুলটি
একেতে জোড় বকুলটি।

গুটি তোলার সাথে ছড়া বলার সমন্বয়ে থাকতে হবে। গুটি তোলার সাথে ছড়ার শ্লোক ভুল হলে প্রতিদ্বন্দ্বী 'থুক্কু' দিলে সে খেলোয়ার দাইন চালার ক্ষমতা হারাবে। অথবা ঠিকমতো গুটি উঠাতে না পারলে অর্থাৎ খেলার সময় শূন্যের গুটি হাত ফঁসকে মাটিতে পড়ে গেলে সে খেলোয়ার তখন দাইন চালার সুযোগ হারাবে।

এরপর মাটি সীমানা দাগ কেটে উপরে একটি গুটি ছুঁড়ে অপর গুটিগুলো হাতের বিভিন্ন কায়দায় সীমানা দাগ পার করতে হয়। সীমানা দাগ পার করানোকে 'গুটি পাকানো' বলে। এভাবে সবগুলো গুটি পাকাতে পারলে এক পয়েন্ট হয়। নির্ধারিত সাত কিংবা পনেরো পয়েন্ট যে আগে সংগ্রহ করতে পারবে সে বিজয়িনী হবে। যে হারবে তার হাতের তালুতে কিংবা পিঠে জোড়-বেজোড় কিল মারার সুযোগ পায়।[১৬]

১৬. মার্বেল খেলা

গ্রাম বাংলার কিশোরদের খুবই জনপ্রিয় এই মার্বেল খেলা। মার্বেল ছিল গ্রামের দোকানগুলির অন্যতম পণ্যসামগ্রী। গ্রামের প্রতিটি দোকানে নানা রঙের, নানা আকারের মার্বেল পাওয়া যেতো। বর্তমানেও এ খেলাটি টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

মার্বেল খেলার নাম আমাদের সকলের নিকট পরিচিত হলেও এ খেলা কিভাবে খেলতে হয় বা মার্বেল খেলা কত প্রকারের তা আমরা অনেকেই জানি না। নিম্নে মার্বেল খেলার বিবরণ দেওয়া হলো :

চাল দিয়ে গর্তে মার্বেল ফেলা : এ খেলায় বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় অংশ নিতে পারে। এ খেলার জন্য প্রয়োজন বেশ খানিকটা সমতল ভূমি। ভূমির মাঝামাঝি জায়গায় একটি ছোট গর্ত খুঁড়তে হয়। খেলোয়াড়রা যে জায়গা থেকে মার্বেল চেলে গর্তে ফেলার চেষ্টা করবে সেখানে একটি আড়াআড়ি দাগ দিতে হয়। গর্ত থেকে ১২-১৪ ফুট দূরে মাটিতে এই দাগ দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের বয়স কম হলে গর্ত থেকে দাগের দূরত্ব কমানো যেতে পারে। এ দাগ থেকে ৮-১০ ফুট দূরে গর্তের সামনে আরেকটি দাগ দিতে হয়।

যেভাবে খেলা শুরু হয় : প্রথম চাল কে দেবে তা নির্ধারিত হয় এক ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে। সব খেলোয়াড় একই দূরত্ব থেকে একটি গর্তের দিকে মার্বেল ছোড়ে। যার মার্বেল গর্তের সবচেয়ে কাছে যাবে সেই প্রথম চাল দেবে এবং সব মার্বেল

www.pathagar.com

একসাথে নিয়ে গর্তের দিকে ছুড়ে মারবে। যেসব মার্বেল সরাসরি গর্তে পড়বে সেগুলিকে নিয়ে নেবে। সে অন্যান্য মার্বেল জিততে পারবে কিনা বা কয়টি মার্বেল জিতবে তা নির্ভর করে কিছু শর্ত ও খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের ওপর।

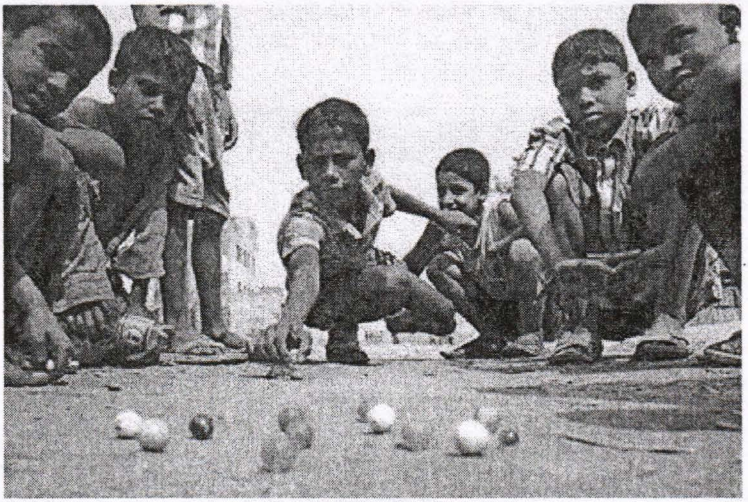

মার্বেল খেলার দৃশ্য

যদি খেলোয়াড় সব মার্বেলকে গর্তের সামনের দাগ অতিক্রম করাতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে খেলোয়াড় যে কয়টি মার্বেল গর্তে ফেলেছিল শুধুমাত্র সেই মার্বেলগুলি পাবে। কিন্তু যে কয়টি মার্বেল দাগ অতিক্রম করেনি তাকে ততগুলি মার্বেল জরিমানা দিতে হবে। যদি সব মার্বেল দাগ অতিক্রম করে সেক্ষেত্রে যে মার্বেলগুলি গর্তে পড়েছে খেলোয়াড় সেগুলির মালিক হবে। চাল দেওয়ার দাগ থেকে একটি মার্বেল ছুড়ে অন্য মার্বেলকে লাগাতে পারলে সেই মার্বেলগুলি জিতে নেবে।

হিট করে মার্বেল নেওয়ার অনেকগুলি নিয়ম আছে। যেমন খেলোয়াড় নিজের পছন্দমতো মার্বেল আঘাত করে জিতে নিতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য মার্বেল, আঘাত পর পর যে কয়টি মার্বেলকে আঘাত করতে পারবে খেলোয়াড় সে কয়টি মার্বেলকে আঘাত করতে বলে। সে যদি নির্দিষ্ট মার্বেলকে আঘাত করতে পারে এবং তার ছুড়ে দেওয়া মার্বেল যদি অন্য মার্বেলকে আঘাত না করে তা হলে সে সবগুলো মার্বেলের মালিক হবে। যদি নির্দিষ্ট মার্বেলকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয় তা হলে সে কোনো মার্বেল পাবে না। এরপর অন্য খেলোয়াড় চাল দেওয়ার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে সাধারণত দূরের বা কাছাকাছি অবস্থানরত মার্বেলের কোনো একটিকে আঘাত করতে বলা হয়।[১৭]

১৭. ষাঁড়ের লড়াই

ষাঁড়ের লড়াই গ্রাম বাংলার একটি জনপ্রিয় খেলা। ষাড়ের লড়াই খেলার কোনো নির্দিষ্ট দিন তারিখ নেই। 'ষাঁড়ের লড়াই' খেলাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা কোনো

www.pathagar.com

ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের কয়েকটি হাটে ঢোল বাজিয়ে 'ষাঁড়ের লড়াইয়ের দিন তারিখ জানানো হয়। ঐদিন ষাঁড়ের মালিকগণ ষাঁড়ের গলায় মালা দিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে সমবেত হন। আবার কমিটির লোকজন নির্ধারণ করেন কোন ষাঁড়ের সাথে কোন ষাঁড়ের লড়াই হবে। দুই ষাঁড়ের মধ্যে লড়াই শুরু হলে দর্শকগণ চারিদিকে গোল হয়ে দাড়াঁয়। পরাজিত ষাঁড় দর্শকের ব্যুহ ভেদ করে দৌড়ে পালায়। জয়লাভকারী ষাঁড়ের মালিককে পুরষ্কার দেওয়া হয়।[১৮]

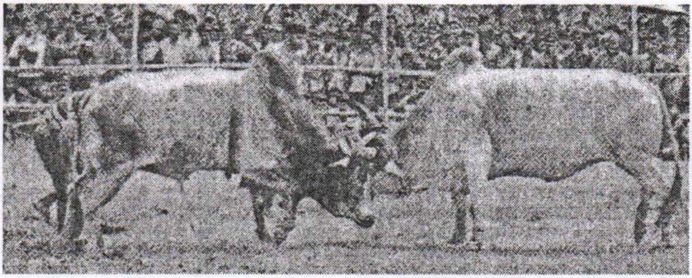

ষাঁড়ের লড়াই

১৮. মইদৌড়

মইকে টাঙ্গাইল অঞ্চলে 'চঙ্গ' বলে। সাধারণত ধান, পাট বপন করার পর খেত সমান করার কাজে 'চঙ্গ' ব্যবহার করা হয়। গরুর কাধে জোয়ালের সাথে 'চঙ্গ' মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। তারপর চঙ্গের উপর কৃষক দাড়িয়ে গরুকে সামনের দিকে তাড়া করে। কৃষক হাল বাওয়া খেতে মাটি সমান করার কাজে এভাবে চঙ্গকে ব্যবহার করে থাকে। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন নাগরপুর উপজেলায় 'চঙ্গদৌড়' প্রতিযোগিতা হয়। পাঁচ/সাত জন কৃষক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শতশত দর্শক এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করে। সাধারণত চরাঞ্চলের দিগন্ত প্রসারিত মাঠে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।[১৯]

১৯. নৌকাবাইচ

প্রাচীনকাল থেকেই টাঙ্গাইলে নৌকাবাইচের প্রচলন রয়েছে। হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী, ধনবাড়ির জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী, আমবাড়িয়ার জমিদার কালিপ্রসন্ন গুহ এবং করটিয়া ও সন্তোষের ভূস্বামীরা বর্ষা মৌসুমে নৌকাবাইচের আয়োজন করতেন। গোপালপুর উপজেলার ঝিনাই নদীর ঝাওয়াইল ঘাটে হতো সবচেয়ে বড় নৌকাবাইচ। ধনবাড়ি, সরিষাবাড়ি, ঘাটাইল, কালিহাতী, মধুপুর ও ভুয়াপুর উপজেলার প্রতিযোগীরা নৌকাবাইচে অংশ নিতো।

প্রতি বছরই বর্ষাকালে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর সদর বৈরান, ঝিনাই এর তীরবর্তী গ্রাম ডুবাইল, মির্জাপুর, সুতী, দিঘলআটা, মধুপুর, ঘাটাইল, ভূয়াপুর, মির্জাপুর উপজেলায় নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়ে থাকে। গ্রামের মানুষের নৌকাবাইচ সবচেয়ে বড় বিনোদনের মাধ্যম। গোপালপুর উপজেলার চেয়ারম্যান ইউনুস ইসলাম

www.pathagar.com

তালুকদার বর্ণাঢ্য নৌকা বাইচের আয়োজন করেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা, পৌরসভার চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিবছর নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।[২০]

গোপালপুরের নৌকা বাইচের দৃশ্য

খ. খেলাধুলার দম

১.

ছি ছাই ঘোড়া দাবড়াই
ঘোড়া না ঘোড়ী?
চাবুক সোয়ারী
চাবুক সোয়ারী
চাবুক দিয়া মারলাম বারি,
ধুলা উড়ে কারি কারি... ।(বাসাইল)

২.

ছি ছাই খেলা
বড় ঠেলা
দশ বারডা
মাইরা ফেলা, মাইরা ফালা... ।(বাসাইল)

৩.

আমি গেছিলাম হরিপুর
দেইখ্যা আইলাম গরুচোর
দুইচোরে বারা ভানে
ধাপ্পুর ধুপ্পুর ধাপ্পুর ধপ্পুর... ।(সখিপুর)

৪.

আমি গেছিলাম

www.pathagar.com

ওই দেশে
ধান খাইয়া
হলুই নাচে।
এক ধান দুই ধান
খোরায়[২৮] কইরা পানি আন
পানি আন...। (সখিপুর)

৫.

কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
যারে পাবি তারে ছো,
কুত কুত মালা উজানী
ছই আলা দুজানী
খাটো গাছের আম
চিনা বাদাম, চিনা বাদাম... ।(ঘাটাইল)

৬.

কুত কুত বিন্দা
ঘড়ি বাজে তিনডা,
বাজে ঘড়ি বাজে না
টিপ টিপ থামে না থামে না... ।(ঘাটাইল)

৭.

এলোরানি ঘন্টা বেলরানি ফুল
ছাইড়া দেরে ঘন্টা মধুপুর,
মধুপুরের কাচারী ডাইল ভাত খিচুরী
লোপানের উজুরী, উজুরী...। (বাসাইল)

৮.

কুত কুত কুত
বিলাতের দুধ,
মা বাবা ঝগড়া করে
আমার কি দোষ, আমার কি দোষ...। (ঘাটাইল

৯.

তালগাছ কাটি তালগাছ কাটি
তালের ডাইগ্যা[২৯] দিয়া,
হাতী নাচে ঘোড়া নাচে
পুবের পাহাড় দিয়া।
বড় ভাবী ধান ভানে
মিঠাই[৩০] মুখে দিয়া,
ছোট ভাবী চাইল ভানে
মিশ্রি মুখে দিয়া। (ঘাটাইল)

www.pathagar.com

১০.
ছি ছাত্তা আত্তা
আলুগোটা ভত্তা
খাবি নারে মর্দা,
খাবি নারে মর্দা... । (ঘাটাইল)

১১.
ভাঙারে ভাঙা
নতুন ভাঙা
পানির মধ্যে ভাসে,
খিল খিলাইয়া হাসে
খিল খিলাইয়া হাসে,
খিল খিলাইয়া হাসে... । (ঘাটাইল)

১২.
ইচ্ছু বিচ্ছু সবুজ চাঁন
গাই বিয়াইল বাছুর আন।
এলের হাত না বেলের হাত
তুইল্যা ফালা সোনার হাত।
সোনর আটে গেছিলাম
তরমুজ আনছিলাম।
তরমুজ নিলো চোরে,
নাতীন জামাই ঘরে।
ছাতির উপর গামছা,
দেখ না মাগীর তামসা।(বাসাইল)

১৩.
একটি হাঁস তল্লা বাঁশ
ধুমে ধুমে চিতল গাছ, চিতল মাছ... । (ঘাটাইল)

১৪.
পানির তলে কাবারি
লাল বউডা আমারী, আমারী... ।(কালিহাতি)

১৫.
একে কুকুরান্তি, কুকুর খা,
দুইয়ে দুইশ কাটি, দুঃখ পা।
তিনে তা ধী না ধীন,
চাইরে ঘোড়ায় চড়ি।
পাঁচে বসন করি,
ছয়ে লেবু টানি,
সাতে মাথায় ঘুড়ি ভন ভন,

www.pathagar.com

আটে তালতা দিব পায়, স্নো দিমু গায়,
দেখুন তো দুলাভাই, কেমুন দেহা যায়।
নয়ে নয়া নয়া ভাবী, দরজায় বসিয়া,
হাতেরী রাখিয়া।
দশে কুমুরী,
মজনুর হাতে ভাঙা ঘড়ি,
এগারতে টেকার চামিচ কাটি,
টানবাজারে কাজ করি।
শিয়াল দেইখ্যা ভয় পাই না,
বাঘ দেইখ্যা ভয় পাই।
বারতে বাঁশের পাতা নড়ে চড়ে,
বাইদানী গো পোলা মরে।
মরুক পোলা দিমু মাটি,
কিসের আবার কান্নাকাটি।
তেরতে তের ইঞ্চি,
চৌদ্দতে চৌদ্দ কাটি,
পনেরতে পানের বোঁা,
বৃষ্টি পড়ে ফোঁটা ফোঁটা।
পান খাবার খিল্লি নাই,
পয়সা দিবার মুনে নাই।
ষোলতে ষোলো রঙের সিঁড়ি নাই,
সতেরতে সবরী পাতা ঝইরা পড়ে,
আঠারতে কলা খাইলে মজা,
না খাইলে কিসের মজা?
উনিশে এসো,
বিশে বস।
একুশের উপরে দাঁড়াই পড়,
বাইশে কুত কুত।[২]

১৬.
(খেলার দম)

ছি...
ঘোড়া না ঘুড়ি
চাবুক মারি
চাবুক দিয়া-ই
মারলাম বারি
ধুলা উঠে

কাড়ি কাড়ি
কাড়ি কাড়ি... ॥ (ভূঞাপুর)

১৭.
(খেলার দম)

বাবা গেছে পাবনা
কিসের আবার ভাবনা,
মা অইলো[৩১] কর্তা
আলু ভর্তা, আলু ভর্তা
আলু ভর্তা... ॥ (ভূঞা

১৮.
(খেলার দম)

বিয়া রে বিয়া
বাগবাড়িগোর[৩২] বিয়া
ঢোল নাই, পালকি নাই
কিসেরই বিয়া
কালা গাইয়ের[৩৩]
ধলা দুত্[৩৪]
পাইল্যা[৩৫] ভাঙে
ঠাসঠুস ঠাসঠুস... ॥ (ভূঞাপুর)

১৯.
(খেলার দম)

তালগাছ কাটি
তালগাছ কাটি
তালের রস দিয়্যা
হাত্তি[৩৬] নাচে
ঘোড়া নাচে
পাছায় ত্যাল দিয়্যা
এডা কাচ্চা এডা কাচ্চা
এডা পাক-কা ॥ (ভূঞাপুর)

তথ্যনির্দেশ

১. মো. আব্দুর রশিদ, গ্রাম : দিগরবাইদ, পো : লাউফুলা, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, বয়স : ৫২ বছর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, তারিখ : ৫.১২.২০১১।
২. সেলিনা আক্তার, বয়স : ১২ বছর, পিতা : সেন্টু মিয়া। উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ১৫.১১.২০১১।
৩. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা: গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ৬.৫.২০১২।

www.pathagar.com

৪-১৬. মামুন তরফদার, গ্রাম : ঢেপাকান্দি, ডাকঘর : ফলদা, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৫.১২.২০১১।

১৭. মো. নজরুল ইসলাম, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪০, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৬.৫.২০১২।

১৮. অধ্যাপক বাণীতোষ চক্রবর্তী, বয়স ৬৫, গ্রাম ও ডাকঘর : ডুবাইল, থানা- গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ৬.৫.২০১২।

১৯. মো. আবু হানিফ, বয়স ৪৩, উচ্চমান সহকারী, গোপালপুর পৌরসভা, গোপালপুর ৬.৫.২০১২।

২০. মো. ইউনুস ইসলাম তালুকদার, উপজেলার চেয়ারম্যান, গোপালপুর, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ৬.৫.২০১২।

২১. সেলিনা আক্তার, বয়স : ১২ বছর, পিতা : সেন্টু মিয়া। উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ১৫.১১.২০১১।

আঞ্চলিক শব্দার্থ

১. পর্তম-প্রথম। ২. বিসগোমিল্লা- বিসমিল্লাহ। ৩. নৈতে-নিতে। ৪. অনাতের-অনাথের। ৫. নাত- নাথ। ৬. নইলাম-লইলাম। ৭. দ্যাও-দাও। ৮. নইয়া-নিয়া। ৯. হাড়ের- ষাঁড়ের। ১০. অয়নাই- হয় নাই। ১১. দবদবাইয়া- প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। ১২. দোয়াত- কুপি। ১৩. খপর খপর- চটপটে। ১৪. হাস- হাসি। ১৫. চারিতে- গরুকে খাওয়ানোর মাটির তৈরি পাত্রে। ১৬. থনে- থেকে। ১৭. আইলা- আসলা। ১৮. ফাইরা- ফেঁটে। ১৯. গাল ভইরা- মুখ ভরে, ২০. ছ্যারা- ছেলে, ২১. বোসকা- ঝুঁড়ি ২২. পাক- রান্না করা। ২৩. কও নাইকা- বল নাই। ২৪. কইলাম- বললাম। ২৫. ঠাঁরে- ইশারায়। ২৬. মোতা- মূলের গোড়া। ২৭. গেচু- পানিতে জন্মানো এক প্রকার কচু। ২৮. খোরা- মরা বা পাতিলের খণ্ডাংশ। ২৯. ডাইগ্যা- ডাল ৩০. মিঠাই- গুড়। ৩১. অইলো- হলো। ৩২. বাগবাড়িগোর- বাগবাড়িদের। ৩৩. গাইয়ের- গাভীর। ৩৪. দুত্- দুধ। ৩৫. পাইল্যা- মাটির পাতিল। ৩৬. হাত্তি- হাতি।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

ক. তাঁতি

যারা বয়ন শিল্পের সাথে পরিচিত তারাই তাঁতি নামে পরিচিত। তবে তারা নিজেদের বসাক নামে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। তাঁতিরা দেশীয় প্রযুক্তির সাহায্যে কাপড় বুনে। এক্ষেত্রে তাঁত চড়কায় সুতা কেটে কাপড় বুননে সহযোগিতা করে। টাঙ্গাইলে বিখ্যাত শাড়ি কাপড় এই বসাক শ্রেণির হাতেই তৈরি। দেশ বিভাগের পর অনেক তাঁতি ভারতে চলে গেছে। সেখানেও তারা বয়ন শিল্পের সাথে জড়িত। টাঙ্গাইলের পাথরাইল, নলশোধা চন্ডি, বাজিতপুর, প্রভৃতি গ্রামে ছোট মানের তাঁতের শাড়ি তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে তাঁতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল। তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে উচ্চ শিক্ষিত হচ্ছে। ফলে তারা কর্মচারী রেখে শাড়ি তৈরি করছে । এসব কর্মচারীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণিই রয়েছে।[১]

খ. জেলে

মধুপুর গড় অঞ্চলের কিছু উঁচুভূমি ব্যতীত সমগ্র টাঙ্গাইলের ভূমি সমতল ও নিচু প্রকৃতির। টাঙ্গাইল জেলার সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে রয়েছে যমুনা নদী। তাছাড়াও জেলার ভিতরে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অনেক ছোট নদী। প্রায় প্রতিটি গ্রামের পাশে রয়েছে ছোটো বড়ো নদী, ছোটো বড়ো নানা আকৃতির বিল, বাওর। এসব জলাশয় একটি অপরটির সাথে খাল দ্বারা সংযুক্ত। বর্ষাকালে এসব খাল বিল নদী প্লাবিত হয়। ফলে অনেক প্রকৃতিক মাছ পাওয়া যায়। মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, বোয়াল, শোল, গজার, মাগুর, শিং, আইর, কৈ, টাকি, টেংরা, পুঁটি ইত্যাদি। বিল বাওরের তীরে জেলেদের বাস। বংশগত পদবি হিসেবে এসব জেলেরা নিজেদের কৈবর্ত দাস হিসেবে পরিচয় দেয়। নিকট অতীতেও জেলেনিরা মাছের ঝাঁকা মাথায় করে চাল ডাল অর্থের বিনিময়ে গৃহস্থবধুর নিকট মাছ বিক্রি করত। বর্তমানে আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হওয়াতে জেলেনিরা গৃহস্থের বাড়িতে মাছ বিক্রি করতে যায় না। জেলার বিভিন্ন জায়গায় জেলেদের বসতি রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মির্জাপুর উপজেলার চামারি ফতেপুর, আমৈদ, দেওহাটা। নাগরপুর উপজেরার মাইলজানি, পুখরিয়া। দেলপুয়ার উপজেলার হেবাওপাড়া, বাথুলি, গাদতলা ইত্যাদি।[১]

গ. কামার

লৌহ নির্মিত গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নির্মাণ করে এই শ্রেণির পেশাজীবী। এদেরকে কামার বলা হয়। সাধারণত বাজারের পাশে ওদের ঘর থাকে। কামারের তৈরি ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে দা, বটি, কাস্তে, লাঙ্গলের ফলা, খুন্তি, পাঁচুন, কোদাল, কুঠার, হাতা ইত্যাদি। এসব তৈরি করার সময় কামার

www.pathagar.com

লোহাকে আগুন দিয়ে নরম করে হাতুরি দ্বারা পিটিয়ে কাজের উপযুক্ত করে। আগুন প্রজ্জ্বলনের জন্য কামার চামড়ার তৈরি 'হাপর' ব্যবহার করে। কামাররা সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।[৩]

কামার

ঘ. কুলু

টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলসহ মধুপুরে কুলু সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে বেশ কয়েক ঘর। সম্প্রদায় বলতে পেশাজীবি শ্রেণিকে বুঝানো হয়েছে। কাঠের তৈরি ঘানীতে সরিষা ভেঙ্গে তেল উৎপাদন করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। ঘানীতে সরিষা ভাঙ্গার সময় বেশিরভাগ কুলুরাই দরিদ্র হওয়ার কারণে নিজের কাঁধে বাঁশের বা কাঠের জোয়াল নিয়ে ঘানী টানে। অমানুষিক পরিশ্রমের দ্বারা এ কাজ করে তারা। একটু সচ্ছল কুলু পরিবার ঘানী টানার কাজে গরু বা মহিষ ব্যবহার করে নিজেদের কষ্ট লাঘব করতে পারে। মধুপুরের গোপদ গ্রামে বেশ কিছু কুলু পরিবার বাস করে। সবচেয়ে বেশি কুলু বাস করে রানিয়াদ গ্রামে। তাছাড়া দিগরবইদ, লাউফুলা, আলোকদিয়া গ্রামেও দু-চার ঘর কুলু পরিবার রয়েছে। গোপালপুরের ডুবাইল, ধনবাড়ির ভাইঘাট, নরিল্যা ও আশেপাশের গ্রামেও বেশ কিছু কুলু পরিবার বাস করে।[৪]

ঙ. কুমার

মাটি দিয়ে হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন, সংসারের নানা ব্যবহারিক সামগ্রী ও খেলনা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে কুমার সম্প্রদায়ের লোকেরা। এ পেশায় নিয়োজিত লোকেরা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। ধনবাড়ি নবাব বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিকের গ্রাম ও উখারিয়াবাড়ি এলাকায় কুমারদের বাস রয়েছে।[৫]

চ. নাপিত

আদিতে নাপিত সম্প্রদায়রা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। মুক্তশাল ও ভ্রষ্টশীল। উত্তম শ্রেণির নাপিত যারা নমশূদ্রদের ক্ষৌরকর্ম করত তারা মুক্তশীল নামে পরিচিত ছিল।

www.pathagar.com

মুক্তশীল নাপিতেরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ক্ষৌরকর্ম না করলেও মুসলমানদের ক্ষৌরকর্ম করতে এদের আপত্তি থাকত না। ভ্রষ্টশীল নাপিতের নমশূদ্রদের ক্ষৌরকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ময়রা সম্প্রদায়ের কোনো এক পূর্ব পুরুষ চৈতন্যদেবকে ক্ষৌরী করেছিল বলে এরা মধু নাপিত বলেও অভিহিত। নমশূদ্রের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর সময় নাপিতের প্রয়োজন হয়। টাঙ্গাইল জেলার সব উপজেলায় এ পেশাজীবীদের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমান সম্প্রদায়দেরও এই কর্মে সম্পৃক্ততা দেখা যাচ্ছে।[৬]

ক্ষৌরকর্মরত নাপিত

ছ. স্বর্ণকার

সোনা দিয়ে নানা রকমের অলংকার তৈরি করে স্বর্ণকারেরা। মধুপুরে স্বর্ণ শিল্পের ব্যাপক চাহিদার কারণে এখানে এ শিল্পের সঙ্গে সংশিষ্ট পেশাজীবি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এখানে অনেক লোক স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কারখানায় কাজ করে। মধুপুরের রায়পাড়া, মদনগোপাল আঙিনা, টেকিপাড়া ও গোপালপুরের নন্দনপুর এলাকায় এসব স্বর্ণকারেরা বসবাস করে। এদের বেশিরভাগই হিন্দু। তবে দু-চার ঘর মুসলমান স্বর্ণকারও রয়েছে।[৭]

জ. কাঠমিস্ত্রি/সূত্রধর

কাঠ দিয়ে বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি ও তাতে নানা রকমের কারুকাজ ফুটিয়ে তোলে কাঠমিস্ত্রিরা। কাঠের তৈরি বাড়ি-ঘর তৈরিতেও এরা কাজ করে। কাঠসংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবন নির্বাহ করে এ অঞ্চলের কিছু মানুষ। দিগরবাইদ,

www.pathagar.com

লাউফুলা, রানিয়াদ, ফুলবাড়ি, চাড়ালজানী, টেকিপাড়া, কাকরাইদ, শোলাকুড়ি, রাধানগর, ভাইঘাট, ধনবাড়ি ও গোপালপুরে এরা বসবাস করে।[৮]

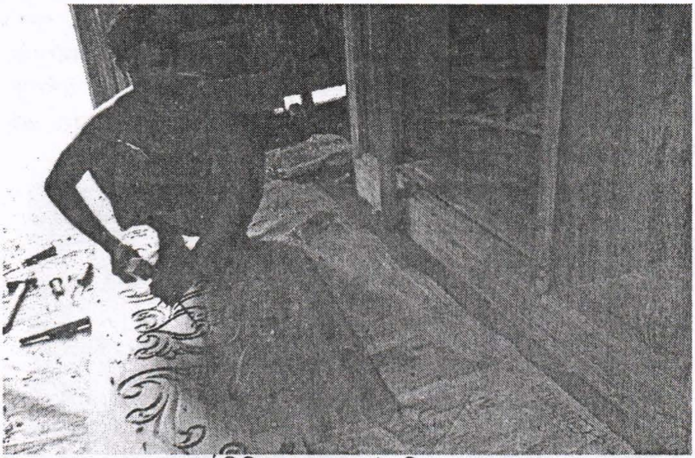

কাঠমিস্ত্রি আসবাবপত্র তৈরি করছেন।

ঝ. মৌয়াল

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ অবৈজ্ঞানিকভাবে সারা বছরই মধু সংগ্রহ করে আসছে। সহজে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করার জন্য মৌচাকে আগুন দেয়া হয়। এতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাজার হাজার মৌমাছি মারা যায়।

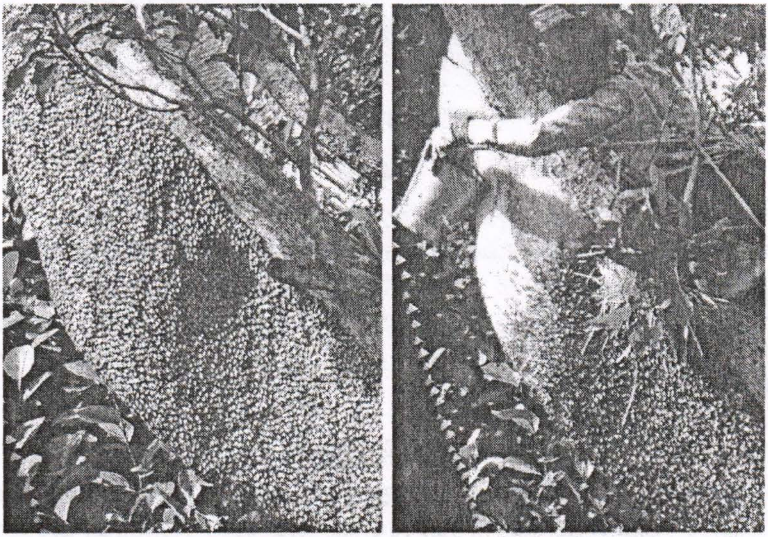

মধু সংগ্রহ করছেন একজন মৌয়াল

www.pathagar.com

অথচ বৈজ্ঞানিকভাবে মধু সংগ্রহ করলে মৌমাছি ধ্বংস হতো না এবং মধুও বেশি সংগ্রহ করা যেতো। ফলে মৌয়ালদের বাড়তি আয়ও হতো এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা হতো।[৯]

তথ্যনির্দেশ

১. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা: গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

২. মো. আ. ছালাম, পেশা : চাকরি, গ্রাম : লাউফুলা (বাজার), ডাকঘর : গাংগাইর, থানা : মধুপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.১১।

৩. মো. নজরুল ইসলাম, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪০, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

৪. মো. জামিনুর রহমান, পিতা : মৃত আনিসুর রহমান, পেশা : চাকরি, গ্রাম : মোমিনপুর, ডাকঘর : উখারিয়াবাড়ী, উপজেলা : ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

৫. মো. জুলহাস উদ্দিন, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৩৫, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

৬. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা: গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

৭. সুবাস দেবনাথ, বয়স : ৪৮ বছর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

৮. রোকেয়া বেগম, পেশা : চাকরি (সহকারী শিক্ষিকা), বয়স : ৩৮, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৬.৫.২০১২।

৯. মোছা. জেসমিন আক্তার (জুলিয়া), সহকারী শিক্ষিকা, বয়স : ২৮, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘরঃ ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

সুপ্রাচীনকাল থেকে টাঙ্গাইলের লোকজীবনে প্রচলিত রয়েছে নানা অবৈজ্ঞানিক লোকচিকিৎসা পদ্ধতি। অশিক্ষিত লোকদের আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক ধারণা, আস্থা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় তারা লোকচিকিৎসার ওপর নির্ভর করে থাকে। অনেকের আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণের সামর্থ্য বা সুযোগ থাকার পরও শুধু অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বশীভূত হয়ে বেছে নেয় লোকচিকিৎসার পথ। ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণেও অনেকে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে লোকচিকিৎসাকে ধর্মসম্মত মনে করে। কেউ হঠাৎ কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়লে মনে করে জ্বিন বা ভূতের আছর পড়েছে। তখন ফেনগাছের শিকড় বা মরিচ পোড়া নাকে দিয়ে তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করা হয়। কখনো কখনো জ্বিন তাড়ানোর জন্য মরা গরম হাড় পুড়ে নাকের কাছে ধরা হয়। কঠিন অসুখ হলে ভাব হয় কেউ তাকে যাদুটোনা করেছে। তখন তার জন্য বাটি চালনা দেওয়া হয়। এ কাজের জন্য তুলা রাশির লোক ডেকে আনা হয়। লোকবিশ্বাস আছে যে কারো নাম করে মন্ত্র পড়ে কলাগাছে পেরেক মারলে তার আর কোনোদিন বিয়ে হবে না। যদি কোনো ছেলে বা মেয়ের সময় মতো বিয়ে না হয় তবে ভাবা হয় কেউ তার নামে পেরেক মেরেছে। তখন তার জন্য ভরন দেওয়া হয় জ্বিন হাজির করে। কোনো নারীর সন্তান না হলে কলা-পড়া খাওয়ানো হয়। রাতে বিছানায় প্রশ্রাব করলে তাবিজ বেঁধে দেয়া হয়। আধ কপালি মাথার ব্যথা হলে কপালে শিকড় বেঁধে রাখে। হাড় ভাঙ্গলে গাছের লতা-পাতা বেঁধে দিয়ে হাড়ভাঙ্গার চিকিৎসা করা হয়। নারী-পুরুষের যৌন সমস্যার টোটকা চিকিৎসাই বেশি ফলপ্রসু বলে মনে করে তারা কবিরাজের শরণাপন্ন হয়। শিশুদের নানা সমস্যার কবিরাজ নির্ভরতা ব্যাপক স্থান দখল করে আছে এ অঞ্চলের লোকজীবনে।

ক. লোকচিকিৎসা

১. কবিরাজী চিকিৎসা

কবিরাজ সব ধরনের রোগের চিকিৎসা করত। কবিরাজ তাঁর চিকিৎসা কাজে বিভিন্ন ধরনের গাছগাছালী ব্যবহার করত। প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা মূলত গাছগাছালি নির্ভর চিকিৎসা। এইজন্য কবিরাজী চিকিৎসার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই দু/একজন কবিরাজের দেখা পাওয়া যেত। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারাও নানা রোগব্যাধীর জন্য ঝাঁড়, ফুঁক ও পানিপড়া দিয়ে থাকে। জন্ডিস হলে লতার মালা গলায় পড়িয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়াও অন্যান্য রোগের জন্য হাতে, কোমরে ও গলায় কিংবা তাবিজের ভিতরে গাছের লতার অংশ বেঁধে দেওয়া হয়। কবিরাজরা ভূতে ধরা রোগেরও চিকিৎসা করে থাকে।

www.pathagar.com

২. গোয়াল

এরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গরুর চিকিৎসা করে। বিনিময়ে গৃহস্থের কাছ হতে চাল, ডাল, টাকা পয়সা নিয়ে থাকে। গোয়াল চিকিৎসকরা মূলত নিম্নশ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক।

৩. বেদে

বর্ষাকালে বেদে সম্প্রদায় নৌকা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। ভাসমান এই সম্প্রদায়ের টাঙ্গাইল জেলায় কোনো স্থায়ী নিবাস নেই। বেদেনীরা চাল, ডাল ও টাকার বিনিময়ে বাত, ব্যথার চিকিৎসা করে থাকে।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

এই অনার্য অধ্যুষিত বাংলাদেশে মন্ত্রের প্রচলন বহু প্রাচীন। টাঙ্গাইল জেলাও একসময় প্রাগজোতিষপুরের অংশ ছিল। কামরূপ, তিব্বত, ভুটান, আসাম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে তন্ত্রমন্ত্র, জাদু-বাণ প্রভৃতি প্রচলিত। দুর্গম অঞ্চল হওয়ায় মানুষের মাঝে অশিক্ষা আর কুসংস্কার বেশি। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এসবের প্রচলন বেশি। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে অনেক অসাধ্য কাজ সাধন করা যায়।

১.

শিং মাছ শরীরে কাঁটা দিলে তার বিষ নামানোর জন্যে এই মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে থাকে। তাতে নাকি বিষ ভালো হয় বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে।

শিং শিং মাগুরা
কলা গাছের ডাগুরা।
এক হাতে পান খাই
আরেক হাতে বৈঠা বাই।
শিংয়ের বিষ পাততালে যায়। (মধুপুর)

২.

মাথা ব্যথা করলে এই মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে মাথার ব্যথা দূর হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করে থাকে।

আগাইরা পানি
বাগাইরা পানি
হাপট দিয়া
টাইনা আনি
মাথার বিষের
মন্ত্র জানি। (মধুপুর)

৩.

শরীরে বাত বিষ দেখা দিলে এই মন্ত্র পাঠ করে ঝারা হয়। লোকজীবনে এ বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে।

রস কষ শিঙ্গারা
বুলবুলি মস্তক। (মধুপুর)

www.pathagar.com

৪.

প্রতিপক্ষ কোনো ব্যক্তি যাদু বাণ টোনা প্রভৃতি দিয়ে যাতে কোনো ক্ষতি করতে না পারে এইজন্য মানুষ মন্ত্র পরে নিজের শরীর বন্ধ রাখে। লোকবিশ্বাস আছে যে, এই মন্ত্র পরে শরীরে ফুঁক দিলে কোনো ক্ষতি হয় না।

(শরীর বন্ধের মন্ত্র)

মহাদেবের ধান্দা লোহা গাইড়া
শরীর করলাম বন্ধন
যদি কোনো বন্ধনে কেউ এসে যাস
দোহাই লাগে তিরিশ কোটি দেবতা ও
কালির মস্তক খাস। (দেলদুয়ার)

৫.

কোনো শত্রু মানুষকে হত্যা করার জন্য বাণ দেয়। এই বাণ দিলে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বাণ যাতে শরীরে কার্যকর হতে না পারে তখন মন্ত্র পড়া হয়। একে বাণ ফিরানোর মন্ত্র বলে।

(বাণ ফিরানোর মন্ত্র)

আল্লাহর ডাল বিসমিল্লাহের তরাল
ফলনার নাম বুকের বাও বাতাস
ঝাইড়া করলাম স্থান
যদি না যাস কালির মস্তক খাস। (মির্জাপুর)

৬.

আগুনে পোড়ে গেলে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে যদি সে পানি আগুনে পোড়া মানুষকে খাওয়ানো হয়। তাহলে লোকবিশ্বাস আছে আগুনে পোড়া রোগী ভালো হয়ে যায়।

(আগুনের পোড়া সারানোর মন্ত্র)

বর্ম্মা দিল বর্ম্মা ডাক
জ্বলিস না পুড়িস না
কাল হইয়া থাক। (টাঙ্গাইল)

৭.

কোনো কারণে কেটে গেলে অনবরত রক্ত ঝরলে ক্ষতস্থানে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেওয়া হয়।

(রক্তপড়া বন্ধের মন্ত্র)

রক্তবর্ণ লোহা
হলদা বর্ণ ঘাস
পাকিস না গলিস না
ভিতরে শুকাইস। (টাঙ্গাইল)

www.pathagar.com

৮.

প্রসূতি মায়ের বুকে কু-বাতাস লেগে শিশু দুধ খাওয়া বন্ধ করলে এই মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেওয়া হয়।

(মার বুকের বাতাসের মন্ত্র)

মনোহর পবনের বর
ফলনার যে নাল ওনা
সেই নাল ভর
আদ্যতিক পদ্ধতির ফলনার নামে
তিল চৈল জল ভর। (ভূঞাপুর)

৯.

ব্যথা লেগে শরীরের কোনো অংশ মচকালে আরোগ্য লাভের জন্য এই মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেওয়া হয়।

(হাড় মচকার ঝাড় ফুঁকের মন্ত্র)

বাঁশ ছোবে ইয়া পক্কি
হাড় ভাঙ্গন মছমছি
শিবে দিল বাঁশী
বর্মা দিল তেল
হাড়ে মাংসে জোড়া লাইগা গেল। (ভূঞাপুর)

১০.

শুক্র ক্ষয়জনিত কারণে স্বাস্থ্য ভগ্ন হলে এই মন্ত্র পড়ে শরীরে ফুঁক দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস আছে তখন মানুষ সুস্বাস্থের অধিকারী হয়।

(স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার মন্ত্র)

ভন্নি পরম ভন্নি পরম
ভন্নি পরম বারংবার
এক নালে ঢালিমু
সহস্র নালে ভরিবি
পরপর বাঁকা সুরের
কোন্দা ভর।
গোরকোণ ঘাথের সুর হেলায়
মুন ঘর মস্তকে মজিবপুর। (ভূঞাপুর)

১১.

কোনো কারণে মানুষ অজ্ঞান হয়ে গেলে যদি তার নাক মুখ দিয়ে ফেনা বের হয় তখন লোকে বলে তার 'সাপ'এর বাতাস লেগেছে। তখন রোগীকে এই মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

(সাপার বাতাস ছাড়ানোর মন্ত্র)

ধরম চলম করম চলম
শ্রী চলন ভগবতি চলন
রঙ্গে বঙ্গে কার গতি
ভাটি ছাইড়া উজান যাও
দোহাই লাগে মা পদ্মার
মাথা খাও
দোহাই লাগে শিব পার্বতির
মাথা খাও
করাত করাত আইতে কাটুম
যাইতে কাটুম
ভাটি ছাইড়া উজান যাও
দোহাই লাগে শিব পার্বতির
মাথা খাও
বিষ বিষ নিদ্রালী
বিষ তোরা ভাই কোনো পথে আইলি
উদ্দিশ নাহি পাই
চল চল বিষ ভাটি চল
ভাটি ছাইড়া উজান যাস
দোহাই লাগে শিব পার্বতির
মাথা খাস। (বাসাইল)

১২.

(সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র)

টাঙ্গাইল জেলা মূলত নিচু ও উঁচুভূমির সমন্বয়ে গঠিত। উঁচুভূমি বা পাহাড়ি অঞ্চলের বনজঙ্গলে বড় বড় সাপ দেখা যায়। আবার নিম্নভূমি অর্থাৎ বিল, বাওর, জলাশয়ে প্রচুর জলজ সাপ দেখা যায়। এ সাপগুলোর মধ্যে কোনোটা বিষধর আবার কোনোটা বিষহীন। এসব সাপের বিষ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মন্ত্রের প্রচলন হয়েছে।

কালা কালা মেঘ লাল
এইতো আন্ধার রাইত
না জানি কি সাপ
কামড়াইলো কোনো জাইত।
ডাইনে কাটলে সাপ
বাইয়্যে ঝারা
বাইয়্যে কাটলে সাপ
ডাইনে ঝারা।
যদি মাথার বিষ উজানে যাস

www.pathagar.com

অষ্টনাগ পদ্মাদেবীর মাথা খাস,
দোহাই মা পদ্মার
ছুহ্- ছুহ্- ছুহ্- । (ভুঞাপুর)

১৩.

(সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র)

দম দমা দম বালি মাদার
ডাংকায় দিল কোপ
চাঁদ কাঁপে সুরুজ কাঁপে
আরো কাঁপে তারা
পাতালের খামুকী কাঁপে
জ্বরে কাঁপে জ্বিন জ্বিন
আরে মাদার ব্যাটা জঠে ছিল
আশি লক্ষ সাপের বিষ চেইতা উঠিল।
উঠো বিষ হাড়ে
উঠো বিষ নাড়ে
উঠো বিষ অমুকের বত্রিশ দ্বারে।
বত্রিশ দ্বারে না পায় দিশা
মাথা দিয়া বাইড়ায় চেরাগের শিশা।
আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ
বিষ উঠব পলকে
নিশকুল তর বাপ মাও
যেথায় ছিলি কালকুইটা নাগের বিষ
সেথায় ফিরা যাও,
যুদি বিষ নামিস
সীতা দেবী হরিশ
দোহাই পদ্মাদেবীর মাথা খাও।
ছুহ্- ছুহ- ছুহ্- ॥ (কালিহাতি)

১৪.

(সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র)

কেনে কেনে বিষম কেনে
বিষ খাইছে তর নানা
বাহর বাহর ডাক ছাড়িয়া
নন্দের বিষ বাক্কা জলে
কালকুটি বিষ পুড়িয়া মারম
ওঝা বলে হাত করলাম নিস মাগো
বিষ কাটালী গাণ্ডারের মাংস

www.pathagar.com

সাপে খাইলো বিষ
নিতাই কমল দুইভাই
একবার হইয়া সার নাই বিষ
হরি রঙের ঘরখানি
আগুনে সঞ্চার বিষকে পুড়িয়া মারম ॥
ছুহ্- ছুহ্- ছুহ্...(ফুঁক)। (টাঙ্গাইল)

১৫.

(ভূত হাজির করার মন্ত্র)

লোকবিশ্বাস আছে, মানুষের ওপর ভূতের আছড় করলে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে। সে কখনো হাসে আবার কখনো কাঁদে। বিশেষ করে অবিবাহিত নারীদের ওপর ভূতের আচরণ বেশি দেখা যায়। গ্রামের কবিরাজরা ভূতেধরা রোগীকে চিকিৎসা করে থাকে। প্রথমে 'ভূতেধরা' রোগীকে গানের আসরের মাঝখানে বসানো হয়। কলার পাতার মধ্যে সিন্দুর দিয়ে ভূতের কল্পিত ছবি আঁকা হয়। কলার পাতার মধ্যে আরও রাখা হয় দুধ, জবা ফুল, বাতাসা ইত্যাদি। এই কলার পাতা রোগীর সামনে রাখা হয়। তারপর খোল মন্দিরা ঢোল সহযোগে শুরু হয় গান। আর কবিরাজ মন্ত্র পড়ে-

দয়াল আয়রে আয়
এই আসরে না আসিলে
ফকির মারা যায়
দয়াল আয়রে আয়।
কাইনছা জাইরা আয়
তেলি জাইরা আয়
শিবের জাইরা আয়।
এই আসরে না আসিলে
ফকির মারা যায়।

পুবেতে বন্দনা করি পুবে পুষ্প ভয়
ওই দ্যাশেরই ভুত পেতনি এই আসরে আয়
এই আসরে না আসিলে ফকির মারা যায়।
পশ্চিমে বন্দনা করি পশ্চিমে পুষ্প ভয়
ওই দ্যাশেরই ভুত পেতনি এই আসরে আয়
এই আসরে না আসিলে ফকির মারা যায়।
উত্তরে বন্দনা করি উত্তরে পুষ্প ভয়
ওই দ্যাশেরই ভুত পেতনি এই আসরে আয়
এই আসরে না আসিলে ফকির মারা যায়।
দক্ষিণে বন্দনা করি দক্ষিণে পুষ্প ভয়
ওই দ্যাশেরই ভুত পেতনি এই আসরে আয়
এই আসরে না আসিলে ফকির মারা যায়।
ছুহ্- ছুহ্- ছুহ্ ...(ফুঁক) ॥[১]

www.pathagar.com

১৭.

(ভূত পেতনি হাজির করার মন্ত্র)

ফুল তুলিতে ফুলেশ্বরী
ফুলের দিকে চাইয়্যা
বর্মার দৃষ্টি হইলো
বর্মার দিকে চাইয়্যা
জল কাঁপে স্থল কাঁপে
কাঁপে শ্রীরাম
ফকিরকে মারলাম বাণ
চাইর কোণা পৃথিবী কাঁপে
দেইখা ফুলে কাম।
হরদেবী দৃষ্টি করল ফুলেতে বসিয়া
ফুল ছাইড়া যদি অন্য দিকে যাও
দোহাই ! তেত্রিশ কোটি দেবতার মাথা খাও।
ছুহ্- ছুহ্- ছুহ্ ...(ফুঁক)।[২]

১৮.

(ভূত পেতনি বন্দি করার মন্ত্র)

কবিরাজের মন্ত্র পাঠ করার এক সময় রোগী কাঁপতে থাকে। তারপর কবিরাজের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দেয়। কবিরাজের বিশ্বাস, ভূত রোগীর মুখ দিয়ে কবিরাজের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। তারপর কবিরাজ ভূতকে রোগীর দেহ হতে চলে যেতে বলে। ভূত কবিরাজের কথায় রাজী না হলে কবিরাজ মন্ত্র পড়ে ভূতকে বোতলে ভরে শাস্তি দেয়।

আইসো আইজোতে বইসো পাইনজোতে
হেটে দমদম পাতাল বন্দি
মোহাম্মদের কালাম দিয়া
আসর করিলাম বন্দি
যুদি আমার আসর ছাইড়া যাস
দোহাই লাগে মোহাম্মদের
মস্তক টুইটা খাস।
ছুহ্- ছুহ্- ছুহ্ ...(ফুঁক)।[৩]

১৯.

ভূতেধরা রোগী চিকিৎসা করানোর জন্য রোগীকে গানের আসরের মাঝখানে বসানো হয়। কবিরাজ তারপর মন্ত্র পড়ে রোগীর উপর ভূত হাজির করে। তারপর ভূত তাড়ানোর চিকিৎসা করা হয়।

(ভূত হাজির করার মন্ত্র)

ইরু কাসু বিরু কাসু কাসু জমদূত
কোমল কাসু দিয়া কালিমা যুদ্ধে যান

www.pathagar.com

হনুমান রামভক্ত পর্বত করিল গুঁড়া
আহাম্মদ কামাক্ষা কালী কণ্ঠে দেও সূরা
নমঃ নমঃ বিষ্ণু নমঃ কিলিং কৃষ্ণ দূত
ইজাজুল জিলাতে আরোজু জেল জালিহা
কাঁপিতে কাঁপিতে অমুকের শরীলে (শরীরে) যা।[৪]

২০.

লোকবিশ্বাস আছে, কবিরাজ মন্ত্র পড়ে চালান করে অন্য লোকের বাড়িতে দিতে পারে। ভূত সে বাড়িতে গিয়ে নানা রকম অত্যাচার করে। কবিরাজ সাধারণ শত্রুতাবশত ভূত চালান করে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় ভূতকে মন্ত্রের মাধ্যমে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

(ভূত চালানির মন্ত্র)

হাড় চালম নাড় চালম চালম মাথার মনি
দেহের চারবীর চালম আল্লাহ কাদের গনি
জ্বীন পরী ডাকে চালম বীর চালম নালে
ভুত পেত্নী চালম বীর বীরবিটির জালে
পাহাড় পর্বত চালম আসলাম জমিন চালম সুরাসুর
চালম চালম চন্দ্র সুরুজ তারা দুই ভাই
ডাকে যদি না চলস আল্লাহর দোহাই।
আল্লাহর কাহার পড়ল ত্রিভুবন জুড়িয়া
সুরাসুরী দেও দৈত্য উঠিলো কাঁপিয়া
কাঁপিয়া উঠিল তারা কইরা থরেথর
না জানোস তো ওরে দুষ্ট চৌষট্টি খবর।
ঘোরাঘোরি দৈত্য চালম হাতে দিয়া তুড়ি
নদীর কুলে বইসা ডাকে আয়তুল কুরসি
আয়তুল করসি বন্দিলাম কোরআন
আখেরি নবীর লাগো বান
আগে চলে হাসল বুরুজ পাছে চলে বান
ছোট বড়ো দেও দুষ্ট মন্ত্রে না সয় টান
আসমান জমিন বন্দ বন্দস চাইর কোণা
জিব্রাইল, মিকরাইল বন্দ শিবের কাঁপে মাথা
শোন গো হিয়ালী তুই পার্বতীর কথা।
ছুহ্ ছুহ্ ছুহ্ ...(ফুঁক)।[৫]

২১.

বিভিন্ন রকমের রোগ ব্যাধি আরোগ্য করার কাজে গ্রামাঞ্চলে কবিরাজরা পানি পড়া দিয়ে থাকে। লোকবিশ্বাস আছে যে, পানি পড়া খেলে রোগ ব্যাধি ভালো হয়।

www.pathagar.com

(পানি পড়ার মন্ত্র)

আওল গেল পদ্ম বনে
পদ্মপত্রের পানি ফুটি
পদ্মপাতে থুয়ে
আচম্বিতি জন্মিলো কন্যা
পদ্মগুণী হয়ে।

বাপে না নইলো কাহে-কোলে
মা'য় না দিলো স্তন
আচম্বিতি জন্মিলো কন্যা
কেউ না দিলো মন।

কোথায় যাও বিষাগর মা
গড়া দেও খাড়ু
টের উপর ডেকে আনো
ঠিকআনা বিকআনী।

কোথায় যাবি গঙ্গা বুড়ি
মোর দিকে তাকাও
মোর কণ্ঠে না পাইলো দিস
মুখে নইলো কালকুটি বিষ
গুরু নামে মহাদেবের বিষ

নাম বিষ রহিতে না পারস
মা পদ্মার তলফে
হেড ছেড়ে উজান যাও
মা পদ্মার মাথা খাও।
ছু... ছু... ছু...(ফুঁক)[৬]

২২.

(মন্ত্রের ছড়া)
উত্তর চরে দিঘলা[১] নাড়া
ফেইচকায় হাগে[২] ছেড়া বেড়া
ফেইচকার ফেচফেচানী
বাধা শালিখের ছা,
এমন করে ঝাড়া দিলাম
ভালা হইয়া যা।[৭]

২৩.

আগাইড়া মাছের পাগাইড়া পানি
হাপট দিয়া টাইনা আনি।

www.pathagar.com

ফেইচকার ফেচফেচানী
বাধা শালিখের ছা,
এমন একটা ঝাড়া দিলাম
বিষ যেন পালায়।[৮]

২৪.

(মাছ ধরার মন্ত্র)
ইগগা বাজে বিগাবন,
ঘড়ি বাজে টন টন।
ঘড়ির কপালে ফোটা,
মাছ মারলাম জোটা (ঘাটাইল)

২৫.

(গোয়ালের ডাক)
হা কর বেটা হা কর,
মুনের ভাবনা দূর কর।
আষাঢ় মাইস্যা ব্যাঙা,
করে চেঙা ভেঙা।
গোয়াল ঘরের পাছে,
ব্যাঙা হক্কুর হক্কুর কাশে।
হলদি মাখি গায়,
ব্যাঙা শ্বশুর বাড়ি যায়। (মির্জাপুর)

২৬.

(চক্ষু ঝারার মন্ত্র)
আইমুনী আইমুনী
আইমুনী আমার ভাই।
ঢোলে ধইরা কান্দি আমার
আইমুনী নাই। (ঘাটাইল)

শব্দার্থ : ১. দিঘলা- লম্বা, ২. হাগে- পায়খানা করে বা মল ত্যাগ করে।

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে ধাঁধা বা মান অন্যতম। ধাঁধার উদ্ভব প্রাচীনকাল থেকেই। আদিম মানুষের চিন্তাধারা যখন থেকে সংহত হতে শুরু করেছে তখন থেকেই ধাঁধার প্রচলন হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। মানুষের তৈরি হাস্যকর প্রশ্ন এবং উত্তর হলো ধাঁধা। কোনো অঞ্চলে ইহাকে হেঁয়ালী বা মান বলে। আমাদের টাঙ্গাইল জনপদেই ধাঁধাকে মান বলে। ধাঁধা গ্রাম বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।[১]

ধাঁধা ও হেঁয়ালী হলো সরস বুদ্ধিগম্য উক্তি-যাতে প্রশ্ন থাকে, যার উত্তরদানে প্রশ্নের মধ্যে অন্তর্নিহিত রস নিষ্পত্তির মজাটুকু উদঘাটিত হয়, তাকেই সরস ভাষায় ধাঁধা বলা চলে।[২] ধাঁধার আভিধানিক অর্থ হলো- কৌতূহল সৃষ্টিকারী বিভ্রান্তিকর অথচ বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন (ধাঁধার উত্তর)।[৩] ভিন্নমতে, 'ধন্ধ' থেকে 'ধাঁধা' শব্দের উৎপত্তি; অর্থ 'ধোঁকা, সংশয়, দুরূহ সমস্যা, কৌতূহলজনক ও বুদ্ধিবিভ্রমকারী প্রশ্ন।[৪] ধাঁধা পল্লির জনগণের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রশ্নের আকারে লিপিবদ্ধ করে। ধাঁধা পল্লি বাংলায় আপামর জনসাধারণের মনে জীবন ও জগৎকে জানার কৌতূহল সৃষ্টি করে। তাই ধাঁধা লোকসাহিত্যে একটি অতি পরিচিত নাম এবং বেশ বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। তাছাড়া ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও। যে বাক্য দ্বারা একটিমাত্র ভাব রূপকের সাহায্যে জিজ্ঞাসার আকারে প্রকাশ করা হয় তাকে ধাঁধা বলা হয়।

ধাঁধাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Riddle'। আবার একে হেঁয়ালিও বলা হয়ে থাকে। যা আগেও উল্লেখ হয়েছে। সংস্কৃত প্রহেলিকা থেকেই হেঁয়ালির উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। ভারতবর্ষে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধাঁধার বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও ধাঁধা বিভিন্ন নামে প্রচলিত। বিভিন্ন অঞ্চলে ধাঁধা বিভিন্ন নামে প্রচলিত থাকলেও সব ধাঁধারই উদ্দেশ্য এক। এলোমেলো বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বস্তুর ভাবনাকে সুসংবদ্ধ করে বাক্যের যে সংক্ষিপ্ত রূপ বা আকার ভাষায় প্রকাশ পায় তাই ধাঁধা।[৫] ধাঁধার মধ্য দিয়ে প্রশ্নকর্তা গুছিয়ে যা একত্রিত করেন, উত্তরদাতাকে তাই-ই খুলে বলতে হয়। ধাঁধার প্রধান বিষয় হলো তার উত্তর। ধাঁধা এবং তার উত্তর উভয়ে মিলেই একটি ধাঁধার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

লোকসাহিত্যে ধাঁধা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। বৈদিকযুগের যাজ্ঞিক ক্রিয়াকর্মেও ধাঁধা জিজ্ঞাসা করার রেওয়াজ ছিল। ঋগ্বেদ, ভারতীয় পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে ধাঁধার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। ধাঁধার আবেদন মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য। ধাঁধা জ্ঞানেরও বিষয়, আবার রসেরও সামগ্রী। এর মধ্যে দিয়ে যেমন উপস্থিত বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয়, আবার চমক বা তাক লাগাবার প্রয়াসেও ধাঁধা রচিত হয়। ধাঁধার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যবোধ, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, চিন্তার উৎকর্ষ, মননশীলতা,

www.pathagar.com

কৌতুক সৃষ্টি, স্মৃতিচর্চা, প্রতীক ব্যবহারের প্রবণতা, নির্মল আনন্দময় ও রসবোধের পরিচয় দৃষ্ট হয়। ধাঁধার মধ্যে একটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। আবার কোনোও কোনোও ধাঁধায় পুরস্কারের আভাসও আছে। এছাড়া এর মধ্যে অনেক সময় একশ্রেণির দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা অনাবশ্যক। ধাঁধা গদ্য ও পদ্য উভয় ভাষাতেই রচিত হতে পারে, এর প্রধান গুণ সংক্ষিপ্ততা। ধাঁধার সঙ্গে ছড়া ও প্রবাদের মিল ও অমিল উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। আবার ধাঁধাতে ছন্দ ও অলংকারের দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়।

মানুষের মনের কোনো একটি বস্তু বা প্রাণীর সম্পর্কিত সাদৃশ্যবোধ তুলনা অথবা পরস্পরের সংযোগ থেকেই ধাঁধার জন্ম। তবে ধাঁধায় শুধু বস্তু বা প্রাণীর সাদৃশ্য বা তুলনাই আছে এমন নয়। মানুষের আচার-আচরণ, জন্ম-মৃত্যু, উৎসব-পার্বণ, প্রকৃতি, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি নানা বিষয় স্থান পেয়েছে।[৬] আমাদের নিতান্ত পরিচিতি বস্তু, নিত্য ব্যবহার্য ও বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বহু জিনিস ও প্রকৃতির নিত্য পরিচিত উপকরণ ধাঁধার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। আবার এর বিষয়বস্তু কেবলমাত্র প্রত্যেক বস্তুই নয়, নৈর্ব্যক্তিক ভাবমূলক বস্তুও ধাঁধায় স্থান লাভ করে। ধাঁধা মূলত মৌখিক সাহিত্য এবং এর প্রচলন সমগ্র বিশ্বব্যাপী। লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদান এর মতো ধাঁধারও জন্ম মুখে মুখে। তার প্রচার ভ্রমণ তথা স্থিতিশীলতাও তেমনি মুখে মুখে। মুখে মুখে সৃজিত ধাঁধা লিখিত সাহিত্যে যেমন বিধৃত হয়েছে তেমনি লিখিতভাবে সৃজিত ধাঁধাগুলোও দীর্ঘকালের ব্যবধানে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে আজো সমাজের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে টিকে আছে।

ধাঁধা শুধু আদিমকালেই রচিত হয়নি, যুগে যুগে রচিত হয়েছে এবং অতি আধুনিককালেও রচিত হচ্ছে। লৌকিক ধাঁধার সাথে এর প্রধান বৈষম্য হলো ঐ সাহিত্যিক ধাঁধাগুলো কোনো জনশ্রুতিমূলক বিষয় নিয়ে রচিত হয় না, যে কোনো বিষয় নিয়ে সেগুলি রচিত হতে পারে। আর ধাঁধা মূলত রচিত হয় শিশু-কিশোরদের জন্যে। কিন্তু ধাঁধার আবেদন শিশু-কিশোরদের আসর ছাড়িয়ে প্রবীণদের আসরেও প্রবেশের পূর্ণ সক্ষমতা রাখে, তাদের আনন্দ বিধান করে তার সাহিত্য রসের জন্যে।[৭]

ধাঁধাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাহিত্যাশ্রী (আধ্যাত্মিক) এবং লৌকিক। লৌকিক ধাঁধার মধ্যে যে বিষয়টি সহজ কথায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়, সাহিত্যিক ধাঁধায় তাই-ই বিচিত্ররূপ ও অলংকারের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়। সাহিত্যিক ধাঁধার ব্যবহার বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। চর্যাপদ, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল কাব্যে, নাথ সাহিত্যে, গোপীচন্দ্রের গানে, গোর্খ বিজয়ে, বাউলগানে, কবিগানে বহু সাহিত্যিক ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু অনুসারে লৌকিক ধাঁধাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. নরনারী ও দেবদেবী বিষয়ক : ক. মানুষ ও তার অঙ্গ পত্যঙ্গ, খ. ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষ ও নারী, গ. পৌরাণিক চরিত্র, ঘ. দেবদেবী। ২. প্রকৃতি বিষয়ক : ক. উদ্ভিদ ও লতাপাতা সংক্রান্ত। খ. আকাশ গ্রহ-নক্ষত্র ও প্রকৃতি। গ. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র। ঘ. আচার-আচরণ-অভ্যাস। ঙ. আচার-অনুষ্ঠান-ক্রিয়াক্রম। ৪. পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গ বিষয়ক। ৫. বাদ্যযন্ত্রবিষয়ক। ৬. আখ্যান বা কাহিনিমূলক। ৭. গাণিতিক বা সংখ্যামূলক। ৮. বিবিধ বিষয়ক।[৮]

www.pathagar.com

নির্মলেন্দু ভৌমিক *বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা* (১৯৮৮) গ্রন্থে আর্চার টেলরের অনুসরণে মানবিক জগৎ, মানবেতর প্রাণী জগৎ, জড়বস্তু জগৎ ও নিসর্গ জগৎ এই চারটি মূখ্য ভাগে ভাগ করেছেন। বিকল্প শ্রেণি বিভাগ হিসাবে তিনি নিম্নের বিভাগ সমর্থন করেন; ১. আত্মকথন, ২. ইতরপ্রাণী, ৩. জড়বস্তু, ৪. গাছপালা, ৫. নিসর্গ জগৎ, ৬. মানুষ ও মানব-অঙ্গ, ৭. যথাযথ বর্ণনা, ৮. রূপক।

ড. ওয়াকিল আহমদ 'ময়মনসিংহের ধাঁধা' নামক প্রবন্ধে আটটি বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন– ১. মানব ও মানব অঙ্গের সহিত তুলনা, ২. প্রাণী ও প্রাণী অঙ্গের সহিত তুলনা, ৩. উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ বস্তুর সহিত তুলনা, ৪. স্থান ও বস্তুর সহিত তুলনা, ৫. প্রবর্তনমূলক, ৬. গল্পমূলক ৭. গ্রাম্যতা সূচক, ৮. অক্ষরমূলক।[৯]

উপরোক্ত বিষয়ভিত্তিক প্রচুর ধাঁধা টাঙ্গাইল জনপদে প্রচলিত আছে। বিবাহ বাসরে, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, গ্রাম্য মজলিসে, আমোদ-প্রমোদের উপকরণ হিসেবে ধাঁধার প্রচলন রয়েছে। ধাঁধার আসর যেখানে সেখানে বসতে পারে। তবে অবসর সময়ে বিশেষ করে জোছনা রাতে ধাঁধার আসর ভালো জমে উঠে। নিম্নে টাঙ্গাইল অঞ্চলের প্রচলিত ধাঁধার উদাহরণ ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হলো।

১.

বাংলা তিন অক্ষরের নাম মোর সর্বত্র প্রচার
মুণ্ড কেটে দিলে হয় মস্ত জানোয়ার
পেট কেটে দিলে থাকি প্রতি ঘরে ঘরে
লেজ কেটে দিলে মূল্য পোয়া কড়া ধরে। (ভূঞাপুর)
উত্তর : কাগজ।

ব্যাখ্যা : কাগজের সর্বত্র প্রজার আছে। 'কা' কেটে দিলে থাকে 'গজ'। যার অর্থ হাতি। আর হাতি হলো মস্ত বড় জানোয়ার। পেট কেটে দিলে অর্থাৎ 'গ' অক্ষর কাটা গেলে হয় কাজ। কাজ-কর্ম তো প্রতি ঘরেই আছে। তারপর লেজ মানে শেষ অক্ষর কেটে দিলে বা বাদ দিলে হয় কাগ। অতীতকালে ধারাপাত বইয়ের অঙ্কে কাগের হিসাব ছিল। চার কাগে এক কড়া বা শতাংশ হিসাব ছিল। অর্থাৎ চার পোয়ায় কড়া ধরা হতো।

২.

একই মায়ের গর্ভে মোরা সবাই বাস করি
জন্মিয়া মায়ের বুকে আঘাত যে করি
সেই পাপে মোরা সব ভস্ম হইয়া মরি। (ভূঞাপুর)
উত্তর : দিয়াশলাই বা ম্যাচ।

ব্যাখ্যা : ম্যাচের কাঠি একই বাক্সে থাকে। এখানে বাক্সকে বলা হয়েছে মা। আর কাঠি বা শলাকে বলা হয় সন্তান। ম্যাচের কাঠি দিয়ে বাক্সের গায়ে আঘাত করলে আগুন জ্বলে। আর সেই আগুনে ম্যাচের কাঠি পুড়ে যায়।

৩.

হাতির দাঁত ময়ূরের পাখ
যে না কহাব সে গাধার জাত। (ভূঞাপুর)
উত্তর : মূলা।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : সাদা মূলার কাণ্ড দেখতে হাতির দাঁতের মতো। আর ময়ূর পাখি পেখম মেলে নাচলে যেমন দেখা যায়। তেমনি সাদা মূলার পাতাগুলোও দেখা যায়।

৪.

এক গিলাসে দুই নমুনার পানি
যে না কহাব তার বোনের জামাই আমি। (ভূঞাপুর)
উত্তর : আণ্ডা বা ডিম।

ব্যাখ্যা : ডিমকে গিলাস হিসেবে তুলনা করা হয়েছে। আর ডিম নামক গিলাসে বা গেলাসে দুই রঙের তরল জিনিস থাকে। তার একটি রং পানির মতো কিন্তু পানির চেয়ে ঘন এবং আঁঠাল পিচ্ছিল। আর অপরটির রং লাল। দেখতে পতাকার লাল বৃত্তের মতো। কিংবা সূর্য উদয় এবং অস্তের সময় যে লাল মতো দেখা যায় তেমনি। এটাকে ডিমের কুসুম বলা হয়।

৫.

এক দুল্লা টুনি
তার বুক বুঝাই বুনি। (ভূঞাপুর)
উত্তর : করলা বা উছতা।

ব্যাখ্যা : উছতা দেখতে ছোট। কিন্তু তার বুকে অর্থাৎ শরীরে অনেক কাটা। দেখতেও উছতার কাটাগুলো অনেকটা স্তনের মতো। স্তনকে টাঙ্গাইল অঞ্চলে বুনি বলা হয়।

৬.

চৌকোণা শরীর তার দন্ত সারি সারি
আহার করিতে যায় অমরার পুরী
অমরার পুরী যাইয়া করে আহরণ
ঠোঁটে করে আনে জীব করে না ভক্ষণ। (ভূঞাপুর)
উত্তর : চিরুনি।

ব্যাখ্যা : চিরুনির চারটি কোনা আছে। চিরুনির খিলকে দাঁত হিসেবে তুলনা করা হয়েছে। দন্ত বা দাঁত যেমন মুখে সারি সারি থাকে। তেমনি মাথা আচড়ানোর চিরুনির খিলাগুলো সারি সারি। চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ালে মাথার চুলে যদি উকুন থাকে, সেই উকুনগুলো চিরুনির খিলের সাথে বেজে চলে আসে। আর উকুনের প্রাণ বা জীবন আছে বলে উকুনকে এখানে জীব বলা হয়েছে। এই উকুন নামক জীবটিকে চিরুনি ঠোঁটে অর্থাৎ অগ্রভাগে করে নিয়ে আসে কিন্তু চিরুনি ভক্ষণ করে না বা খায় না। সেই উকুন নামক জীবকে অন্য জীবেরা মেরে ফেলে দেয়।

৭.

দিতে কষাকষি
দিতে পারলে সবাই খুশি। (গোপালপুর)
উত্তর : চুড়ি।

ব্যাখ্যা : মহিলা মানুষের হাতে চুড়ি পরাতে অনেক কষ্ট হয়। হাত টিপে টিপে কষাকষি করে হাতে কবজি পর্যন্ত আস্তে আস্তে নিতে হয়। কবজি পর্যন্ত চুড়ি পরানোর পর হাতে আর ব্যাথা অনুভব হয় না। তখন মেয়েদের বা মহিলাদের মনে আনন্দ অনুভব হয়।

www.pathagar.com

৮.

কাটলে চিকন হয়
চাঁচলে মোটা হয়। (বাসাইল)
উত্তর : কূপ বা চুলা।

ব্যাখ্যা : কূপ বা চুলা খনন করার সময় চিকন করে আগে কাটতে হয়। তারপর সেই কূপ বা চুলাকে চারিদিক চেঁছে চেঁছে গোলাকার করতে হয়। তখন সেই খননকৃত কূপ বা চুলাটি আর চিকন থাকে না। সেটা আস্তে আস্তে মোটা হয়ে যায়।

৯.

এই আছে এই নাই
গাব তলায় গাই নাই। (বাসাইল)
উত্তর : বিদ্যুৎ চমক।

ব্যাখ্যা : আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যায়। একটু পরেই আর সেই চমকানো আলো দেখা যায় না। এখানে আকাশের ভূ-মণ্ডলকে উপমার সাহায্যে গাবতলা বুঝানো হয়েছে।

১০.

গান গায় বাজনা বাজায়, মানুষও তো নয়
মানুষও খায় গরুও খায়, বাঘও তো নয়। (ঘাটাইল)
বল সেটা কি?
উত্তর : মশা।

ব্যাখ্যা : মশা নামক প্রাণীটি যখন মানুষের কানের কাছে এসে ভন ভন করে তখন গানের সুরের মতো বাজনা শোনা যায়। মনে হয় এই প্রাণীটি যেন কানের নিকট এসে বাজনা বাজিয়ে সুর করে গান গাইছে। মশায় মানুষের শরীরের রক্ত যেমন চুষে নেয় তেমনি গরুর শরীরের রক্তও চুষে নেয়। বাঘ হিংস্র প্রাণী হিসেবে মানুষ ও গরু খায়। মশাও মানুষ ও গরুর রক্ত চুষে খায়।

১১.

হাত আছে পা নাই
পুরো মানুষ গিলে খাই। (কালিহাতি)
উত্তর : বোরকা।

ব্যাখ্যা : মেয়ে মানুষ বোরকা নামক বস্ত্র দিয়ে সকল অঙ্গপ্রতঙ্গ ঢেকে রাখে। বোরকার দুইটি হাত আছে। কিন্তু পা নেই। মেয়ে মানুষ দুই পায়ে বোরকা পরে না। দুই হাতে বোরকা পরে। আর বোরকা নামক বস্ত্রে মেয়েদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গও কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে। এটাকে গ্রাম্য মানুষ রূপকে মাধ্যমে গিলে খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছে। মানুষ মুখে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে গিলে ফেললে যেমন মুখে খাদ্য আর দেখা যায় না। তেমনি মেয়েরা বোরকা পরলে তাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যায় না।

১২.

পা পিষ্ঠ মাথা দুই হাত বিশ আঙ্গুল নাকটা
চক্ষু দন্ত নাই এই শোলকের মানে কী রে ভাই? (মধুপুর)
উঃ মানুষ

www.pathagar.com

১৩.
চারকানি দন্ত তার রমণী সাজে
হস্তে উঠে যায় রণের মাঝে
দন্তে করে আনে আহার না করে ভক্ষণ
রমণীর সাথে যখন হয় দরশন
তবেই জানিবে তার নিশ্চয় মরণ। (কালিহাতি)
উঃ চিরুনি ও উকুন।

১৪.
শিশুকালে শাড়ি পরে
যৌবনকালে উলঙ্গ
বৃদ্ধকালে মাথায় চুল
মাঝখানে সুরঙ্গ। (ঘাটাইল)
উঃ বাঁশ

১৫.
দশ ঠ্যাং পাঁচ কাল্লা
এক মুখে বলে আল্লা।
অন্য মুখ নিরব থাকে
কিছুই বলে না
দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ে
সেজদা করে না। (বাসাইল)
উঃ জানাজা নামাজ।

১৬.
তিন অক্ষরে নাম তার মইধ্যে আছে খাল
ধর্ম কর্ম বান্ধা কিন্তু তিন গাছি বাল।
ইচ্ছা করলে তুইলা লয় কোলে
গোটা চারি পাঁচ ঠেলা দিলে
যা বলবার কয় তাই বলে। (ভূঞাপুর)
উঃ সারিন্দা।

১৭.
জন্মে কালা কর্মে লাল
মইরা হয় সাদা
এর মানে কিরে দাদা? (বাসাইল)
উঃ কয়লা।

১৮.
এমনই সে ভাগ্যবান
নাকে বসিয়া মলে দুই কান
তবু কেউ বোধ করে না অপমান। (কালিহাতি)
উঃ চশমা।

www.pathagar.com

১৯.
এমন একটা খাবার আছে
অনেক লোকেই খায়
শিশুরা খাইলে পরে
কাইন্দা মায়ের কাছে যায়।
যুবকেরা খাইলে পরে
দৌড়াইয়া পালায়
আর বৃদ্ধলোকে খাইলে
হাড় ভাইঙ্গা যায়। (বাসাইল)
উঃ আছাড় খাওয়া।

২০.
দুই অক্ষরে নাম তার
প্রথমে থাকে কলি
বয়েস হইলে ওর
মুখে বসে কালি।
বড়লোকে নাড়ে চাড়ে
ছোটলোকে খায়
মুর্খে কি বুঝবে তাহা
পণ্ডিতে বোঝাই দায়। (মির্জাপুর)
উঃ স্তন।

২১.
থো ফালাইয়া তোর নটর বটর
গোয়াল ঘরের পাছে
পাঁচ মাথা পনের পেট
কোনো জোনারের আছে? (ঘাটাইল)
উঃ হাতের পাঁচ আঙ্গুল।

২২.
কান্দার উপর কান্দা
বাপ মাও সুইন্ধা বান্দা। (মধুপুর)
উঃ কলার কাদি

২৩.
ইত ঘুঘুর পীত কান
কোনো ঘুঘুর তিন কান? (মির্জাপুর)
উঃ হেঁসেল।

২৪.
কলা তলে গলা পানি
কই বুগ বুগ করে

কার বাপের শক্তি আছে
জাল ফালাইতে পারে? (বাসাইল)
উঃ চুলার উপরের তরকারি।

২৫.
চতুর পাশে কাঁটাতারের বেড়া
মইধ্যে একটা ব্যাটা খাড়া। (দেলদুয়ার)
উঃ আনারস।

২৬.
দুই ঠ্যাং ফাঁক কইরা মারলাম জাতা। (নাগরপুর)
উঃ শরতা/সুপারি কাটার যন্ত্র।

২৭.
চাইর পোলা তার নাদুর নুদুর[১]
চাইর পোলা তার ঘৃত মধুর
দুই পোলা তার শুখান[২] কাঠ
এক পোলা তার পাগল নাথ। (কালিহাতি)
উঃ গাভী

২৮.
সাগরে জন্ম নগরে বাস
মায়ে ছানলে[৩] সর্বনাশ। (দেলদুয়ার)
উঃ লবণ।

২৯.
কাত কইরা ধইরা চিৎ কইরা শোয়াইয়া
এমন করাই করে ঝুমকাসহ নড়ে। (ভূঞাপুর)
উঃ শিল পাটা।

৩০.
বুক দিয়া খায়
পিঠ দিয়া যায়। (ভূঞাপুর)
উঃ র‍্যাঁদা।

৩১.
ভিতরে ছিলাইয়া উপরে খায়।
উঃ মুরগীর/হাঁসের গিলা।

৩২.
দুইটা খাড়া একটা কাইত[৪]
দিয়া শোয়, উইঠা[৫] খোলে। (কালিহাতি)
উঃ দরজা।

৩৩.
ইল[৬] বিল শুকাইয়া গেল
গাছের আগায় পানি। (মধুপুর)
উঃ ডাব।

www.pathagar.com

৩৪.
দুই হাতে জোরাজোরি ভিতরে গেলে সুখ
যদি হয় ভণ্ড দশ টাকা দিমু দণ্ড। (টাঙ্গাইল)
উঃ চূড়ি।

৩৫.
একখান দড়ি গোছাইতে গোছাইতে মরি। (গোপালপুর)
উঃ রাস্তা।

৩৬
এক হাতির তিন মাথা
হাতি খায় লতা-পাতা। (গোপালপুর)
উঃ চুলা

৩৭.
হাত নাই পাও[৭] নাই বইসা গাতা[৮] করে। (ভূঞাপুর)
উঃ কলসি।

৩৮.
এক গাছ টান দিলে বেগ[৯] গাছ নড়ে
কানা কুরকা[১০] ডাক দিলে সমুদ্দুর নড়ে। (কালিহাতি)
উঃ ভূমিকম্প।

৩৯.
ঝিলে বিলে পানি নাই
ঢেলের তলে পানি। (বাসাইল)
উঃ শামুক।

৪০.
তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে খায়
প্রথম অক্ষর কাইটা দিলে মেয়েলোকে চায়। (নাগেরপুর)
উঃ খিচুড়ি।

৪১.
রাইতে চিতল দিনে শোল। (বাসাইল)
উঃ পাটি।

৪২.
রাইতে[১১] নড়ে চড়ে দিনে পইড়া[১২] থাকে। (টাঙ্গইল)
উঃ গোয়ালের গরুর দড়ি।

৪৩.
রাইতে পানায়[১৩] দিনে খায়। (ভূঞাপুর)
উঃ খেজুর রস।

৪৪.
হাত নাই পাও[১৪] নাই
দেশে দেশে ঘোরে।

www.pathagar.com

অভাব হইলে তার
লোকে অনাহারে মরে। (কালিহাতি)
উঃ টাকা।

৪৫.
ছোট্ট ছোট্ট গাছে
লাল পক্ষি নাচে। (ভূঞাপুর)
উঃ মরিচ।

৪৬.
হালটের[১৫] মুরিতে[১৬] গজারী গাছ
কালা বলদে তোলে চাষ। (টাঙ্গাইল)
উঃ করাত।

৪৭.
তুমি থাকো খালে
আমি থাকি ডালে
তোমার আমার দেখা
হবে মরণের কালে। (কালিহাতি)
উঃ মাছ ও মরিচ।

৪৮.
খোদার কি কাম[১৭]
এক ঘরে এক খাম[১৮]। (ভূঞাপুর)
উত্তর : ছাতা।

৪৯.
খোদার কি কুদরত
লাঠির মধ্যে শরবত। (ভূঞাপুর)
উত্তর : কুইশাইল (আখ)।

৫০.
দিমু[১৯] দেইখা দিলাম না
না দিলি[২০] দিলামনি[২১]। (ভূঞাপুর)
উত্তর : লাঙ্গোইলা।

৫১.
উড়িতে ঝমঝম
পড়িতে ময়ুর
হাত নাই পাও নাই
চৌদ্দ হাত নেঙ্গুর[২২]। (ভূঞাপুর)
উত্তর : ঝাঁকিজাল।

৫২.
জন্মে সাদা কর্মে কালো
মাজায় গুরগুরি[২৩] হার

www.pathagar.com

লাফ দিয়া শিকার করে
উর্ধ্বে নেঙ্গুর তার। (ভূঞাপুর)
উত্তর : ঝাঁকি জাল।

৫৩.
তুমি থাকো ডালে
আমি থাকি জলে
তোমার সাথে দেখা হবে
মরণের কালে। (মির্জাপুর)
উত্তর : মরিচ ও মাছ।

৫৪.
ঘর আছে দুয়ার নাই
মানুষ আছে শব্দ নাই। (ভূঞাপুর)
উত্তর : কবর।

৫৫.
চিৎ কইরা[২৪] ফালাইয়া
দুই হাতে ধইরা
আমার কাম[২৫] কইরা
দিলাম ছাইড়া। (টাঙ্গাইল)
উত্তর : পাটা ও শিল।

৫৬.
দুই ঠ্যাং ছড়াইয়া
মইধ্যে দিলাম ছোয়াইয়া
জাতা[২৬] দিলে কাম হয়
যদি হয় ভগু, দশ টাকা দণ্ড। (টাঙ্গাইল)
উত্তর : সর্তা (যাতি) ও সুপারি।

৫৭.
উঠিতেছে ডগমগ
মুখখালি তার কালো
গোসাই গোবিন্দ কয়
শুইলে[২৭] আর উঠবার নয়। (টাঙ্গাইল)
উত্তর : স্তন।

৫৮.
তিন অক্ষরের নাম যার
জলে বাস করে
মইধ্যের অক্ষর কাইটা[২৮] দিলে
আকাশেতে উড়ে। (টাঙ্গাইল)
উত্তর : চিতল

www.pathagar.com

৫৯.
ছোট একটি দড়ি
গোছাইতে গোছাইতে মরি। (টাঙ্গাইল)
উত্তর : পথ (রাস্তা)।
৬০.
পানির তলে মরিচ গাছ
পারা দিলে সর্বনাশ। (মির্জাপুর)
উত্তর : শিং মাছ।
৬১.
আমার একটা ষাঁড় আছে
বটের পাতা খায়
সাত সুমুদ্দুর[২৯] পাড়ি দিয়া
ডিপ খেলিতে যায়।(মির্জাপুর)
উত্তর : তুফান।
৬২.
কালা[৩০] ছাগলের গলায় গড়ি
রাইত[৩১] হইলে তালাশ করি। (মির্জাপুর)
উত্তর : কেরোসিন তেলের বোতল।
৬৩.
আড়া[৩২] হইতে বাহির হইলো টিয়া
লাল টুপি মাথায় দিয়া। (মির্জাপুর)
উত্তর : কলার থোর।
৬৪.
খাইলে খাড়াইয়া[৩৩] থাকে
না খাইলে শুইয়া থাকে। (মির্জাপুর)
উত্তর : ছালা (বস্তা)।
৬৫.
যে বানায় সে ব্যবহার করে না
যে ব্যবহার করে সে চোখে দেখে না। (টাঙ্গাইল)
উত্তর : চাঙ্গাড়ি (খাটিয়া)।
৬৬.
কচুর পাতা জলে ভাসে
হাড় নাই মাংস আছে। (মির্জাপুর)
উত্তর : জোঁক।
৬৭.
আড়ের উপর তারের বাস
তারই উপর বাইলা[৩৪] হাঁস

www.pathagar.com

বাইলা হাসে ডিম পাড়ে
কে কতো গুণতে পারে। (মির্জাপুর)
উত্তর : তারা (নক্ষত্র)।

৬৮.

আত্তা[৩৫] গাছের পাত্তা[৩৬]
দিঘল গাছের গোটা
কালা গরুর কইজ্জা[৩৭]
সুমুদ্দুর ফেনা।
কও[৩৮] তো কী? (মির্জাপুর)
উত্তর : পান, সুপারি, খয়ার ও চুন।

৬৯.

ইট ঘুঘুর পিট টান
কোনো ঘুঘুর তিন কান। (নাগরপুর)
উত্তর : আইশাল (চুলা)।

৭০.

এক গাছ টান দিলে
সব গাছ নড়ে
কানাকুক্কায়[৩৯] ডাক দিলে
সুমুদ্দুর নড়ে। (নাগরপুর)
উত্তর : ভূমিকম্প।

৭১.

আগা[৪০] ঝুমঝুম গোড়া মোটা। (নাগরপুর)
উত্তর : ঝাড়ু।

৭২.

ঘরের নিচে ঘর
তার নিচে পইড়া[৪১] মর। (দেলদুয়ার)
উত্তর : মশারি।

৭৩.

ঢেউয়ের উপর ঢেউ
তার উপরে বইসা রইছে
জমিদারের বউ। (দেলদুয়ার)
উত্তর : কচুরপাতা।

৭৪.

গলা আছে তার মাথা নাই
হাত আছে তার পাও নাই। (দেলদুয়ার)
উত্তর : জামা।

www.pathagar.com

৭৫.
হাতির দাঁত ময়ুরের পাখ[৪২]
যে না কইতে পারে সে
গাধার জাত। (দেলদুয়ার)
উত্তর : মুলা।

৭৬.
ইলে বিলে পানি নাই
ঢ্যাল[৪৩] ক্ষেতে পানি। (দেলদুয়ার)
উত্তর : শামুক।

৭৭.
ইলে বিলে পানি নাই
গাছের আগায় পানি। (দেলদুয়ার)
উত্তর : ডাব।

৭৮.
আমার একটা কাঠের গাই[৪৪]
রাইতে পানাই[৪৫] দিনে খাই। (টাঙ্গাইল)
উত্তর : খেজুর গাছ ও রস।

৭৯.
এক গেলাসে দুই নমুনার[৪৬] পানি
যে না কইতে পারে
তার বুইনের[৪৭] জামাই আমি। (টাঙ্গাইল)
উত্তর : ডিম।

৮০.
ছোট কালে ঘোমটা
বড়ো কালে ন্যাংটা[৪৮]। (টাঙ্গাইল)
উত্তর : বাঁশ।

৮১.
উপরে মাটি তলে[৪৯] মাটি
তার মাঝে সুন্দর বেটি। (টাঙ্গাইল)
উত্তর : হলুদ।

৮২.
নড়বড়ে নড়বড়ে
ছ্যাপ[৫০] দিয়া খাড়া করে।
উত্তর : সুই-সুতা। (টাঙ্গাইল)

www.pathagar.com

শিমাশা/মেছাল

১.

একদিন এক চন্দন বৃক্ষ আসন্ন বিপদের হাত থেকে এক কাঠুরিয়াকে নিজের বুকের ভিতরে আড়াল করে রক্ষা করে। কালক্রমে কাঠুরিয়া একদিন শুনতে পায় যে জনৈক বাসুকি রাজার সৎকারের জন্যে যে উপযুক্ত চন্দন কাঠ সরবরাহ করবে তাকে অনেক অর্থ প্রদান করা হবে। কাঠুরিয়া তার আশ্রয়দাতা চন্দন বৃক্ষের শিকড় সমেত উৎপাটনের আয়োজন করে। চন্দন গাছ তখন আক্ষেপ করে বলে যে, সে যদি কাঠুরিয়াকে বিপদ থেকে সেদিন রক্ষা না করত তাহলে আজকের এই দিনটি দেখতে হতো না। অকৃতজ্ঞ কাঠুরিয়া যদি সব কেটে নিয়ে মূলটুকু রেখে যেতো তাহলেও বৃক্ষটি আবার বেড়ে উঠতে পারত। মানুষ তার উপকারীর উপকারের কথা সহজেই ভুলে যায়।

বুক ফাঁড়িয়া জায়গা দিলাম
দেল পরিমাণ
লতা পাতা সবই খাইলি
শিকড়ে বাঁচাইতো জান।
কোথায় রইল বাসুকি রাজা
দক্ষিণা রায়
উপকার করছিলাম বলে
এখন শিকড় সুইদ্ধা যায়।[১০]

২.

কোরা শিকারি বিলের মধ্যে ফাঁদ পেতে রাখে কোরা পাখি ধরার জন্যে। ফাঁদের কাছাকাছি ছোট বাঁশের ঘরে পোষা কোরাকে রেখে ঘরটিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। যাতে পোষা কোরার ডাক শুনে অন্য কোরাগুলো এগিয়ে এসে ফাঁদে আটকা পড়ে। কথিত আছে এক কোরা ডাকলে নাকি অন্য সব কোরা সেদিকেই এগিয়ে যায়। ফাঁদে আটকা পড়ার পর আক্রান্ত কোরাগুলো পোষা কোরাকে আক্ষেপ করে বলে, তুই আমাদের জাতি ভাই হয়েও আমাদেরকে বিপদের মধ্যে ডেকে আনলি? তখন পোষা কোরা প্রত্যুত্তরে বলে, আমি মালিকের নেমক খাই বলে তার নির্দেশে ডাকাডাকি করি। তোদের চোখ থাকা সত্ত্বেও তোরা কেন না দেখে অন্ধের মতো পথ চলিস? ব্যক্তিগত লাভে অথবা নিজে বিপদে পড়েছে বলে কেউ কেউ আপনজনকেও বিপদে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই অন্ধ বিশ্বাসে পথ না চলে নিজের বিবেক-বুদ্ধিমতো কাজ করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত।

বাঁশের ঘর কাপড় দিয়া ছাইয়া
আঠেকান[৫১] ঠেকাইলি তুই
আমার জাতের ভাই হইয়া।
আমি যার নুন খাই
তার গুণ গাই
ফাঁকে[৫২] থেকে করে রাও[৫৩]

www.pathagar.com

সোনার মতো দুই চোখ থাকতে
তুই ফান্দে দিলি ক্যান পাও?[১১]

৩.

এক রাজকন্যা ঘাটে বসে গোসল করছে। এমন সময় পাশে খুলে রাখা গলার হার চিল ছোঁ মেরে নিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। হারের পাশে এক সাপ ঝুলে রয়েছে। রাজকন্যা কেমন করে তার হার উদ্ধার করবে ভেবে পায় না। ইতোমধ্যে রাজকন্যা লক্ষ্য করে দেখে যে, পুকুরের অদূরেই ঘাস কাটছে এক রাখাল। রাজকন্যা নিরুপায় হয়ে গলার হার উদ্ধারের জন্যে রাখালের সাহায্য কামনা করে। রাজকন্যার সঙ্গে রাত্রি যাপনের সুযোগ দিলে তার হার উদ্ধার করে দিবে বলে রাখাল রাজকন্যাকে জানিয়ে দেয়। রাজকন্যা প্রস্তাবে রাজি হলে রাখাল তার হার উদ্ধার করে দেয়। কথামত রাজকন্যা রাখাল বন্ধুকে এক রাতে তার শয়ন কক্ষে ডেকে নিয়ে যায়। রাজমহলের জৌলুস দেখে এবং রাজকন্যার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে অনেক রাতে রাখাল ঘুমিয়ে পড়ে। রাজকন্যা রাখালের মনের বাসনা পুরণের জন্যে তাকে গভীর রাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলে রাখাল হন্তদন্ত হয়ে দড়ি কাঁচি খোঁজার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। পরে রাজকন্যার সাথে দেখা হলে রাখাল তার মনোবাসনা পুরণে রাজকন্যার দেওয়া ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দেয়। রাজকন্যা তার ওয়াদা পুরণ করতে না পারার কারণ হিসেবে গত রাতে রাখালের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ মানুষ তার নিজের স্বভাব কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না।

শূন্যে চড়িলাম সাপও মারিলাম
না করলাম প্রাণের ভয়
আইজ[৫৪] দেহি[৫৫] রাজকন্যা
কোনো কথা কয়।
রাগ কর যে রাখাল,
তুমি কি কিছু বোঝ?
কাজের বেলায় ডাকলে যে
তুমি দড়ি কাঁচি খোঁজ।[১২]

৪.

এক প্রেমিক নদীর কিনারে এসে এক বককে তার প্রেমিকার সন্ধান জিজ্ঞাস করে। বকের চেনার সুবিধার্থে প্রেমিক তার প্রেমিকার রূপের বর্ণনা করে। বক ঐ রকম এক নারীকে নদীর কিনারে অপেক্ষা করতে দেখেছে। কিন্তু এক সময় কি ভেবে হাতের পান, ফুল পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে নদীর ঘাট ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে যেতে দেখেছে। এ কথা শোনে প্রেমিক নিরাশ হৃদয়ে নদীর তীর ধরে হাঁটতে শুরু করে। অনতিদূরে গিয়ে প্রেমিক দেখতে পায় কাঁটা বনে তার প্রেমিকা আটকা পড়েছে। দু-জন দু-জনকে পেয়ে আত্মহারা হয়ে যায় এবং কাঁটা বনকে হৃদয়ের অভিনন্দন জানায়। অনেক সময় বিপদের মধ্যেও মঙ্গল নিহিত থাকে।

নদীর মুরিত[৫৬] থাকো গো বগিলা[৫৭]
খাও কুসুম্বের ফুল

www.pathagar.com

এই রাস্তায় যাইতে দেখছো
নারী গজভরি চুল?
হ্যাঁ দেইখাছি দেইখাছি নারী
গজভরি চুল
একবার ঢালে আবার তোলে
কন্যা পন্থ পানে চায়
হাতের ফুল পান ফেলে কন্যা
গৃহে চইলা যায়।
আহা রে আগরা[১৮] বাজাইছো ঝগড়া
তোরাই প্রাণের ভাই
ভাঙ্গা পিরিত জোড়া নওয়াস
সাবাস! সাবাস! তোর জাতের বড়াই।[১৩]

৫.

নদীর স্রোতে পড়পড় এক বৃক্ষ নিজের মৃত্যুর কথা না ভেবে তার ডালে বাস করা পাখপাখালির চিন্তায় ব্যাকুল। পাখিরা বৃক্ষের এই মমতা দেখে অবাক হয়ে যায়। সারা জীবন যে বৃক্ষের ডাল পাতা নষ্ট করে শুধুই কষ্ট দিয়েছে সে বৃক্ষ মৃত্যুকালেও তাদের হিত কামনায় ব্যাকুলিত চিত্ত। হায়রে পিরিতি! মরণেও মায়া ভোলে না। পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে যারা পরার্থে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে মহোত্তম হৃদয়ের দৃষ্টান্ত রেখে যায়।

এক চিন্তা চিন্তি আমি
নদী বয় কিনা বয়
আরেক চিন্তা চিন্তি আমি
পাখি কোথায় রয়।
শ্বাস খাইলাম, ডাল ভাঙলাম
না ভোললাম তোর কায়া
এমন বৃক্ষের সাথে পিরিত করছি
মরলেও ছাড়ে না দয়া।[১৪]

৬.

এক রাজকন্যার শখ হলো সে নতুন কিছু শুনবে। রাজা রাজ্যময় মেয়ের ইচ্ছার কথা জানিয়ে বকশিশ ঘোষণা করল। কারো কথাই রাজকন্যার মনে লাগল না। শেষে এক ব্যক্তি এসে আশ্চর্য কিছু কথা শুনাল যা শুনে রাজকন্যার মুখে হাসি ফুটে উঠল। রাজকন্যা লোকটির নিকট আশ্চর্য কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইল। লোকটি বলল যে- সে রাজ দরবারে আসার পথে যা দেখেছে এসব তারই বিবরণ। এগুলো আদৌ রূপকথা নয়। লোকটি বলল- সে এক জায়গায় দেখেছে মৃত মহিষের মাথার কঙ্কালের অক্ষি গোলকের মধ্যে এক পাখি বাসা করে বসে আছে। পথের পাশে ঘাসের উপর শিশির কণাগুলো এমনভাবে ঝুলে আছে যেন কেউ তাদেরকে শূলে চড়িয়ে দিয়েছে। নদীতে গরু গোসল করানোর সময় একটি ছোট মাছ লাফিয়ে উঠে তার পিঠে এবং একটি পাখি

www.pathagar.com

তা ঠোঁটে করে গাছের ডালে তুলে নিয়ে যায়। একটি বিড়াল শিকায় উঠে দুধ খাওয়ার সময় ইঁদুর শিকার বাঁধন কেটে দিলে বিড়ালটি নিচে পড়ে মারা যায়। ব্যাখ্যা শেষে রাজকন্যা খুশি হয়ে লোকটিকে বকশিশ দিয়ে বিদায় দেয়। সুখী মানুষেরা নিছক কারণে কত বিশাল আয়োজন করে চিত্তের খোরাক জোগায়।

আঁখির উপর পাখির বাসা
জল কে দিল শূলে
চার পাইয়ার[৫৯] উপর
নিপাইয়া[৬০] উঠে
দোপাইয়া তোলে ডালে।
শোন কন্যা বিবরণ
ইঁদুর হইয়া বিড়াল
মারে কী কারণ?[১৫]

৭.

যে যত বেশি অপকর্ম করে তার তত বেশি প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। দুশ্চরিত্র ব্যক্তির পিছনে লোকবলের কমতি নেই। পক্ষান্তরে সজ্জন, সদাচারী ও পরোপকারী ব্যক্তির প্রতি লোকের সমর্থন মিলে না। সৎ লোকের প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। অভাব, অনটন ও দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হয়।

যে করে পাপ
সে হয় আঠারো
পোলার বাপ।
যে করে পুণ্যি
তার ঘর হয় শূন্যি।[১৬]

৮.

একদিন এক সওদাগর এসে নদীর তীরে বটবৃক্ষের নিচে নৌকা ভিড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। সওদাগরের রূপে মোহিত হয়ে অনেক যুবতী নদীর ঘাটে জলের ছলে আসা যাওয়া করে। বাড়িতে গিয়ে কলসির জল মাটিতে ঢেলে আবার জল নিতে আসে। সওদাগর ঘটনা জানতে পেরে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। কারণ তার ঘরে এসব যুবতী অপেক্ষা বেশি সুন্দরী স্ত্রী বর্তমান রয়েছে। যুবতীরা নানাভাবে সওদাগরকে উস্কানি দেয় তবু সে তাদের ছলনায় পা দেয় না। ঘরে যদি ভালবাসা থাকে তাহলে মানুষ বাইরের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে না। সচ্চরিত্র পুরুষ কখনো পর নারীর প্রতি আসক্তি দেখায় না, সে যত রূপযৌবনের অধিকারী হোক না কেন।

আইসাছো গো নন্দন
গায়ে মাখাইয়া চন্দন।
বইসা আছো বটবৃক্ষের তলে
তোমার জন্যে কত যুবতী
বাড়ি ভাসায় জলে।

www.pathagar.com

ভাসাইকো ভাসাইকো বাড়ি
ভাসাই দেইগ্যা জলে
ঘরে আছে চম্পা ফুল
কী করব ধুতুরা ফুলে?
ধুতুরা ফুল উত্তম ফুল
শিবে যারে পুজে
তোমার মতো সওদাগর
বাগুন ফুলে মজে।
বাগুন ফুলও উত্তম ফুল
নিন্দন নাহি যায়
যার ঘরে আছে ভাত
সে কি চিনা[৬১] কাউন[৬২] খায়?[১৭]

৯.

রাজার হালা রানির ভাই,
হাটের অংশ আমিও পাই।

কাহিনি : ভাটি দেশে এক অত্যাচারী ও খেয়ালি রাজা ছিলেন। রাজা শৌর্য-বীর্য আর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে, আশে-পাশের দেশের রাজাদের চেয়ে শীর্ষে ছিলেন। জুলুমবাজ খেয়ালী রাজার অত্যাচারে রাজ্যের সমস্ত প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠল। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা সমালোচনা করতেও সাহস পাচ্ছে না। রাজ্যের সমস্ত প্রজারা ভয় করে কিন্তু রানি রাজার অন্যায় কাজে সমর্থন করেন না। যাকে বলে 'রাজায় করে রাজ্য শাসন, রাজাকে শাসায় রানি'। রানি যেমন রূপসী তেমনি বিদূষী। রূপে-গুণে আচার-আচরণে এবং পরোপকারী হিসেবে, প্রজাদের নয়নের মণি। ন্যায়-নীতির কারণে ক্ষুদ্ধ প্রজাদের মনে মায়ের আসন করে নিয়েছেন। প্রজাদের কাছে রাজা খুবই কঠিন কিন্তু রানির কাছে খুব দূর্বল। তারপরও রাজা-রানির প্রীতির বন্ধন খুবই মধুর।

একদিন রাজা তাঁর রাজ দরবার সম্পন্ন করে, বারান্দায় পায়চারী করছেন। এমন সময় দেখতে পেলেন, এক প্রজা তাঁর পতিত জমির ওপর দিয়ে তরতাজা একটি ষাঁড় হাঁটে নিয়ে যাচ্ছে। রাজার ষাঁড়ের মাংসের ওপর লোভ চাপল। রাজা পাইক-পেয়াদাদেরকে ডেকে বললেন, এই কে আছিস!

পাইক-পেয়াদারা হয়রান হয়ে দৌড়ে কুর্নিশ করে বলল, জো হুকুম জাহপানা।

ওই যে আমার পতিত জমির ওপর দিয়ে একটি ষাঁড় নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষুণি এনে জবাই কর!

জ্বি-হুজুর।

পাইক-পেয়াদাগণ দৌড়ে গিয়ে লোকটিকে বলল, এই যে মিয়া, গরু নিয়া থাম।

কেন, আমার অপরাধ?

তুই রাজার জমির ওপর দিয়ে গরু নিয়েছিস। রাজার হুকুম দিয়েছেন ষাঁড় জবাই করব।

লোকটি অবাক হয়ে বলল, ওই ক্ষেতে কোনো ফসল নাই।

পেয়াদা রেগে বলল, সে কৌফিয়ত আমরা দিব না। পারলে রাজাকে বল।

পাক-পেয়াদারা জোর করে গরুটি রাজার সামনে হাজির করল। লোকটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজার সামনে হাত জোর করে বলল, মহারাজ ওই খেতে কোনো ফসল নাই।

রাজা রেগে বললেন, খেতে যদি ফসল থাকত?

বলে গরুটি জবাই করার হুকুম দিল, গরুটি জবাই কর।

রাজার এই নির্দয় আচরণে লোকটি খুব কষ্ট পেল এবং কেঁদে রওনা হলো।

রাজার ফুল বাগানে বসে রাজরানি প্রিয় দাসীর সঙ্গে গল্প করছেন। লোকটিকে কাঁদতে দেখে রানি দাসীকে বললেন, এই দাসী দেখতো, লোকটি ওভাবে কাঁদছে কেন?

হাঁ তাইতো রানি-মা। আমি এক্ষুণি শুনছি। এই যে ভাই শুনুন।

দাসীর ডাকে লোকটি মাথা নিচু করে বলল, জ্বি কিছু বলবেন?

হ্যাঁ। রানি-মা জিজ্ঞেস করেছেন। আপনি কাঁদছেন কেন?

লোকটি জানত রাজা অত্যাচারী হলেও, রানি-মা খুব প্রজাবৎসল। লোকটি সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বলল, রানি-মা কী বলবো দুঃখের কথা। পতিত জমির ওপর দিয়ে গরু নেয়ার অপরাধে, রাজা মশায় আমার গরুটা জবাই করলেন।

রানি অবাক হয়ে বললেন, তুমি রাজাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছ?

জ্বি রানি-মা। আমি বলেছিলাম জমিতে তো কোনো ফসল ছিল না? তখন রাজামশায় বললেন, ফসল যদি থাকত। এই কথা বলেই আমার একমাত্র সম্বল গরুটা জবাই করে ফেললেন।

শুনে রানির মন বিষণ্নতায় ভরে ওঠল। রানি কতক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তুমি আজ থেকে, রাজার হাঁটের তোলা তুলবে। যদি কেহ তোলা না দিতে চায়, তবুও তুমি জোর করে তুলবে। আর বলবে,

রাজার হালা রানির ভাই,
হাঁটের অংশ আমিও পাই।

সাবধান তুমি ভয় করো না! কোনো প্রকার সমস্য হলে আমাকে জানাবে।

লোকটি ভয় পেয়ে বলল, না রানি-মা। একথা জানলে রাজামশায় আমাকে মেরেই ফেলবেন। আমার গরু গেছে যাক, জানটা ...

রানি আবারো দৃঢ়ভাবে অভয় দিয়ে বললেন, না, তুমি ভয় পেয়ো না। রাজা জিজ্ঞেস করলে আমাকে সাক্ষী মানবে।

রানির হুকুম পেয়ে লোকটি বাজারে গেল। প্রথমে ঝাকা হাঁটে গিয়ে ঝাকা তুলল। তারপর ছালা হাঁটে ছালা, মাছ হাঁটে মাছ, বেগুন, কুমড়া, ধান, চাল, সরিসা, তেল, নুন থেকে শুরু করে সব তোলা তুলতে লাগল। দোকানদাররের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে জোরপূর্বক, রাজার শ্যালক পরিচয় দিয়ে তোলা তুলতে লাগল।

এভাবে অল্পদিনেই মধ্যেই অনেক টাকার মালিক হলো। এখবর রাজার কানে পৌছল। তার শ্যালক বাজার থেকে জোর করে তোলা আদায় করছে। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে

www.pathagar.com

বললেন, আমার তো কোনো শ্যালক নেই। এক্ষুণি মূর্খ-প্রতারকটাকে রাজদরবারে হাজির কর।

রাজার হুকুম পাওয়া মাত্রই, পাইক-পেয়াদারা, লোকটিকে ধরে রাজদরবারে হাজির করল।

রাজা লোকটিকে ধমক দিয়ে বললেন, আমার তো কোনো শালাই নাই। অথচ আমার শ্যালক পরিচয়ে বাজারের তোলা তুলে, ব্যবসায়ীদেও ক্ষতি করছিস। এখন তোর গর্দান নেব।

লোকটি মাথা তুলে বলল, গর্দান নিবার আগে, রানিকে জিজ্ঞেস করুন। আমি তার ভাই কি না?

রাজা দ্রুত রানিকে ডেকে পাঠালেন। রানি দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে স্মরণ করেছেন মহারাজা?

রাজা বললেন, হ্যাঁ ডেকেছি। এই মূর্খটি তোমার ভাই পরিচয় দিয়ে, আমার মান-সম্মান নষ্ট করছে।

রানি হেসে বললেন, রাজারমান-সম্মান জগৎ জুড়ে এত সহজেই কী শেষ হবে?

তা অবশ্য মন্দ বলনি।

তা হলে বলুন মহারাজা। লোকটির গরুটা কে, পতিত জমি থেকে এনে জবাই করে খেয়েছেন?

রানির প্রশ্নে রাজা বললেন, পতিত জমিতে যদি ফসল থাকত?

রানি এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বললেন, যদি আমার একজন ভাই থাকত?

রানির এমন তাৎক্ষণিক পাল্টা জবাবে রাজা, রীতিমতো লজ্জিত হলেন এবং উজিরকে ডেকে বললেন, উজির সাহেব রানির ভাইকে, এক গরুর বদলে শত গরু দিয়ে সম্মানের সঙ্গে বাড়ি পৌঁছে দেন।

রাজার এমন ঘোষণায় লোকটি রাজা ও রানিকে সালাম জানিয়ে, খুশি মনে বাড়ি চলে গেল।[১৮]

১০.

আমার বাড়ির চত্তুরমুড়া, কৃষ্ণমালা ঘুরে,
হরিণনামের প্রেমের মধু, টবর টবর পড়ে।

কাহিনি : বর্ণবৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় একবর্ণের মেয়ে ছেলেকে, অন্যবর্ণের ছেলে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয় না। বিশেষ করে, তথাকথিত উচ্চবর্ণ আর নিম্মবর্ণের মধ্যে, এসব কল্পনাই করা যায় না। এসব কু-প্রথা শত শত বছর পেরিয়ে আসায়, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ। এই নিষ্টুর কু-প্রথার শিকার হয়েছে, কোনো এক গ্রামের দরিদ্র মুসলিম কুলু পরিবারের সন্তান। প্রভাশালী কয়েকজন কৌলিন্যের দাবিদার মুসমানের নির্যাতনে, পুরো কুলু সম্প্রদায় বিতারিত হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে একঘর কুলু নিরূপায় হয়ে থেকে যায়। একমাত্র যুবক ছেলে, বাপ-মাকে নিয়ে ঘানিতে তেল বানায় এবং তা বাজারে বিক্রি করে, কায়ে-কষ্টে সংসার চালায়। কুলুর সুদর্শন

www.pathagar.com

ছেলেটি বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে কিন্তু ছেলের বিয়ের পাত্রী খুঁজে পাচ্ছে না। এলাকায় সমবর্ণের মেয়েতো দূরের কথা, কোনো কুলু সম্প্রদায়ই নেই। সবাই তো অন্য বর্ণের অত্যাচারে এলাকা ত্যাগ করে দূরে চলে গেছে। অনেক দিন এপাড়ায় ওপাড়ায় বিয়ের ঘটক পাঠাচ্ছে কিন্তু একটা কালা-পচা পাত্রীও জুটেনি। শুধু জুটেছে ধিক্কার, গালি-গালাছ সবাই সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে, কেউ কুলুর ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিবে না।

এ পরিস্থিতে কষ্ট পেয়ে কুলুর ছেলে রাগে, দুঃখে-অভিমানে এলাকা ছেড়ে, অজানা এলাকার চলে গেল এবং কুৎসিত-কালো এক দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করতে লাগল। এভাবে দিন যায় বছর যায়, স্বামী-স্ত্রী মিলে সুখে সংসার করতে থাকে। কুলুর ছেলে সারাদিন পরের জমিতে কাজ করে এবং সন্ধ্যেবেলা কিছু টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে।

একদিন রাস্তার পাশের জমিতে আরো অনেক কামলা সঙ্গে নিড়ানির কাজ করছিল। ওই রাস্তা দিয়ে কুলুর ছেলের দেশের এক প্রতিবেশী যাচ্ছিল। হঠাৎ কুলুর ছেলেকে দেখে চিনে, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এই হাশেম কিবা আছস? অনেকদিন দেশ ছাড়ছস, দেশে যাসনা ক্যান?

হাশেম তার এলাকার লোকটিকেই চিনেও না চেনার ভাব দেখাতে লাগল। কিন্তু নাছোড়বান্দা লোকটি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করে বলল, বিয়ে টিয়ে করছ নাকি? দেশে তো তোমারে কেউ মাইয়াই দিল না।

এমন রসিকতার কথা হাশেম কোনো উত্তর দিল না। বাধ্য হয়ে পাশের এক কামলা জিজ্ঞেস করল, এই যে ভাই, মাজম মিয়ারে আপনে হাশেম কইতাছেন ক্যান?

লোকটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলল– ওর নাম তো হাশেমই।

ওরে আপনে চিনুন?

লোক দৃঢ়তা প্রকাশ করে বলল, চিনুম না মানে। নজু কুলুর পোলা হাশেম কুলুরে কেডায় না চিনে।

জমির সমস্ত লোকজন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তাইলে ও শালায় কুলু?

আরে হ, শালায় আমাগো গেরামেই থাকত

এ কথা শুনে সমস্ত লোক উত্তেজিত হয়ে উঠল। একজন হাশেমের গলায় গামছা পেছিয়ে ধরে বলল, এই শালা কুলুর পোলা কুলু। মণ্ডল পরিচয়ে আমাগো জাতের মাইয়া বিয়া কইরা, খুব সুখ পাইবার লাগছ? ধর শালারে, মার শালারে।

যেই কথা সেই কাজ, লোকজন হাশেমকে পিঠমোড়া দিযে বেঁধে, গ্রামের মাতব্বরের কাছে হাজির করল। ক্ষিপ্ত লোকজন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বলতে লাগল, মাতব্বর সাব, এই কুলু আমাগো জাইত মারছে। ওরে কাইটা টুকরা টুকরা কইরা ন্যায় বিচার করুন।

মাতাব্বর বাঁধভাঙ্গা জনতাকে ধমক দিয়ে বলল, তোমরা চুপ কর। বিচার যখন চাইছ এর উচিৎ বিচার করমু। এই কুলুর পোলা কুলু, ক্যান মিছা কথা কইয়া কুলিন ঘরের মাইয়্যা বিয়া করলি?

www.pathagar.com

হাশেম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাত করে বলল, মাতব্বর সাব, আমি তো বিয়ার আগে সত্য পরিচয়ই দিছিলাম।

মাতব্বর সাহেব বললেন, কী পরিচয় দিছিলি আবার ?

তখন কুলুর ছেলে বলল,

'আমার বাড়ির চত্তুরমুড়া, কৃষ্ণমালা ঘুরে,
হরিণনামের প্রেমের মধু, টবর টবর পড়ে।'

মাতব্বর সাহেব কিছুসময় চুপ থেকে বললেন, এই মিয়ারা, হাশেম তো এই পরিচয়ই দিয়াছিল। কী মিয়ারা, কয় নাই?

উপস্থিত সবাই এক সঙ্গে বলল, হ কইছে। তয় মুনে করছি, খুব ভালা কথা কইছে, কুলুতো বুঝি নাই।

মাতব্বর সাহেব দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বললেন, নিজের ভুল নিজে বুঝে, পরের কাছে বিচার চাওয়া বোকামি।

জনতার মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠল, তাইলে এহন কী করবেন মাতব্বর সাব?

নিজে ঠকলে বাপের কাছেও কওন যায় না। তাছাড়া হাশিম কুলু হলেও একজন ভালো মানুষ। পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষকে বিয়ে করেছে। এটা দোষের কিছু নয়। যাও হাশেম তুমি সুখে সংসার কর।

মাতব্বরের রায়ে গ্রামের সমস্ত লোক শান্ত হলো এবং হাশেম স্ত্রীকে নিয়ে সুখে সংসার করতে লাগল।[১৯]

১১.

সঙ্গীর মতো সঙ্গী ধরলে, প্রত্যেক কথায় রং,
কু-সঙ্গীর মতো সঙ্গী ধরলে, গলায় ঢং ঢং।

কাহিনি : এক প্রভাবশালী জমিদার দীর্ঘদিন পর তাঁর দূরদেশি বন্ধুর বাড়িতে রওনা হলেন। রওনা হবার আগে সবচেয়ে বেশি দামের কেনা, তেজি ঘোড়াটি বেছে নিলেন। দূর-দূরান্তে যাবায় সময় জমিদার সাহেব এ ঘোড়াটিই ব্যবহার করে থাকেন। ঘোড়ার পিঠে বসে দীর্ঘ পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করে, জমিদার খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। নয়ার হাটে বংশাই নদীর কিনায় বট গাছের ছায়ায় ঘোড়া থামিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। বট গাছের ছায়ায় এক বিশাল বলদ শুয়ে, আয়েশে জাবর কাটছিল। জমিদারের ঘোড়াটি হাটতে হাটতে গিয়ে বলদের পাশে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

জমিদার দোকানে বসে জলপান করে, এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। জমিদারের ঘোড়ায় বলদটির সু-স্বাস্থ্য দেখে জিজ্ঞেস করল, এই বলদ ভাই, তুমি এত সুখি হলে কেমনে করে?

বলদ আরো জোরে আয়েশে জাবর কাটতে কাটতে বলল, ঘোড়া ভাই ওইসব শুনে তোমার কি লাভ?

বলদ ভাই আমারও যে তোমার মতো সুখি হতে ইচ্ছে করছে।

সত্য বলছ, ঘোড়া ভাই?

হ্যাঁ বলদ ভাই সত্যি বলছি।

www.pathagar.com

আমার পরামর্শ মানবে? প্রথমে একটু কষ্ট হবে। তারপরই হবে রমরমা সুখ।

খুশিতে ঘোড়া বলদের গা চেটে আদর করে বলল, বলদ ভাই তুমি আমার ধর্মের ভাই। দাওনা বুদ্ধিটা শিখিয়ে।

বলদ নিজেও ঘোড়ার গা চেটে আদর করে বলল, ভাই যখন ডেকেছ, তবে কান পেতে শোন।

ঘোড়া আগ্রহে কান বাড়িয়ে দিলে বলদ বলল, ভাই তোমাকে আর তেজ দেখিয়ে দৌড়ান যাবে না। আমার মতোন অলস হও। দুদিন পরই দেখবে কত সুখ ভীড় করেছে।

ঘোড়া ভেবে বলল, তাহলে জমিদার আমাকে যে চাবুক মারবে?

আরে ভাই চিরদিনের সুখের জন্য, দু চার ঘা চাবুক তো খেতেই হবে। তারপরই দেখবে কেমন গদগদ সুখ।

ঘোড়া খুশিতে আটখানা হয়ে বলল, সত্যি বলছ তো আইলসা বলদ ভাই।

আরে ঘোড়া ভাই, আমি নিজেই তো তার প্রমাণ। প্রথমে গৃহস্ত আমাকে খুব পেটাত। এখন আমার কাছেই আসে না, খাই দাই আর আয়েসে ঘুমাই।

খুশিতে ঘোড়া বলদের গা চেটে আদর করে বলল, বলদ ভাই সত্যি তুমি মহাসুখি। আমি তোমার সুখি হওয়ার পরামর্শই মেনে নিলাম।

বলে বলদের গা ঘেষে ঘোড়াটি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

জলপান শেষে জমিদার ঘোড়ার লাগাম ধরে টান দিলেন কিন্তু ঘোড়া উঠল না। একবার দুবার এভাবে বার বার টেনেও উঠাতে পারলেন না। জমিদার অবাক হয়ে ভাবলেন, যে ঘোড়া আমাকে দাঁড়াতে দেখেই উঠে দাঁড়ায়। আজ টানলেও সে গোড়া উঠছে না, কারণ কি? তাছাড়া গরু ঘোড়ার এমন শখ্যতা তো কখনো দেখিনি?

জমিদার বাধ্য হয়েই দু ঘা চাবুক লাগলেন তবুও ঘোড়া উঠল না। পুনরায় রেগে বেশ ক ঘা লাগালেন। এবার মার খেয়ে ঘোড়া উঠে দাঁড়াল। ঘোড়ার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বলদ সব পর্যবেক্ষণ করে বলল, কেন রে ঘোড়া ভাই, এক্ষণি উঠলি যে?

ঘোড়ায় চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলল, বলদ ভাই জীবনে যে কুলায় না।

আর একটু সহ্য কর। তার পরই তো মহাসুখ।

ও সুখ কী আমার কপালে সইবে?

সইতে একটু সময় লাগবে, তার পরই গা সওয়া হয়ে যাবে।

জমিদার ঘোড়ায় উঠে বসলেন কিন্তু ঘোড়া এগুচ্ছে না বরং পেছনে দিকে পেছাচ্ছে। বাধ্য হয়ে জমিদার সাহেব বেশ ক ঘা চাবুক চালালেন। এই চরম মূহুর্তে বদল তার শিষ্যকে অভয় দিল–ঘোড়া ভাই ধৈর্য ধর।

ঘোড়ার অভয় পেয়ে ঘোড়া তার সিদ্ধান্তে অটুট রইল। বাধ্য হয়ে জমিদার ঘোড়ার পিঠে থেকে নেমে ভাবতে লাগলেন, যে ঘোড়া হাজার ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ে প্রথম হয়। অথচ এখন সে ঘোড়া সম্মুখে এগুচ্ছে না। এমতাবস্থায় বন্ধুর বাড়িতো দূরের কথা, নিজের বাড়ি ফেরাও হবে না।

www.pathagar.com

বটগাছের শেকড়ে বসে জমিদার ভাবতে লাগলেন। ভাবনার মাঝে গরু ও ঘোড়ার সখ্যতা তার কাছে সন্দেহজনক ধরা পড়ল। পাশের দোকানদারকে ডেকে বললেন, দোকানদার ভাই, এই সতেজ বলদটি কার?

দোকানদার এগিয়ে এসে বলল, ওটা আমির মণ্ডলের আইলস্যা বলদ। যখন যেখানে মন চায়, খায় আর ঘুমায়।

জমিদার বললেন, কেন হালচাষ করে না?

হালে গেলে তো।

জমিদারের মাথায় টনক পড়ল, নিশ্চয়ই আমার তেজি ঘোড়াকে অলস বলদে কু-বুদ্ধি দিয়েছে।

জমিদার ভেবে বললেন, ন্যায্য মূল্য দিলে বলদটি বিক্রি করবেন?

কেন করবেন না।

যদি কিনে দিতে পারেন। আমি ন্যায্য মূল্য দিয়ে বলদটি জবাই করব। মাংস আপনারাই খাবেন, শুধু আমাকে সামনের দুটি পা দেবেন।

দোকানদার খুশি হয়ে বলল, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। এক্ষুণি মণ্ডলকে হাজির করছি।

যেই কথা সেই কাজ। বলদের মালিক মণ্ডলকে হাজির করলেন। মণ্ডল এগিয়ে এসে উপযাজক হয়ে বললেন, জমিদার সাব শুনলাম বলদ কিনবাইন।

জমিদার আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, জ্বি মণ্ডল সাহেব বলদের দাম কত?

বলদ আইলস্যা অইলেও গা গতরে ভালা। পাঁচ শ টেহা দিয়েন।

জমিদার খুশি হয়ে বললেন, ভাবছি আরো বেশি চাবেন, এই নিন টাকা।

জমিদার সাহেব মণ্ডলের হাতে টাকা দিয়ে বললেন, বলদটি আপনার লোক দিয়ে জবাই করে ফেলেন।

জমিদারের নির্দেশ পাওয়ার পর বলদটি জবাই করে ফেলল। এ নির্মম দৃশ্য দেখার জন্য ঘোড়াটিকে একদম সামনে রাখা হলো। সমস্ত মাংস পাড়া-পড়শিদের মধ্যে বিতরণ করে, ঘোড়ার গলায় বলদের পা দুটি ঝুলিয়ে দিয়ে জমিদার সওয়ার হলেন। প্রচণ্ড জোরে দু ঘা চাবুক চালাতেই, ঘোড়া ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে চলল। চলার পথে অন্য ঘোড়ায় এ অবস্থা দেখে জমিদারের ঘোড়াকে জিজ্ঞেস করল, ঘোড়া ভাই, তোমার এই দশা ক্যান?

তখন জমিদারের ঘোড়া চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলল :

সঙ্গীর মতো সঙ্গী ধরলে, প্রত্যেক কথায় রং,
কু-সঙ্গীর মতো সঙ্গী ধরলে, গলায় ঢং ঢং।[২০]

১২.

ভাতারের অভাবে ভাতার ধরলাম
ভাতার অইল দরবাইরা

www.pathagar.com

কলার দুঃখে কলা কিনলাম
কলা অইল কেরকেইরা

কাহিনি : এক বজ্জাত মহিলা সাতবার তালাকপ্রাপ্ত হয়ে বাপের বাড়ি চলে এলো। তার বাজে আচরণে পাড়া-পড়শি বিরক্ত হয়ে ওঠল। ভাই ভাবীরাও অপয়াকে সহজভাবে মেনে নিতে পারল না। ওদিকে বোনকে ফেলে দেয়াও যায় না। বাধ্য হয়ে বাড়ির পাশে একটা ছনের ঘর তুলে পৃথক করে দিল। বজ্জাত মহিলার দেহভরা রূপ-যৌবন, পেটভরা খিদে। ভাইদের দেয়া সামান্য সম্পদে কতক্ষণ চলে? বাধ্য হয়েই তার দুটি প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে, পাড়ার এক মাতাব্বরের সঙ্গে পরকীয়ায় মেতে ওঠল। এক সময় প্রেমের মাত্রা এতোই বেড়ে গেলে মহিলা মাতাব্বরকে বিয়ে করতে উন্মাদ হয়ে ওঠল। সাত গ্রামের মাতাব্বরকে তো অত উতালা হলে চলে না। তার ঘরে স্ত্রী সন্তান আছে অথচ মহিলাটি প্রতিদিন মাতাব্বরের অপেক্ষায় সেজেগুজে বসে থাকে। মাতাব্বর আসতে দেরি হলে মহিলার খুব কষ্ট হয়, রান্না-বান্নার কথাও ভুলে যায়। মহিলার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টির খবর প্রকাশ হওয়ায়, পরিবারের লোকেরা মাতাব্বরকে রীতিমতো চাপ দিল। বাধ্য হয়ে মাতাব্বর বিচার-সালিশের অজুহাতে, বেশ কদিন মহিলার কাছে আসে না। মাতব্বর না আসায় মহিলার চুলায় আগুন জ্বলেনি। প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালায় মহিলার পেটে আগুন জ্বলছে। এমন সময় এক কলা বিক্রেতা, কলা নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। কলা বিক্রেতাকে দেখে মহিলা ডেকে বলল, এই যে কলাওয়ালা ভাই, কলা কিবা অইব?

বেপারী হেসে বলল, বুজি, কলা খুব ভালা অইব।

মহিলা দুই হালি কলা কিনে, মনে মনে ভাবল, মাতাব্বর এলে একসঙ্গে বসে কলা খাওয়া যাবে।

বেপারী চলে গেলে খোসা ছাড়িয়ে একটা কলা মুখে দিল এবং বিচিতে মুখটা ভরে গেল। মহিলার মন রাগে-দুঃখে, অভিমানে ভরে ওঠল এবং মুখে মুখে আওড়ালো

ভাতারের দুঃখে ভাতার ধরলাম
ভাতার অইল দরবাইরা
কলার দুঃখে কলা কিনলাম
কলা অইল কেরকেইরা।[২১]

১৩.

রাজা হলো যেমন তেমন
উজির হলো তেমনি
তাঁত গাঁড়াতে ঘোড়া পড়ে
ঘাড় করেছে এমনি।

কাহিনি : এক প্রতাপশালী রাজা রানিকে নিয়ে, ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা উপভোগে করছেন। সব ঘোড়াকে পেছনে ফেলে যে ঘোড়াটি প্রথম হলো, রাজা উজিরকে বললেন, উজির সাহেব। ওই তেজি ঘোড়াটি আমার চাই।

উজির সাহেব ব্যস্ত হয়ে ওঠে গেলেন। হাজার টাকার বিনিময়ে ঘোড়াটি কিনে দিয়ে বললেন, জাহাপনা তেজি ঘোড়াটি হাজার টাকার বিনিময়ে কিনেছি।

www.pathagar.com

রাজা ঘোড়ায় চড়তে চড়তে বললেন, বেশ করেছেন উজির সাহেব। মনে রাখবেন, প্রজার শখের তোলা আশি টাকা হলেও, রাজার শখের তোলা হাজার টাকা।

জ্বি হুজুর আপনি যথার্থই বলেছেন।

উজির কতক্ষণ চুপ থেকে বললেন, হুজুর তেজি ঘোড়ার জন্য, একজন চাকর নিয়োগ করতে হবে না?

রাজা বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন, তার প্রয়োজন কী? রাজার শখের ঘোড়া, যেখানে ইচ্ছে যাবে, খাবে, এবং ঘুমাবে। আমি শুধু শখ করে মাঝে-মধ্যে দৌড়াব।

উজির লজ্জিত হয়ে কুর্নিশ করে বললেন, হুজুর অতি উত্তম বলেছেন।

রাজা হেসে বললেন, উজির সাহেব আপনি ঘোষণা করে দিন, রাজার ঘোড়া ইচ্ছেমতো যাবে, খাবে এবং ঘুমাবে। যদি কেউ এর মৃত্যু সংবাদও দেয়, তবে তার গর্দান যাবে।

উজির মাথানত করে বেরিয়ে গিয়ে, রাজার এ ফরমান সবাইকে জানিয়ে দিলেন।

এভাবে বেশ কিছুদিন গত হলো। রাজার ঘোড়া নিয়ে প্রজাদের মাঝে প্রচণ্ড শঙ্কা। হঠাৎ একদিন রাজার ঘোড়াটি হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজা-খোঁজির পরও কেউ ঘোড়াটি পাচ্ছে না। এ সংবাদে রাজার মাথা গরম গরম হয়ে গেল। রাজা মনে মনে ভাবলেন, আমার হাজার টাকা তোলার শখের ঘোড়া, কোথায় গেল?

রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোষণা দিলেন, উজির সাহেব যেখানেই পান, আমার হাজার টাকার শখের ঘোড়া উদ্ধার করুন। তা না হলে কাউকে আমি ক্ষমা করব না।

রাজার এ ঘোষণায় উজির রাজ্যময় লোক পাঠিয়ে ঘোড়াটিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন কিন্তু ঘোড়ার সন্ধান মিলল না।

রাজার পাশের বাড়ির এক তাঁতি পায়খানা করতে গিয়ে দেখল তাঁত গাঁড়ায় পরে রাজার ঘোড়া মরে আছে। তাঁতির ভয় পেয়ে গলা শুকিয়ে গেল। তাঁতি কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এলে। তাঁতিনী স্বামী মুখ শুকনা দেখে জিজ্ঞেস করল, তাঁতি কি হয়েছে? তুমি কাঁন্দ ক্যান?

তাঁতি সন্দেহের চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, কাঁন্দি কি সুখে? বউ আমাগো যে বাঁচন নাই।

বাঁচন নাই মাইনে? খুইলা কও কি হইছে?

তাঁতিনীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখে তাঁতি চুপিচুপি বলল, আমাগ তাঁত গাঁড়ায় রাজার ঘোড়া পড়ে মরছে।

স্বামির কথায় তাঁতিনী হেসে বলল, ওহ তুমি এই জন্য ভাবছ?

তাঁতি রেগে বলল, আমি কাঁন্দি মরার ডরে, তুমি হাস সুখের হাসি।

মরলে মরছে রাজার ঘোড়া, আমরা কাঁনমু ক্যান?

আরে মাগী, রাজার ঘোড়ার মরার খবর দিলেই আমাগ গর্দান যাবে।

তাঁতিনী হেসে বলল, শুন আমি একটা কথা শিখাইয়া দেই, তাতে কোনো বিপদই অইব না।

www.pathagar.com

সত্যি বলছো তো?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাইলে শুন।

তাঁতি কান বাড়াল তাতিনী একটি শ্লোক শিখিয়ে দিল। অমনি তাঁতি হেসে রাজ বাড়িতে রওনা হলো।

রাজা উজির ঘোড়া খুঁজে ব্যর্থ হয়ে, মলিন মুখে বসে আছে। তাঁতি গলায় কাপড় নিয়ে, জোড়হাত করে সামনে এগুলে রাজা বললেন, তাঁতি তুমি কিছু বলবে?

জ্বে রাজা মশায়। ভয়ে না নির্ভয়ে কইব?

রাজা অভয় দিয়ে বললেন– তাঁতি তোমার কথা নির্ভয়ে বল।

তাঁতি ছড়া কেটে বলল,

রাজা হলো যেমন তেমন
উজির হলো তেমনি
তাঁতগাঁড়াতে ঘোড়া পড়ে
ঘার করেছে এমনি।

তাঁতি ছড়া শুনে রাজা দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, উজির সাহেব দেখেন তো আমার হাজার টাকায় কেনা শখের ঘোড়ার কী খবর?

অমনি দলে দলে লোকজন দৌড়ে গিয়ে দেখল। রাজার শখের ঘোড়া মরে ঘার বাঁকা করে আছে।

এ খবরে রাজার বিচারে তাতির কোনো ক্ষতি হলো না। কারণ তাঁতি তো রাজারার ঘোড়ার মৃত্যু সংবাদ দেয়নি, শুধু বলেছে ঘার করেছে এমনি।[২২]

১৪.

আকাইলা চাইলের ভাত,
খাইয়া যারে জোলার জাত,
ঘাটে আইছে রমনী দত্ত,
কইয়া গেছে তোর জাতের তথ্য।

কাহিনি : জোলা ছেলে আবুলের বয়স বেড়েছে, কিন্তু বিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না। ছোটজাত বলে সবাই তাকে ঘৃণা করে। অনেক চেষ্টা শেষে গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল। সেখানে বর্ণ পরিচয় গোপন রেখে, এক গৃহস্থ মেয়েকে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে রইল। মেয়েটি যতনা রূপসী তার চেয়ে বেশি গুণবতী। কিন্তু জোলার গুণে মন বসে না, কথায়-কথায়, ওঠতে-বসতে, গালি-গালাছ ও মার-পিট করে। মেয়েটি স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। ইদানীং স্ত্রীর ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। পরিস্থিতি এমনই আকার ধারণ করছে, হাতের কাছে যখন যা পায়, তা দিয়েই হামলা চালায়। মারতে মারতে অনেক সময় অজ্ঞান করে ফেলে। স্ত্রী তার স্বামীকে স্বাভাবিক হতে অনেক প্রার্থনা করেছে। শেষ পর্যন্ত তাবিজ-কবজ নিয়েছে কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। একদিন স্বামীর হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে কলসি নিয়ে, নদীর ঘাটে গেল। ঘাটে দেখল তার স্বামী এক সওদাগরের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলছে। স্ত্রীকে নদীর ঘাটে দেখেই স্বামী দ্রুত

www.pathagar.com

কেটে পড়ল। স্ত্রী কাঁদছে আর কলসিতে জল ভরছে। এমন সময় সওদাগার কাছে এসে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, বোন তুমি কাঁদছ কেন?

মেয়েটি কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে বলল, কান্দি আমার কপালের দুঃখে।

বোন তুমি খুলেই বল না দেখি, তোমাকে কোনো উপকার করতে পারি কি না?

আমার উপকার করতে কেউ পারে নাই, আপনে পারবাইন?

বলেই দেখ না, করতেও তো পারি।

মেয়েটি আঁচলে মুখ ডেকে বলল– ওই যে মানুষটার লগে কথা কইলেন, ওনিই আমার স্বামী। আমারে বিনা দোষে সারাক্ষণ মাইর-ধোর করে।

সওদাগর প্রশ্ন করলেন, তুমি স্বামীর কথা শুন না?

ক্যান শুনব না? ওর খুশির লাইগ্যা কত কিছু করলাম কিন্তু কামের কাম কিচ্ছু হইল না।

বলেই মেয়েটি অঝোরে কেঁদে ওঠল। সওদাগর কাছে গিয়ে অনুশোচনা জানিয়ে বললেন, ওই অমানুষের কাছে, তোমায় কে বিয়ে দিয়েছে?

মেয়েটি মাথানত করে বলল– আমি এতিম, সংসারে কেউ নাই।

সওদাগর মুখে চুক চুক শব্দ করে বললেন, আমি একটি শ্লোক শিখিয়ে দেব। মারতে এলে বলবে, তখন আর মারবে না।

সওদাগর মেয়েটিকে শ্লোকটি শিখিয়ে দিলেন।

মেয়েটি সওদাগরকে ধন্যবাদ জানিয়ে, শ্লোকটি মুখস্থ করতে করতে বাড়িতে গেল। বাড়ি এসে স্বামীর জন্য ভাত বাড়ছে, এমন সময় হঠাৎ স্বামী রেগে বলল, এই মাগী পানি আনতে কতক্ষণ লাগে? ভাত খামু না?

তখন সুযোগ মতো স্ত্রী বলল,

আকাইলা চাইলের ভাত, খাইয়া যারে জোলার জাত,
ঘাটে আইছে রমনী দত্ত, কইয়া গেছে তোর জাতের তথ্য।

শ্লোক শুনে মেয়েটির দরজাল স্বামী একদম চুপসে গেল এবং মনে মনে ভাবল, মাগী তো আমার জাতের খবর জাইনা গেছে।

এরপর থেকে আর কোনোদিন, স্ত্রীর ওপর নির্যতন করে নাই।[২৩]

১৫.

আমি বুঝি না, বুঝে কে?
বড় কৈডা, আমারে দে।
তোমারে দিম না, দিমু কারে?
হাত দিবার পাই না, ততার ডরে।

কাহিনি : এক দরিদ্র জেলে মাছ ধরে বাড়িতে এলো। তার সুন্দরী স্ত্রী দৌড়ে এসে খালই খুলে, কিছু মাছের সঙ্গে বড় একটা কৈ মাছ দেখল। স্ত্রী আনন্দে ডগমগ হয়ে বলল, কৈ মাছটা তো বেশ বড়।

জেলে হেসে বলল, তোমার নামে জাল ফেলাতেই এই মাছটা ওইঠা পড়ল। সত্যি তুমি আমার লক্ষ্মী বউ।

www.pathagar.com

সত্যি কইছ তো?

কইছি মানে? এক সত্যি, দুই সত্যি, তিন সত্যি।

স্ত্রী বাঁধা দিয়ে বলল, না গো আর সত্যি কইতে হইব না। আমি বিশ্বাস করছি।

জেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, তাইলে তুমি রান্না কর, আমি বাজার কইরা আহি।

যাও দেরি কইর না। রাইত হবার আগেই ফিরা আইও।

আইচ্ছা।

বলেই জেলে দ্রুতপায়ে বাজারে চলে গেল।

জেলে বাজারে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই, মাতব্বরের যুবক ছেলে, ভাবী, ভাবী।

বলে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল। জেলেনি হাসি মুখে নাগরের হাত ধরে কাছে টেনে বলল, ওরে আমার গুণের দেওরা, এতক্ষণে আমার কথা মুনে পড়ল? আমি ওদিকে যৌবন জ্বালায় মরি।

মাতব্বরের পুত্র হেসে জেলেনিকে জড়িয়ে ধরে বলল, লক্ষ্মী ভাবী কোনো চিন্তা করো না। আমি তোমার সব জ্বালা মিঠামু।

জেলেনি সরে গিয়ে বলল, মন চাইলেই সব অয় না সুযোগ-সুবিধাও নাগে।

একবারে খালিবাড়ি, তার পরও বলছ সুযোগ-সুবিধা।

আরে মর্দা বও, আমি মাছ কাইটা রান্না-বান্না করি। তারপর তোমার পালা।

মাতব্বরের পুত্র হেসে বলল, আরে ভাবী। খালি আমারই পালা, তোমার না?

আরে দেওরা দুইজনেরই। আগে কামডা শেষ করি।

মাতব্বরের পুত্র হেসে ভাবীর কাছে বসল। জেলেনি মাছ কাটতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই রান্না শুরু করল। মাতব্বর পুত্র কাছে বসে বলল, আচ্ছা ভাবী, তুমি আমারে কতটা ভালোবাস?

জেলেনি হেসে বলল, পৃথিবীর সব চাইতে বেশি।

সত্য কইলা তো?

হ সত্যি।

এই বড় কৈ মাছটা যদি, আজ আমারে খাওয়াইতে পার। তবেই প্রমাণ পামু।

জেলেনি হেসে বলল, এ আর কী কঠিন কাম।

ভাবী কাজেই তার প্রমাণ।

জেলেনি বলল, তাইলে এহন তুমি চইলা যাও। রাইতে জেলে ঘুমাইলে আইস।

ঠিক আছে বলেই নাগর, জেলেনির মুখে চুমু খেয়ে বাড়ি চলে গেল।

জেলে বাজার শেষে বাড়ি ফিরে, হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসল। স্ত্রী সামনে বসে ফুলতোলা হাতপাখায় বাতাস করতে করতে, সংসারের এটা-সেটা আলাপ শুরু করল। বড় কৈ মাছটি একপাশে রেখে, অন্য মাছ জেলের পাতে তুলে দিল। জেলের মাছ ধরার সময়ই কৈ মাছটির ওপর লোভ বসেছিল। অথচ স্ত্রী তাকে সে মাছটি দিচ্ছে না। স্ত্রী স্বামীর মতলব বুঝতে পেরেও অহেতুক সংসারের জটিল বিষয় তুলল। এটা তুমি আন না, ওটা তুমি বুঝ না, তুমি লোকটা মোটেই ভালো না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

স্ত্রীর কথা ধরে জেলে রেগে বলল–

আমি বুঝি না, বুঝে কে?
বড় কৈডা, আমারে দে।

স্ত্রী তখন হাতনাড়া করে বলল–

তোমারে দিমু না, দিমু কারে?
হাত দিবার পাই না, ততার ডরে।

স্বামী তখন রেগে বলল, হাত পুড়লে ওষুধ আইনা দিমু।

স্ত্রী আর কোনো উপায় না দেখে, স্বামীর পাতে কৈ মাছটা তুলে দিল। জেলে রসনা তৃপ্তীসহকারে মাছ ভাত খেতে খেতে বলল, বউ তোমার স্বাদের রান্নার তুলনা হয় না।

জেলের স্ত্রী মনে মনে অনেক কষ্ট পেলেও সংসারের শান্তি রক্ষার স্বার্থে মুশকি হাসি হাসল।[২৪]

১৬.

মক্কর জানে সক্কর ঝি,
আমি মক্করের জানি কি?
মক্কর জানে আমার জায়,
তার ঘ্যাগের উপর খারইলে,
ধলাপাড়ার হাঁট দেহা যায়।

কাহিনি : চৈতারবাইদ গ্রামের কদ্দুস মাতব্বরের ছেলে নওশের আলী কুড়ি বছর বয়সী টগবগে যুবক। সংসারের কোনো কাজ করে না। সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মক্কর সংগ্রহ করে। তার মহান উদ্দেশ্য, একদিন মহামূল্যমান লোকায়িত লোকসাহিত্য উদ্ধার করে, জাতির সম্মুখে তুলে ধরবে। নওশের আলীর স্বভাব-চরিত্র রীতিমতো ভালো। একজন ভালো মানুষ হিসেবে তাঁর সব মহলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এভাবে মক্কর সংগ্রহ করতে করতে ভরদুপুরে এক পরমাসুন্দরী ভাবীর বাড়িতে হাজির হলো। যাকে পাড়ার সবাই মক্কর ভাবী হিসেবে জানে ও ডাকে। মক্কর ভাবী নওশেরকে আদর করে ঘরে বসিয়ে বলল, এই যে গুণের দেওর নওশের আলী, এই ভরদুপুরে খাতা কলম নিয়ে কি পণ্ডিতি খুঁজতেছ?

নওশের আলী হাসিমুখে বলল, ভাবী আমার কাজ হলো মক্কর সংগ্রহ করা।

মক্কর ভাবী অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, তুমি মক্কর দিয়া কি করবা?

ভাবী এই লোকায়িত লোকসাহিত্য মহামূল্যমান জাতীয় সম্পদ। এসব একদিন হারিয়ে যাবে। তাই সংগ্রহ করে বই আকারে বের করার চেষ্টা করছি।

মক্কর ভাবী অনেকটা বিরক্ত হয়ে বলল, এসব নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন?

নওশের আলীর এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়। তবুও হাসিমুখে বলল, একজন সচেতন মানুষ হিসেবে অমূল্য সাহিত্য সম্পদ উদ্ধারের প্রয়োজন মনে করছি।

নওশের আলীর কথায় মক্কর ভাবী মোটেই খুশি হলো না বরং বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, এ দায়িত্ব তোমার না পালন করলেও চলব।

কিন্তু ভাবী কাউকে না কাউকে তো এ গুরু দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

তা জানি না। তোমার এইসব পচা গপ্প কেডা শুনব কেডাই বা পড়ব?

www.pathagar.com

নওশের আলী সবিনয়ে প্রতিবাদ করে বলল, না না ভাবী। এসব সত্যি মূল্যমান।

ভাবি বিরক্ত হয়ে বলল, আরে মিয়া ওইসব ভীমরতি মাথায় থাইক্যা জাইরা তাড়াতাড়ি বিয়া কইরা বুড়া মাওডারে একটু শান্তি দেও।

মক্কর ভাবীর অযাচিত উপদেশে নওশের আলী কোনো বিরক্তি প্রকাশ করল না বরং অকৃত্রিম হাসি হেসে বলল, বিয়ে তো করবই, এনিয়ে ভাবছ কেন?

কখন করবে? চাচী আম্মা তো তোমার বিয়ার কথাই কয়।

আমার মায়ের শুধু ওই এক চিন্তা বিয়ে আর বিয়ে।

আরে দেওরা ওটাই সঠিক চিন্তা, 'হাইজ্জা গেলে বাতি আর শেষকালে বিয়া। করলেও যা না করলেও তা'।

নওশের ভাবীর আগ্রহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলল, ভাবী এই বইটা শেষ করেই বিয়ে করব।

সত্যি কইছ তো?

একদম সত্যি। এখন একটা মক্কর বল।

ভাবী হেসে বলল, ওসব মক্কর তো সব সময় মনে থাকে না।

আপাতত একটা বল।

মক্কর ভাবী মনে মনে কি যেন ভেবে বলল, তুমি চক্কিতে একটু বহ, আমি উঠানটা একটু পরিষ্কার করে...

মাতব্বর পুত্র মনে মনে রীতিমত খুশি হয়ে চকিতে বসল। ভাবী উঠান ঝাড়ু দিতে শুরু করল। যে টুকুন সময়ে উঠান ঝাড়ু শেষ করার কথা। তার চেয়ে অনেক পরে ঘরে এসে মুচকি হেসে বলল, দেওরা উঠান ঝাড়ু দিতেই সুন্দর একটা মক্কর মনে পড়ল। এমন মক্কর তুমি জিন্দিগিতেও শুন নাই।

নওশের আলী খুব খুশি হয়ে বলল, ঠিক আছে ভাবী, এখন শুরু করুন লিখে ফেলি।

ভাবী হাতের একাজ ওকাজ করতে করতে বলল, শুন দেওরা এসব মক্কর-সক্কর একটু ঠান-ঠাওরে কইতে হয়। তুমি আর একটু বহ। তোমার ভাইয়ের রান্নাটা শেষ করে লই। জানই তো তোমার ভাইটা যে রাগী ও গোয়ার। মানুষ খুন করতেও হাত কাঁপে না।

নওশের অনেকটা অবাক হয়ে বলল, ভাবী তুমি রান্না-বান্না শেষ করে বলবে?

আরে বেশি সময় লাগবে না। নয়লে পিঠের দাম থাকবে না। আল্লায় কেন যে খুইন্যা জামাইর পাল্লায় ফালাইছাল।

খুনির কথা মনে হয়ে মতব্বর পুত্র ভয়ে শিউরে উঠল। সবাই জানে মক্কর ভাবীর স্বামী একটা দুর্ধর্ষ খুনি। তার সামনে এলাকার কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। দেখলে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা দিয়ে লোকজন ঘুরে যায়। নওশের আলী এ বাড়িতে খুব কমই আসে। মাতব্বর পুত্র তো দূরের কথা তার বাবাও এই খুনিকে সমীহ করে। তবুও মক্করের প্রয়োজনে এ বাড়িতে এসেছে। মাতব্বর পুত্র শান্তভাবে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে ভাবী আমি বসছি।

www.pathagar.com

নওশের আলীকে বসিয়ে ভাবী রান্নায় চলে গেল এবং মাতব্বর পুত্র অপেক্ষার প্রহর গুণতে লাগল।

অপেক্ষা মৃত্যুর সামিল। মনে মনে ব্যাপকভাবে খুনের ভয় কাজ করছে। হঠাৎ মক্কর ভাবী ঘরে এসে বলল, এই যে দেওরা, রান্না-বান্না শেষ করছি। তোমার নিগা খাবার নিয়া আহি।

না, না ভাবি, আমি খাব না।

আরে খাও। তুমি তো বেশি আহ না। আমার কি আদর-যত্নের ইচ্ছে করে না?

তা করবে না কেন? আমি এখন ...

আরে বহ দুইজন মিলা খাইয়া, মক্কর শুনামু।

অগত্যা বাধ্য হয়ে মাতাব্বর পুত্র বলল, ঠিক আছে ভাবী।

ভাত বেড়ে সামনে দিয়ে ভাবী বলল, খুব তাড়াতাড়ি খাইতে হব। যদি নিরমুইশায় দেহে!

দু-জন মিলে দরজা বন্ধ করে খেতে বসল। কিছুক্ষণ পরে মক্কর ভাবীর খুইন্যা স্বামি দরজায় কড়া নেড়ে ডাকল, বউ, বউ। দুয়ার খোল।

খুনি ভাইয়ের ডাক শুনে দু-জনে ভয়ে কেঁপে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে ভাবী বলল, খাইছে আমারে।

মাতব্বর পুত্রের ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল। খুবই হতাশা প্রকাশ করে বলল, ভাবী এখন কী হবে?

তোমার মরণ হব!

ভাবী আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।

ভাবী তাড়াতাড়ি সিন্দুকের দরজা খুলে বলল, বাঁচতে চাইলে, এক্ষুনি সিন্দুকের ভেতরে পলাও।

মাতব্বর পুত্র ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিন্দুকে ঢুকে বলল, আমি ঢুকছি। আপনি দরজা দেন।

ভাবী সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে বলল, তুমি চুপ চাপ থাক। আমি দরজা খুলছি।

ঘরের দরজা খুললে স্বামী রেগে বলল, দরজা খুলতে এত দেরি করলি ক্যান?

স্ত্রী কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল, খুনির সরদার তুমি বাইচ্যা থাকতেই আমার ঘরে লোচ্চা ঢুকে?

স্ত্রীর কথায় স্বামী রেগে লাফ দিয়ে রাম দা হাতে নিয়ে বলল, কী কইলী লোচ্চা? কই সে বদমাশ, আমি তার মাথা দুই খণ্ড কইরা ফালামু!

একথা শুনে মাতব্বরের পুত্র ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছোট হয়ে গেল। মনে মনে বিধাতার নাম স্মরণ করে বলল, হায় আল্লাহ কোনো বিপদে ফেললে। এইবার বুঝি জীবন যায়।

লুঙ্গির ভেজা টের পেয়ে মনে মনে বলল, প্রস্রাব করে ফেলছি।

ভাবী শান্ত হয়ে বলল, খুন করবার আগে মাথা ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথা হুন।

না আগে লোচ্চার মাথা কাইটা ওর রক্তে গোসল করমু।

আরে আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ কর। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কর।

www.pathagar.com

সত্য সত্য স্বামী থেমে ভাত খেতে বসল। স্ত্রী ভাত বেড়ে দিচ্ছে স্বামী রেগে বলল, এত সাহস কোনো বদমাইশের? কী তার পরিচয়?

আহ খাও তো সব কইব।

আমার মাথায় আগুন ধইরা গেছে। কোথায় সে শয়তান?

স্ত্রী বলল, সিন্দুকে আটকইয়া রাখছি।

একথা শুনে মাতব্বর পুত্র মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে, দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা। প্রস্রাবের পর এবার পায়খানা করে ফেলল।

স্বামী রেগে বলল, আগে কেন খাবার দিলি? মাগী রাম দা দে, ওর রক্তে গোসল করি।

স্ত্রী ধমক দিয়া বলল, আরে মর্দা লোচ্চা কোনোদিন সিন্দুকে আটকাই রাখন যায়?

স্বামী থেমে বলল, তাইলে কুনু?

মক্কর ভাবী বাজারে ব্যাগ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, মর্দা তোমারে পরীক্ষা করলাম। যাও বাজার থাইকা ভালা ভালা মাছ মাংস নিয়া আও।

স্বামী অবাক হয়ে হেসে বলল, আচ্ছা। তুমি বড় রসিক। আমি বাজারে যাই।

ব্যাগ হাতে বাজারে চলে গেল।

ভাবী সিন্দুকের দরজা খুলে দিল, একটা বিশ্রি গন্ধ নাকে লাগল। মাতব্বর পুত্র কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। ভাবী হেসে বলল, একদম পায়খানা প্রসাব কইরা ফালাইছ?

শুধু তাই না, জীবনের বেডারি ফিউজ হয়ে গেছে।

আরে দেওরা বহ এহন মক্কর শুনাই।

মক্কর জানে সক্কর ঝি,
আমি মক্করের জানি কি?
মক্কর জানে আমার বড় জায়,
তার ঘ্যাগের উপর খারাইলে
ধলাপাড়ার হাঁট দেখা যায়।

মাতব্বরের পুত্র প্রাণপনে দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, ভাবী তোমার মক্করেই আমার সাড়ে বারটা বেজে গেছে। আর মেঝ ভাবীর মক্কর শোনার দরকার নেই। ভাবী বিজয়ীর হাসি হাসতে লাগল।[২৫]

১৭.

টুইন্যা মালির পিছলো পাও,
পাড়ার মাগীরা সদাই খাও

কাহিনি : টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার কাছড়া গ্রামে টুইন্য মালি নামে এক স্বভাব কবি বাস করতেন। টুইন্যা মালি ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল পরোপকারী মিশুক প্রকৃতির মানুষ। তিনি উপস্থিত সময়ে ছড়া, কবিতা ও ছিলকি রচনা করে সবাই আনন্দদান করতে পারতেন। টুইন্যা মালি পেশায় ছিলেন চকিদার। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানো ছিল তাঁর অন্যতম মহৎ গুণ। তিনি কারণে-অকারণে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। পাড়ার মহিলাদের পান-পাতা, মোয়া-মুড়ি খেতেন এবং ছড়া, কবিতা ও ছিলকি

www.pathagar.com

শোনাতেন। টুইন্যা মালি সারাক্ষণ খোশ-গল্প করে সময় কাটাতেন। হাট-বাজারে যাওয়ার সময় পাড়ার মহিলারা টুইন্যা মালিকে দিয়ে সদাই করাতেন। টুইন্যা মালি ঠিক মতো সদাই পৌঁছে দিয়ে ও পাড়া-পড়শিদের মন জয় করেছিলেন।

টুইন্যা মালির কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে সবাই জানতেন এবং তাঁকে আলাদাভাবে মানতেন। সাপ্তাহিক হাজিরার দিন থানার পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা টুইন্যা মালির রচিত কাব্যরসে খুশি হতেন। এ জন্য থানার বড় সাহেব টুইন্যা মালিকে ভালো চোখে দেখতেন ও সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিতেন।

এক সময় টুইন্যা মালির গ্রামে পরগণার জমিদার এসেছিলেন। জমিদার এলাকার সমস্যার কথা জানতে চাইলে টুইন্যা ছন্দাকারে বলেছিলেন,

রাইতে মশা দিনে জোঁক
মরল রে ভাই কাছড়ার লোক
পানির উপর বাইন্ধা ঘর
কাছড়ারা দেয় টোং পহর।

টুইন্যা মালির কাছে এলাকাবাসীর কষ্টের কথা শুনে জমিদার চিরদিনের জন্য, কাছড়াবাসীর খাজনা মাপ করে কবিকে সম্মানীত করেছিলেন।

সে থেকেই এলাকাবাসীর কাছে টুইন্যা মালির কদর ও সম্মান আরও বেড়ে গিয়েছিল। আশে-পাশের গ্রামবাসীরা আফসোস করে বলেছিল, টুইন্যা মালির জন্ম কেন তাঁদের গ্রামে হয়নি।

এভাবেই সময়ের গতিতে টুইন্যা মালির জীবনে বার্ধক্য নামে। এক সময় টুইন্যা মালির সুঠাম দেহে নেমে আসে দূর্বলতা। চলতে ফিরতে টুইন্যা মালির খুব কষ্ট হয়েও মনের চঞ্চলতা কমে না। মালি প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেন ও হাট–বাজারে যান। পাড়ার মহিলারা এখনও টুইন্যা মালিকে সদাইর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত থাকে। পাড়ার ভাবীদের সদাই করে দিতে টুইন্যা মালির খুবই কষ্ট হয় কিন্তু মুখ খুলে বলেন না।

দিনটি ছিল বৃষ্টিঝরা শ্রাবণের দিন। সারাদিনে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। গ্রামের কোনো লোক রাস্তায় মাথা বের করেনি। অনেক পুরুষ কাঁথা মুড়ি দিয়ে আয়েশে ঘুমিয়েছে। অনেক মহিলারা স্বামীর বিছানায় শুয়েছে। টুইন্যা মালি ভাঙ্গা ছাতা মাথায় দিয়ে হাটে রওনা হয়েছেন। টুইন্যা মালিকে হাটে যেতে দেখে পাড়ার ভাবীরা সদাই আনতে দিয়েছে।

টুইন্যা মালী হাটে গিয়ে দেখে তেমন বেশি দোকানদার আসেনি। হাটে লোকজনের উপস্থিতি খুবই কম। টুইন্যা মালি ঘুরে ঘুরে সদাই করে, ব্যাগ কাঁধে নিয়ে অতি কষ্টে বাড়ি রওনা হলেন। পথ-ঘাট বৃষ্টিতে ভিজে কর্দমাক্ত হয়েছে। টুইন্যা মালি খুব কষ্টে পা টিপে এগিয়ে চললেন। বাড়ির কাছে আসার পর হঠাৎ পা পিছলে রাস্তার নিচের গর্তে পরে সমস্ত সদাই জলে ভেসে গেল। টুইন্যা মালি খুব কষ্টে ভেজা শরীরে রওনা হলেন। টুইন্যা মালির করুণ অবস্থা দেখে পাড়ার ভাই ও ভাবীরা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, টুইন্যা মালি তোমার এই বাজে অবস্থা কেন?

তখন টুইন্যা মালি কোকাতে কোকাতে বললেন,

টুইন্যা মালির পিছলো পাও,
পাড়ার মাগীরা সদাই খাও।[২৬]

www.pathagar.com

১৮.

অস্থির উপরে পস্থির বাসা
জল বাইসাছে জালে
চার পাইয়ার উপরে নিপায়া উঠল
দুই পাইয়া উঠল ডালে।
তালতলা হইলের[৬৩] পোনা
হইলে হেয়াল[৬৪] খায়
চৈত মাসে বাঘের পারা
জলে ভাইসা যায়।
ছাতির উপর দিয়া পাও[৬৫]
ছাগলে খাইল সাত'শ নাও
শুন কন্যা বিবরণ
ইঁদুরে বিলাই[৬৬] মারল কি কারণ? (বাসাইল)

ব্যাখ্য : এক রাখাল গরু সাঁতর দিচ্ছে পাগাড়ে। এক পুঁটি মাছ উঠছে গরুর উপরে। চিল ছিল এক গাছের ডালে। সেই চিলে নিল পুঁটিমাছ। আর শিয়াল মরে পঁচে পোকায় পরিণত হয়েছে। সেই মরা শিয়াল ষোইল মাছে খেয়েছে। চৈত্র মাসে কালাই ক্ষেত ডাঙ্গা দিছে, সেই খানে গরুয়ে নাদাইছিল। তখন সেই নাদায় বাঘের পা পরছিল, তা শুকিয়ে গিয়ে চিহ্নিত নাদা জলে ভেসে গেল। আবার এক মহাজন জলে সাত'শ নাও চালায়। সেই নায়ের সব হিসাব ছিল কাঁঠালের পাতায়। কাঁঠালের পাতা ছাগলে খাইছে। তারপর এক গৃহস্তের বউ গাভী দোহন করে দুধসহ দোনা রাখছে ছিকার উপর। এক বিড়াল দুধ খাবার জন্য উৎ পেতে আছে। তখন ইঁদুরে ছিকার রশি কেটে দিয়েছে। সেই দুধের পাত্রটি বিড়ালের উপর পড়ে বিড়ালটি মারা যায়।

১৯.

ওপার দিয়ে যায় রে ছেরি
গোল খাইরা তার পায়
কাইশা বনে[৬৭] ঠাইসা ধরে
ডাক পারে তার মায়। (বাসাইল)

ব্যাখ্যা : এক লোকের মেয়ে সাজগোজ করে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছিল। তখন ঝড়ের বেগে বাতাস বইতে থাকে। সেই সময় কাশবন মেয়েটির উপর পরতে থাকে। তার মায়ে নদীর পাড়ে এসে দেখে তার মেয়ের এই অবস্থা। তখন মায়ে মেয়েকে বাড়িতে ফিরে আসার জন্য ডাকে।

২০.

বড়র বড় মাথা
শুইয়া খায় বাঁশের পাতা
আমি এক ক্ষুদ্রপ্রাণী
বাঁশের মাথায়[৬৮] নড় নড়ানী। (টাঙ্গাইল)

ব্যাখ্যা : এক হাতি বাঁশ বাগানের নিকট শুয়ে থেকে তার শুড় দিয়ে একটি বাঁশ নামিয়ে বাঁশের পাতা খাচ্ছে। তা দেখে ছাগল গিয়ে সেই বাঁশের উপরে চড়ে বাঁশের পাতা

www.pathagar.com

খাচ্ছিল। এমন সময় হাতি বাঁশটি ছেড়ে দিলে বাঁশ ছাগলসহ উপরে ওঠে যায়। ছাগলটি বাঁশের কঞ্চিতে আটকিয়ে নড়াচড়া করে। অর্থাৎ যার যে কাজ, তার সেই কাজই করতে হয়। দেখাদেখি কোনো কাজ করতে নেই।[২৭]

দরবারী শোলক

২১.

(ভাল)

দক্ষিণ দুয়ার ঘর
খাইতে দুধের সর
বিয়ের হও বর। (মির্জাপুর)

২২.

(ভাল)

দক্ষিণ সদর বাড়ি
মেয়েদের পড়াও শাড়ি
দৌড়াও সাইকেল গাড়ি। (টাঙ্গাইল)

২৩.

(ভাল)

খাঁটি দুধের মাটা
চিকন সলার ঝাটা[৬৯]
বাঙ্গি পাকলে ফাটা। (টাঙ্গাইল)

২৪.

(ভাল)

জানা পথে চলা
সত্য কথা বলা
খাইতে শরবি কলা। (ভূঞাপুর)

২৫.

(ভাল)

মাজা চিকন নারী
চড়তে ঘোড়ার গাড়ি
যাইতে শ্বশুর বাড়ি। (ভূঞাপুর)

২৬.

(মন্দ)

অল্প লোকের রাজা
পঁচা কই ভাজা
চিটকা গুড়ের[৭০] খাজা। (ভূঞাপুর)

২৭.

(মন্দ)

উলুবনে হাঁটা
মাদার গাছে[৭১] উঠা
টেংরা মাছ কুটা। (ভূঞাপুর)

www.pathagar.com

২৮.
(মন্দ)
পঁচা বাঁশের জোড়া
পা থাকতে খোঁড়া
গড়ি ছাড়া মোড়া। (দেলদুয়ার)

২৯.
(মন্দ)
পিচলা পথে চলা
মিথ্যা কথা বলা
খাইতে পঁচা কলা। (টাঙ্গাইল)

৩০.
(মন্দ)
চড়তে ঠেলা গাড়ি
থাকতে শ্বশুর বাড়ি
পরতে মোটা শাড়ি। (টাঙ্গাইল)

তথ্যনির্দেশ

১. *টাঙ্গাইল জেলার লুপ্তপ্রায় লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, মামুন তরফদার, পৃ. ২৫৩।
২. *সাহিত্য- সংজ্ঞা অভিধান*, বদিউর রহমান, পৃ. ১০৯।
৩. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃ. ৬৪২।
৪. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকাতা-১৯৬৪, ২য় সংস্করণ, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত)।
৫. *সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান*, বদিউর রহমান-২০০১, পৃ. ১০৮।
৬. *টাঙ্গাইল জেলার লুপ্তপ্রায় লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, মামুন তরফদার-২০০২, পৃ. ২৫৩।
৭. *টাঙ্গাইল জেলার লুপ্তপ্রায় লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, মামুন তরফদার-২০০২, পৃ. ২৫৩।
৮. *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, ২০০০।
৯. *বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা*, ওয়াকিল আহমদ, ২০০৭, পৃ. ১৭৫।
১০. মো. শামছুল হক, বয়স : ৭২ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : মাধববাড়ি, পো : নল্যা বাজার, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৪.১১.২০১১
১১. ঐ
১২ ঐ
১৩. ঐ
১৪. ঐ
১৫. মো. হাফিজ উদ্দীন, বয়স : ৬৮ বছর, শিক্ষা : এস এস সি, গ্রাম : টেংরী (কাঁঠালতলী), পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ৮.১২.২০১১
১৬. মো. আ. গফুর, বয়স : ৬০ বছর, শিক্ষা : এস এস সি, গ্রাম : টেংরী (কাঁঠাতলী), পো : মধুপুর, থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ২৯.১১.২০১১
১৭. মো. শামছুল হক, বয়স : ৭২ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : মাধববাড়ি, পো : নল্যা বাজার, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৪.১১.২০১১
১৮. মো. আবির ইসলাম, বয়স : ৬ বছর, শিক্ষা : কেজি, গ্রাম+ডাকঘর : পশ্চিম ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৪.১১.২০১১

www.pathagar.com

১৯. রিয়াজ উদ্দিন তালুকদার, বয়স : ৯০ বছর, পিতা : বরমুল্লাহ, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা: ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল।
২০. সেলিনা আকতার, বয়স ৫৮ বছর, পিতা : সাকেদ আলী। গ্রাম : ছাফাকোট, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ১০.০৯.২০১১
২১. মো. নূরুল ইসলাম, বয়স : ৭০ বছর, পিতা : ইছহাক আলী মুন্সি, গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল।
২২. সেলিনা আকতার, বয়স ৫৮ বছর, পিতা : ছাকেদ আলী, গ্রাম : ছাফাকোট, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল।
২৩. মীর মোহাম্মদ আলী বয়স : ৯০ বছর, পিতা মৃত-মীর রজব আলী। গ্রাম : আড়াইপড়া, উপজেলা : সখিপুর, জেলা : টাঙ্গাইল।
২৪. সেলিনা বেগম বয়স ৫৮ বছর, পিতা : ছাদেক আলী, গ্রাম : ছাফাকোট, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২৬ জুন-২০১২।
২৫. সুফিয়া বেগম, বয়স ৫০ বছর স্বামী-হাফিজ উদ্দিন। গ্রাম : মলাজানী, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২২ এপ্রিল-২০১১।
২৬. মীর মোহাম্মদ আলী, বয়স : ৯০ বছর। পিতা : রজব আলী, গ্রাম : আড়াইপাড়া, উপজেলা : সখিপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২০ নভেম্বর-২০০৫
২৭. আব্দুল আজিজ খাঁন, বয়স : ৬০ বছর, পিতা : আব্দুল বাহার খাঁন, গ্রাম : জুগিয়াটেঙ্গ, উপজেলা : ঘাটাইল, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ১৩ জানুয়ারি-২০১২

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : ১.নাদুর নদুর-নাদুস নুদুস। ২.শুখান- শুকনো। ৩. ছানলে-ছুঁইলে। ৪.কাইত-কাত। ৫.উইঠা- উঠে। ৬. ইল- ঝিল। ৭.পাও-পা, ৮. গাতা-গর্ত। ৯.বেগ-সমস্ত, ১০. কুরকা-মুরগী। ১১. রাইতে- রাতে, ১২. পইড়া- পড়ে। ১৩.পানা- দোহন করা। ১৪.পাও-পা। ১৫.হালট- রাস্তা। ১৬.মুরিত- কিনার। ১৭. কাম- কাজ। ১৮. খাম- খুঁটি। ১৯. দিমু- দেবো।২০. দিলি- দিলে। ২১. দিলামনি- দিতাম। ২২. নেঙ্গুর- লেজ। ২৩. গুরগুরি- লোহার মালা, যাকে জালের কাঠি বলে। ২৪. কইরা- করে। ২৫. কাম- কাজ। ২৬. জাতা- চাপ। ২৭. শুইলে- নেতিয়ে গেলে অর্থে। ২৮. কাইটা- কেটে, বাদ। ২৯. সুমুদ্দুর- সমুদ্র, সাগর। ৩০. কালা- কালো। ৩১. রাইত- রাত। ৩২. আড়া- জঙ্গল।৩৩. খাড়াইয়া- দাঁড়িয়ে। ৩৪. বাইলা- বেলে। ৩৫. আত্তা- আতা। ৩৬. পাত্তা- পাতা। ৩৭. কইজ্জা- কলিজা। ৩৮. কও- বলো। ৩৯. কানাকুক্কায়- কাক জাতীয় পাখি। ৪০. আগা- শীর্ষদেশ। ৪১. পইড়া- পড়ে। ৪২. পাখ- পাখা। ৪৩. ঢ্যাল- ঢেলওয়ালা। ৪৪. গাই- গাভী। ৪৫. পানাই- দোহাই। ৪৬. নমুনার- ধরনের, রকমের। ৪৭. বুইনের- বোনের। ৪৮. ন্যাংটা- উলঙ্গ। ৪৯. তলে- নীচে। ৫০. ছ্যাপ- থুথু। ৫১.আঠেকান- ভীষণ ভাবে ঠেকানো। ৫২. ফাঁকে-দূরে। ৫৩. রাও- কথা/ডাক। ৫৪.আইজ- আজ, ৫৫. দেহি- দেখি। ৫৬.মুরিত- কিনার। ৫৭. বগিলা- বক। ৫৮. আগরা-কাঁটা বন। ৬৯. পাইয়া- পা যুক্ত। ৬০. নিপাইয়া- পা নাই যার। ৬১.চিনা- এক ধরনে র শস্য দানা, ৬২. কাউন- প্রাচীন আমলের শস্য কণা। ৬৩. হইলের- শোইলের। ৬৪. হেয়াল- শিয়াল। ৬৫. পাও- পা। ৬৬. বিলাই- বিড়াল।৬৭. কাইশা বনে- কাশবনে। ৬৮. মাথায়- অগ্রভাগে। ৬৯. ঝাটা- ঝাড়ু। ৭০. চিটকা গুড়ের- ছিতিপড়া কালো গুড়ের। ৭১. মাদার গাছ- কাটাযুক্ত গাছ।

www.pathagar.com

প্রবাদ প্রবচন

১.

যেন তেন দুই ভাই
যেন তেন দুই গাই। (টাঙ্গাইল)

মূলভাব : একাধিক ব্যক্তি একটি কাজ সহজে করতে পারে। তেমনি একাধিক গাভী দহন করলে অল্প অল্প দুধ পেলেই কাজ চলে।

২.

গ্রাম নষ্ট কানায়
খেত নষ্ট পানায়। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : খারাপ স্বভাবের ব্যক্তিরা গ্রামে বদনাম সৃষ্টি করে, আর পানায় অনায়াসে খেতের ফসল নষ্ট করে ফেলে।

৩.

আগের হাল যে দিকে যায়
পিছের হাল সে দিকে যায়। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান খারাপ হলে অন্য সন্তানও খারাপ হয়।

৪.

যার বুদ্ধি হয় না নয়ে
তার বুদ্ধি হয় না নব্বইয়ে। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : যে মানুষের বুদ্ধি হয় বালক বয়সেই হয়।

৫.

সহিলে সম্পদ বাড়ে
না সহিলে সম্পদ ছাড়ে। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : ধৈর্য্য সহকারে চললে ক্ষয় ক্ষতি হয় না।

৬.

আগে ভাগে
পিছে লাগে বা না লাগে। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : আগে ভাগে কাজ করা ভালো।

৭.

যার মরণ যেনু[১]
নাও ভাড়া কইরা যায় হেনু[২]। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : ভাগ্যে দুঃখ থাকলে সে দুঃখ ভোগ করতে হবে।

www.pathagar.com

৮.

যদি থাকে নসিবে
ঘুইরা ঘুইরা আসিবে। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : ভাগ্যে কোনো কিছু থাকলে তা কোনো এক সময় পাওয়া যায়।

৯.

যদি হয় সুজন
এক ঘরেই থাকে সাতজন
আর যদি হয় কুজন
একেক জাগায় থাকে একেকজন। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : মানুষ ভাল হলে একত্রে বেশি মানুষও থাকতে পারে। আর মন্দ হলে একত্রে থাকতে পারে না।

১০.

টাকার নাম মাসি
ঘর থেকে গেলে
আসি বা না আসি। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : টাকা অন্যের হাতে গেলে আর ফিরে আসে না।

১১.

খুটির জোরও চাই
থুতির জোরও চাই। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : সংসার সংগ্রামে জয়ী হতে হলে লোকবল ও বাক্যবল উভয়ই প্রয়োজন।

১২.

কোন্দলে জাত নষ্ট
রোগে রূপ নষ্ট। (মধুপুর)

মূলভাব : রোগ হলে যেমন শারীরিক সৌন্দর্য নষ্ট হয় তেমনি ঝগড়া বিবাদ বংশের আভিজাত্য নষ্ট হয়।

১৩.

দারিদ্র রোষে
গুণরাশি নাশে। (মধুপুর)

মূলভাব : দারিদ্র মানব স্বভাবের উত্তম গুণাবলি নষ্ট করে দেয়।

১৪.

সময় গুণে আপন পর
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর। (মধুপুর)

মূলভাব : সময় গুণে আপন পর হয় এবং খোঁড়া গাধাও ঘোড়ার দরে বিক্রি হয়।

১৫.

দিনে বালিশ
রাতে চলিস। (মধুপুর)

মূলভাব : মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ক্ষণিক বিশ্রাম ও নৈশ ভোজের পর পায়চারি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

www.pathagar.com

১৬.

বুদ্ধিতে সকল ঘটে
কপালের সঙ্গে কেউ না আঁটে। (মধুপুর)

মূলভাব : বুদ্ধি বলে অনেক কিছু করা যায় সত্য, কিন্তু অদৃষ্টের সঙ্গে জোর খাটে না।

১৭.

ধরি মাছ, না ছুঁই পানি
তবেই বুদ্ধি বলে জানি। (মধুপুর)

মূলভাব : কৌশলে যে কার্যোদ্ধার করতে পারে সেই বুদ্ধিমান।

১৮.

খড়ের কুটায় আগুন দিয়া
পেত্নি বসল আলগোছে[৩] গিয়া। (মির্জাপুর)

মূলভাব : মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করলে বলা হয়।

১৯.

গুরু করবে জেনে
জল খাবে ছেনে। (মির্জাপুর)

মূলভাব : পানি পান করতে গেলে যেমন সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, তেমনি গুরু পদে কাউকে বরণ করার পূর্বে সবদিক বিচার করে দেখতে হয়।

২০.

দুধকলা দাও যত
সাপের বিষ বাড়ে তত। (মির্জাপুর)

মূলভাব : লোকের অপরিবর্তিত স্বভাব সম্পর্কে এ কথা বলা হয়।

২১.

দুর্জনকে পরিহার
দূর থেকে নমস্কার। (বাসাইল)

মূলভাব : দুর্জনের সঙ্গ পরিত্যাজ্য।

২২.

খেতে গেলে হাস হাস
দিতে গেলে সর্বনাশ। (বাসাইল)

মূলভাব : কেউ কেউ এমন আছে যে তারা পরেরটা নিতেই চায়, দেওয়ার বেলায় তারা যেন আকাশ থেকে পড়ে।

২৩

তেল তামাকে পিত্তনাশ
যদি হয় তা বার মাস। (বাসাইল)

মূলভাব : সর্বদা নিয়মিত তৈলাক্ত খাদ্য গ্রহণে ও ধুমপানে পিত্তনাশ ঘটে।

www.pathagar.com

২৪.

খাইতে না জানলে মরে
বসতে না জানলে লড়ে। (বাসাইল)

মূলভাব : অপরিমিতি আহারে বা অখাদ্য গ্রহণে রোগগ্রস্থ হয়। আর নিজের যোগ্যতা অনুসারে বসতে না জানলে বারবার উঠতে হয়।

২৫.

আহারান্তে চোখে জল
দৃষ্টিশক্তি বাড়ে বল। (বাসাইল)

মূলভাব : আহারান্তে চোখে পানি ছিটিয়ে দিলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

২৬.

ঠেক ছিলাম যেখানে
শিখছিলাম সেখানে। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : দায়ে পড়তে পড়তেই লোক অভিজ্ঞ হয়ে উঠে।

২৭.

গায়ে কামড় পায়ে বিষ
তেল না থাকলে পানি দিস। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : গা কামড়ালে বা পায়ে ব্যথা করলে তেল মালিশ করা উপকারী।

২৮.

বার মাসে বার ফল
না খেলে যায় রসাতল। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : মৌসুমী ফল পুষ্টির জন্য পর্যায়ক্রমে খাওয়া প্রয়োজন।

২৯.

চাষি আর চষা মাটি
এই দুই মিলে দেশ খাঁটি। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : কৃষিপ্রধান দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের চাষি ও আবাদী জমির ফসলের উপর।

৩০.

কাজের সময় কাজি
কাজ ফুরাইলে পাজি। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রশংসা এবং কার্যসিদ্ধির পর দেখা না গেলে এ কথা বলা হয়।

৩১.

গাছের শত্রু লতা
মানুষের শত্রু কথা। (ঘাটাইল)

মূলভাব : লতা গাছকে নষ্ট করে। তেমনি কথার জন্য মানুষ বিরাগভাজন হয়।

www.pathagar.com

৩২.

কপাল যদি মন্দ হয়
দূর্বা খেতে বাঘের ভয়। (ঘাটাইল)

মূলভাব : ভাগ্যের লিখন পরিবর্তন হয় না।

৩৩.

পণ্ডিত শিখে দেখে
মূর্খ শিখে ঠেকে। (ঘাটাইল)

মূলভাব : পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে প্রকৃত বুদ্ধিমান, ঠেকে জ্ঞান লাভ করে অশিক্ষিত লোক।

৩৪.

চৈতে লাগাইলে আদা
বৈশাখে লাগাইলে আধা। (ঘাটাইল)

মূলভাব : আদা চাষের উপযুক্ত সময় চৈত্র মাস। আর বৈশাখ মাসে লাগালে ফলন অর্ধেক হয়।

৩৫.

চোর যদি যায় সাধুর কাছে
স্বভাব যায় তার পাছে পাছে। (ঘাটাইল)

মূলভাব : সাধুর সংসর্গেও দুষ্ট লোকের স্বভাব পরিবর্তন হয় না।

৩৬.

বেল খেয়ে খায় পানি
জির বলে মরলাম আমি। (ঘাটাইল)

মূলভাব : বেল খাওয়ার পর পানি পান করলে কৃমিনাশক হয়।

৩৭.

ঘোড়া চিনা যায় ময়দানে
বন্ধু চিনা যায় নিদানে। (নাগরপুর)

মূলভাব : প্রতিযোগিতার সময় ঘোড়ার দৌড়ানোর ক্ষমতা বুঝা যায়, তেমনি দুঃসময়ে প্রকৃত বন্ধু চেনা যায়।

৩৮.

খড়ের লেজ যার
আগুনের ভয় তার। (নাগরপুর)

মূলভাব : দোষী ব্যক্তিরাই শাস্তির ভয়ে থাকে।

৩৯.

বেয়াই খায় কত ঘি
এক আঁচতেই জেনেছি। (নাগরপুর)

মূলভাব : কথাবার্তায় মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

৪০.

ঘি দিয়া ভাজ নিমের পাতা
তবুও যায় না জাতের তিতা। (নাগরপুর)

মূলভাব : মন্দ লোকের স্বভাব পরিবর্তন হয় না।

৪১.

পান খাইয়া না খায় চুন
সেই পানে কিবা গুণ। (নাগরপুর)

মূলভাব : চুন ছাড়া পান খেলে পানের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না।

৪২.

কত হাতি ঘোড়া গেল তল
ভেড়া বলে কত জল? (নাগরপুর)

মূলভাব : যেখানে অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিরা ব্যর্থ হয়েছেন, সেখান অনভিজ্ঞ, অযোগ্য ব্যক্তি চেষ্টা করলে এ কথা বলা হয়।

৪৩.

পাপত লুকায় না
সাগরও শুকায় না। (মধুপুর)

মূলভাব : পাপ একদিন প্রকাশিত হবেই।

৪৪.

ভাঙ্গা নিড়ান বন্ধ আলি
তাতে দিও নানা শালি। (মধুপুর)

মূলভাব : জঙ্গল ও দূর্বা পরিষ্কার করা শালী ধান রোপণের পূর্ব শর্ত।

৪৫.

ঝড়ে বক মরে
ফকিরের কেরামতি বাড়ে। (মধূপুর)

মূলভাব : একজনের কাজ কর্মে অন্য লোকের সুনাম হলে একথা বলা হয়।

৪৬.

অন্ন নাই যার ঘরে
তারে কেবা মান্য করে? (মধুপুর)

মূলভাব : দরিদ্র ব্যক্তিকে কেউই সম্মান প্রদর্শন করে না।

৪৭.

আপ রুচি খানা
পর রুচি পর না।(মধুপুর)

মূলভাব : মানুষ নিজের রুচিমতো খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু পোশাক পরিধান করে পরের রুচি মাফিক।

www.pathagar.com

৪৮.

বনে বনেই মধু না
জনে জনেই সাধু না। (নাগরপুর)

মূলভাব : সকল বনেই মধু পাওয়া যায় না। তেমনি সাধুর বেশ ধারণ করলেও সবাই প্রকৃত সাধু হয় না।

৪৯.

যার জন্যে যার পরাণ কান্দে
কোলায় চাউল না থাকলেও
কর্জ কইরা রান্ধে। (নাগরপুর)

মূলভাব : প্রাণের সম্পর্ক থাকলে মানুষ তার প্রিয়জনের জন্যে সাধ্যের অতীত যে কোনো কাজও করতে পারে অতি আগ্রহ চিত্তে।

৫০.

উপকার করে কোনো বুড়ি
ধইরা আন তার খেতা[৪] পুড়ি। (মির্জাপুর)

মূলভাব : পরোপকারী ব্যক্তি সমাজের হিত সাধন করলেও সমাজ তাকে যথাযোগ্য প্রতিদান দেয় না। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি পরোপকারী ব্যক্তির ক্ষতি সাধনে আত্মনিয়োগ করে।

৫১.

গাইয়ে বাছুরে মিল থাকলে
আড়ায়[৫] যাইয়া দুধ দেয়। (মির্জাপুর)

মূলভাব : মনের মিল থাকলে যে কোনো বাধা অতিক্রম করে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আত্মোৎসর্গ করতে পারে।

৫২.

কী এর মধ্যে কী
পানতা ভাতে ঘি। (মির্জাপুর)

মূলভাব : পানতা ভাতে ঘি যেমন বেমানান, ঠিক তেমনি অসামঞ্জস্য দেখা যায় যখন কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিকতার অবতারণা করা হয়।

৫৩.

হাঁড়ি পাতিল ভাঙ্গলে নেয় ঠাঠারো[৬] বাড়ি
মেনোকের[৭] কপাল ভাঙ্গলে যায় বাপের বাড়ি। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : কাঁসা বা পিতলের বাসন কোসন ভাঙ্গলে তা মেরামতের জন্যে কাঁসা শিল্পীর নিকট নিয়ে যেতে হয়। তেমনি মেয়ে মানুষের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলে তার শেষ আশ্রয় হয় বাপের বাড়ি।

৫৪.

ধলা বলদ পালের শোভা। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : গুণহীন সৌন্দর্য চোখ ধাঁধায় কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করে না। অর্থাৎ অকর্মণ্য ব্যক্তির পরিপাটি দেখে তার প্রকৃত অবস্থা বিচার করা যায় না।

www.pathagar.com

৫৫.

বাইরে ফিটফাট
ভিতরে সদরঘাট। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : বাইরের রূপ দ্বারা মানুষকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ভদ্রবেশী মানুষও ভিতরে ভিতরে দুশ্চরিত্রের অধিকারী হতে পারে।

৫৬.

হিল[৮] পাটায় ঘঁষাঘঁষি
মইচের[৯] কাম হার[১০]। (মধুপুর)

মূলভাব : বিবদমান দুপক্ষের মাঝখানে পড়ে অনেক সময় সাধারণ মানুষের বেহাল দশা হয়।

৫৭.

যদি চলে পরে পরে
কার চেটে[১১] বিয়া করে। (মধুপুর)

মূলভাব : অন্যের নিকট থেকে সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি কখনো কোনো কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে চায় না।

৫৮.

নাইয়ার[১২] এক নাও
নিনাইয়ার[১৩] হাজার নাও। (মির্জাপুর)

মূলভাব : যার সামান্য কিছু আছে সে ঐ টুকুরই মালিক। কিন্তু যার কোনো সহায় সম্বল নেই সে মনে করে দুনিয়ার সব কিছুতেই তার একটি অলিখিত অধিকার রয়েছে।

৫৯.

যার যাবার তার যাবো
ধোপার যাবো ক্ষার আর খৈল। (মির্জাপুর)

মূলভাব : অতি মাত্রায় ক্ষার ব্যবহার করে ধোপা কাপড়ের দাগ দূর করতে গিয়ে কাপড়ের ক্ষতি সাধন করেও নিজের নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে চায়। তেমনি সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা অন্যের অনিষ্ট করে হলেও নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করতে চায়।

৬০.

গাই গুণে ঘি
মাও গুণে ঝি।
গাছ গুণে গোটা
বাপ গুণে ব্যাটা॥ (মির্জাপুর)

মূলভাব : গাভীভেদে দুধের মানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভাল জাতের গাভীর দুধে তৈরি ঘি ভাল হয়। ঠিক তেমনি ভাল মায়ের কন্যাও স্বভাবে ভাল হয়। ভাল গাছ ভাল ফল প্রদান করে থাকে এটা যেমন সত্যি; তেমনি পিতার গুণাগুণ তার পুত্রের উপর অনেকাংশেই প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই তার মূলের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

www.pathagar.com

৬১.

মাতবর ছাড়া গাঁও
গলুই ছাড়া নাও
আর আছাড়ি[১৪] ছাড়া দাও[১৫]। (ঘাটাইল)

মূলভাব : দা এর হাতল না থাকলে সে দা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা যায় না। তদ্রুপ গলুই বিহীন নৌকাও কাজের অনুপযুক্ত। ঠিক একইভাবে কোনো গ্রামে যদি মাতব্বর না থাকে তাহলে সে গ্রামও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় না।

৬২.

নাইয়ার নাও যাব
মহাজনের মাল যাব
আমার কী বাল যাব। (ঘাটাইল)

মূলভাব : বৈরী আবহাওয়ায় নৌকা ডুবি হলে মাঝির কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। কারণ নৌকা যাবে মালিকের এবং নৌকার মাল যাবে মহাজনের। তাই মাঝি আবহাওয়ার কথা বিবেচনা না করে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সমাজে এমনও লোক আছে যারা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারে না।

৬৩.

কথায় কথা বাড়ে
জলে বাড়ে ধান
শ্বশুর বাড়ি জামাই
বেশি দিন থাকলে
হয় অপমান। (ঘাটাইল)

মূলভাব : একটি কথা বড় হয়ে দশটি কথার জন্ম দেয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় জল না পেলে ধান গাছ বেড়ে উঠে না। শ্বশুর বাড়ি জামাইর কদর দু'চার দিন। তার বেশি হলে মর্যাদা হারায়। যা জামাই এর জন্যে অপমানজনক। যে কোনো বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের মাত্রা জ্ঞান থাকা উচিত।

৬৪.

নোয়া[১৬] চিনা যায় তায়[১৭]
মানুষ চিনা যায় রায়[১৮]। (ঘাটাইল)

মূলভাব : লোহার প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলে লোহাকে আগুনে পোড়া দিতে হয়। তেমনি মানুষের মনের পরিচয় তার কথা বার্তার ভিতর দিয়েই স্পষ্ট হয়।

৬৫.

খাইয়া যায় দাড়ি আলায় [১৯]
বাইজা[২০] পড়ে মোছ[২১] আলায়। (নাগরপুর)

মূলভাব : যে ব্যক্তি অপরাধ করে সে পার পেয়ে যায়। আর নিরপরাধ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়।

www.pathagar.com

৬৭.

ছাল নাই কুত্তা বাঘা নাম
পচা কুত্তা মধু নাম। (নাগরপুর)

মূলভাব : শুধু নামের দ্বারা মানুষের সঠিক বিচার হয় না। কর্মেই মানুষের আসল পরিচয়। বিখ্যাত ব্যক্তির নামে অনেকের নামকরণ করা হয়ে থাকে কিন্তু তাদের কর্ম সে নামের মাহাত্ম্য বহন করে না।

৬৮.

ভাত দিয়া মারে
বুদ্ধি দিয়া বাঁচায়। (নাগরপুর)

মূলভাব : অভাবগ্রস্ত লোককে ক্রমাগত আর্থিক সাহায্য করলে সে পরনির্ভরশীল হয়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে পরমুখাপেক্ষিতা মৃত্যুরই নামান্তর। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি পরনির্ভরশীল ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্যের বদলে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ বাতলে দেয় তাহলে সে নতুন জীবন গড়তে পারে।

৬৯.

নদীর পানি ঘোলা ভালা[২২]
জাতের ম্যায়া[২৩] কালা ভালা। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : চলমান নদীর পানি ঘোলা হলেও তা ব্যবহার করা যায়। ভালো বংশের মেয়ে কালো হলেও তার মধ্যে আদর্শ নারীর সকল বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকে।

৭০.

রাগের ঘর খাগ হয়। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : ষড় রিপুর মধ্যে রাগ অন্যতম। রাগ মানুষের মনে হিংস্রতার জন্ম দেয়। যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে দেয়।

৭১.

যুদি থাকে নসীবে
ঘুইরা ঘুইরা আসিবে। (বাসাইল)

মূলভাব : নিয়তির সাথে মানবের জীবন অদৃশ্য সূত্রে গাঁথা। ভাগ্যের অনিবার্য পরিণতিকে রোধ করা মানবের শক্তির পক্ষে অসম্ভব। আজ হোক, কাল হোক মানুষের ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই।

৭২.

আশা করছি মুল্লুক জুইড়া,
খোদায় থুইছে বাগুন পুইড়া। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : ভাগ্যে না থাকলে পাওয়া যায় না।

৭৩.

ধানের মধ্যে চামারা,
খেসির মধ্যে মামারা। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : চামারা ধান যেমন ফলনশীল তেমনি এ ধানের ভাত সুস্বাদু। আর আত্মীয়ের মধ্যে খামার বংশীয় আত্মীয় শীর্ষস্থানীয়।

www.pathagar.com

৭৪.

নোন্দের কথা ভাসুরে কয়,
রাইতে রাইতে জ্বর বয়। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে হাসি তামাসার কথা বলা ভাসুরের বেমানান। ভাসুরের হাসি তামাসার কথা মনে করেই ছোট ভাইয়ের স্ত্রী অস্বস্থিতে আছে।

৭৫.

মিনমিন করে কলসা নাড়ে,
সেই বাঘেই মানুষ মারে। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : শান্ত স্বভাবের মানুষই দুষ্কর্ম করতে পারে।

৭৬.

মানলে তালগাছ,
না মানলে বালগাছ। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : কাউকে মান্য না করলে কিছুই করার থাকে না।

৭৭.

আমি করি মাই মাই,
মায়ের চোখে পানি নাই। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : যারা জন্য আমি ত্যাগ স্বীকার করি সে আমার জন্য কিছুই করে না।

৭৮.

আসল ঘরে খাম নাই
ঢেহি ঘরে চান্দা। (ঘাটাইল)

মূলভাব : গুরুত্বপূর্ণ কাজের চেয়ে গুরুত্বহীন কাজকে প্রাধান্য দেওয়া।

৭৯.

বড়ো গাছের তলে বাস
ডাইল ভাঙ্গলে সর্বনাশ। (ঘাটাইল)

মূলভাব : শক্তিধর ব্যক্তির ক্রুদ্ধ ভয়াবহ। শক্তিধর ব্যক্তির আক্রোশ এড়িয়ে চলা উচিত।

৮০.

পুরুষের রাগ বাদশা
নারীর রাগ বেশ্যা। (ঘাটাইল)

মূলভাব : পুরুষের জন্য রাগ অনেক সময় আশীর্বাদে পরিণত হয়, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা হয় না।

৮১.

নাং করলে গায়ের ঠাকুর
মাছ খাইলে বিলের মাগুর। (ঘাটাইল)

মূলভাব : যে কোনো কাজের নেতৃত্বস্থানে থাকা বা প্রধানটাকে গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

৮২.

গপ্পোর নাম দপ্পোজি
তুমি গপ্পোর জানো কি
গপ্পো জানে ছোট জায়
বাল দিয়া উঠান হুইরা যায়। (ঘাটাইল)

মূলভাব : অল্প জানাশোনা লোকও অনেক সময় বিদ্যার বড়াই করে এক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে।

৮৩.

আংগুইলা বান
পায়ে ধরুইনা নাং।· (ঘাটাইল)

মূলভাব : ছোট বান থেকে দুধ দোহন করা যেমন অসুবিধা, তেমনি বেহায়া উপপতির সাথে সম্পর্ক রাখা ও অসুবিধা।

৮৪.

ছোটো ঘরে যাব না বউ, বড়ো ঘর যাব,
শ্বশুর-শাশুড়ি বাদ দিয়া ভিন্ন[২৪] হয়ে খাব। (টাঙ্গাইল)

মূলভাব : যৌথ পরিবার বধূর কাছে অপছন্দ তাই সে একক পরিবারের ভাত খেতে চায়।

৮৫.

বেশি বড় হয়ো না, ঝড়ে ভাঙবো মাথা,
বেশি ছোট হয়ো না, ছাগলে খাব পাতা। (টাঙ্গাইল)
সর্বক্ষেত্রে মাঝামাঝি থাকাই ভাল।

মূলভাব : প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বড় বা ছোট হওয়া উচিত নয় কেননা তাতে বিপদে পরতে হয়।

৮৬.

আত্তী[২৫] যখন গাতায়[২৬] পড়ে,
চামচিকায়ও নাথি[২৭] মারে। (টাঙ্গাইল)

মূলভাব : প্রভাবশালী ব্যক্তি কোনো সময়ে বিপদগ্রস্থ হলে নিরীহ প্রকৃতির লোকও তাকে আঘাত করার চেষ্টা করে।

৮৭.

এই দিন দিন না, আরো দিন আছে,
এই দিন নিয়া দিমু[২৮], হেই[২৯] দিনের কাছে। (টাঙ্গাইল)

মূলভাব : কোনো মানুষের জীবনে সুদিন বা দুর্দিন কখনো চিরস্থায়ী হয় না।

৮৮.

অভাগী যেদিকে চায়,
সাগর শুকাইয়া যায়। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : বঞ্চিত লোক সর্বদাই আশায় নিরাশ হয়।

www.pathagar.com

৮৯.

যার লাঠি,
তার মাটি। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : শক্তিশালী ব্যক্তির প্রভাব বেশি।

৯০.

জোর যার,
মুল্লুক তার। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : শক্তিশালী ব্যক্তির প্রভাব বেশি।

৯১.

কি করলাম, কি অনল,
ছাতু[৩০] মাহাইলাম[৩১], গু অইল। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : আশায় নিরাশ হওয়া।

৯২.

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস
অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : ভালো বন্ধুর সঙ্গ যেমন কল্যান বয়ে আনে, তেমনি খারাপ বন্ধুর সঙ্গ সর্বনাশ ডেকে আনে।

৯৩.

দেহা দেহি শিক্ষা,
আঁচলেরি ভিক্ষা। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : দেখেদেখে শিখলে যেমন প্রকৃত শিক্ষা হয় না তেমনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অভাব মোচন হয় না।

৯৪.

যা দিব হাতে,
তাই যাব সাথে। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : কর্মফলের উপরই মানুষের সবকিছু নির্ভর করে।

৯৫.

শইলের[৩২] নাম মহাশয়,
যাহা সহায় তাহাই সয়। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সব সম্ভব।

৯৬.

খাপসা[৩৩] মুখে মুগের ডাইল[৩৪],
আইজ খাব না, খাব কাইল[৩৫]। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : ভালো জিনিস অপাত্রে পড়লে সেটা যথার্থ মূল্য পায় না।

www.pathagar.com

৯৭.

বুইড়ার[৩৬] বুদ্ধি তলায়[৩৭],
চেংরার[৩৮] বুদ্ধি গলায়। (দেলদুয়ার)

মূলভাব : অল্প বয়সের লোকের তুলনায় বয়স্ক লোকের অভিজ্ঞতা বেশি।

৯৮.

পোলা[৩৯] নষ্ট আটে[৪০],
মেয়া[৪১] নষ্ট ঘাটে। (নাগরপুর)

মূলভাব : ছেলে মানুষ বাজারে থাকলে নষ্ট হয় তেমনি মেয়ে ঘাটে গিয়ে গল্প করে সময় ব্যয় করলে সেও নষ্ট হয়।

৯৯.

জাতের মেয়ে কালাই[৪২] ভালা,
গাংঙ্গের পানি ঘোলাই ভালো। (নাগরপুর)

মূলভাব : নদীর পানি ঘোলা হলেও তা ব্যবহার করা যায়। ভালো বংশের মেয়ে কালো হলেও তার মধ্যে আদর্শ নারীর সকল বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকে।

১০০.

আষাইঢ়া[৪৩] পাটের ফুল,
ভাবীর নাকে নাকফুল। (নাগরপুর)

মূলভাব : যথার্থ সময়ে যার যেখানে স্থান, সেখানে তাকে ভালো মানায়।

১০১.

খাইটা[৪৪] মরে আইল্যা চাষা[৪৫],
হুইয়ার[৪৬] ঘরে লক্ষ্মীর বাসা। (নাগরপুর)

মূলভাব : সমাজের নিম্নশ্রেণির লোকের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে অন্য এক শ্রেণি।

১০২.

যার বিয়া, তার খবর নাই,
পাড়াপড়শির ঘুম নাই। (নাগরপুর)

মূলভাব : কোনো কাজ নিজের চেয়ে অন্যে লোক অধিক গুরুত্ব দিলে একথা বলা হয়।

১০৩.

চোরে চোরে আলি[৪৭],
এক চোরে বিয়া করে,
অন্য চোরের শালি। (বাসাইল)

মূলভাব : সমপ্রকৃতির বা সমমনা লোকের সাথেই মানুষের সম্পর্ক হয়।

১০৪.

বাপে বানায় ভূত,
শিক্ষকে বানায় পুত[৪৮]। (বাসাইল)

মূলভাব : সন্তান মানুষের ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে শিক্ষকের ভূমিকা বেশি।

www.pathagar.com

১০৬.
তুই দিলে তো মুই[৪৯] দেয়,
একা একা কত দেয়? (বাসাইল)
মূলভাব : দুই তরফ থেকে সমান আগ্রহ দেখালে সম্পর্ক জোরদার হয়।

১০৭
শ্বশুড় বাড়ি মধুর হাড়ি,
দুইদিন পরই হলার[৫০] বারি। (বাসাইল)
মূলভাব : অতি আদরের জায়গায়ও বেশি দিন থাকতে নাই।

১০৮.
যার ঘরে আছে ধান,
তার কথায় কথায় মান। (বাসাইল)
মূলভাব : সম্পদশালী বা বিত্তবাণকে মানুষ বেশি সম্মান দেয়।

১০৯.
মায়ের পুড়ে না, মারানির[৫১] পুড়ে,
হতমায়ের[৫২] না কি ঘুঘুরা[৫৩] পুড়ে। (বাসাইল)
মূলভাব : আপনজনের চেয়ে অন্যে বেশি দরদ দেখালে একথা বলা হয়।

১১০.
আসল ঘরে মুসুর[৫৪] নাই,
ঢেঁহি[৫৫] ঘরে চান্দা। (মির্জাপুর)
মূলভাব : মূলকাজ বাদ রেখে অন্য কাজ করা।

১১১.
কুত্তার[৫৬] কোনো কাম নাই,
দৌড় ছাড়া কাইক[৫৭] নাই। (মির্জাপুর)
মূলভাব : জীব মাত্রই তার প্রকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চলে।

১১২.
অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী,
কথায় কথায় ডিকসেনারি। (মির্জাপুর)
মূলভাব : অল্প জানা শোনা লোক বেশি বড়াই করে।

১১৩.
অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী,
জুতারে কয়[৫৮] আলমারি। (মির্জাপুর)
মূলভাব : অল্প জানা শোনা লোক বেশি বড়াই করে।

১১৪.
এক সহে[৫৯] মায়,
আর এক সহে নায়[৬০]। (মির্জাপুর)
মূলভাব : গর্ভধারিণী মা এবং খেয়াপারের নৌকা নানা প্রকার অত্যচার সহ্য করে।

www.pathagar.com

১১৫.

যেথা ধর্ম যেথা জয়,
ব্যবহারে পরিচয়। (মির্জাপুর)

মূলভাব : সত্য সর্বদা জয়ী হয়। এবং আচার ব্যবহারে মানুষকে যথার্থভাবে চেনা যায়।

১১৬.

যে কাঠ খায়,
সে আংগার[৬১] হাকে[৬২]। (মধুপুর)

মূলভাব : মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী ফল পেয়ে থাকে।

১১৭.

খেত কইর উরে[৬৩],
ইষ্টি কইর দূরে। (মধুপুর)

মূলভাব : বাড়ির কাছের জমিতে যেমন ফসল ভাল হয়, তেমনি দূরে আত্মীয় করলে সম্পর্ক ভাল থাকে।

১১৮.

বয়সকালে বেটা,
শেষকালে টেকা[৬৪]। (মধুপুর)

মূলভাব : প্রথম যৌবনের পুত্র সন্তান যেমন প্রয়োজন, তেমনি বৃদ্ধকালে টাকার প্রয়োজন।

১১৯.

ইষ্টি কইর, দেইখ্যা শুইন্যা,
টেকা নিও গুইন্যা গুইন্যা। (মধুপুর)

মূলভাব : দেখে শুনে আত্মীয় করা যেমন ভাল তেমনি কারো কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সময় গুনে নেওয়া ভাল।

১২০.

পরের ক্ষতি করে
যে, মাথা তুইল্যা ছুটে,
সবার আগে তাহার মাথা,
ধুলায় পইড়্যা[৬৫] লুটে[৬৬]। (মধুপুর)

মূলভাব : যে অন্যের ক্ষতি করে বা ক্ষতি কামনা করে তার নিজেরও ক্ষতি হয়।

১২১.

সুময় থাকতে রাইখ্যা[৬৭] খাইও,
বেলা থাকতে হাইটা[৬৮] যাইও। (মধুপুর)

মূলভাব : ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবেই কাজ করা উচিত।

১২২.

আয় বুঝে ব্যয় কর। (মধুপুর)

মূলভাব : যার যেমন আয় তার সে অনুপাতেই খরচ করা উচিত।

www.pathagar.com

১২৩.

ডাইল[৬৯] দিয়া ভাত খামু,
সোজা পথে আইটা[৭০] যামু। (ঘাটাইল)

মূলভাব : সরল মানুষের সব সময় নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের প্রত্যাশী।

১২৪.

নিজের থাকলে, খাইয়া দেইখ,
পরের থাকলে চাইয়া দেইখ। (ঘাটাইল)

মূলভাব : নিজের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পরের সম্পত্তি কোনো কাজে আসে না।

১২৫.

দাতার নারকেল, ভক্কিলের[৭১] বাঁশ,
চিপুইরায়[৭২] হয় না আনারস। (ঘাটাইল)

মূলভাব : নারিকেল দান করিলে ফলন বেশি হয়, বাঁশ দান করিলে কমে, কৃপণ ব্যক্তি আনারস খাইলে আফসোস করে।

১২৬.

সময়কালে বিয়া,
হাইঞ্জা[৭৩] কালে বাতি,
দিলেও যা, না দিলেও তা। (ঘাটাইল)

মূলভাব : সময়ের কাজ সময়ে না করলে অসময়ে তা ভাল ফল দেয় না।

১২৭.

বন্ধকী জমি নিঃসন্তান নারী,
একই সমান। (ঘাটাইল)

মূলভাব : নিজের জিনিস অন্যের কাছে থাকলে তার কোনো মূল্য নেই।

১২৮.

খেতের কোনা,
বাণিজ্যের সোনা। (ঘাটাইল)

মূলভাব : খেতের ফসল কৃসকের কাছে বাণিজ্যের সোনার চেয়েও অধিক মূল্যবান।

১২৯.

কয়লা যায় না ধুইলে,
স্বভাব যায় না মইলে। (ঘাটাইল)

মূলভাব : যার যে স্বভাব বৈশিষ্ট্য তা শত চেষ্টা করেও পরিবর্তন করা যায় না।

১৩০.

যেমন কুকুর,
তেমন মুগুর[৭৪]। (ঘাটাইল)

মূলভাব : যে যেমন তাকেই তেমন ভাবেই মূল্যায়ন করা উচিত।

www.pathagar.com

১৩১.

জন্ম হোক যেথা সেথা,
কর্ম হোক ভালো। (কালিহাতি)

মূলভাব : কর্মই মানুষের মূল্যায়নের মাপকাঠি, জন্ম নয়।

১৩২.

যে কয় আয় লো,
তার নগেই যাই লো। (কালিহাতি)

মূলভাব : ভালমন্দ বিচার না করে হুজুগে সাড়া দেওয়া উচিত নয়।

১৩৩.

আদা সব রোগের দাদা। (কালিহাতি)

মূলভাব : আদা খেলে সব রোগই কম বশি উপসম হয়।

১৩৪.

এছাকে তেছাকে[৭৫] মিলে,
ভুতকে পেতুনী,
খাবসার[৭৬] খাবসানী মিলে,
রাজার ভাগ্যে রানি। (কালিহাতি)

মূলভাব : যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য স্থান হয়।

১৩৫.

দাঁতের সাথে আঁতের মিল। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : দাঁত পরিছন্নতার সাথে পেটের পীড়ার সম্পর্ক রয়েছে।

১৩৬.

আদরে আদরে বউ নাল হয়। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : বেশি আদর করলে নষ্ট হয়।

১৩৭.

দার পেট কথায় ভরে না। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : ক্ষুধার কাছে সব কিছু হার মানে।

১৩৮.

চুক্কা চুক্কা কথা কয়,
হেইডাই আমার ননদ হয়। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : ননদের প্রতি ভাবির বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

১৩৯.

শামুকে পাও কাটে। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : অবহেলিত ব্যক্তির দ্বারাও মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১৪০.

এক পেট কুত্তায়ও পালে। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : একক ব্যক্তির খাবারের অভাব হয় না।

www.pathagar.com

১৪১.

জঞ্জালের চাইতে কাঙ্গাল ভালো। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : সন্তানের প্রতি বিরক্ত হলে বলা হয়।

১৪২.

কাঙ্গালের চাইতে জঞ্জাল ভালো। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : ধন সম্পদ না থাকলেও সন্তান থাকা ভাল।

১৪৩.

আক্কেলের ইশারা বেয়াক্কেলের ধাক্কা। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : পণ্ডিত ব্যক্তি ইঙ্গিতে বুঝে। আর বোকাকে বুঝাতে হয় মেরে।

১৪৪.

ছুটা গরুর নেঙ্গুরের দোষ। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : গরু দৌড়ানোর সময় লেজ উচুঁ এবং বাঁকা করে দৌড়ায়। এটা অনেকের কাছে দোষ মনে হয়।

১৪৫.

চৈতের গান বৈশাখে। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : এক সময়ের কথা অন্য সময় বললে বেমানান হয়।

১৪৬.

দশের চক্রে ভগবান অস্থির। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : দশজনের মতই জয়যুক্ত হয়।

১৪৭.

হাদা জিনিস আধা দাম। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : উপযাজক হয়ে জিনিস দিলে সেটার মূল্য কম হয়।

১৪৮.

হগুনের দোয়ায় গরু মরে না। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : স্বার্থযুক্ত দোয়া কাজে লাগে না।

১৪৯.

ওস্তাদের মাইর শেষ রাইতে। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : নেতা সবশেষে আসরে আসে।

১৫০.

আগা ধইরা মোচরাইতে না পাইরা গোড়া ধইরা মোচরায়। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : আসল জায়গায় কাজ করতে না পেরে অন্য জায়গায় চেষ্টা করলে বলা হয়।

১৫১.

কুত্তার পেটে ঘি হজম হয় না। (ভূঞাপুর)

মূলভাব : অভ্যাস না থাকেলে বেমানান হয়।

১৫২.

অতো নালি আদেস সের না। (ঘাটাইল)

মূলভাব : বেশি ক্ষমতা দেখালে কটাক্ষ করে বলা হয়।

www.pathagar.com

১৫৩.

ছলের জিনিস জলে যায়। (ঘাটাইল)

মূলভাব : প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ সহজেই নষ্ট হয়।

১৫৪.

ঘাড়ের নাম গর্দনা। (ঘাটাইল)

মূলভাব : একই বিষয় বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।

১৫৫.

ববার দিলে হুবার চায়। (ঘাটাইল)

মূলভাব : কিছু সুবিধা দিলে আরও সুবিধা চায়।

১৫৬.

একুইটা গরু বাঘে ধরে। (ঘাটাইল)

মূলভাব : বেশি জেদ বিপদ ডেকে আনে।

১৫৭.

আগে দর্শনদারী পরে গুণ বিচারী। (ঘাটাইল)

মূলভাব : বাহ্যিক দিক মূল্যায়ন করার পর গুণ বা বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করা হয়।

১৫৮.

ভাত পায় না খাট্টার জন্য কান্দে। (ঘাটাইল)

মূলভাব : খাবারের সাথে টক থাকলে রুচি বাড়ে। কিন্তু যার ভাতই নেই তার টকের প্রয়োজন কি?

১৫৯.

হক কথায় বন্ধু বেজার। (ঘাটাইল)

মূলভাব : সত্য কথা বললে বন্ধু অপ্রিয় হয়।

১৬০.

ভরা কলসি নড়ে না। (ঘাটাইল)

মূলভাব : জ্ঞানী ব্যক্তি সহজে মত প্রকাশ করে না।

১৬১.

হাদলে মানিক নষ্ট। (ঘাটাইল)

মূলভাব : সহজ প্রাপ্যতে বস্তুর যথার্থ মূল্যায়ন হয় না।

১৬২.

বেশি কথায় খ্যাতা আড়ায়। (ঘাটাইল)

মূলভাব : বেশি কথা বললে আসল কথা বাদ পড়ে।

১৬৩.

মোটা হইলেই দারোগা না। (ঘাটাইল)

মূলভাব : স্বাস্থ্য ভাল হলেই নেতা হয় না।

১৬৪.

ফু চলে না দুধ রোজ। (ঘাটাইল)

মূলভাব : অভাব থাকা সত্ত্বেও ভালো জিনিসের প্রতি আকাঙ্খা থাকলে বলা হয়।

www.pathagar.com

১৬৫.

খাতিরে খাতিরে মা-ওইর প্যাট। (ঘাটাইল)

মূলভাব : সুসম্পর্ক বেশি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়।

১৬৬.

ভাঙ্গা পাও গাতায় পড়ে। (ঘাটাইল)

মূলভাব : অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থানে আঘাত লাগে।

১৬৭.

মক্কার মানুষ হজ্জ পায় না। (ঘাটাইল)

মূলভাব : নিকটস্থ ব্যক্তি কাজের সময় পেছনে পড়ে।

১৬৮.

হাতারের উপর পানি নাই। (ঘাটাইল)

মূলভাব : বড়ো বিপদের সময় ছোটো বিপদ নগন্য মনে হয়।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ

১. যেনু- যেখানে, ২. হেনু- সেখানে। ৩. আলগোছে- আস্তে আস্তে ৪. খেতা-কাঁথা। ৫. আড়া-বন/জঙ্গল বিশেষ। ৬. ঠাঠারো-কাসা বা পিতলের কর্মকার। ৭. মেনোক-মেয়েলোক। ৮. হিল-শিল, ৯. মইচ-মরিচ, ১০. হারা-সারা/অনিষ্ট হওয়া। ১১. চেট- দায় (তুচ্ছার্থে)। ১২. নাইয়া- নায়ের মালিক। ১৩. নিনাইয়া- নৌকার মালিকানা বিহীন ব্যক্তি। ১৪. আছাড়ি-কাঠের হাতল। ১৫. দাও-দা। ১৬. নোয়া-লোহা। ১৭. তায়-তাপে। ১৮. রা-কথা। ১৯. আলা-ওয়ালা। ২০. বাইজা-আটকা। ২১. মোছ-গোঁফ। ২২. ভালা-ডাল, ২৩. ম্যায়া-মেয়ে। ২৪. ভীন্ন- পৃথক। ২৫ . আত্তি- হাতী। ২৬ . গাতা- গর্ত। ২৭. নাথি- লাথি। ২৪. দিমু-দিব। ২৯. হেই- সেই। ৩০. ছাতু- গমের গুড়ো। ৩১. মাহাইলাম- মাখাইলাম। ৩২. শইল-শরীর। ৩৩. খাপসা- পঁচা। ৩৪. ডাইল- ডাল। ৩৫. কাইল- কাল। ৩৬. বুইড়া- বৃদ্ধ। ৩৭. তলায়- গভীরে। ৩৮. চেংরা- কিশোর। ৩৯. পোলা- ছেলে। ৪০. আটে- হাটে। ৪১. মেয়া- মেয়ে। ৪২. কালা- কালো বর্ণ। ৪৩. আষাইঢ়া- আষাঢ় মাসের। ৪৪. খাইটা-খেটে। ৪৫. আইল্যা চাষা- কৃষক। ৪৬. হুইয়া- বানিয়া (বণিক)। ৪৭. আলি- চারটায় এক হালি। ৪৮. পুত- পুত্র। ৪৯. মুই- আমি। ৫০. হলার বারি- ঝাড়ুর বারি। ৫১. মারানি-উপপত্নী। ৫২. হতমায়ের-সৎমায়ের। ৫৩. ঘুঘুরা- পায়ের মুগুর। ৫৪. মশুর- মশারি। ৫৫. ঢেঁহি- ঢেঁকি। ৫৬. কুত্তা- কুকুর। ৫৭. কাইক- পদক্ষেপ। ৫৮. কয়- বলে। ৫৯. সহে-সহ্য করে। ৬০. নায়- নৌকায়। ৬১. আংগার- কয়লা। ৬২. হাগে- মল ত্যাগ করে। ৬৩. উরে- বাড়ির কাছে। ৬৪. টেকা- টাকা। ৬৫. পইড়্যা- পড়ে। ৬৬. লুটে- লুটুপুটি খায়। ৬৭. রাইখ্যা- রেখে। ৬৮. হাইটা- হেঁটে। ৬৯. ডাইল- ডাল। ৭০. আইটা- হেঁটে। ৭১. ভক্কিল- কৃপণ। ৭২. চিপুইরা- কৃপণ। ৭৩. হাইঞ্জা- সন্ধ্যে। ৭৪. মুগুর- খেতে ডেলা ভাঙায় ব্যবহৃত কাঠের দন্ড। ৭৫. এছাক তেছাক- যেমন তেমন। ৭৬. খাবসার- খারাপের।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

১. সন্ধ্যার পর মাছ ধরার গল্প বলতে নেই। বললে কানাউলায় ধরে নিয়ে যায়।

২. মাছ ধোয়া পানি মেয়েদের ডিঙ্গাতে নেই। ডিঙ্গালে মেয়েদের লজ্জাস্থানে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হয়।

৩. পাটখড়ি দিয়ে কাউকে মারতে নেই। মারলে সে শুকিয়ে যায়।

৪. ভাজা পিঠার প্রথমটি ও বাড়া ভাতের প্রথমটা মেয়েদের খেতে নেই। খেলে সংসারের আয় কমে যায়।

৫. উঠান ঝাঁট না দিয়ে কোথাও যাত্রা করতে নেই। যাত্রা করলে দুর্ঘটনা ঘটবে।

৬. মেয়েদের ফাটা চুড়ি হাতে দিতে নেই। দিলে অমঙ্গল হয়।

৭. মাথায় কাপড় না দিয়ে মেয়েদের প্রশ্রাব অথবা মলত্যাগ করতে নেই। করলে ভুত পেত্নীর আছর হয়।

৮. শনিবার ও মঙ্গলবারে কাউকে গোবর দিতে নেই। দিলে গরু মারা যায়।

৯. ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে নেই। দেখলে আয়ু কমে যায়।

১০. ভাঙ্গা থালা বা গ্লাসে পানি খেতে নেই। খেলে আয়ু কমে যায়।

১১. সন্ধ্যার সময় ঘর ঝাড়ু দিয়ে বাইরে ফেলতে নেই। লক্ষ্মী চলে যায়।

১২. পান কারো শরীরের উপর দিয়ে অন্যকে দিতে নেই। দিলে যে ব্যক্তির উপর দিয়ে দিবে তার পাণ্ডুর রোগ হয়।

১৩. ছোট ছেলেমেয়েদের দাঁত পড়ে গেলে সে দাঁত ইঁদুরের গর্তে ফেলে দিতে হয়। তাহলে যখন নতুন দাঁত গজাবে সে দাঁত ইঁদুরের দাঁতের মতো সরু, ধারালো ও মজবুত হবে।

১৪. নদীতে কিংবা পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে প্রস্রাব করতে নেই। করলে গনোরিয়া রোগ হয়।

১৫. অমাবস্যা রাতে স্ত্রী সহবাস করতে নেই। করলে পরবর্তীতে ছেলে সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তান চোর বাঁটপার হয়। মেয়ে জন্ম নিলে সে বেশ্যা হয়।

১৬. সন্ধ্যা কিংবা রাতে হলুদ কর্জ দিতে নেই। দিলে বিবাহযোগ্যা মেয়েকে বিবাহ দিতে বিলম্ব হয়।

১৭. নতুন চাঁদ দক্ষিণ দিকে বাঁকা হয়ে উঠলে দেশে আকাল পড়বে।

১৮. চুলো বা হেসেলের উপর পাতিল থেকে কিছু খেতে নেই। খেলে বজ্রপাতে মরার সম্ভাবনা থাকে।

www.pathagar.com

১৯. গর্ভকালীন সময়ে গর্ভবতীর খোসাওয়ালা বা খসখসে মাছ খেতে নেই। খেলে সন্তানের শরীর খসখসে হয়।

২০. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় চৌকাঠে কিংবা অন্য কোনো কিছুর আঘাত লাগলে কিছু সময় বসে তারপর যেতে হয়। না হলে অমঙ্গল হবে।

২১. বাম চোখ নাচলে অমঙ্গল হয়।

২২. খাওয়ার পর পরনের কাপড়ে হাত মুখ মুছলে গরিব হয়ে যায়।

২৩. ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা অমঙ্গলের লক্ষণ।

২৪. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় কিছু খাওয়া যায় না। এত ক্ষতি হয়, বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা কিছু খেলে ঠোঁট কাটা সন্তান প্রসব করার সম্ভাবনা থাকে।

২৫. পাল্লা-হাঁড়ি-কুলা-চালুন প্রভৃতিতে পা লাগা ভালো নয়। পা লাগলে সালাম করতে হয়।

২৬. যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হয় বলে বিশ্বাস।

২৭. বিবাহিত মেয়ের চুলের খোঁপা খোলা রাখলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।

২৮. ভাঙা প্লেটে খেলে আয়ু কমে যায়।

২৯. যাত্রাকালে হাঁচি এলে কিছুক্ষণ বসে যাত্রা করতে হয়।

৩০. কোনো কিছু দেখে ভয় পেলেও লোহা পুড়ে পানি পান করা হয়।

৩১. কাউকে কুপির আগুন দিলে ঘরের লক্ষ্মী চলে যায়।

৩২. বিড়াল নিজের পা চাটতে থাকলে ঘরে মেহমান আসবে বলে ধারণা করা হয়।

৩৩. চাল ভাজা খাওয়া গরিবের লক্ষণ।

৩৪. এক নাগাড়ে কুকুর ডাকলে অমঙ্গলের আশংকা করা হয়।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

ক. নৌকা

লোকপ্রযুক্তির অন্যতম একটি নিদর্শন হলো নৌকা। এককালে টাঙ্গাইল জেলার জলাময় এই জনপদে যোগাযোগের বড় মাধ্যম ছিল নৌকা। টেকসই জাতীয় গাছ দিয়ে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের নৌকা। মাচাল, গলৈ, গুরা, বৈঠা, হাল, চৌড় এগুলো নৌকা তৈরির উপকরণ। পাতাম দিয়ে নৌকা মিস্ত্রিরা একটার পর একটা তক্তা লাগিয়ে তৈরি করে নৌকা। বাচাড়ি, খোসা, পানসি, করফাই, ব্যাপারী নৌকা এরকম নানাবিধ নৌকা গ্রাম্য দারু শিল্পীগণ তৈরি করে থাকেন। লক্ষ্মীপূজা, দুর্গাপূজা ও কালীপূজার মেলায় বাচাড়ি নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।[১]

নৌকা

খ. ভেলা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বর্ষা মৌসুমে চলাচলের জন্য প্রাচীন লোকপ্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম হলো ভেলা। যাদের নৌকা কেনার সামর্থ্য নেই তারা কলাগাছ দিয়ে নিজেরাই ভেলা তৈরি করে ব্যবহার করে। ৪/৫টি কলাগাছ একত্রে করে বাঁশের কাঠি দিয়ে দুই পাশ থেকে বেঁধে এটি তৈরি করে থাকে। গ্রাম অঞ্চলের প্রায় সবাই এটি তৈরি করতে পারে। ভেলা খুব ধীরে চলে কারণ এটি অত্যন্ত ভারী। দীর্ঘদিন পানিতে থাকতে থাকতে কলাগাছগুলো পচন ধরে যায়, তখন তার ভাসমান ক্ষমতা কমে যায়।[২]

www.pathagar.com

ভেলা

গ. পলো

বাঁশের তৈরি এক প্রকার মাছ ধরার যন্ত্র। দেখতে অনেকটা মাইকের হর্নের মত। এটি দিয়ে গভীর পানিতে নেমে মাছ ধরা যায়। সারিবদ্ধভাবে দশ-বারো জন বা তারও বেশি লোক মিলে একযোগে এই পলো পানিতে চাপতে চাপতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। পলো তৈরিতে বাঁশই প্রধান উপকরণ। তবে কাঠামো তৈরিতে পাটের চিকন্ দড়ি বা গুনার দরকার হয়। প্রথমে বাঁশের মোটা শলাকা তৈরি করা হয়।

পলো দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য

তারপর বাঁশের বেতি দিয়ে চাক তৈরি করা হয়। প্রথম চাকটির ব্যাস ছয়-সাত ইঞ্চি হয়। এটি থাকে সবার উপরে। পরবর্তী চাকগুলো আনুপাতিক হারে ক্রমশ বড় হতে

www.pathagar.com

থাকে। সর্বনিম্নের চাকটির ব্যাস আড়াই থেকে তিন ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। চাকগুলোর ওপর দিয়ে বাঁশের তৈরি শলাকাগুলোকে অনেকটা কৌণিকভাবে স্থাপন করে চিকন দড়ি দিয়ে ঘন সন্নিবদ্ধভাবে বাঁধা হয়। এভাবেই খাঁচার মতো সুদৃশ্য পলো তৈরি হয়। সবার উপরের চাকটিকে ধরার সুবিধার্থে পাটের দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বেশ মোটা করা হয়।[৩]

ঘ. ঢেঁকি

ধান ভানার পুরাতন লোকযন্ত্র হচ্ছে ঢেঁকি। টাঙ্গাইলের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এখনো ঢেঁকি দেখতে পাওয়া যায়। গৃহস্থ বাড়িতে ঢেঁকির পাড়ের শব্দ ও কচকচানি এক চিরচেনা আওয়াজ। ঢেঁকিতে শুধু ধান নয়, গম পাড়ানো, গমের ছাতু পাড়ানো, চালের গুড়া কোটা এবং চিড়া কোটা হয়ে থাকে।

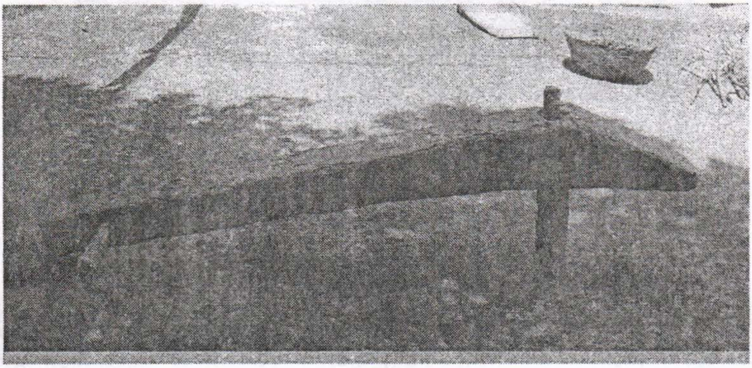

ঢেঁকি

গ্রামীণ গরীব নারীরা অর্থের বিনিময়ে বাড়া ভানার কাজ করে থাকে। গরীব রমণীরা অনেকে নিজ বাড়িতে ঢেঁকিতে ধান ভেনে বাজারে চাউল বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে 'বিরক' ভানা। ঢেঁকি তৈরির একমাত্র উপকরণ কাঠ। দশ-বার ফুট লম্বা গাছের গুড়ি ছেঁটে ঢেঁকি তৈরি করা হয়। ঢেঁকির অগ্রভাগ একটু সরু এবং পিছনের দিকে ক্রমান্বয়ে মোটা বা প্রশস্ত হয়। গোড়ার দিকের স্ফীত অংশে পা দ্বারা আঘাত করে ধান ভানা হয়।

অর্থাৎ ঢেঁকির অগ্রভাগ ওঠানামা করানো হয়। স্ফীত অংশের সামান্য সামনে আড়াআড়িভাবে একটি ছিদ্র তৈরি করা হয়। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে গোলাকৃতির এক টুকরো কাঠ লাগানো হয় যার দুই দিকে বর্ধিত অংশ থাকে। দুই দিকের বর্ধিত গোল কাঠটি মাটিতে পোঁতা মোটা কাতলার ওপর বসানো হয়। ঢেঁকির অগ্রভাগের একফুট বা তার একটু কম পিছনে ওপর নিচে একটি ছিদ্র করা হয়। এখানে নিচের দিক থেকে একটি গোলাকৃতির দ-লাগানো হয় যা মাটির দিকে ক্রমশ মোটা। স্থানীয় ভাষায় যার নাম 'ওচা'। এই ওচার নিম্নভাগে একটি ধাতব রিং লাগানো হয়। যাকে বলা হয় 'কালি'। এই কালিটি ধানের খোসা আলগা করতে ভূমিকা পালন করে। ঢেঁকির ওচা বরাবর মাটি খুঁড়ে 'নোট' নামে পরিচিত একটি গর্ত করা হয়। নোটের তলায় একটি

www.pathagar.com

শক্ত কাঠের গুড়ি বা কংক্রিটের টুকরা স্থাপন করা হয়। ঢেঁকি তৈরিতে শক্ত কাঠ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত শেওড়া, গাব, বেল বা গামার গাছ ঢেঁকি তৈরিতে ব্যবহৃত থাকে।[৪]

ঙ. জাতা

ডাল ভাঙ্গার পুরাতন লোকযন্ত্র হচ্ছে জাতা। টাঙ্গাইলের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এখনো জাতা দেখতে পাওয়া যায়। গৃহস্থ বাড়িতে যাতা খুবই প্রয়োজনীয়।[৫]

যাতা

চ. চালুনি

টাঙ্গাইলের লোকজীবনে চালুনি এক অপরিহার্য গৃহস্থ উপকরণ। এটি বাঁশের তৈরি একটি ছাকনা বিশেষ। ধান, গম, সরিষা ইত্যাদি কৃষি পণ্যের মধ্যে মিশে থাকা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পৃথকীকরণের কাজে চালুনি ব্যবহার করা হয়। এর প্রধান উপকরণ বাঁশ ও গুনা। বাঁশ দিয়ে পাতলা ও চিকন বেতি তৈরি করা হয়। এই বেতিগুলো সামান্য পরিমান ফাঁকা রেখে প্রায় গোলাকৃতির একটি চটা বুনানো হয়। তারপর দেড়-ইঞ্চি প্রশস্ত বাঁশের বেতি দ্বারা একটি চাক তৈরি করে চটাটির কিনারা বরাবর গুনা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়।[৬]

চালুনি ও অন্যান্য সামগ্রী

ছ. ডোল

শস্য রাখার এক প্রকার আধার হচ্ছে ডোল। টাঙ্গাইলের গ্রামাঞ্চলে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। গৃহস্থ বাড়িতে এর প্রয়োজন অনিবার্য। বাঁশ দিয়ে পাতলা ও বেশ প্রশস্ত বেতি তৈরি করা হয়। তারপর উক্ত বেতি দ্বারা বর্গাকার একটি চটা তৈরি করা হয়। বর্গাকার চটাটির চারদিকে একই সাথে চারটি দেয়াল বিশেষ কৌশলে বুনে ওপরের দিকে তোলা হয়। ফলে দেখতে কাগজের তৈরি ঠোঙার মতো একটি বস্তু তৈরি হয়। অতপর ওপরের প্রান্ত বরাবর এক-দেড় ইঞ্চি মোটা বাঁশের বেতি দিয়ে একটি চাক বানিয়ে লাগিয়ে দিলেই ডোল তৈরি হয়ে যায়।[৭]

জ. হুকা

লোকজীবনে ধূমপানের জন্যে সুপ্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে হুকা। খেতে-খামারে নিয়োজিত মজুরশ্রেণির লোকেরা দলীয়ভাবে হুকা দ্বারা ধূমপান করে থাকে। বিড়ি সিগারেট ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার আগে হুকাই ছিল ধূমপানের সহজ ও সুপ্রাচীন ব্যবস্থা। নারকেলের শক্ত খোলসটির সোজা উপরিভাগে একটি ছিদ্র করে তাতে কাঠের তৈরি ফাঁপা নল বা নলচে লাগানো হয়। নলচেটির গায়ে অনেক সময় সুদৃশ্য কারুকাজ করা হয় শোভা বর্ধনের জন্য। নলচের মাথায় মাটির তৈরি একটি কল্কি থাকে যা প্রয়োজনে খোলা বা লাগানো যায়। নারকেলের খোলটির দেয়ালের একপাশে নলচের সংযোগ থেকে সামান্য নিচে আরেকটি ছিদ্র করা হয়। এ ছিদ্র পথে মুখ লাগিয়ে ধূমপান করা হয়। হুকা তৈরি হওয়ার পর নারকেলের খোলসের ভিতরে পানি প্রবেশ করানো হয়। তারপর ওপরের মাটির কল্কেতে নারকেলের শুকনো আঁশ কুচি কুচি করে কেটে তাতে অঙ্গার বা জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। এই জ্বলন্ত আঁশে তামাক পাতা সংযোগ করে নিচের খোলসের ছিদ্র পথে মুখ দিয়ে ধূয়া টেনে নিতে হয়। এসময় হুকার ভেতর পানিতে ঘড় ঘড় শব্দ ওঠে।[৮]

হুকা

www.pathagar.com

ঝ. জাঁতি বা ছরতা

এটি সুপারি কাটার যন্ত্র। টাঙ্গাইলে এর নাম সরতা/ছরতা হিসেবে পরিচিত। লৌহ নির্মিত জাঁতির দুটি অংশ। উপরের অংশ বাঁকা ধারালো ছুরির মতো। নিচের অংশ লৌহদণ্ড বিশেষ। উভয়ের এক প্রান্ত স্ক্রু দ্বার সংযুক্ত থাকে। অপর প্রান্ত খোলা। নিচের দণ্ডে সুপারি রেখে উপরের অংশে চাপ দিয়ে সুপারি কাটা হয়। এক হাতের আঙুলে সুপারি আর অপর হাতের আঙুলে সরতা ধরে এভাবে সরু অথবা মোটা করে সুপারি কাটা হয়। সংসারের আবশ্যক সামগ্রী হিসেবে টাঙ্গাইল জেলার প্রায় প্রতিটি ঘরেই একটি জাঁতি বা সরতা থাকবেই। কারণ টাঙ্গাইলের বেশিরভাগ মানুষই পান-সুপারি খেয়ে থাকেন। স্থানীয় কামার জাঁতি তৈরি করে থাকেন।[৯]

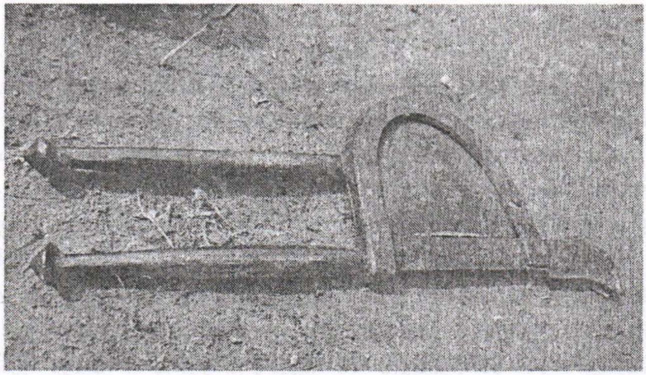

জাঁতি বা ছরতা

ঞ. লাঙল

লাঙল একটি বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কৃষিযন্ত্র। আধুনিক যান্ত্রিক আবিষ্কারের পূর্বে কাঠের তৈরি এ যন্ত্রটি ছিল কৃষকের চাষাবাদের অপরিহার্য উপকরণ। কাঠের তৈরি লাঙল কেবল প্রাচীন চাষযন্ত্রই নয় এটি পুরোনো লোকঐতিহ্যের একটি অনন্য নিদর্শনও বটে। লাঙল তৈরির প্রযুক্তিতে কাঠই প্রধান ভূমিকা পালন করে। তবে কাঠের সঙ্গে সামান্য লোহার ব্যবহারও রয়েছে। মাটির সাথে সামান্য কৌণিক অবস্থায় একটা প্রশস্ত কাঠ থাকে যাকে বলে পৈঠা। এই পৈঠার সাথে উপরের দিকে একটা প্রায় খাড়া কাঠ লাগানো হয় যা ক্রমশ অগ্রভাগের দিকে সরু হয়। এবং অগ্রপ্রান্তের সরু অংশে পিছনের দিকে ঈষৎ বর্ধিত ডিম্বাকৃতির একটি হাতল থাকে যাকে স্থানীয় ভাষায় কুঠি বা কুটি বলা হয়। মাটির সাথে কৌণিকভাবে লাগানো প্রশস্ত পৈঠার অগ্রভাগটি খুব সরু ও সূচালো রাখা হয়। এই সরু ও সূচালো অংশের উপরিতলে একটি ধারালো লোহার তৈরি ফলা লাগানো হয় যা মাটিকে অলগা করতে ভূমিকা রাখে। পৈঠা এবং কুটির সংযোগস্থলে চৌকোণা একটি সুরঙ্গ তৈরি তাতে চৌকোণা লম্বা কাঠের এক প্রান্ত ঢুকিয়ে শক্ত করে আটকানো হয়। এ কাঠটি সংযোগ প্রান্তের বিপরীত দিকে ক্রমশ সরু হয়ে থাকে। এ কাঠটিকে বলা হয় লাঙলের ঈষৎ। ঈষতের অগ্রভাগের আধা ফুট পেছনে নিচের তলে

www.pathagar.com

কয়েকটি খাঁচ কাটা থাকে। এ খাঁচের সঙ্গে হাল লেংড়া বা মোটা রশি আটকিয়ে জোয়ালের সাথে লাঙলকে বেঁধে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, হাল লেংড়া ঈষের বিভিন্ন খাঁচে স্থানান্তর করে প্রয়োজনমত লাঙলের ফলা বা ফালকে মাটির সঙ্গে বিভিন্ন কৌণিকে স্থাপন করা যায়।[১০]

লাঙ্গল

ট. মই

মই একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কৃষিযন্ত্র। কাঠের অথবা বাঁশের তৈরি এ যন্ত্রটি ছিল কৃষকের চাষাবাদের অপরিহার্য উপকরণ। মই তৈরির প্রযুক্তিতে বাঁশই প্রধান উপকরণ।

মই/চংগ

www.pathagar.com

তবে কাঠের ব্যবহারও রয়েছে। টাংগাইলের কোনো কোনো এলাকায় মইকে চংগ বলে থাকে। এটি তৈরি করতে একটি মোটা বাঁশ মাঝামাঝি দুই খণ্ড করা হয়। বাঁশটির এক ফুট দুরত্বে দুই পাশে ছিদ্র করে সেখানে আরও একটি করে বাঁশের শক্ত কাঠি ঢোকানো হয়। এভাবেই তৈরি করা হয় মই বা চংগ। মই ছাড়া কৃষি কাজের জমি চাষ উপযোগী করে তোলা সম্ভব ছিল না। বর্তমানে ট্রাক্টর দ্বারা জমি চাষ করার ফলের এর গুরুত্ব অনেকটাই কমে গেছে।[১১]

ঠ. কোদাল

কোদাল একটি বহু প্রাচীন কৃষিযন্ত্র। আধুনিক যান্ত্রিক আবিষ্কারের পূর্বে কোদাল ছিল কৃষকের চাষাবাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। লোহার তৈরি কোদাল কেবল প্রাচীন চাষযন্ত্রই নয় এটি দ্বারা অন্যান্য বিভিন্ন কাজ করা হয়। কোদাল তৈরি করতে লোহার চেপ্টা অংশের বিপরীতে ছিদ্রযুক্ত অংশে কাঠে অথবা বাঁশের ২/৩ হাত লম্বা হাতল লাগানো হয়। গ্রামের সকল মানুষ কোদালের ব্যবহার করে থাকে। এটি অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রাচীন যন্ত্র। এটির সামনের অংশ ধারালো লোহার তৈরি যা কৃষি জমির মাটি অলগা করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং গ্রামের মানুষের মাটি কাটার একমাত্র যন্ত্র।[১২]

কোদাল

ড. গরুর গাড়ি/মহিষের গাড়ি

লোকপ্রযুক্তির অন্যতম একটি নিদর্শন হলো গরুর গাড়ি/মহিষের গাড়ি। এককালে টাঙ্গাইল জেলার এই জনপদে যোগাযোগের বড় মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ি/মহিষের গাড়ি। কাঠে দুইটি চাকা এবং বাঁশের তৈরি বডি যুক্ত গাড়িটি চালাতে দুইটি গরু/মহিষের প্রয়োজন। এটি গ্রাম্য ছুতাররা তৈরি করে থাকেন। পূর্বে গ্রামের কৃষকরা ধান, পাট এবং অন্যান্য ভারি মালামাল হাটে বাজারে আনা-নেয়ার জন্য গরুর গাড়ি

www.pathagar.com

ব্যবহার করতেন। এটিই ছিল তখন একমাত্র সহজলভ্য যানবাহন। বর্তমানে এটি বিলুপ্তির পথে। তবে এখনও পাহাড়ি অঞ্চলে গরু/মহিষের গাড়ির ব্যবহার দেখা যায়।[১৩]

মহিষের গাড়ি

ঢ. ঘুঁটে বা গোবরের লড়ি

টাঙ্গাইল জেলার জ্বালানির একটি উৎস ছিল গরুর গোবর। কাঁচা গোবর দিয়ে ঘুঁটে তৈরি করে তা রোদে শুকিয়ে জ্বালানির সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী চাহিদা পূরণ করা হয়। টাঙ্গাইলের এলাকায় একে ঘঁষি বলা হয়। গোয়ালঘর কিংবা চারণভূমি থেকে কাঁচা গোবর সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত গ্রামের মহিলারা এ কাজ বেশি করে থাকে। গোবর সংগ্রহ করে তার সাথে তুষ বা খড় মিশিয়ে গোল পিণ্ড হাতের তালুতে চাপ দিয়ে ঘুঁটে তৈরি করা হয়। একে ঘুঁটে বলে।

ঘুঁটে বা গোবরের লড়ি

www.pathagar.com

আবার এই ঘুঁটে পাটকাঠি বা বাঁশের শুকনো কঞ্চির চারপাশে তুষ বা খড় মিশ্রিত কাঁচা গোবর দুই হাত দিয়ে চেপে লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরে রোদে শুকিয়ে পালা করে রাখা হয়। এটি সাধারণত দেড়/দুই হাত লম্বা হয়। শুকনা মৌসুমে ঘুঁটে তৈরি করে বর্ষা মৌসুমে রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঘুঁটের আগুনে তাপ বেশি হয়। ঘুঁটের আগুন বেশি সময় জ্বলে। তাই আঁতুর ঘরে প্রসূতি সারারাত ঘুঁটে জ্বালিয়ে নবজাতককে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করে। টাঙ্গাইলের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘুঁটে ব্যবহার করে থাকে।[১৪]

ণ. নলকাইটা

গৃহস্থ বাড়ির উগার বা মাচাকে আড়াল করার জন্য এক ধরনের বেড়া হচ্ছে নলকাইটা। এটি বাঁশ দ্বারা তৈরি করা হয়। বাঁশের প্রশস্ত বেতি কেটে বড় বড় খোপ বা ফাঁক রেখে এক ধরনের বেড়া বিশেষ কৌশলে বুনানো হয়। এতে ঘরের সৌন্দর্য যেমন বাড়ে তেমনি এক বিশেষ শিল্পবোধের প্রকাশও দৃষ্টিগোচর হয়।[১৫]

ত. ধিয়াইর

এটা মাছ ধরার এক বিশেষ যন্ত্র। এটিও বাঁশ নির্মিত। নদীর ধারে, বিলে বা ডোবায় ডুবিয়ে রাখলে এতে ছোটো ছোটো মাছ ধরা পড়ে। এটি তৈরিতে বাঁশ এবং এক ধরনের চিকন ও শক্ত নল জাতীয় লতা ব্যবহৃত হয়। ইহা বিভিন্ন ধরন ও আকৃতির হয়। প্রথমে বাঁশ কেটে খুব সরু করে শলাকা তৈরি করা হয়। শলাকাগুলোকে পাশাপাশি খুব সন্নিবদ্ধভাবে শক্ত নল দিয়ে বেঁধে একটি শলাকা জাল বোনা হয়। তারপর ধিয়াইরের ধরন অনুযায়ী মোটা বেতি দিয়ে একটি কাঠামো তৈরি করা হয়। কাঠামোর গায়ে প্রয়োজন মতো শলাকা জালটি জড়িয়ে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। এ

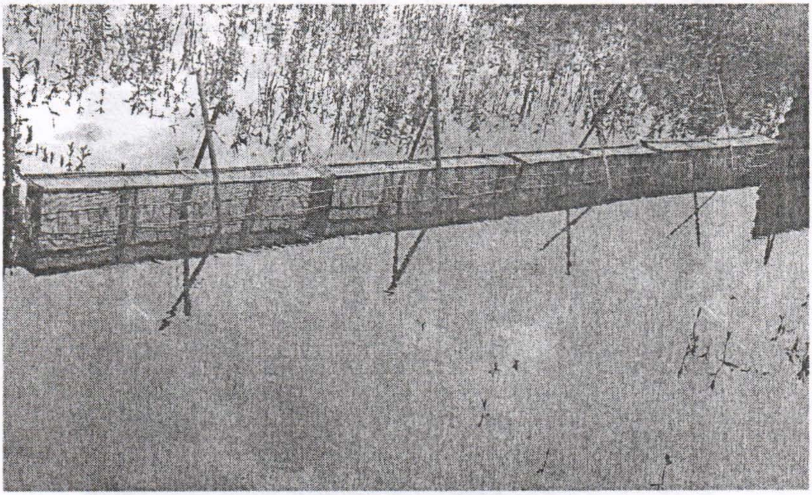

ধিয়াইর

www.pathagar.com

সময় ধিয়াইরের দুই দিকে প্রবেশ দ্বার তৈরি করা হয় যাতে মাছ অনায়াসে ভিতরে ঢুকতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না। ওপরের দিকে একটি ঢাকনা রাখা হয় যা সহজে খোলা বা লাগানো যায়। এ ঢাকনা খুলেই ধিয়াইর থেকে মাছ বের করে নেওয়া যায়।[১৬]

থ. ওছা/হরকা

মাছ ধরার এক প্রকার যন্ত্র। এটি বাঁশের তৈরি। দেখতে অনেকটা পানি সেচে ব্যবহৃত হোচার মতো কিন্তু আকৃতিতে হোচার চেয়ে বহুগুণে বড়। ওছা প্রায় সাত-আট হাত লম্বা এবং পাঁচ-ছয় হাত চওড়া হয়ে থাকে। টাঙ্গাইল নদীবহুল এলাকা হওয়ায় এ অঞ্চলে এটি বহুল ব্যবহৃত মাছ ধরার যন্ত্র। আঞ্চলিক ভাষায় একে শরকা বা হরকা বলা হয়ে থাকে। বাঁশ দ্বারা চটা তৈরি করে হোচার মতো করে এটি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সম্মুখভাগের দুই কোণায় দুটি সরু বাঁশের লম্বা লাঠি শক্ত করে আটকানো থাকে। যা দ্বারা ওছা পানিতে ঠেলে ডুবিয়ে রাখা বা টেনে পানি থেকে ডাঙার কিনারে তুলে আনা যায়। ওছার ভিতরে লতা-পাতা, ডাল-পালা দিয়ে ঝাড় বানিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। যাতে ঝোঁপ-ঝাড়ের ভিতরে মাছ আশ্রয় নিতে আসে।[১৭]

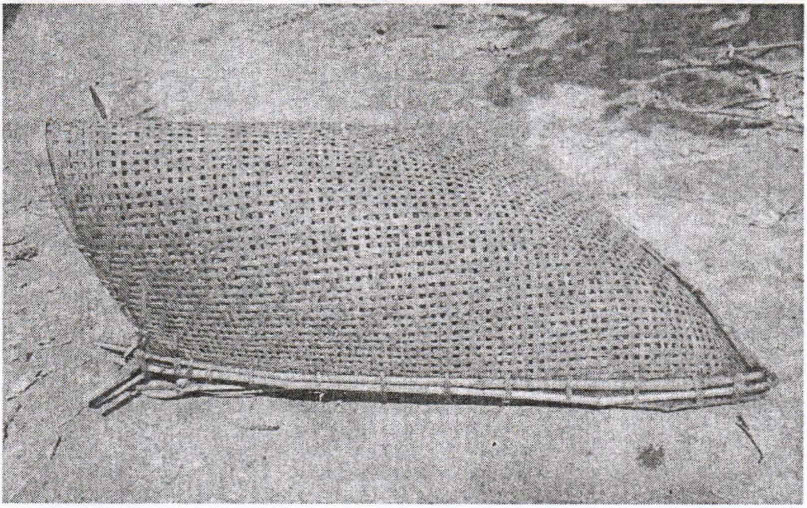

ওছা

দ. খুচইন/খুইয়া

খুচইন বা খুইয়া সুতা দিয়ে জালের মতো বোনা হয়। ইহা তিন কোণাকৃতির হয়। এর তিন দিকে বাঁশের কাঠি দিয়ে মোড়ানো হয়। তারপর মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। খেত-খামারে কিংবা নালা-ডোবায় অল্প পানিতে মাছ চলাচল করে। খুচইন দিয়ে সে মাছ ছেঁকে তোলা হয়। বাঁশের অখণ্ড প্রান্ত ধরে শিকারি জাল পানিতে ডুবিয়ে ঠেলে সামনের দিকে নেয় এবং মাঝে মাঝে উপরে তুলে দেখে মাছ ধরা পড়েছে কিনা।[১৮]

www.pathagar.com

খুচইন/খুইয়া জাল

ধ. ধর্মজাল বা ছিপজাল

এ জাল চারকোণা বিশিষ্ট। চারটি 'বাঁশের টুকরো দিয়ে আড়াআড়িভাবে একটি কাঠামো তৈরি করে জালের চারটি কোণে বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর অন্য একটি বাঁশের সাহায্যে জালটিকে পানিতে ফেলা হয় এবং বাঁশের এক প্রান্তে চাপ দিয়ে এই জালটি পানি থেকে তোলা হয়। এটি সাধারণত খাল পাড়ে একটি মাচা তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসানো হয়। জোয়ার-ভাটার সময় এই জাল ফেলা হয়।[১৯]

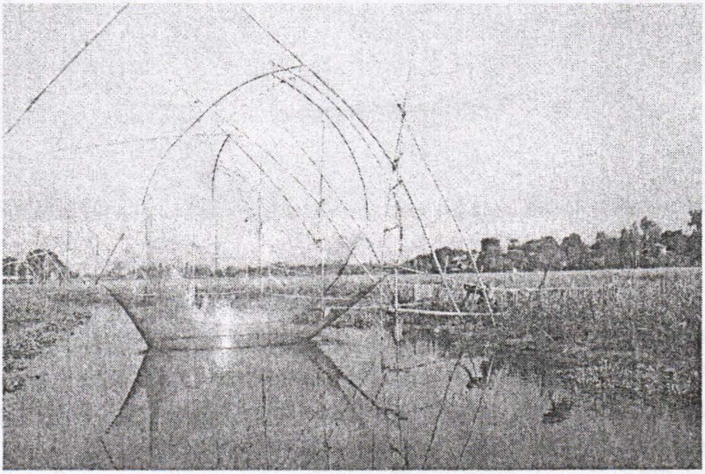

ধর্মজাল বা ছিপজাল

www.pathagar.com

ন. কোচ

ছাতির শলাকার মতো সূচালো অগ্রভাগসম্পন্ন কয়েকটি লোহার শলাকা বাঁশের মাথায় বরশির মতো কালযুক্ত থাকে। সাধারণত এটা দিয়ে কোপ মেরে মাছ ধরা হয়।[২০]

প. খলুই

আগের দিনে বাজার করার ব্যাগের পরিবর্তে মাছ কিনে আনার জন্য খলুই ব্যবহৃত হতো। তবে এই খলুই সাধারণত জাল দিয়ে মাছ ধরার পর সেগুলোকে তুলে রাখার কাজে বেশি ব্যবহার করা হতো। এটি বাঁশের চিকন পাতের তৈরি ও বেত দিয়ে বাঁধা হয়।[২১]

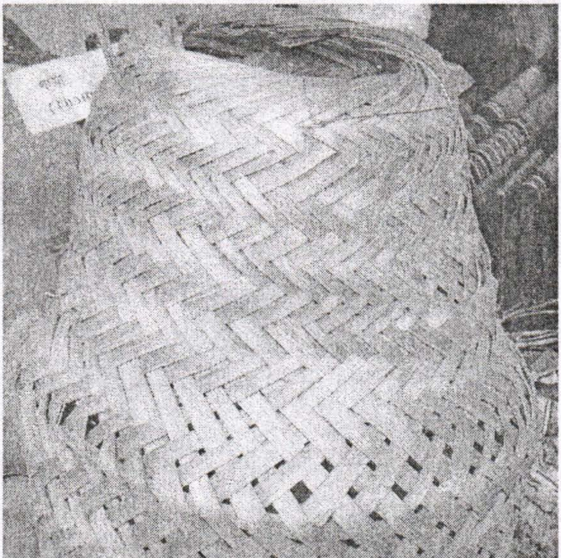

খলুই

ফ. ছিক্কা বা শিকা

পাট থেকে তৈরি দড়ি দিয়ে ছিক্কা বা শিকা তৈরি করা হয়। এটি রান্নাঘরে রাখা খাবার বিড়ালের হাত থেকে নিরাপদ রাখার জন্য তৈরি করা হয় এবং কিছু কিছু বাসনকোসন রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাটের দড়ি দিয়ে চুলের বিনুনির মতো পাকিয়ে সেগুলো নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়ে শিঁকা তৈরিতে গ্রামের মহিলাদের ভূমিকা অপরিহার্য।[২২]

www.pathagar.com

ব. মাথাল

এটি সাধারণত তালপাতা বা গোলপাতা দিয়ে তৈরি করা হয়। ওপরের অংশটি টুপির মতো করে তৈরি করা হয়। আগের দিনে ছাতার ব্যবহার কম ছিল, তাই রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথাকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথাল ছিল গ্রামের মানুষের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এটি সাধারণত মাঠে-খেতে কৃষকেরা বেশি ব্যবহার করে থাকে।[২৩]

ভ. হাতপাখা

তালগাছের পাতা, বট এবং পাকুট পাতা দিয়ে এই পাখা তৈরি করা হয়। এর চারপাশের অংশটা বেত বা বাঁশের পাতলা পাত দিয়ে মুড়িয়ে সুতা দিয়ে সেলাই করে দেয়া হয়। একটি তালগাছের পাতায় দুটি পাখা তৈরি করা যায়। এছাড়া মোটা কাপড় দিয়েও হাতপাখা তৈরি করে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুতার কাজ করা হয়, যাকে নকশি পাখা বলা হয়। গ্রামের মহিলারা এই হাতপাখায় নানান ধরনের বাণী পেনসিল দিয়ে লিখে তার ওপর বিভিন্ন রং-এর সুতা দিয়ে সেলাই করে। বাড়িতে নতুন জামাই, জামাইয়ের আত্মীয়-স্বজন কিংবা অন্য কোনো মেহমান এলে তাদের বাতাস খাওয়ার জন্য পাখা দেয়া হয়। বর্তমানে গ্রামে বিদ্যুত আসার কারণে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় হাত পাখার ব্যবহার অনেকটা কমে গেছে।[২৪]

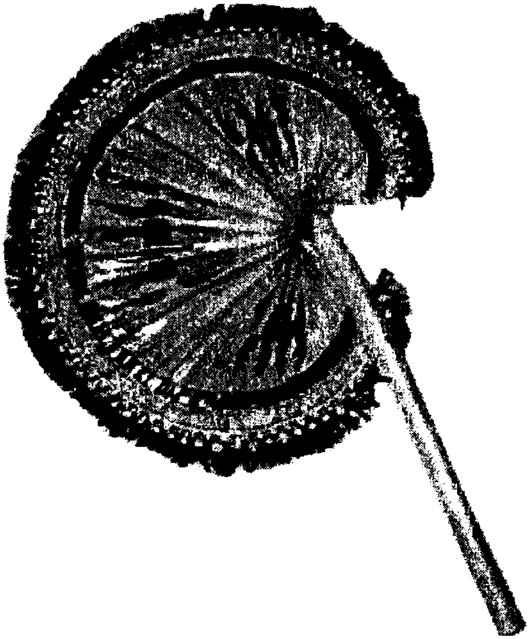

হাতপাখা

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. অধ্যাপক বাণীতোষ চক্রবর্তী, বয়স ৬৫, গ্রাম ও ডাকঘর : ডুবাইল, থানা- গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
২. মো. ইউনুস ইসলাম তালুকদার, উপজেলার চেয়ারম্যান, গোপালপুর, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৩. মো. আ. করিম, প্রধান শিক্ষক, পাকুয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স : ৪৭ বছর, গ্রাম : ডুবাইল (পশ্চিম পাড়া), ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৪. মো. দেলোয়ার হোসেন, প্রধান শিক্ষক, পশ্চিম ডুবাই রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স : ৪৮ বছর, গ্রাম : নিচনপুর, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৫. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানাঃ গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৬. মো. সফিকুল ইসলাম, বয়স : ২৭, পেশা : চাকরি, গ্রাম : কাচপাই, ডাকঘর : সলিমাবাদ, থানা : নাগরপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.৯.২০১১।
৭. বাবু, পিতা : আ. ছালাম, বয়স : ২০, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৮. মো. আ. জব্বার, বয়স : ৫৪, পেশা : ব্যবসা (তুহিন মেডিকেল হল), গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
৯. কে.এম. বদরুল হক (শাহীন), বয়স : ৪০ বছর, পেশা : চাকরি, গ্রাম : সূতীপলাশ, ডাকঘর : সূতী, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল। তারিখ : ২৯.০৮.২০১১।
১০. মো. নুরুজ্জামান, শিক্ষা : বি.এ, বয়স : ৬২, গ্রাম : ডুবাইল (আটাপাড়া), ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, ২৪.১১.২০১১
১১. মো. নজরুল ইসলাম, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪০, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. মো. আ. ছালাম, কমিশনার, গোপালপুর পৌরসভা, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
১৪. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানাঃ গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
১৫. মো. নজরুল ইসলাম, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪০, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
১৬. বাবু, পিতা : আ. ছালাম, বয়স : ২০, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
১৭. মো. আবু হানিফ, বয়স ৪৩, উচ্চমান সহকারী, গোপালপুর পৌরসভা, গোপালপুর ৬.৫.২০১২।
১৮. কে এম মিঠু, বয়স : ৩২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানাঃ গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।
১৯. অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন, পেশা : অধ্যাপনা, সাংবাদিক ও কলামিস্ট। সভাপতি গোপালপুর প্রেসক্লাব, গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১
২০-২৪. মো. নজরুল ইসলাম, পেশা : চাকরি, বয়স : ৪০, গ্রাম : পশ্চিম ডুবাইল, ডাকঘর : ডুবাইল, থানা : গোপালপুর, টাঙ্গাইল, তারিখ : ১৫.১০.২০১১।

www.pathagar.com

লোকভাষা

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্বে টাঙ্গাইল মহকুমা ময়মনসিংহ জেলার অংশ ছিল। পাশাপাশি অবস্থানের জন্য টাঙ্গাইলের ভাষার উপর ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার প্রভাব পড়েছে। এজন্য ঢাকা-ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। জেলার জনসংখ্যার বেশির ভাগ মুসলমান হওয়ায় আরবি, পারসি শব্দ স্বভাবতই যথেষ্ট পরিমাণে এ জেলার শব্দ ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে। 'বেবাক' (সমস্ত ইত্যাদি শব্দ এর উদাহরণ)। নমুনা হিসেবে এ রকম অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতিবেশি অহমিয়া ভাষার দ্বারাও এ ভাষা অনেকটা প্রভাবিত। যেমন আদ্য স্বর হিসেবে 'স' ধ্বনি 'হ' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত ও লিখিত হয়। অহমিয়া ভাষায় উষ্ম বর্ণ আদ্য স্বর হোক বা না হোক কর্কশ 'হ' এর মতো উচ্চারিত হয়। উদাহরণ : 'সে'র স্থলে 'হো', 'সকল' এর স্থলে 'হগল', 'শুয়ার'এর স্থলে 'হুয়ার', 'সম্মুখ' এর স্থলে 'হমকে', 'শুন্যা' এর স্থলে 'হুনা'। টাঙ্গাইল জেলার ভাষার নমুনা হিসেবে বাংলা একাডেমির সংগৃহীত টাঙ্গাইলের লোকগল্প থেকে নীচের অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

"এ্যাক দ্যাশে আছিলো এক মণ্ডল। হেই মণ্ডলের আছিলো তিন ব্যাটা। মণ্ডল খুব সুখে শান্তিত থাইকপার নোছিলো। এ্যাক দিন ছোট ব্যাটা কি এ্যাক রোগ অয়া ধূপ কইরা মইরা গ্যালো। তে মন্ডর খুব কাতর অয়া পইড়লো। মণ্ডলের বৌয়ের আবার আছিলো দশ মাইসা প্যাট। হশুড় বাড়ীত থাইকা খবর আইলো যে তোমার আর এ্যাকটো ব্যাটা ওইছে। তহন মণ্ডল এ্যান্না সুস্থির অয়া কয় যে..."।

এ ভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. উচ্চারণ

শব্দের মধ্যে বা অন্তে 'খ' বর্ণ থাকলে তা কখনো 'হ' ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যথা তখন>তহন (সে সময় অর্থে); চোখে>চোহে। শব্দের অধিস্থিত 'ল' 'ন'তে পরিবর্তিত হয়। যথা : লাগে>নাগে; লেণ>নেণ; লাগাম>নাগাম। অনুরূপভাবে 'ঠ'>ড়; ক>হ, খ>হতে পরিবর্তিত হয়। যথা : পিঠ>পিড, টাকা >টেহা, দেখা>দেহা ইত্যাদি।

২. বিশেষ্য

কর্তৃপদের অন্তে 'ডা' যুক্ত হয়। যেমন পুলাডা (ছেলেটা), বুড়াডা– শিষ্ট ভাষায় অধিকরণ কারকের অন্তে 'তে' হয় কিন্তু এখানে কখনো কখনো 'ত' হয়। যেমন 'বাড়ীতে' স্থলে 'বাড়ীত', 'গলাতে' স্থলে 'গলাত' (কণ্ঠে)।

কর্ম ও সম্প্রদান কারকে বহুবচনে 'দের' স্থলে 'গো' ব্যবহৃত হয়। যেমন 'চাকরদের' 'চাকরগো' (চাকরেরা অর্থে), 'রহিমদের' 'রহিমগো'।

www.pathagar.com

৩. সর্বনাম

সর্বনামের কতকগুলি বিশেষরূপ লক্ষ্যযোগ্য। তাকে অর্থে 'তানে', 'তিনিরে', 'তান' (ডাকায় 'তান' বলে)।

৪. ক্রিয়া

ভবিষ্যৎ কালের উত্তমপুরুষে ক্রিয়াপদের অন্তে 'মু' বসে। যেমন পামু (আমি পাব), যামু (আমি যাব), কমু (আমি বলব) ইত্যাদি।

অতীতকালের প্রথম পুরুষের একবচনের অন্তে 'অ' বর্ণ বা 'ও' বর্ণ উচ্চারিত হয় আবার কখনো কোনটাই হয় না। যেমন দিল>দিলঅ কিংবা দিলো (সে দিয়েছিল অর্থে); আছিল আছিলো (চিল অর্থে)।

অনুজ্ঞার (মান্যার্থে) বিশেষ ধরনের পৃথক রূপ লক্ষ্যণীয় যেমন জিগাইয়েন অর্থাৎ আপনি জিজ্ঞাসা করবেন। সংযোজক ক্রিয়ার অন্তে 'য' ফলা (্য) 'আ' উচ্চারিত হয় যেমন ধইর‍্যা (লিখিতরূপে) হয় 'দইরা' (ধরে নিয়ে অর্থে), কইর‍্যা (লিখিতরূপে) 'কইরা' (করে নিয়ে অর্থে) শন্যা (লিখিতরূপে), 'হুনা' (শুনে নিয়ে অর্থে)।[1]

টাঙ্গাইলের উপভাষার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর উপভাষার সাদৃশ্য রয়েছে।

ক. ধ্বণিতত্ত্ব :

এই ভাষার স্বধ্বণির সংখ্যা সাধারণ বাংলা স্বরধ্বণির অনুরূপ। এখানে অ থেকে ও পর্যন্ত সব ধ্বণিই বিদ্যমান।

১. অ = অসুন, গতর
২. আ = আবাইতা, হাভাতে; পয়সাল, নষ্ট।
৩. ই = (ইটা, ছাইড্যা) । ইটা মাটির ঢেলা।
৪. উ =উপুর, কেমুন
৫. এ = এই ভাবে কি দিন যাবে আমার। (প্রথমে এই)
৬. এ্যা = এ্যাখন ক্যানে কানছো রান্ধার আগে মনে ছিল না।
৭. ও = ও, যথা : ও প্রাণ কানাইরে ওপর বয়ে বাজাও বাঁশি। (প্রথমে ও)

ব্যঞ্জন ধ্বণি

প = পরথম, পরমান
ফ = আফর (ঢিলা করা)
ব = ডুইব্যা (ডুবে যাওয়া)
ত = গাতা (গর্ত),
থ =দাবরানো (দৌড়)
ট = ট্যাহা (টাকা), টেলা (বোকা)
ঠ = ঠ্যালা (ধাক্কা)
ড = ডাহা মিথ্যা (নির্জলা মিথ্যা)
চ = চেলা (শিষ্য)
ছ = ছালা (বস্তা)
জ = জরম (জন্ম)
ঝ = ঝাটা
ক = কইয়্যা, কইছে (বলে), কাইল (কাল)
খ = খাটা (খাটো), এ্যাখন (এখন)
গ = গাও (শরীর)
ঘ = ঘাও (পচঁন)
ম = যেমুন
ন = নুটা (লোটা), চিরজন (সৃজন)
র = রাইত (রাত)
ল = বাল (বালক), আলাজালা
হ = হলা (শলা), দ্যাহ (দহ)

ধ্বণি পরিবর্তন ও রূপধ্বণিতত্ত্ব

শব্দের মধ্যে ধ্বণি পরিবর্তন

১. শব্দের মধ্যে 'হ' ধ্বণি থাকলে তা লোপ পায় বাহির>বাইর

২. অপনিহিত :

নাসিয়া>নাইমা, জ্বলিয়অ>জ্বইল্যা

৩. স্বরভক্তি :

প্রথম >পরথম, প্রান >পরাণ

টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক ভাষার কিছু শব্দ নিম্নে দেয়া হলো :

আকাম – অকাজ
আইশাল – চুলা
আংগ – আমাদের
আছাল – ছিল
আজাইরা – অবসর
আড়া – জঙ্গল
উক্তা – উল্টো
উদলা – খোলা
উলুপোকা – উইপোকা
ইচা – চিংড়ি
ইস্টি – মেহমান
এবা – এমন
কইতর – কবুতর
কদু – লাউ
কাহই – চিরুনী
কামলা – দিনমজুর
কল্লা – মাথা
খ্যাতা – কাঁথা
গাতা – গর্ত
গতর – শরীর
চঙ্গ – মই
চলা – লাকড়ি
চুকা – টক
ছেমা – ছায়া
ছেরা – ছেলে
ছেরি – মেয়ে
জার – শীত
জাইরামী – দুষ্টামী
জিরান – বিশ্রাম
তফন – লুঙ্গি
ততা – গরম
তোংগ – তোমাদের
ত্যাকত্যাকা – নরম
থালি – থালা
দিলগা – লম্বা
দুক্কু – ব্যাথা
দোপা – নিচু
ধূমা – ধোয়া
নাও – নৌকা
নগে – সাথে
ট্যাহা – টাকা
ঠিলা – কলস
ঠ্যাং – পা
পয়লা – প্রথম
সালুন – তরকারী
নারাই – ঝগড়া
বিচোন – পাখা
ডাংগর – বড়
ফিড়া – পিঁড়ি
ফকফকা – পরিষ্কার
ফতুর – নিঃস্ব
বিগার – রাগ
মেলা – অনেক
বাজান – বাবা
হাছা – সত্য
হিয়াল – শিয়াল

তথ্যনির্দেশ

১. *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার*, টাঙ্গাইল- ১৯৯০, পৃ. ২৭১।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

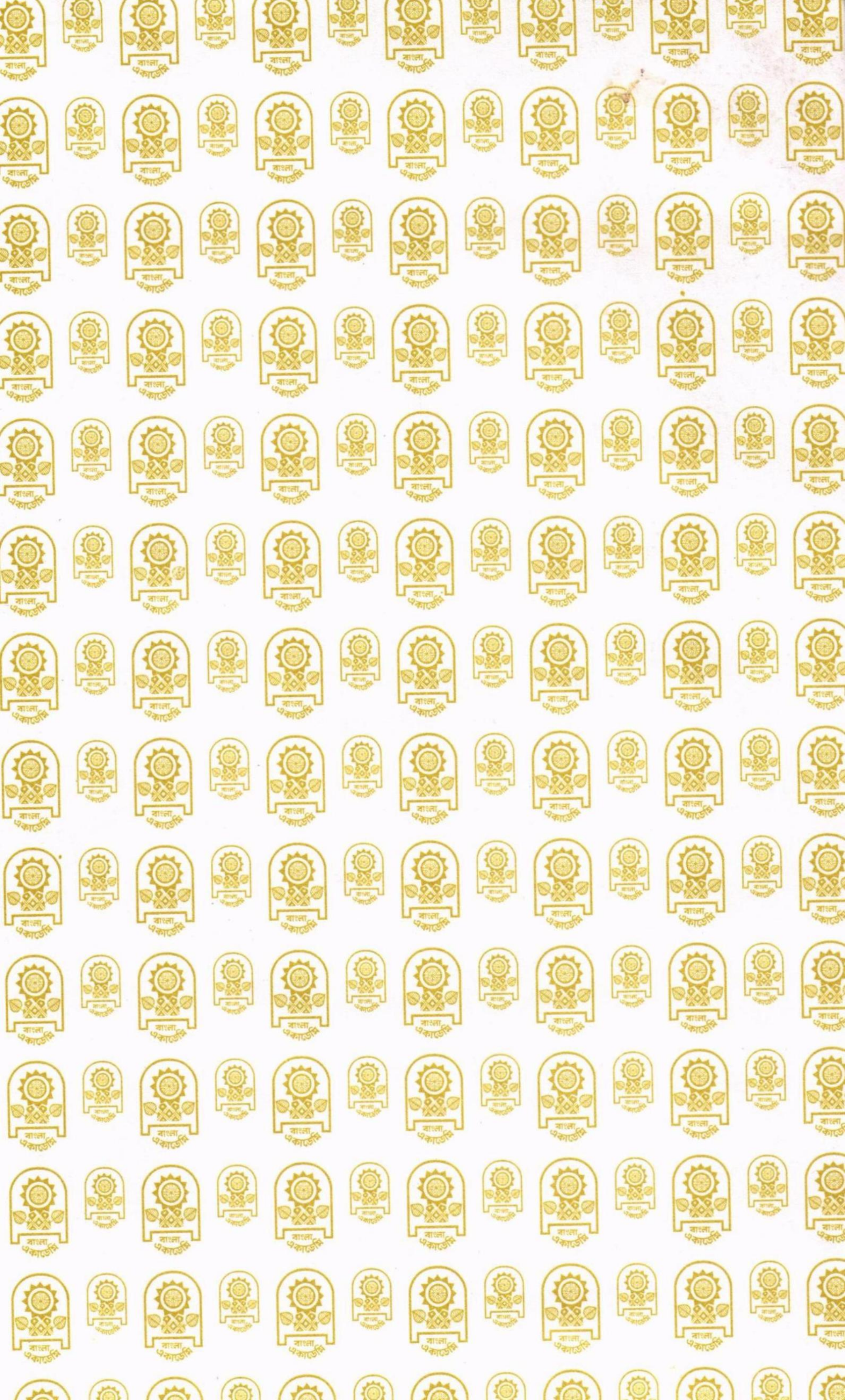
বাংলা একাডেমি